Written strictly in accordance with the latest syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal.

প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

[For Higher Secondary Students]

অনিল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

PRATHAMIK ARTHANAITIK BHUGOL

Elementary Economic Geography

[For Higher Secondary Students]

By Prof ANIL MUKHOPADHYAYA

Price : Rs. 6·50 (Rupees Six and fifty nP.) only

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংশোধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

মূল্য : টা. ৬·৫০ (সাড়ে ছয় টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-প্রবর্তিত উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী অনুসরণে
খিত 'প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যল্প কালের
ই নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার সংশোধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ
াশিত হইল। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে গ্রন্থখানি বিশেষ আদৃত হওয়ায়
ম বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আমার সহকর্মীদের সকৃতজ্ঞ
াদ জানাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে যাহাদের জন্য এই সংস্করণটি প্রকাশিত হইল,
াদের উপকারে আসিলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — অনিল মুখোপাধ্যায়

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : মানুষ ও তাহার পরিবেশ

দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাথমিক উৎপাদন

তৃতীয় খণ্ড : পরিবহন ব্যবস্থা

চতুর্থ খণ্ড : গৌণ উৎপাদন

পঞ্চম খণ্ড : ভোগ ও বাণিজ্য

ষষ্ঠ খণ্ড : আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল

SYLLABUS IN ECONOMIC GEOGRAPHY
FOR HIGHER SECONDARY COURSE

CLASSES IX & X

1. (A) **Man and his environment.**

Principal factors of environment :—

(a) **Physical :** Geographical location, mountains, rivers, coast line, climate, soil, animals, vegetation, minerals, etc.

(b) **Non-physical :** Population, political and social organisation, religion, etc. Adaptation of man to his environment ; effects of environment on the economic life of man.

Examples from Indian conditions.

(B) The Importance of Economic Geography.

(প্রথম খণ্ড : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়)

2. **Climatic regions of the world**—Polar, Temperate (cool and warm), Tropical and Equatorial—their influence on vegetation, animal life, distribution of population, transport, economic development, etc.

Natural divisions of India.

(প্রথম খণ্ড : চতুর্থ অধ্যায়)

3. **Principal resources of the world and their utilization**—(To be studied with special reference to Indian conditions).

(a) **Agricultural and Rural Industries.**

Agriculture—its main features ; intensive and extensive cultivation ; types of farming ; importance of soil and irrigation. Principal agricultural products—(i) Food crops : Rice, Wheat, Tea, Coffee, Sugar-cane, and Sugar-beet ; (ii) Commercial crops : Cotton, Jute, Hemp, Silk, Rubber and Oilseeds. Their uses and principal growing areas, important markets.

(দ্বিতীয় খণ্ড : ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়)

(b) Forests :

(a) Different classes of forests—distribution of forest areas—products of the forests—other advantages. The lumber industry and the paper-pulp industry. (b) Indian forests and their utilisation. (দ্বিতীয় খণ্ড : একাদশ অধ্যায়)

(c) Pastoral Industries :

(a) Livestock—its importance—food, transport and power, raw materials, clothing. Principal products and their uses. Production of raw wool, hides and skins, frozen meat. Important areas devoted to commercial rearing of cattle and sheep.

(b) India's livestock problems—trade in hides and skins. (দ্বিতীয় খণ্ড : অষ্টম অধ্যায়)

4. Minerals and power resources :

(a) Mining : its features. Principal minerals and their uses :

(i) Metals : Iron, Copper, Lead, Tin, Aluminium.

(ii) Non-metallic : Coal, Petroleum, Salt, Mica, Building materials, Principal fields of the world and their reserves, important mining industries.

(b) Hydro-electricity—importance.

(c) Principal minerals in India and their problems. Multipurpose schemes in India in relation to power and irrigation.
(দ্বিতীয় খণ্ড : দশম অধ্যায়)

5. Fishing :

(a) Sources—inland, coastal and deep sea. Physical characteristics of fishing grounds—principal fishing grounds. Problems of the fishing industry.

(b) The fishing industry in india.
(দ্বিতীয় খণ্ড : নবম অধ্যায়)

6. **Transport, trade routes and trade centres :**

(a) Importance of transport—different modes of modern transport—roads, inland waterways, railways, shipping, airways. A descriptive study with special reference to India.

(b) Trade Routes : Land Routes (road and rail). water Routes (ocean, canal and river) and Air-routes. Examples of Important Routes. The Suez Canal and the Panama Canal.
(তৃতীয় খণ্ড : দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়)

(c) Trade Centres :

(i) Ports and Harbours : their functions, relation with the hinterland ; required conditions for development. Some important ports of international standing. India's principal ports.
(ii) Towns and Cities : Conditions favouring growth of some important trade centres of the world. (তৃতীয় খণ্ড : পঞ্চদশ অধ্যায়)

CLASS XI

7. **Manufacturing Industries :**

(a) Essential factors for development—raw materials, power resources, climate, transport, labour and markets. Important Industries—Iron and Steel, Textile (cotton, woollen, silk and artificial silk), Jute, Paper and Chemical. Chief world centres.

(b) Principal manufacturing industries in India—Cotton, Iron and Steel, Jute, Paper, Sugar, Chemical and Engineering. (চতুর্থ খণ্ড : ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়)

8. Foreign Trade of India—direction and composition.
(পঞ্চম খণ্ড : একবিংশ অধ্যায়)

9. Population—regional distribution—density of population —factors of density. (প্রথম খণ্ড : পঞ্চম অধ্যায়)

10. West Bengal—principal Agricultural and Mineral resources—large-scale industries and industrial regions —Tea industry—Importance of Calcutta Port.
(ষষ্ঠ খণ্ড : দ্বাবিংশ অধ্যায়)

প্রথম খণ্ড

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (Definition and Importance)—মানুষের বৈষয়িক জীবনযাত্রার সহিত তাহার পার্থিব পরিবেশের (environment) যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ের তত্ত্ববিচারকে বলে বৈষয়িক বা **অর্থনৈতিক ভূগোল।**

মানুষ পৃথিবীতে বাস করে, পৃথিবীতেই তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। পৃথিবীর জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, ভূ প্রকৃতি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির দ্বারা তাহার জীবন নানা ভাবে প্রভাবিত হয়, আবার তাহার ক্রিয়াকলাপের ফলেও তাহার চারিদিকের পার্থিব পরিবেশে ঘটে নানারূপ পরিবর্তন—বনভূমির স্থলে দেখা দেয় গ্রাম বা শহরের মতো লোকালয়, যোজকের বুক চিরিয়া বাহির হইয়া আসে বড় বড় সামুদ্রিক খাল, এইরূপ আরও কত কী। মানুষ আর পৃথিবীর মধ্যে আছে এইরূপ একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধটির মূলে আছে কার্যকারণের খেলা। ভূগোলের প্রধান কাজ হইল এই কার্যকারণ-সম্বন্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ বহুমুখী। তাহার এই বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে দিকটা বিশেষ করিয়া তাহার বৈষয়িক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহারই সঙ্গে তাহার পার্থিব পরিবেশের কার্যকারণ-সম্বন্ধ কিরূপ, সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক ভূগোলের।

পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বৈষয়িক জীবন এক ছাঁচে ঢালা নয়; কোথাও বনের ফলমূল সংগ্রহ করা আর বনের পশুপক্ষী শিকার করাই তাহার প্রধান উপজীবিকা, কোথাও তাহার প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য, কোথাও প্রধানতঃ শ্রমশিল্পের অনুশীলনকেই সে জীবিকা অর্জনের পন্থা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। **এইরূপ পার্থক্যের কারণ কী?**

ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। **প্রথমতঃ**, বিভিন্ন **পার্থিব পরিবেশ** তাহাকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া থাকে—যেখানে সংবৎসর মাটির উপর কঠিন বরফের স্তূপ জমিয়া থাকে, যেমন উত্তরের হিমমরু বা তুন্দ্রা অঞ্চলে, সেখানে কৃষিকার্য চলে না, যেখানে ভূমিভাগ পর্বতসঙ্কুল, অথবা যেখানে তিব্বতের মতো আকাশচুম্বী মালভূমির অবস্থান, সেখানে মাছের চাষ এক হাসির কথা। **দ্বিতীয়তঃ, মানুষের সংস্কৃতিগত পার্থক্য** অনুযায়ীও মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তাহার ব্যবহার জানিত না বলিয়া যান্ত্রিক শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, ইউরোপ হইতে ঔপনিবেশিকরা সেখানে বসতি স্থাপন করার পরই সেখানে বিবিধ যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের উন্নতি ঘটে।

মানুষকে তাহার পার্থিব পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, কিন্তু তাহার সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না—সে ভাবে দেখিতে গেলে মানুষ হইয়া দাঁড়ায় জৈবধর্মী প্রাণী মাত্র, জীবকুলের মধ্যে মানুষের বিশিষ্ট পরিচয়ই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। ঔপনিবেশিক যুগের ইউরোপীয়েরা ছিল সাধারণ ভাবে একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ; কিন্তু ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করায় পৃথক পৃথক পার্থিব পরিবেশে আসিয়া তাহারা আজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজেদের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। এই সব দেশের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে আজ যে নানারূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল কারণ ইহাই। ভূগোল-বিজ্ঞানে তাই মানুষ বলিতে শুধু জৈবধর্মী মানুষকেই বুঝায় না, বুঝায় সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষকেও। মানুষের এই যে সংস্কৃতি, তাহা উচ্চ বা নীচ বা অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কৃতি-বিহীন মানুষের অস্তিত্ব ভূগোল-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না। এই যে মানুষ, ইহারই বৈষয়িক জীবনযাত্রার আর যে পার্থিব পরিবেশে সেই জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয় তাহার মধ্যে অবিরাম কার্যকারণ-সম্বন্ধের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক ভূগোলের যথার্থ কাজ। তাই অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল (dynamic) শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হইল মানুষ। স্থানগত প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়কে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে সুপরিকল্পিত প্রয়াস তাহারই অনুশীলন এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থনৈতিক ভূগোলকে সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অনুশীলন-ক্ষেত্র (Scope)—অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন দুই

প্রকারের—**বর্ণনামূলক** (descriptive) ও **গঠনমূলক** (constructive)। পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহারই ধারাবাহিক আলোচনাকে বর্ণনামূলক অনুশীলন বলা হয়। কিন্তু পরিবেশ এবং মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ-সম্বন্ধের বর্ণনামূলক অনুশীলন দ্বারা লব্ধ যে জ্ঞান বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে গঠনমূলক অনুশীলন বলা হয়। অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠে বর্ণনামূলক অনুশীলন ও গঠনমূলক অনুশীলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানবজাতির যে সমস্ত প্রধান প্রধান বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদের বিভিন্নতা হিসাবে অর্থ-নৈতিক ভূগোলের অনুশীলন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) ভূমি বা জলভাগ হইতে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা মানুষের সর্বপ্রধান বৃত্তি। এই উৎপাদনকে মুখ্য বা **প্রাথমিক উৎপাদন** (Primary production) বলা হয়। প্রাথমিক উৎপাদন আবার পাঁচ প্রকারের—(ক) কৃষিজ উৎপাদন, (খ) মৎস্য উৎপাদন, (গ) খনিজ উৎপাদন, (ঘ) বনজ উৎপাদন এবং (ঙ) শিকার-বৃত্তি হইতে উৎপাদন। পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কাঁচামাল এবং জনসাধারণের ভোগে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য প্রাথমিক উৎপাদনের সাহায্যেই সংগৃহীত হয় প্রাথমিক উৎপাদন বন্ধ হইলে পৃথিবীর সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে।

(২) প্রাথমিক উৎপাদনের দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদি প্রায়শঃই উৎপাদনক্ষেত্রে ভোগ করা যায় না। সেই কারণে উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমস্ত দ্রব্যাদি **পরিবহন** (Transport) করা প্রয়োজন। অতএব প্রাথমিক উৎ-পাদনের পরেই পরিবহনের স্থান।

(৩) আবার প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যসমূহ ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চাষের ক্ষেত্র হইতে আহৃত পাট ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও চট, থলে, দড়ি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না, অনেক ক্ষেত্রে এভাবে রূপান্তরিত হইয়াই তবে ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হয়। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদির এই রূপান্তরীকরণকে **গৌণ উৎপাদন** (Secondary production) বা **যন্ত্রশিল্প** বলা হয়। সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এরূপ গৌণ উৎপাদনের প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) প্রাথমিক ও গৌণ উৎপাদন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যাদি আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ভোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ বা ব্যবহারই **বাণিজ্যের** (Trade) সূচক।

প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য—মানুষের এই চারিটিই অর্থনৈতিক বৃত্তি। মানুষের পরিবেশের সহিত এই বৃত্তিগুলির যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য।

অনুশীলনের পদ্ধতি (Methods of study)—এই বিশাল পৃথিবীর অগণিত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একত্রে বিচার করা সম্ভব নহে বলিয়া অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলনের জন্য সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। ইহাদের একটিকে **বিষয়ানুগ পদ্ধতি** (topical approach) এবং অপরটিকে **আঞ্চলিক পদ্ধতি** (regional approach) বলা হয়। বিষয়ানুগ পদ্ধতি অনুসারে যে কোন একটি আর্থিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি, স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে কি কি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কিভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করা হয়। আর, আঞ্চলিক পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া উহার পরিবেশ ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে যে কার্যকারণের পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহারও বিশদ আলোচনা করা হয়। বর্তমান পুস্তকে প্রধানতঃ বিষয়ানুগ পদ্ধতিই অনুসৃত হইবে।

অন্যান্য পরস্পর-সম্পর্কিত শাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ (Its relation to other allied subjects)—প্রত্যেকটি শাস্ত্রকেই অন্যান্য নানা শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, ভূগোলও ইহার ব্যতিক্রমস্থল নহে—ইহাকেও অন্যান্য বহু শাস্ত্র হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। ভূত্বক মানুষের বিবিধ পার্থিব পরিবেশের মধ্যে একটি, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূগোল প্রধানতঃ ভূতত্ত্বের (Geology) উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু ও আবহাওয়া মানুষের আর এক শ্রেণীর পার্থিব পরিবেশ, এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূগোল নির্ভর করে প্রধানতঃ আবহবিদ্যার (Meteorology) উপর। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ মানুষের আর একটি পার্থিব পরিবেশ, এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূগোল উদ্ভিদবিজ্ঞানের (Botany) মুখাপেক্ষী। এইভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), সামুদ্রবিদ্যা (Oceanography), জীববিজ্ঞান (Biology) প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের উপরই ভূগোল নির্ভরশীল। আবার মানুষ ও তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্যকরূপে অনুধাবনের জন্য ভূগোল, সমাজতত্ত্ব (Sociology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), ধনবিজ্ঞান (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics), ইতিহাস (History) প্রভৃতি অন্যান্য বহু প্রকার শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলিয়া ভূগোল এই সব শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন নয়। অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভূগোলেরও একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভূগোলে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত

তথ্যাদির বিচার হইয়া থাকে। ভূগোলের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও তাহার পরিবেশ কার্যকারণ-সম্বন্ধের পারস্পরিক সূত্রে আবদ্ধ।

ভূগোল শাস্ত্রকে অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্র হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—(১) **গাণিতিক ভূগোল** (Mathematical Geography)—মহাশূন্যে পৃথিবীর অবস্থান, ইহার আকার ও আয়তন, আবর্তন ও পরিক্রমণ, অক্ষাংশ ও দেশান্তরে ভূপৃষ্ঠের বিভাগ প্রভৃতিই ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু। (২) **প্রাকৃতিক ভূগোল** (Physical Geography)—ভূপৃষ্ঠের গঠন ও উচ্চাবচতা, স্থল ও জলভাগের বণ্টন, জলবায়ু, সমুদ্রস্রোত, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। (৩) **রাজনৈতিক ভূগোল** (Political Geography)—দেশ ও মহাদেশে ভূপৃষ্ঠের বিভাগ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের অধিবাসী, তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, উপজীবিকা প্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। (৪) **অর্থনৈতিক ভূগোল** (Economic Geography)—দেশগত ধনসম্পদের উৎপাদন, উহাদের বণ্টন, পরিবহন ও ভোগ প্রভৃতিই হইল এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

অর্থনৈতিক ভূগোল বৃহত্তর ভূগোলের অংশবিশেষ হইলেও প্রাকৃতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল এবং গাণিতিক ভূগোলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কারণ কোন অঞ্চলের উৎপাদন, বিনিময় ইত্যাদি বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ আবার রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আবার পৃথিবীর গতি, ঋতু পরিবর্তন, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আমরা গাণিতিক ভূগোল পাঠে বুঝিতে পারি।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল—কোন কোন ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography) ও বাণিজ্যিক ভূগোল (Commercial Geography) বলিয়া দুইটি পৃথক্ শাস্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের মতে পরিবেশের সহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া কি ভাবে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে তাহারই অনুশীলন অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু, আর বাণিজ্যিক ভূগোল হইতেছে এই ভাবে মানুষের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব বিচার। তবে এইরূপ বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে, কারণ, অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রসার বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রসার অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং মানুষের পার্থিব পরিবেশ ও তাহার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার তত্ত্ববিচারও অর্থনৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Economic Geography. Indicate the importance and the scope of the subject.

(অর্থনৈতিক ভূগোল কাহাকে বলে? এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং অনুশীলনক্ষেত্র নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১—৪)

2. Examine the relation of Economic Geography with other allied subjects.

(অন্যান্য পরস্পর-সম্পর্কিত শাস্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া বল।) (পৃঃ ৪—৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবী ও পার্থিব পরিবেশ

সৌরজগৎ ও পৃথিবী—সূর্য ও সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু লইয়া যে বিশাল জ্যোতিষ্ক পরিবার উহারই নাম সৌরজগৎ (solar system)। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া উহা হইতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে প্রথমে বুধ (ক্ষুদ্রতম গ্রহ) এবং তাহার পর যথাক্রমে শুক্র (পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ), পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি (বৃহত্তম গ্রহ), শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো এই নয়টি গ্রহ নিজ নিজ নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রায় ২০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বা গ্রহাণু লইয়া গঠিত গ্রহাণুপুঞ্জও (asteroids) এক সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য এই গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার (elliptical) কক্ষপথের (orbit) এক নাভিতে (focus) অবস্থিত রহিয়াছে। পৃথিবী সূর্য হইতে গড়ে* প্রায় ৯·৩ কোটি মাইল দূরে থাকিয়া সূর্যকিরণের ২৩ কোটি ভাগের মাত্র ১ ভাগ পায়। উহাতেই পৃথিবীপৃষ্ঠে কত উত্তাপ, কত আলো!

কোন কোন গ্রহের আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহও রহিয়াছে। ইহারা

*পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ১লা জুলাই তারিখে [পৃথিবীর অপসূর (aphelion) অবস্থান] প্রায় ৯·৪৫ কোটি মাইল এবং ঐ দূরত্ব হ্রাস পাইতে পাইতে ৩১শে ডিসেম্বর [পৃথিবীর অনুসূর (perihelion) অবস্থান] প্রায় ৯·১৫ কোটি মাইলে দাঁড়ায়।

আবার ইহাদের অধিপতি গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগণের ন্যায় ইহাদেরও নিজেদের আলো নাই। সূর্যের আলোকেই ইহারা আলোকিত। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং উহার নিকটতম জ্যোতিষ্ক—মাত্র ২.৩৮ লক্ষ মাইল দূরবর্তী। ইহার আয়তন পৃথিবীর $\frac{১}{৪৯}$ অংশ মাত্র। পৃথিবীকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে চন্দ্রের ২৯½ দিন সময় লাগে।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (universe) অতিক্ষুদ্র অংশ এই সৌর জগৎ আর এই সৌর জগতের এক অতি সামান্য অংশ আমাদের এই পৃথিবী—যেখানে আমরা বাস করি।

পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন—পৃথিবীর আকৃতি একটি অভিগত গোলক (oblate spheroid)-এর ন্যায়। ইহার মেরু ও বিষুব-ব্যাস যথাক্রমে ৭৮৯৯ ও ৭৯২৬ মাইল এবং ইহার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বৃহত্তম পরিধি যথাক্রমে প্রায় ২৪,৮৬০ ও ২৪,৯০২ মাইল। পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট আয়তন ১৯.৭ কোটি বর্গ মাইল। ইহার প্রায় ২৯.২% (৫.৭ কোটি বর্গ মাইল) স্থলভাগ, অবশিষ্ট প্রায় ৭০.৮% (১৪.০ কোটি বর্গমাইল) জলভাগ।

পৃথিবীর গতি—পৃথিবীর আবর্তন (rotation) ও পরিক্রমণ (revolution) এই দুইটি গতি রহিয়াছে। পৃথিবী নিজ অক্ষের* চারিদিকে অবিরত পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। ইহাকে পৃথিবীর আবর্তন গতি বলে। একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হইতে পৃথিবীর মোট ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়কে সৌর দিবস (solar day)** বলে। একদিনে একবার আবর্তন হয় বলিয়া পৃথিবীর এই গতিকে আহ্নিক-গতিও বলা হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠে পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রি, প্রভাত ও সন্ধ্যা, এবং ঊষা ও গোধূলি হইতেছে। আবার এই আবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যাইতেছে (ফেরেলের সূত্র)।

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হইতে হইতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে (এই কক্ষপথের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি মাইল) গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল বেগে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে। ইহাকে পরিক্রমণ-গতি বলে। সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড সময় লাগে। ইহাই আমাদের সৌর বৎসর। একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে এক বৎসর সময় লাগে বলিয়া

* পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখাটি ধ্রুবনক্ষত্রের অভিমুখী হইয়া কক্ষ-সমতলের সহিত সর্বদাই প্রায় ৬৬½° কোণ করিয়া অবস্থিত থাকে।

** সূর্য-নিরপেক্ষ ভাবে এক পাক ঘুরিতে পৃথিবীর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময় লাগে। ইহাকে নাক্ষত্রদিন (sidereal day) বলে।

পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতিও বলা হয়। পৃথিবীর এই পরিক্রমণ-গতির ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি এবং ঋতুভেদ হইয়া থাকে।

পৃথিবীর স্তর-বিন্যাস—পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৪০০০ মাইল ব্যাসযুক্ত স্থান লৌহ, নিকেল, প্রভৃতি গুরুভার পদার্থে পরিপূর্ণ। এই স্তরের নাম **কেন্দ্রমণ্ডল** (Centrosphere)। ইহা এখনও উত্তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। কেন্দ্র-মণ্ডলের ঠিক উপরেই রহিয়াছে **গুরুমণ্ডল** (Barysphere)। ইহার গভীরতা প্রায় ৮০০ মাইল। ভারী শিলা ও লৌহ ইহার প্রধান উপাদান। ইহাও অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। গুরুমণ্ডলের উপরেই রহিয়াছে **অশ্মমণ্ডল** (Litho-sphere)। কঠিন ভূত্বক ও তাহার নীচের কিয়দংশ লইয়া ইহা গঠিত। অশ্মমণ্ডল প্রায় ৭০০ মাইল গভীর * এই স্তরের সমস্টাই লঘু ও ঈষৎ-গুরু শিলাদ্বারা গঠিত। অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগ যত কঠিন, নিম্নাংশ তত কঠিন নহে। ইহার কারণ ভূপৃষ্ঠ শীতল হইলেও ভূগর্ভ এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে।† ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত বারিরাশির নাম **বারিমণ্ডল** (Hydrosphere)। ইহা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র ব্যাপ্ত নহে, গভীরতাও সর্বত্র সমান নহে।‡ পৃথিবীর গ্যাসীয় আবরণের নাম **বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere)। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে প্রায় ২০০।৩০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।
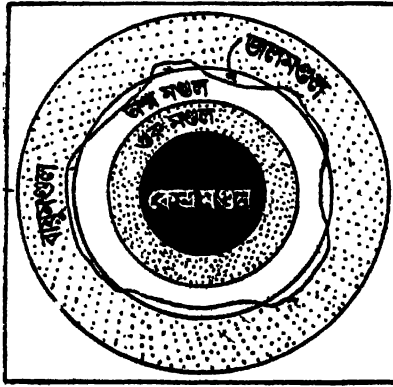
১নং চিত্র—পৃথিবীর স্তর-বিন্যাস

অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল মানবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই তিনটি মণ্ডলের সংযোগ-ক্ষেত্রেই মানবজাতির সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। অশ্মমণ্ডলের অন্তর্গত স্থান-বিশেষের অবস্থান, সৈকতরেখা, আকার, আয়তন, শিলা, খনিজ, মৃত্তিকা, জৈব-প্রকৃতি ও উদ্ভিজ্জসংস্থান, ভূপ্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ জলভাগ ; বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত

* ভূগর্ভের স্তরবিন্যাস ও বিভিন্ন স্তরের গভীরতা সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদগণ এখনও সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই।

† গুরু ও কেন্দ্রমণ্ডল এই উভয় স্তরের উপাদানগুলি অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় থাকার জন্য তরল অবস্থায় থাকিবার কথা। কিন্তু উপরের অশ্মমণ্ডলের প্রবল চাপের ফলে এই সকল পদার্থ ইস্পাতের ন্যায় কঠিন ও স্থিতিস্থাপক অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন।

‡ সমুদ্র-সমতল হইতে স্থলভাগের সর্বাধিক উচ্চতা এবং জলভাগের তলদেশের সর্বাধিক গভীরতা, এই দুই-ই প্রায় সমান (প্রায় ৬ মাইল)।

স্থানীয় জলবায়ু এবং বারিমণ্ডলের অন্তর্গত সমুদ্র ও সমুদ্রস্রোতই হইল প্রধান প্রধান পার্থিব পরিবেশ।

অশ্মমণ্ডল

জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফলের ২৯.২% বা ৫ ৭ কোটি বর্গমাইল স্থলভাগ। এই স্থলভাগ সাতটি মহাদেশ, যথা -এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কুমেরু দেশ বা অ্যান্টার্কটিকা, ইউরোপ ও ওশিয়ানিয়া এবং অসংখ্য দ্বীপ লইয়া গঠিত
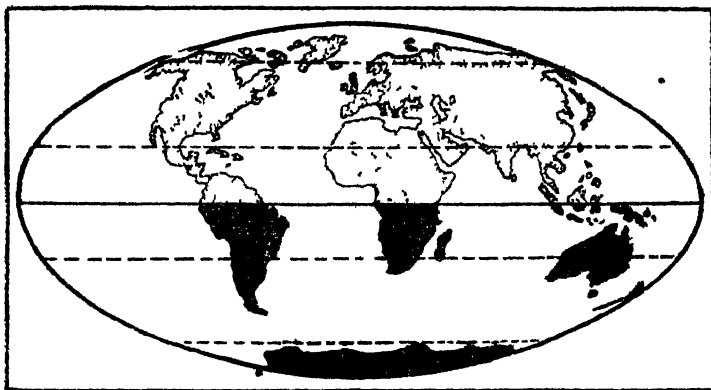
২নং চিত্র—উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের স্থলভাগ

পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থলভাগের অবস্থানে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:—(১) পৃথিবীর মোট স্থলভাগের $\frac{2}{3}$ অংশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত, (২) সুমেরুবৃত্তের চারিদিকে স্থলভাগ বৃত্তাকারে অবস্থিত, (৩) বৃহদায়তন স্থলভাগসমূহের বিস্তৃতি উত্তরাংশেই অধিক, দক্ষিণাংশে ইহারা ক্রমশঃ সংকীর্ণ, (৪) স্থলভাগসমূহের পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি অপেক্ষা উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃতিই অধিক এবং (৫) ভূপৃষ্ঠের যে অংশে স্থলভাগ (বা জলভাগ) তাহার প্রতিপাদে জলভাগ (বা স্থলভাগ) রহিয়াছে

শিলা (Rock)—বালি, কাঁকর, কাদা, পাথর প্রভৃতি যে সমস্ত নরম ও কঠিন উপাদানে ভূত্বক গঠিত তাহাদের সাধারণ নাম শিলা। অশ্মমণ্ডলের সুকঠিন অংশকে **শয্যাশিলা** (bedrock) বলা হয়। তবে অধিকাংশ স্থলেই ইহা শিলাচূর্ণ দ্বারা আবৃত থাকে। এইরূপ শিলাচূর্ণকে **আবরক শিলা** (mantlerock) বলে। শয্যাশিলা প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত।

উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা হইতে শীতল ও কঠিন হইবার সময়ে পৃথিবীর চারিদিকে প্রথমে যে শিলাস্তর গঠিত হইয়াছিল তাহার নাম **আগ্নেয়** (igneous) বা **প্রাথমিক** (primary) শিলা। এই জাতীয় শিলাতে কোন স্তরবিন্যাস নাই বলিয়া ইহাকে **অস্তরীভূত** (unstratified) শিলাও বলা হয়। আগ্নেয় শিলা ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত (extrusive) ও অকেলাসিত, যেরূপ অবসিডিয়ান, অথবা ভূগর্ভে অন্তপ্রবিষ্ট (intrusive) ও কেলাসিত, যেরূপ গ্রানাইট, এই দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়িত ও পরিবাহিত প্রাথমিক শিলার অংশগুলি হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে পলির আকারে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইতেছে। কালক্রমে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ, উপরিস্থ জলরাশি ও পলিস্তরের চাপ এবং মৃত সামুদ্রিক জীবের দেহজাত পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় নীচের স্তরগুলি ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া কঠিন **পাললিক** (sedimentary) বা **স্তরীভূত** (stratified) শিলায় পরিণত হয়। ভূ-আলোড়নের ফলে এই শিলাস্তর সমুদ্রের উপরে উঠিয়া আসে এবং বহুক্ষেত্রে উচ্চভূমি ও পর্বতমালার (হিমালয়, আল্পস্ প্রভৃতি) সৃষ্টি করে। বেলেপাথর, চুনাপাথর, কাদাপাথর, খড়িমাটি প্রভৃতি পাললিক শিলা। প্রাণিদেহ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ অনেক সময় ভূপ্রোথিত হইয়া তাপ ও চাপের ফলে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। ইহাও পাললিক, তবে জীবদেহ হইতে সৃষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে **জৈব** (organic) **শিলা** বলা হয়। একপ্রকার চুনাপাথর ও কয়লা এই শ্রেণীর শিলা। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বায়ুতাড়িত ধূলি ও বালুকণা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া যে 'লোয়েস'-এর সৃষ্টি করিয়াছে উহাও পাললিক, তবে উহা সমুদ্রগর্ভে সৃষ্ট হয় নাই।

কখনও কখনও ভূগর্ভস্থ উত্তাপ, স্তরের চাপ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব, ভূ-আন্দোলন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাথমিক ও পাললিক শিলা পরিবর্তিত হইয়া নূতন প্রকারের কেলাসিত শিলায় পরিণত হয়। ইহাকে **পরিবর্তিত** বা **রূপান্তরিত** (metamorphic) শিলা বলে। এইভাবে কাদাপাথর শ্লেটে, বেলেপাথর কোয়ার্টজাইটে, চুনাপাথর মার্বেলে, কয়লা গ্রাফাইটে, গ্রানাইট নীসে পরিণত হয়।

খনিজ (Minerals)—শিলাসমূহ খনিজ দ্রব্য হইতেই উদ্ভূত। পৃথিবীর অধিকাংশ শিলাই প্রধানতঃ কোয়ার্টজাইট, ফেল্‌ড্‌স্পার, অভ্র, হর্নব্লেণ্ড ও ক্যালসাইট এই পাঁচটি খনিজ দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই কারণে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিলাসমূহের সহিত খনিজ দ্রব্যের একটি বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অধিকাংশ ধাতব খনিজ পদার্থের আকরসমূহ আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই পাওয়া যায়। কয়লা ও খনিজ তৈল সর্বদাই পাললিক শিলাস্তরে পাওয়া যায়। অবশ্য আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলাজাত স্বর্ণ, রাং, রত্ন প্রভৃতি

কয়েকটি ধাতব খনিজ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়িত ও বাহিত হইয়া পাললিক শিলাস্তরেও সঞ্চিত হইতে পারে, যেরূপ পাললিক স্বর্ণ।

মৃত্তিকা (Soil)—ভূ-ত্বক বিভিন্ন শিলাস্তরে গঠিত। সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা এই শিলাস্তর অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হইতেছে। ঐ সকল শিলাচূর্ণের সহিত জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকার সৃষ্টি হইতেছে।

বৈশিষ্ট্য (Features)—মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভর করে ইহার বর্ণ, কণিকার আকার ও গঠন, জলধারণের ও বায়ু-প্রবেশের ক্ষমতা, গভীরতা, প্রবেশ্যতা, ঢাল, প্রাচীনতা, রাসায়নিক ধর্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণতঃ ঘোর বাদামী বা কৃষ্ণ **বর্ণের** (colour) মৃত্তিকায় অধিক জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকায় উহা উর্বর ও কৃষিকার্যের উপযোগী। হাল্কা বাদামী, ধূসর বাদামী, রক্ত, পীত, ধূসর ও শ্বেত বর্ণের মৃত্তিকায় অতি সামান্য জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকায় উহা সাধারণতঃ অনুর্বর। মৃত্তিকা-কণিকার **আকার** (texture) সাধারণতঃ ২৫৬ মিলিমিটার (বোল্ডার) হইতে $\frac{1}{256}$ মি. মি. (কাদার কণিকা) পর্যন্ত হইয়া থাকে। তবে মৃত্তিকা সাধারণতঃ বিভিন্ন আকারের কণিকার সংমিশ্রণে গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে বালিমাটি, অধিক বালিযুক্ত দো-আঁশ মাটি, দো-আঁশ মাটি (৩০-৫০ ভাগ বালি, ৩০-৫০ ভাগ পলি এবং ২০ ভাগের অনধিক কাদার সমন্বয়ে গঠিত), অধিক পলিযুক্ত দো আঁশ মাটি, অধিক কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটি ও কাদামাটি—এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সূক্ষ্ম ধূলিচূর্ণ একত্রিত হইয়া মৃত্তিকার **গঠন** (structure) সৃষ্টি করে। মৃত্তিকার এই গঠন দানাদার, ইটের ন্যায় প্রভৃতি নানা আকারের হইয়া থাকে। তবে মাঝারি গঠনের দো-আঁশ মাটিই কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। ভারী কাদামাটিতে কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। হাল্কা বালিমাটিতে কৃষিকার্য একেবারেই চলে না। **রাসায়নিক ধর্ম** (chemical properties) হিসাবে মৃত্তিকাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। **অম্লধর্মী** (acidic) মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ অল্প থাকে বলিয়া ইহা কৃষিকার্যের অনুপযোগী, তবে চুনযুক্ত হইলে ইহা শস্যপ্রসূ হয়। **ক্ষারধর্মী** (alkaline) মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ অধিক থাকে এবং ইহা কৃষি-কার্যের বিশেষ উপযোগী।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—জলবায়ুর উপর মৃত্তিকার গঠন বহুলাংশে নির্ভর করে বলিয়া জলবায়ুর বিভিন্নতা হিসাবে পৃথিবীর পরিপুষ্ট মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা, (২) আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা এবং (৩) মধ্যবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা।

(১) **শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedocals)**—এই মৃত্তিকা উর্বর, চুনপ্রধান এবং উদ্ভিদ-খাদ্য নানা ধাতব পদার্থে পূর্ণ। ইহা ক্ষারধর্মী, এবং

জলসিঞ্চিত হইলে ইহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহার স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে ১'-২' পর্যন্ত গভীর হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য হিসাবে এই মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) **কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা** (chernozems)—তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত অধিক, বাষ্পীভবন অল্প এবং দীর্ঘ ও নিবিড় তৃণ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর, এবং জলসিঞ্চিত হইলে প্রচুর গম, যব, ভুট্টা, বীট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। দঃ পূঃ রুশিয়া হইতে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, এবং উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলের ভূমিভাগ এই মৃত্তিকায় গঠিত। (খ) **রক্তাভ-বাদামী মৃত্তিকা** (chestnut earths)—তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত মধ্যম প্রকারের এবং নিকৃষ্ট তৃণ জন্মে সে স্থানে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত জলসেচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে এই মৃত্তিকায় চারণযোগ্য তৃণ, গম, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি জন্মে। (গ) **বাদামী মৃত্তিকা** (brown earths)--তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫"-র অনধিক এবং তৃণ খর্বাকৃতিবিশিষ্ট সেই সমস্ত স্থানে চাঙ্ক, অল্প জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ-যুক্ত এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহে পশুপালন ও শুষ্কচাষপ্রথায় কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। (ঘ) **পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকা** (gray earths)—ইহা মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের মৃত্তিকা। ফসফরাস ব্যতীত উদ্ভিদ্-খাদ্য ধাতব পদার্থে পূঃ ও অল্প জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন যুক্ত এই মৃত্তিকা প্রায় সকল কার্যেরই অনুপযুক্ত।

(২) **আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা** (Pedalfers)—এই শ্রেণীর মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর, অল্প চুন ও উদ্ভিদ-খাদ্য জৈব ধাতব পদার্থ ও নাইট্রোজেন যুক্ত এবং লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ। ইহা অম্লধর্মী এবং এই মৃত্তিকার স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১"-২ পর্যন্ত গভীর। এই শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) **ধূসরবর্ণের মৃত্তিকা** (podzol)—প্রধানতঃ সরলবর্গীয় এবং কখনও কখনও মিশ্র ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যধিক অম্লধর্মী ও অত্যন্ত অনুর্বর। চুন ও সারের ব্যবহারের দ্বারা এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে আলু ও চারণযোগ্য তৃণ উৎপাদিত হয়। (খ) **ধূসর বাদামী বর্ণের মৃত্তিকা** (gray-brown earths)—মধ্য অক্ষাংশের অন্তর্গত উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য ইউরোপের আর্দ্রতর ও উষ্ণতর অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরভাগে তৃণগুল্মযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা অল্প অম্লধর্মী এবং সাধারণতঃ উর্বর। এই শ্রেণীর মৃত্তিকায় ফলের চাষ, পশুপালন, তামাক, খাদ্যশস্য ও দ্রাক্ষার উৎপাদন ভাল হয়। (গ) **রক্ত ও পীত বর্ণের মৃত্তিকা** (red and yellow

earths)—প্রধানতঃ ক্রান্তীয় এবং কখনও কখনও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অরণ্যাচ্ছাদিত অংশে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত অম্লধর্মী ও অল্প উদ্ভিদ্-খাদ্যযুক্ত, তবে চুন ও সারের ব্যবহার করিলে এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিভাগে তামাক, কার্পাস, নানাবিধ ফল প্রভৃতি প্রচুর জন্মে।

(ঘ) **রক্তবর্ণের মৃত্তিকা** (red lateritic soil and laterite)—প্রধানতঃ ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের ভূমিভাগে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। অল্প সবমাটি ও অধিক লৌহ কণিকাযুক্ত এই মৃত্তিকা অত্যন্ত অম্লধর্মী, তবে উত্তম গঠনযুক্ত হওয়ায় সার ব্যবহারের দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। এইরূপ মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলের স্থানে স্থানে অভ্যন্তরভাগে লৌহকণিকা প্রগাঢ় ভাবে সঞ্চিত হওয়ায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহপ্রস্তর গঠিত হয়।

(৩) **মধ্যবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা বা প্রেয়রী মৃত্তিকা** (Prairie earths)—ইহা পেডালফার ও পেডোক্যাল এই দুই শ্রেণীর মৃত্তিকারই গুণবিশিষ্ট। আর্দ্র অঞ্চলে দৃষ্ট হইলেও এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিভাগে দীর্ঘ তৃণ নিবিড় ভাবে জন্মে। এইরূপ মৃত্তিকা মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রায় সমপরিমাণ চুন, লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম কণিকা বিদ্যমান থাকায় ইহা সমধর্মী, তবে অবস্থানভেদে সামান্য অম্লধর্মীও হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণের এবং অত্যন্ত উর্বর। এই মৃত্তিকায় খাদ্যশস্য, বিশেষতঃ ভুট্টা ও গম, এবং কার্পাস প্রচুর জন্মে।

মৃত্তিকার সমস্যা (Soil Problems)—নানাবিধ কারণে ভূত্বকের বহিঃস্তরের **ক্ষয়** (erosion) এবং একই ক্ষেত্রে বারংবার শস্য উৎপাদনের ফলে ভূমির **উর্বরতা হ্রাস** (exhaustion) কৃষিকার্যের প্রধান অন্তরায়। সাধারণতঃ পার্বত্য ও শুষ্ক মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই ভূত্বকের বহিঃস্তরের ক্ষয় ব্যাপক। তবে বনোৎপাটন, অতিচারণ, অবৈজ্ঞানিক চাষ প্রণালী, এবং বিবেচনাহীনভাবে ভূত্বকের অপসারণের দ্বারাই যে ভূত্বকের অধিকতর ক্ষয় সাধিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভূমিক্ষয় নানাপ্রকারের হইয়া থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে বৃষ্টি ও বায়ু তাড়িত (splash and wind) ক্ষয়, ক্ষেত্রের সমস্ত অংশ হইতে সমপরিমাণ (sheet) ক্ষয়, প্রণালী (gully) ক্ষয়, অভ্যন্তরীণ শিলাস্তরের বহিঃপ্রকাশ (rock outcrop), এবং সমতল ভূমিভাগের মধ্যে মধ্যে অনুর্বর স্তূপের (bad land) সৃষ্টিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভূমিক্ষয়রোধক ব্যবস্থা হিসাবে নূতন অরণ্য রচনা, বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তন, বায়ুপ্রবাহ-রোধক অরণ্যবলয় রচনা, ক্ষয়প্রণালীর পূরণ প্রভৃতি আশু কর্তব্য। ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে মৃত্তিকাক্ষয় একটি প্রধান সমস্যা হইলেও কৃষকেরা এই সমস্যা সমাধানে বিশেষ কৃতকার্য হয় নাই। ক্ষেত্রে কৃত্রিম সার দিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্যাবর্তন করিয়া এবং ক্ষেত্রকে পতিত রাখিয়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন রূপ (Land Forms)—বিভিন্ন জাতীয় শিলা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া ভূত্বক গঠন করিয়াছে। কিন্তু স্তরগুলি সর্বত্র এক সমতলে নাই। কোথাও শিলাস্তর উচ্চ হইয়া স্থলভাগের গঠন করিয়াছে আবার কোথাও বা ভূগর্ভে নামিয়া গিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূত্বকের এই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তি ও উত্তাপের জন্য শয্যাশিলার আলোড়ন (diastrophism) ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত (vulcanism)-এর দ্বারা যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে তাহাকে আকস্মিক পরিবর্তন' এবং সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, সাগরতরঙ্গ, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অতি ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে তাহাকে ধীর পরিবর্তন বলা হয়। ভূত্বকের এই ধীর পরিবর্তন সাধারণতঃ ভূত্বকের ক্ষয়ীভবন ও আবহবিকার-জনিত নগ্নীভবন, ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাচূর্ণের বহন ও উহাদের অবক্ষেপণ এই ত্রিবিধ কাযের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। ভূত্বকের আকস্মিক ও ধীর পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠে পবত, মালভূমি, সমভূমি, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অন্তরীপ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থলরূপের উদ্ভব হয়।

সাধারণতঃ বহুদূর বিস্তৃত, অতিশয় বন্ধুর ও তীব্র ঢালুযুক্ত সুউচ্চ শিলা-স্তূপকে **পর্বত** (mountains) এবং অল্পদূর বিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ, অল্প বন্ধুর ও অল্প ঢালযুক্ত শিলাস্তূপকে **পাহাড়** (hill) বলে। উৎপত্তির কারণ হিসাবে পৃথিবীর পর্বতগুলিকে ভঙ্গিল পর্বত, স্তূপ পবত, ক্ষয়জাত পর্বত ও সঞ্চয়জাত পর্বত এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০´-এরও অধিক উচ্চে অবস্থিত সুস্পষ্ট ঢাল ও বন্ধুরতা-যুক্ত বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে **মালভূমি** (plateaus) বা অধিত্যকা বলে। মালভূমি প্রায়ই পর্বতবেষ্টিত হইয়া থাকে। ভূসংক্ষোভের ফলে ভূত্বকের কোন বিস্তীর্ণ সমতল অংশের উন্নয়ন বা আগ্নেয়গিরি-নির্গত লাভা-সঞ্চয় হেতু বহু মালভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। নদী ও বৃষ্টির জলধারার প্রভাবে উচ্চ মালভূমির কোমল শিলাসমূহের অপসারণ-জনিত ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিও বহু স্থানে দৃষ্ট হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনুচ্চ কিংবা প্রায় সমতলে অবস্থিত, অল্প বন্ধুরতা ও মৃদু ঢালযুক্ত বিস্তৃত স্থলভাগকে **সমভূমি** (plains) বলে। উৎপত্তির কারণ হিসাবে সমভূমিগুলিকে সাধারণতঃ প্লাবন সমভূমি, বদ্বীপ সমভূমি, উপকূলীয় সমভূমি, হ্রদ সমভূমি, হিমবাহ সমভূমি, লোয়েস সমভূমি ও নগ্নীভূত সমভূমি এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

দুইটি উন্নত ভূমির মধ্যবর্তী অবনতভূমিকে **উপত্যকা** (valleys) বলে। উৎপত্তির কারণ অনুসারে উপত্যকাগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। ভঙ্গিল পর্বতের দুইটি ঊর্ধ্বভঙ্গের (anticline) মধ্যবর্তী অধোভঙ্গকে (syncline) পার্বত্য উপত্যকা, ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের দুইটি সমান্তরাল

চ্যুতির (fault) মধ্যবর্তী অবনত অংশকে গ্রস্ত উপত্যকা, হিমবাহের ক্রমাগত ঘর্ষণে পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন উপত্যকাকে হিমবাহ উপত্যকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত সমভূমিতে পরিণত নদীখাতকে নদী উপত্যকা বলে।

চারিদিকে সমুদ্রজলবেষ্টিত স্থলভাগের নাম **দ্বীপ** (island)। মহাদেশের নিকটেই অবস্থিত এবং মহাদেশ হইতে অগভীর ও অপ্রশস্ত জলভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন স্থলভাগকে মহাদেশীয় দ্বীপ এবং মহাদেশ হইতে বহুদূরে মহাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বীপসমূহকে মহাসাগরীয় দ্বীপ বলে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন (Topography)—ভূপ্রকৃতি হিসাবে আমরা পৃথিবীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(ক) **ভঙ্গিল পর্বতাঞ্চল** (fold mountains)—পৃথিবীর ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী ইউরেশিয়ার মধ্যভাগ অবলম্বন করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিন্যস্ত রহিয়াছে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে আটলাস পর্বতশ্রেণী নামে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণে সিয়েরা নেভাডা এবং উত্তরে ক্যান্টাব্রিয়ান ও পীরেনীজ নামে স্পেন অতিক্রম করিবার পর ইহা দক্ষিণ ইউরোপের আল্পস্ পর্বতগ্রন্থিতে মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে ট্রানসিলভ্যানিয়ান আল্পস, বলকান পর্বত, দিনারিক আল্পস্, পিণ্ডাস,
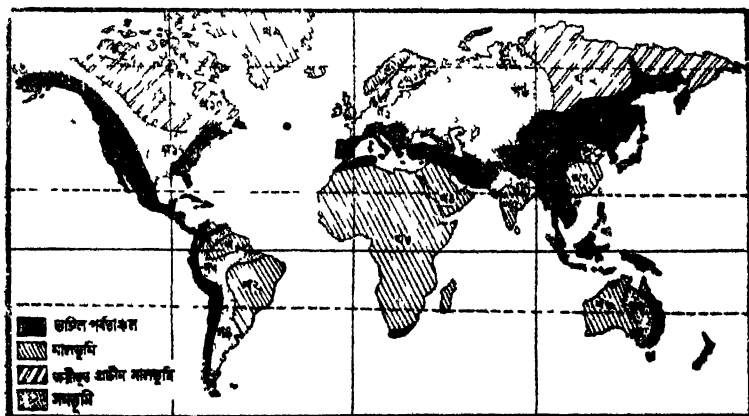
৩নং চিত্র—পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন

রোডোপ এবং আপেনাইন নামে নানা শাখা প্রশাখায় মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ অতিক্রম করিয়া পন্টিক, টরাস, ককেশাস ও আর্মেনীয় গ্রন্থি নামে এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। আর্মেনীয় গ্রন্থি হইতে এক শাখা উত্তর দিকে এলবুর্জ ও হিন্দুকুশ নামে এবং অপর শাখা দক্ষিণ দিকে জ্যাগ্রোস নামে প্রসারিত হইয়া পামীর গ্রন্থিতে মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে হিমালয়, কারাকোরাম, কুয়েনলুন প্রভৃতি পর্বতমালায় পরিণতি লাভ করিয়া তিব্বতের মালভূমি অতিক্রম করিয়াছে। তিব্বতের প্রায় একদিকে ইহার গতি ব্রহ্মদেশ ও

মালয়ের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়ায়, একটি শাখার গতি নিউজীল্যাণ্ডে আর মূল শাখা গিয়াছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, সিখোটা আলিন, শাখালিন, কামচাট্‌কা এবং সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে। এখান হইতে ইহা গিয়া পৌঁছিয়াছে আমেরিকায়। সেখানে ইহার গতি উত্তর-দক্ষিণমুখী। আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ব্যাপিয়া ইহা উত্তর আমেরিকায় রকি ও দক্ষিণ আমেরিকায় আন্দিজ পর্বতমালা রূপে স্থবিন্যস্ত রহিয়াছে।

(খ) **মালভূমি অঞ্চল** (plateaus)—পৃথিবীর প্রধান প্রধান মালভূমি হইতেছে গিয়ানার উচ্চ মালভূমি (খ১), ব্রাজিলের মালভূমি (খ২), আফ্রিকার প্রায় সমগ্র অংশ (খ৩), আরব (খ৪), দাক্ষিণাত্য (খ৫), পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া (খ৬), চীন (খ৭), স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (খ৮), ও গ্রীনল্যাণ্ড (খ৯)। এই মালভূমিসমূহের অধিকাংশই প্রাচীন রূপান্তরিত শিলায় গঠিত। ইহা ব্যতীতও যে সমস্ত মালভূমি ক্ষয়ীভূত হইয়া বর্তমানে সমস্থলীতে (peneplains) পরিণত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল লরেন্সীয় ফলক (খ১০), বাল্টিক ফলক (খ১১) ও আঙ্গারাল্যাণ্ড (খ১২)।

(গ) **সমভূমি অঞ্চল** (plains)—অপেক্ষাকৃত নূতন পাললিক শিলাস্তরে গঠিত সমভূমিগুলির মধ্যে প্রধান কয়টি হইতেছে—উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগের সমস্থলী (গ১); দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনোকো নদীর পযঙ্ক (গ২), আমাজন নদীর অববাহিকা (গ৩), পারানা-পারাগুয়ে নদীদ্বয়ের অববাহিকা (গ৪); ইউরোপীয় সমভূমি (গ৫), পশ্চিম সাইবেরিয়া (গ৬), উত্তর ভারত (গ৭), উত্তর চীনের সমভূমি (গ৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ভাগের নিম্নভূমি (গ৯)।

বায়ুমণ্ডল

স্তরবিন্যাস—ভূপৃষ্ঠ হইতে ২০০।৩০০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমণ্ডলে একটির উপর আর একটি এইভাবে বহু বায়ুস্তর রহিয়াছে। উপরের বায়ুস্তর নীচের বায়ুস্তরের উপর অবিরত চাপ দিতেছে বলিয়া পৃথিবীর ঠিক উপরেই যে বায়ুস্তর আছে তাহা খুব ঘন আর উপরের বায়ুস্তরগুলি ক্রমশঃ হাল্কা। সমুদ্রতল হইতে প্রায় ১০।১১ মাইল* উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবাহযুক্ত ও মেঘসঙ্কুল নিম্ন বায়ুমণ্ডলকে 'ট্রপোস্ফিয়ার', এই স্তর হইতে ৪০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায়-প্রবাহহীন, শীতল এবং সর্বত্র প্রায়-সমতাপযুক্ত মধ্য বায়ুমণ্ডলকে 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' এবং উহার উপরের বায়ুমণ্ডলকে 'আয়োনোস্ফিয়ার' বলে। জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সাধারণতঃ নিম্ন বায়ুমণ্ডল বা 'ট্রপোস্ফিয়ারের' প্রকৃতি-পরিবর্তনকেই বুঝিয়া থাকি।

* মেরু অঞ্চলে ৪ মাইল ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১২ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত।

বায়ুর উপাদান—বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদান হইল নাইট্রোজেন (৭৮%), অক্সিজেন (২১%) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, আর্গন, নিওন, ক্রিপটন ও জেনন গ্যাস (১%)। ইহা ব্যতীত প্রচুর জলীয় বাষ্প, ধূম ও ধূলিকণায় বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ।

বায়ুর ধর্ম—বায়ুর ধর্ম হইল :—(১) তাপ পাইলে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হয়, তাপ হ্রাস পাইলে বায়ু সংকুচিত ও ভারী হয়। (২) চাপ বৃদ্ধি পাইলে বায়ু সংকুচিত, ভারী ও উষ্ণ হয়, চাপ হ্রাস পাইলে বায়ু প্রসারিত, লঘু ও শীতল হয়। (৩) উষ্ণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা শীতল বায়ু অপেক্ষা অধিক। (৪) জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা লঘু এবং (৫) বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অধিক।

বায়ুর উষ্ণতা (Temperature)—সূর্যকিরণ হইতে তাপ শোষণ, উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে বায়ুমণ্ডলে তাপ বিকিরণ, উত্তপ্ত ও শীতল বায়ুর পরিচলন ও মিশ্রণ
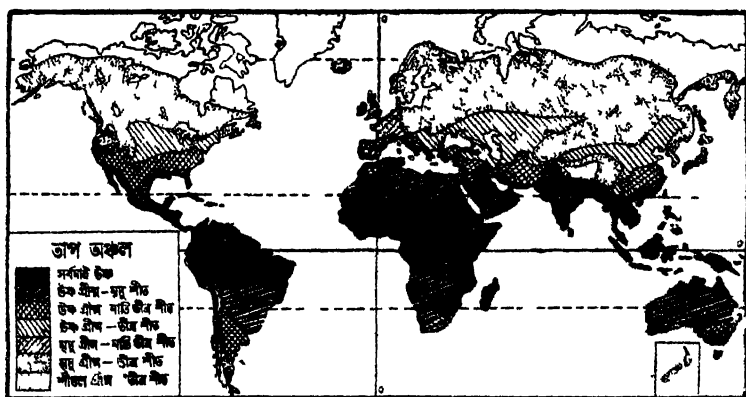
৪নং চিত্র—পৃথিবীর তাপ অঞ্চলসমূহ

প্রভৃতি কারণে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানের বায়ুর উষ্ণতা বা তাপকেই আমরা সেই স্থানের তাপ বলিয়া থাকি। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের বায়ুর তাপ বিভিন্ন প্রকার। কারণ (১) সূর্যকিরণ যে স্থানে যত তির্যকভাবে পতিত হয় সে স্থানের বায়ুমণ্ডল তত অল্প উত্তপ্ত হয়। এই কারণে নিরক্ষ রেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে উষ্ণতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। (২) একই অক্ষাংশে অবস্থিত দুইটি স্থানের উচ্চতা ও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধিভেদে উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। কোন স্থানের উচ্চতা যত বৃদ্ধি পাইবে সেই স্থানের বায়ুও তত শীতল হইবে। কারণ—(ক) ভূপৃষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ তাপ উচ্চস্তরে অতি অল্পই পৌঁছায়, (খ) উচ্চস্তরের বায়ু

অপেক্ষাকৃত লঘু ও ধূলিকণাহীন বলিয়া উহা শীঘ্রই তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়ে, (গ) প্রতি ৩০০' উচ্চতায় ১° উষ্ণতা হ্রাস পায় এবং (ঘ) ভূপৃষ্ঠের উষ্ণ বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া গেলে হঠাৎ চাপের হ্রাস হেতু শীতল হইয়া পড়ে। (৩) কোন স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক থাকিলে ঐ স্থানে দিবাভাগের তাপ প্রখর হইতে পারে না; আবার রাত্রিকালের তাপও অধিক শীতল হইতে পারে না। এই কারণেই সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহ মৃদুতাপসম্পন্ন, কিন্তু বায়ু শুষ্ক বলিয়া মরু অঞ্চলে দিনে যেরূপ প্রখর গ্রীষ্ম রাত্রিতেও তেমনি
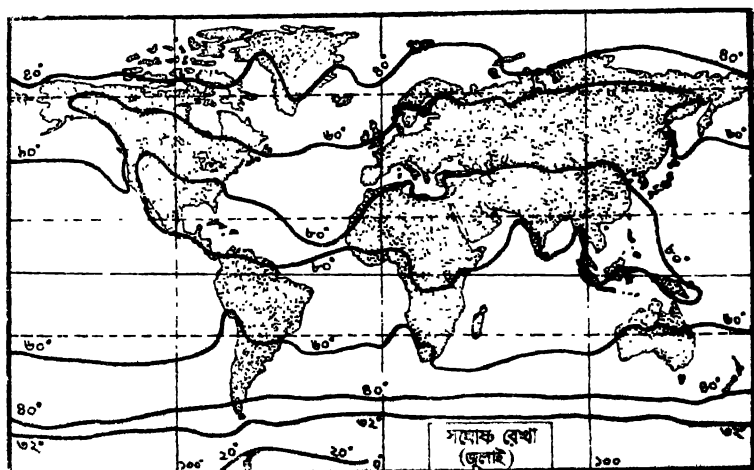
৫নং চিত্র—সমোষ্ণ রেখা (জুলাই)

প্রবল শীত অনুভূত হয়। (৪) বায়ুর স্তর যত ঘন ও গভীর হয় সূর্যরশ্মির তাপশক্তি তত হ্রাস পায় এবং (৫) অরণ্যভূমির দ্বারা প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলেও উষ্ণতার পরিবর্তন হয়।

গড় উষ্ণতা—কোন স্থানের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক হইতে সেই স্থানের দৈনিক গড় উষ্ণতা (mean temperature) পাওয়া যায়। উহা হইতে মাসিক ও বার্ষিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

তাপপ্রসর—কোন স্থানের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপাঙ্কের অন্তর ফলকে সেই স্থানের দৈনিক তাপপ্রসর (range of temperature) বলা হয়। কোন স্থানের উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের ,,গড় উত্তাপের অন্তর ফলকে ঐ স্থানের বার্ষিক তাপপ্রসর বলা হয়। সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত অঞ্চলসমূহের বার্ষিক তাপপ্রসর অল্প, কিন্তু মহাদেশীয় জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলসমূহের বার্ষিক তাপপ্রসর অত্যন্ত অধিক।

সমোষ্ণ রেখা—যে সকল স্থানের সমুদ্র-সমতলের উত্তাপ সমান সেই সকল
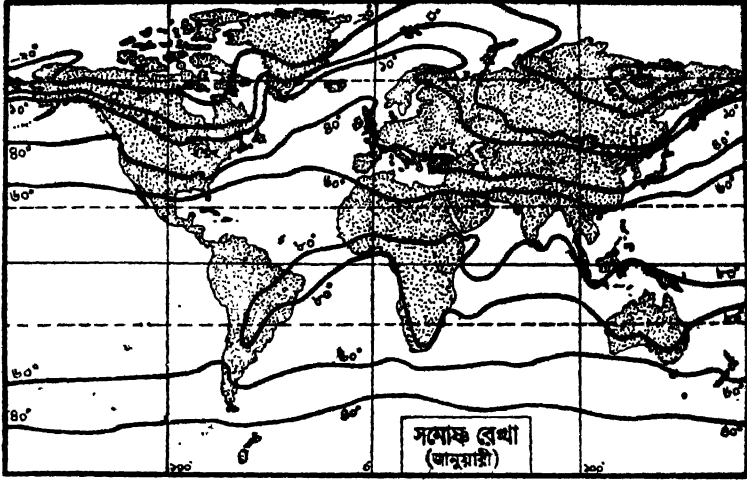
৬নং চিত্র—সমোষ্ণ রেখা (জানুয়ারী)

স্থান যোগ করিয়া যে রেখা অঙ্কন করা হয় তাহাকে সমোষ্ণ রেখা (Isotherm) বলে।

তাপমণ্ডল (Temperature Zones)—সূর্যতাপের তারতম্য ও দিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ভৌগোলিকেরা পৃথিবীকে পাঁচটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করিয়াছেন :—

৭নং চিত্র—তাপমণ্ডল

(১) **ক্রান্তীয় উষ্ণ মণ্ডল** (Tropical Hot Zone)—২৩½° দক্ষিণ হইতে ২৩½° উত্তর সমাক্ষরেখা পর্যন্ত, (২) **উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (North Temperate Zone)*—২৩½° উত্তর হইতে ৬৬½° উত্তর সমাক্ষরেখা পর্যন্ত ; (৩) **দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (South Temperate Zone)—২৩½° দক্ষিণ হইতে ৬৬½° দক্ষিণ সমাক্ষ রেখা পর্যন্ত ; (৪) **উত্তর হিমমণ্ডল** (North Cold Zone) —৬৬½° উঃ হইতে সুমেরু পর্যন্ত এবং (৫) **দক্ষিণ হিমমণ্ডল** (South
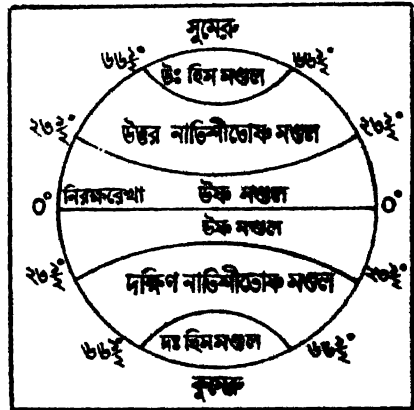
*উভয় গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলটিকে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণশীতোষ্ণ বা উপক্রান্তীয় মণ্ডল—

Cold Zone)—৬৬½° দঃ হইতে কুমেরু পর্যন্ত। তবে জল ও স্থলভাগের অসমান উষ্ণতা, সাগর ও মহাদেশের অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতির প্রভাবে আবার একই তাপ-মণ্ডলের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বায়ুর চাপ—ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ সর্বত্র সমান নহে। সমুদ্রপৃষ্ঠের সহিত একই সমতলে অবস্থিত যে কোন প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ প্রায় ১৪·৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ব্যারোমিটার যন্ত্রের পারদের ২৯·৯২" উচ্চতার সমান। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ুর চাপ ততই হ্রাস পায়। বায়ুর তাপ যদি ৭২° ফাঃ থাকে তবে সমুদ্রতল হইতে ১৫০০' উচ্চতা পর্যন্ত প্রতি ৯০০'-এ ১" পরিমাণ চাপ হ্রাস পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৩·২ মাইল উপরের বায়ুর চাপ সমুদ্রতলের বায়ুর চাপের প্রায় অর্ধেক।

যে বায়ুর চাপ অধিক তাহাকে উচ্চচাপ (high pressure) বায়ু এবং যে বায়ুর চাপ অল্প তাহাকে নিম্নচাপ (low pressure) বায়ু বলে। একই সমতলে অবস্থিত দুইটি স্থানের বায়ুর চাপ বিভিন্ন হইতে পারে কারণ উষ্ণ বা আর্দ্র বায়ু শীতল বা শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়। অতএব উষ্ণ বা আর্দ্র বায়ু যুক্ত অঞ্চল নিম্নচাপসম্পন্ন এবং শুষ্ক বা শীতল বায়ুযুক্ত অঞ্চল উচ্চচাপসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমপ্রেষ রেখা—যে সকল স্থানের সমুদ্র-সমতলের চাপ সমান তাহাদিগকে যোগ করিয়া যে রেখা অঙ্কন করা হয় তাহাকে সমপ্রেষ-রেখা (Isobar) বলে।

চাপ-বলয় (Pressure Belts)—উষ্ণতা ও আর্দ্রতার তারতম্য অনুসারে বায়ুচাপের তারতম্য হয় বলিয়া ভূপৃষ্ঠে সাতটি চাপবলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে :—(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়—এই অঞ্চলের বায়ু সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে বায়ুপ্রবাহ প্রায়ই অনুভূত হয় না বলিয়া এই অঞ্চলকে নিরক্ষীয় শান্তবলয় (Doldrum) বলে। (২—৩) অতিরিক্ত শৈত্য ও বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতা হেতু দুই মেরুর নিকটবর্তী স্থানে দুইটি উচ্চচাপ বলয়। (৪—৫) পৃথিবীর আবর্তন হেতু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বায়ুর বিক্ষিপ্ততার জন্য মেরুবৃত্ত-সন্নিহিত অঞ্চলে দুইটি নিম্নচাপ বলয়। (৬—৭) নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঊর্ধ্বগামী লঘু বায়ু ঊর্ধ্বস্তর দিয়া মেরুর দিকে প্রবাহিত হইবার সময় ক্রমশঃ শীতল ও

উঃ গোলার্ধে ২৩½° উঃ হইতে ৪৫° উঃ এবং দঃ গোলার্ধে ২৩½° দঃ হইতে ৪৫° দঃ সমাক্ষ রেখা পর্যন্ত ; এবং (২) শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ বা হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল—উঃ গোলার্ধে ৪৫° উঃ হইতে ৬৬½° উঃ এবং দঃ গোলার্ধে ৪৫° দঃ হইতে ৬৬½° দঃ সমাক্ষ রেখা পর্যন্ত।

ভাবী হইয়া ক্রান্তিবৃত্তের দিকে নামিয়া আসে বলিয়া ক্রান্তীয় অঞ্চলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে এখানে বায়ুপ্রবাহ বিশেষ অনুভূত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে ক্রান্তীয় শান্তবলয় বলা হয়। এই অঞ্চলের বায়ু নিম্নগামী বলিয়া বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা অল্প এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম। পৃথিবীর অধিকাংশ উষ্ণ মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত হইবার ইহা অন্যতম কারণ।

৮নং চিত্র—সূর্য ও তাপ বলয়ের পরিবর্তন
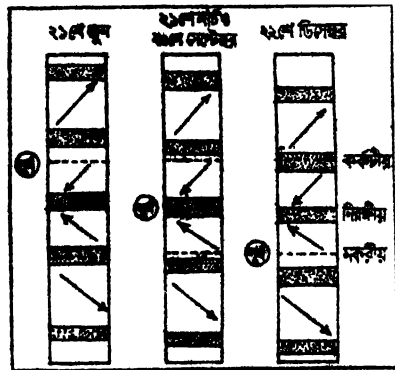
সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের* সঙ্গে সঙ্গে এই চাপবলয়গুলি যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে সরিয়া যায়।

৯নং চিত্র—নিয়ত বায়ুপ্রবাহ
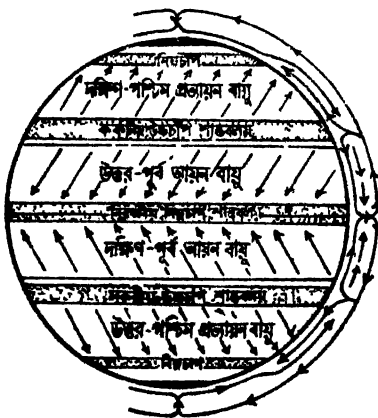
বায়ুপ্রবাহ (Winds)—তাপ ও চাপের বৈষম্যই বায়ুপ্রবাহের প্রধান কারণ। তবে এই বায়ুপ্রবাহের কয়েকটি নিয়ম রহিয়াছে :—(১) চাপ-সমতা রক্ষার জন্য বায়ু উচ্চচাপযুক্ত স্থান হইতে নিম্নচাপযুক্ত স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়, (২) উচ্চচাপ অঞ্চলের ভারী বায়ু নিম্নস্তর দিয়া নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে এবং নিম্নচাপ অঞ্চলের লঘু বায়ু ঊর্ধ্বস্তর দিয়া উচ্চ-চাপ অঞ্চলের দিকে যাইতে থাকে, (৩) পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায় (ফেরেলের সূত্র)। যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকের নাম

* ২২শে ডিসেম্বর (দক্ষিণায়নান্ত দিবস) হইতে ২১শে জুন (উত্তরায়ণান্ত দিবস) পর্যন্ত মকর-ক্রান্তিরেখা হইতে কর্কটক্রান্তিরেখা পর্যন্ত সূর্যের উত্তরমুখী আপাত গতিকে সূর্যের উত্তরায়ণ এবং ২১শে জুন হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্কট ক্রান্তি রেখা হইতে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণমুখী আপাত গতিকে সূর্যের দক্ষিণায়ন বলে। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুই তারিখে সূর্য আপাত গতিতে রবিমার্গ (ecliptic) অতিক্রম কালে নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই দুইটি দিন ছায়াবৃত্ত (shadow circle) সকল সমাক্ষরেখাকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করে বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয়। এই দুইটি দিনকে মহাবিষুব (vernal equinox) ও জলবিষুব (autumnal equinox) দিবস বলা হয়।

অনুসারেই উহার নামকরণ হয় ; যেরূপ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইলে পশ্চিমা বায়ু বলা হয়।

বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ (Wind systems)—পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহগুলিকে প্রকৃতি হিসাবে প্রধানতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) **নিয়ত বায়ু (Planetary winds)**—পৃথিবীর চাপ বলয়ের বৈষম্যের জন্য সারা বৎসর নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্টপথে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে নিয়ত বায়ু বলে। যেরূপ, আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুদেশীয় বায়ু। ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উঃ গোলার্ধে উঃ পুঃ দিক হইতে এবং দঃ গোলার্ধে দঃ পুঃ দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে যথাক্রমে উঃ পুঃ ও দঃ পুঃ **আয়ন বায়ু** (Trade winds) বলে। এই বায়ু শীতল অঞ্চল হইতে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া ইহাদের বৃষ্টিপাতন-ক্ষমতা অল্প, তবে পূর্ব উপকূল সন্নিহিত পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ইহা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির (relief rains) সৃষ্টি করে।

ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে মেরুবৃত্ত অঞ্চলের দুইটি নিম্নচাপ বলয়ের দিকে উঃ গোলার্ধে দঃ পঃ দিক হইতে এবং দঃ গোলার্ধে উঃ পঃ দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে যথাক্রমে উঃ গোলার্ধে দঃ পঃ এবং দঃ গোলার্ধে উঃ পঃ **প্রত্যায়ন বায়ু** (Anti-trade winds) বলে। স্থানে স্থানে প্রত্যায়ন বায়ু পশ্চিমা বায়ু (Westerlies) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দুই মেরু সন্নিহিত দুইটি উচ্চচাপ বলয় হইতে মেরুবৃত্ত অঞ্চলের দুইটি নিম্নচাপ বলয়ের দিকে উঃ গোলার্ধে উঃ পুঃ এবং দঃ গোলার্ধে দঃ পুঃ দিক হইতে যথাক্রমে শুষ্ক ও শীতল **সুমেরু ও কুমেরু** বায়ু (Polar winds) প্রবাহিত হয়।

(২) **সাময়িক বায়ু (Periodical or Seasonal winds)**—যে সমস্ত বায়ুপ্রবাহ বিশেষ বিশেষ সময়ে দেখা যায় তাহাদিগকে সাময়িক বায়ু বলে। স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু ও মৌসুমী বায়ু ইহাদের অন্তর্গত।

জল অপেক্ষা স্থলভাগের উত্তাপ গ্রহণ ও তাপ বিকিরণের ক্ষমতা অধিক হওয়ায় সমুদ্র বা বৃহৎ হ্রদ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে বায়ুচাপের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। দিবাভাগে জলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে স্থলভাগের নিম্নচাপের দিকে এবং রাত্রিতে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে জলভাগের নিম্নচাপের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে যথাক্রমে **সমুদ্রবায়ু** (Sea Breeze) ও **স্থলবায়ু** (Land Breeze) বলে। স্থল ও সমুদ্র বায়ু প্রবাহের ফলে সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলির জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হইয়া থাকে।

মৌসুমী বায়ু (Monsoon winds)—এই বায়ুর বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দিক পরিবর্তন ঘটে। ইহাকে স্থল ও

জলবায়ুর একটি সুবৃহৎ রূপও বলা যাইতে পারে। উষ্ণ মণ্ডলের বিশাল স্থলভাগের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জলভাগ অথবা বিস্তীর্ণ জলভাগের দক্ষিণে বিশাল স্থলভাগের অবস্থানের জন্যই মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি হয়। তবে ইহা শুধু ক্রান্তীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নহে, এশিয়া মহাদেশের পূর্ব ভাগে প্রায় ৬০° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থান ইহার প্রভাবাধীন।

গ্রীষ্মকালে সূর্য আপাত গতিতে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত আসিলে মহাদেশীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশসমূহে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। তখন সন্নিহিত সমুদ্র হইতে জলকণা-সম্পৃক্ত উচ্চচাপের বায়ু ঐ নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বায়ুকেই উঃ গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু বলে। গ্রীষ্মকালে ভারতের উঃ পঃ অংশে ও ব্রহ্মদেশে প্রবল নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় উঃ পূঃ আয়ন বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত দঃ পূঃ আয়ন বায়ু বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া দঃ পূঃ বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, দঃ আরব ও আবিসিনিয়া অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত করে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত বায়ুও ঐ একই কারণে দঃ চীন, ভিয়েৎনাম, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ঐ সকল দেশে এই বায়ু দঃ পূঃ দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া তথায় ইহাকে গ্রীষ্মের দঃ পূঃ মৌসুমী বায়ু বলে।

শীতকালে এশিয়ার স্থলভাগ হইতে শীতল ও উচ্চচাপের শুষ্ক বায়ু সমুদ্রের নিম্নচাপের দিকে বহিতে থাকে। ইহাকে শীতের শুষ্ক মৌসুমী বায়ু বলে। ভারত মহাসাগরের দিকে এই বায়ুপ্রবাহ উঃ পূঃ দিক হইতে আসে বলিয়া ভারতে ইহাকে উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ু বলে। দঃ চীন, শ্যাম, ইন্দোচীন, প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ইহা প্রবাহিত হয়।

শীতের মৌসুমী বায়ু বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া উঃ পঃ মৌসুমী বায়ুরূপে অস্ট্রেলিয়ার দিকে ধাবিত হয়। কারণ দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল এবং অস্ট্রেলিয়ায় তখন বায়ুর নিম্নচাপ।

প্রধানতঃ আফ্রিকার গিনি উপকূল, উঃ আমেরিকার মেক্সিকো উপকূল, উঃ অস্ট্রেলিয়া এবং দঃ ও দঃ পূঃ এশিয়া মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল।

(৩) **আকস্মিক বায়ু (Irregular or Sudden winds)**—ঘূর্ণবাত, প্রতীপ ঘূর্ণবাত, টর্নেডো প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

কোন অল্পপরিসর স্থানে সহসা নিম্নচাপের সৃষ্টি হইলে চতুর্দিকস্থ উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বায়ুপ্রবাহ উঃ গোলার্ধে বামাবর্তে (anticlockwise) এবং দঃ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে (clockwise) কেন্দ্রের নিম্নচাপে প্রবেশ করিয়াই ঊর্ধ্বগামী হয়। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে **ঘূর্ণবাত** (cyclone) বলে। ঘূর্ণবাত

ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থান হইতে সাধারণতঃ প্রবাহিত বায়ুর পথ অবলম্বন করিয়া বহুদূরে চলিয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের ও মরুভূমির উপর দিয়া যাইবার সময় যথাক্রমে জলস্তম্ভ ও বালুকাস্তম্ভের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণবাত অতি ভীষণ ঝড়। প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতের উচ্চতা ৬ মাইল এবং ব্যাস ৩,৪ শত মাইলেরও অধিক হইয়া থাকে। ঘূর্ণবাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত—যেরূপ, চীন সমুদ্রে টাইফুন, বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন ও প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জে হ্যারিকেন প্রভৃতি। বঙ্গদেশের কালবৈশাখী এবং আশ্বিনের ঝড়ও এই ঘূর্ণবাতের ফলেই সৃষ্টি হয়।

কোন অল্প পরিসর স্থানে সহসা উচ্চচাপের সৃষ্টি হইলে ঐ উচ্চচাপ বলয় হইতে বায়ুপ্রবাহ উঃ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে ও দঃ গোলার্ধে বামাবর্তে পার্শ্ববর্তী নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাকে **প্রতীপ ঘূর্ণবাত** (anticyclone) বলে। প্রতীপ ঘূর্ণবাত ততটা ভীষণ নয় এবং অতি দ্রুত স্থানপরিবর্তনও করে না। বহুক্ষেত্রে দুইটি ঘূর্ণবাতের মধ্যভাগে একটি প্রতীপ ঘূর্ণবাত দেখা যায়।

অল্পস্থানব্যাপী ও অল্পক্ষণস্থায়ী ঘূর্ণবাতকে **টর্নেডো** (Tornado) বলে। ইহার ধ্বংস-ক্ষমতা অতীব ভয়াবহ।

(৪) **স্থানীয় বায়ু (Local winds)**—কোন কোন দেশে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে একপ্রকার বায়ুপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগকে স্থানীয় বায়ু বলে। সাহারা মরু অঞ্চল হইতে প্রবাহিত উত্তপ্ত বায়ুকে দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলিতে 'সিরোক্কো', গিনি উপকূলে 'হারমাট্টান' ও মিশরে 'খামসিম'; শীতকালে উঃ ও উঃ পূঃ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে উঃ ইতালী ও আড্রিয়াতিক উপকূলে 'বোরা', শীতকালে উঃ ও উঃ পঃ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে রোন উপত্যকায় 'মিস্ট্রাল', পূঃ দিক হইতে প্রচণ্ড গতিতে প্রবাহিত বায়ুকে স্পেনে 'সোলানো', সাহারা ও আরবের মরুভূমিতে বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রবাহিত উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুকে 'সাইমুম্'; আল্পস্ পর্বতগাত্র বাহিয়া নীচের দিকে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুকে 'ফন', দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা তৃণভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুকে 'প্যাম্পেরো' এবং ক্যানাডার রকি পর্বত হইতে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুকে 'চিনুক' বলে। পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে 'লু' বলে।

বৃষ্টিপাত (Rainfall)—কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যতটা জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাকিলে তাহাকে পরিপৃক্ত বায়ু (saturated air) বলে। প্রচুর জলীয়বাষ্পযুক্ত পরিপৃক্ত বায়ু লঘু বলিয়া সহজেই ঊর্ধ্বগামী হয় এবং প্রসারিত হইয়া শীতল হইয়া পড়ায় উহার জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। জলীয় বাষ্পের কিয়দংশ তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম জলকণার আকারে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া মেঘ

রূপে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। মেঘ অধিকতর শীতল হইলে জলকণাগুলি মিলিত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুর আকারে পড়িতে থাকে। কিন্তু কোন কারণে মেঘ উত্তপ্ত হইলে জলকণাগুলি আবার বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়।

বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু লঘু বলিয়া সহজেই ঊর্ধ্বগামী হয় এবং প্রসারিত ও শীতল হইয়া সেই স্থানেই বৃষ্টিপাত করে। ইহাকে **পরিচলন বৃষ্টি** (convectional rains) বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যতাপ অধিক বলিয়া সারা বৎসরই পরিচলন বৃষ্টি হইয়া থাকে। (২) পরিপৃক্ত বাতাস প্রবাহিত হইয়া পর্বতগাত্রে প্রতিহত হইলে উপরে উঠিতে থাকে এবং পরে শীতল হইয়া বারিবর্ষণ করে। ইহাকে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (relief rains) বলে। পর্বতের যে পার্শ্বে বায়ু প্রতিহত হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহাকে প্রতিবাত পার্শ্ব (windward side) এবং বিপরীত দিককে অনুবাত পার্শ্ব (leeward side) বলে। পর্বতের অনুবাত পার্শ্বস্থিত বর্ষণবঞ্চিত অঞ্চলসমূহকে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে (rain shadow area) বলে। (৩) ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ থাকে। পরিপৃক্ত বাতাস সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয় এবং পরে শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত করে। ইহার নাম **ঘূর্ণিবৃষ্টি** (cyclonic rains)। পশ্চিমা বায়ু বলয়ের অন্তর্গত স্থানসমূহের অধিকাংশ বৃষ্টিপাতই ঘূর্ণিবৃষ্টি।

রাত্রিকালে শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুস্তরের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া **শিশিরে** (dew) পরিণত হয়। শীতপ্রধান দেশে শিশির জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইলে ইহাকে **তুহিন** (frost) বলে। কখনও কখনও জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী ভাসমান ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া অল্পঘনীভূত
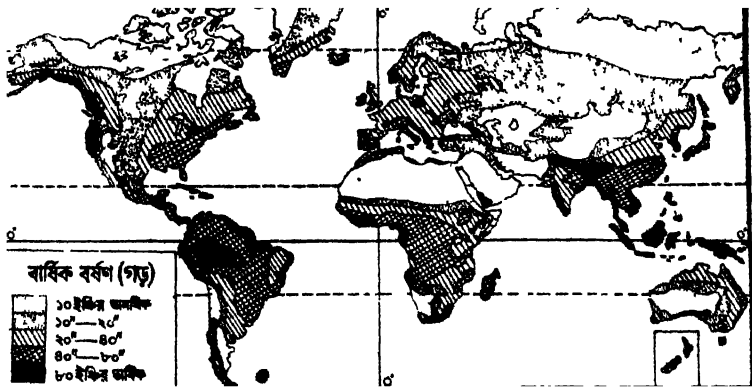
১০ নং চিত্র—বৃষ্টিপাত অঞ্চল

অবস্থায় ধোঁয়ার আকারে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাকে **কুয়াসা** (mist) বলে কুয়াসার জলকণাসমূহ অতি সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে **ফগ** (fog) বলে

কখনও কখনও বৃষ্টিবিন্দু নীচে পড়িবার সময় অতিরিক্ত শৈত্য হেতু জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাকে **শিলা** বা করকা (hail) বলে। শীতপ্রধান দেশে বা উচ্চ পর্বতাঞ্চলে অনেক সময় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হইয়া থাকে।

সমবর্ষণ রেখা—যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান সেই সকল স্থানকে যোগ করিয়া যে রেখা অঙ্কন করা যায় তাহাকে সমবর্ষণ রেখা (Isohyet) বলে।

বারিমণ্ডল

জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফলের ৭০·৮% বা ১৪ কোটি বর্গমাইল যে জলরাশির দ্বারা আবৃত তাহাই বারিমণ্ডল। বারিমণ্ডল প্রধানতঃ পাঁচটি মহাসাগর (প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, সুমেরু ও কুমেরু) এবং উহাদের বহু উপসাগর ও সাগর লইয়া গঠিত।

সমুদ্রের তটরেখাই মহাদেশের সীমা নহে। মহাদেশের কিয়দংশ সমুদ্রজলের মধ্যেই বিস্তৃত থাকে। এই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা সাধারণতঃ ১০০ ফ্যাদম বা ৬০০'-এর অধিক হয় না। মহাদেশের এই নিমজ্জিত অংশকে **মহীসোপান** (continental shelf) বলে। মহাসোপানের উপরিস্থিত এই অগভীর জলরাশিকে **উপমহাদেশীয় সমুদ্র** (epicontinental sea) বলা যাইতে পারে। মহীসোপানের শেষ প্রান্তে মহীসোপান হঠাৎ ঢালু হইয়া গভীর সমুদ্রতলে মিশিয়া যায়। এই ঢালু অংশকে **মহীঢাল** (continental slope) বলে। সমুদ্রোপকূলের স্থানে স্থানে বহুদূর বিস্তৃত মহীসোপান দেখা যায়, কিন্তু পর্বতময় উপকূলে মহীসোপানের বিস্তার অধিক নহে। মহীঢালের প্রান্ত হইতে **সমুদ্রতল** (ocean floor) আরম্ভ হয়। সমুদ্রের এই অংশ ২।৩ মাইল গভীর। ইহাকে গভীর সমুদ্রতলও (deep sea plain) বলা হয়। সমুদ্রতলের কোন কোন স্থানে নদীখাতের মত গভীর অংশ (২৫,০০০'-এরও অধিক) রহিয়াছে। এই সকল গভীর অংশকে **সমুদ্রখাত** (ocean deeps) বলে।

সমুদ্রজলের উষ্ণতা—সমুদ্রের উপরিস্থিত জলের উষ্ণতা, উহার অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, ঋতুভেদ এবং দিবারাত্রি-ভেদের উপর নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ৮০°-৮২° ফাঃ এবং উত্তরে ও দক্ষিণে এই উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে মেরুপ্রদেশে ২৮°-২৯° ফাঃ হয়। সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা অধিক, নিম্নে উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রতরঙ্গ হেতু সর্বদা আলোড়নের ফলে দিবারাত্রি ও ঋতুভেদে সমুদ্রজলের উত্তাপের পার্থক্য অধিক হইতে পারে না।
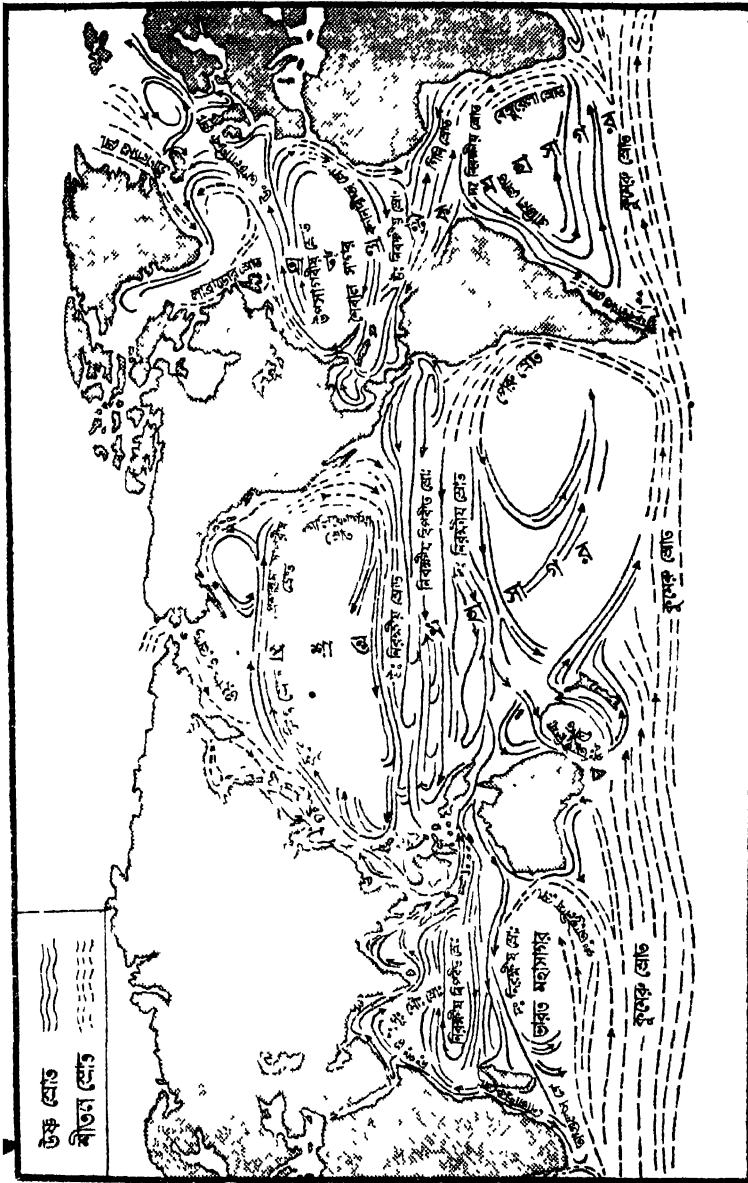
২১ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রস্রোত

সমুদ্রজলের ঘনত্ব—সমুদ্রজলে নানা জাতীয় লবণ দ্রব অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া ইহা স্বাদু জল অপেক্ষা ভারী। আবার অধিক লবণাক্ত সমুদ্রজল অল্প লবণাক্ত সমুদ্রজল অপেক্ষা ঘন। একই প্রকার লবণাক্ত উষ্ণ জল অপেক্ষা

কম লবণাক্ত* শীতল জল অধিক ঘন হইতে পারে। সমুদ্রের উপরিভাগের জল অপেক্ষা নিম্নভাগের জল অধিক ঘন।

সমুদ্রস্রোত—নিয়মিতভাবে সমুদ্রের উপরিভাগের জল একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হইলে তাহাকে সমুদ্রস্রোত (ocean currents) বলে। প্রধানতঃ সমুদ্রজলের উষ্ণতা, ঘনত্ব ও বায়ুপ্রবাহের চালনা হেতুই সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমুদ্রস্রোত দুইপ্রকারের—উষ্ণ ও শীতল। নিম্নলিখিত কারণগুলি সমুদ্রস্রোতের গতি নির্ধারণ করে :—(১) নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও লঘু সমুদ্রজল উষ্ণ বহিঃস্রোতরূপে (hot surface current) মেরু অঞ্চলের শীতল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, আবার মেরু অঞ্চলের শীতল ঘন জল ঐ স্থান পুরণের জন্য শীতল অন্তঃস্রোতরূপে (cold undercurrent) নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। (২) প্রবল নিয়ত বায়ু নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রজলকেও সেই দিকে পরিচালিত করে। (৩) অধিক ঘন জল অল্প ঘন জলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া অধিক লবণাক্ত সমুদ্রের জল অল্প লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। (৪) ফেরেলের সূত্র অনুসারে সমুদ্রস্রোতের গতি উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যায়। (৫) স্থলভাগের আকৃতিও অনেক সময়ে সমুদ্রস্রোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রস্রোতগুলি ১১নং চিত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. How soils are formed? What are their main features? Classify the major soil groups of the world and examine the nature of their utilisation.

(মৃত্তিকা কিরূপে সৃষ্টি হয়? মৃত্তিকার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? পৃথিবীর মৃত্তিকা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর এবং উহাদের প্রত্যেকটি কি কি শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহা লিখ।) (C. U. '51) (পৃঃ ১১-১৩)

*সমুদ্রজল সকল স্থানে সমান লবণাক্ত নহে। নদীবাহিত স্বাদুজল, বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের পরিমাণের উপরই সমুদ্রজলের লবণতা নির্ভর করে। উচ্চ অক্ষাংশ ও মেরুপ্রদেশ অপেক্ষা নিম্ন অক্ষাংশে উত্তাপের আধিক্যহেতু বাষ্পীভবন অধিক হওয়ায় তথাকার সমুদ্রজল উচ্চ অক্ষাংশের সমুদ্রজল অপেক্ষা অধিক লবণাক্ত। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাষ্পীভবন অধিক হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যহেতু তথাকার সমুদ্রজল অধিক লবণাক্ত হইতে পারে না। চারিদিকে স্থলবেষ্টিত সমুদ্রে পতিত নদীর সংখ্যা অল্প হইলে ঐ সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয় (যেরূপ ভূমধ্যসাগর, মরুসাগর ইত্যাদি) আর অধিক হইলে অল্প লবণাক্ত হয় (যেমন বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর ইত্যাদি)।

2. Indicate the major problems connected with soils. What steps have been taken to solve these problems ?

(মৃত্তিকার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি নির্দেশ কর। ঐ সমস্যাসমূহের নিরসন কল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ?) (পৃঃ ১৩)

3. Indicate the various factors determining the temperature of any point on the earth's surface

(ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা-নির্ধারক কারণসমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৭-১৮)

4. Give a brief account of the main wind system of the earth noting the causes of the winds.

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান বায়ুপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ এবং উহাদের প্রত্যেকটির উৎপত্তির কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২২-২৪)

5 What are monsoons ? How are they caused ?

(মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ কাহাকে বলে ? ইহার উৎপত্তির কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২২-২৩)

6. Describe the planetary winds. What other types of wind occur on the earth's surface and how do they arise ?

(নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্যান্য কি কি বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয় এবং উহারা কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে ?) (পৃঃ ২২-২৪)

7. Explain the factors favouring the formation of rain Suggest a classification of rainfall

(বৃষ্টিপাতের কারণ কি ? বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর।) (পৃঃ ২৪-২৫)

8. Write notes on :—rocks, land forms, temperature zones, winds, cyclones, anticyclones frost isotherm isobar, isohyet, continental shelf, ocean currents

(টীকা লিখ :—শিলা, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন রূপ, তাপমণ্ডল, বায়ুপ্রবাহ, ঘূর্ণবাত, প্রতীপঘূর্ণবাত, তুহিন, সমোষ্ণ রেখা, সমপ্রেষ রেখা, সমবর্ষণ রেখা, মহীসোপান, সমুদ্র স্রোত।)

(পৃঃ ৯, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ১৯, ২০, ২৬ ২৬, ২৮)

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

মানুষ ও পরিবেশ—মানুষ ও তাহার পার্থিব পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ বর্তমান। পরিবেশের পার্থক্যের দরুন মানুষ কোথাও কৃষিজীবী, কোথাও পশুপালক, কোথাও শিকারী আবার কোথাও বা যাযাবর। কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্তমান সভ্য মানুষ পরিবেশের (environment) দাস নহে। পরিবেশ মানুষের উপর শুধু প্রভাবই বিস্তার

করে, তাহার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে কর্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহার ফলে পরিবেশে ঘটে রূপান্তর ; এই রূপান্তরিত পরিবেশ আবার নূতন করিয়া তাহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ; আর তাহারই ফলে তাহার মধ্যে জাগে নবতর কর্মপ্রচেষ্টা, এবং সেই কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাবে পরিবেশেও ঘটে নবতর পরিবর্তন। মানুষের সহিত তাহার পরিবেশের সম্বন্ধ তাই স্থিতিশীল (static) নয়, নিয়তই গতিশীল (dynamic)।

পরিবেশের প্রকারভেদ—পরিবেশ দ্বিবিধ—**প্রাকৃতিক** (Physical environment) ও **সাংস্কৃতিক** (Cultural environment)। ভূপৃষ্ঠে স্থানবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতরেখা, আকার, আয়তন ও উহার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, আভ্যন্তরীণ জলভাগ, সমুদ্রস্রোত, উদ্ভিজ্জ ও জৈব প্রকৃতি প্রভৃতি হইল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র, জনসংখ্যা প্রভৃতিকে বলে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান।

সামগ্রিক পরিবেশ—পরিবেশ-সম্পর্কিত আলোচনার সময় ইহা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর ইহাদের যে প্রভাব তাহা ব্যষ্টিগত নহে, সমষ্টিগত। পরিবেশের উপাদানগুলি প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবেই কার্যকরী হয়, ইহারা পৃথকভাবে কাজ করে না, কারণ স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া ইহাদের কিছুই নাই। স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরিবেশের এক একটি উপাদানের সহিত অন্য উপাদানগুলি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত—অবিচ্ছেদ্যসূত্রে একত্রে গ্রথিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location)—ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি স্থানেরই এক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান রহিয়াছে, গাণিতিক ভূগোলের ভাষায় এই অবস্থান অক্ষাংশ ও দেশান্তর দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বৈষয়িক দৃষ্টিতে নানা প্রকার সুবিধা অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক অবস্থানকে প্রধানতঃ **মহাদেশীয়** (Continental), **সমুদ্রপ্রান্তিক** (Littoral), **দ্বৈপ** (Insular) এবং **উপদ্বীপীয়** (Peninsular) এই চারি প্রকারে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য এ সমস্তই আপেক্ষিক প্রত্যয় ; কারণ একই ক্ষেত্রের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এশিয়া মহাদেশের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক আবার আকারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান প্রায় উপদ্বীপীয়। এইরূপ প্রায় যে কোন দেশের অবস্থানই পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব (Influence of Geographical location on man's economic life)—কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, কোন দেশের **জলবায়ু** নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহার অবস্থানের উপর। নিরক্ষবৃত্তের নিকটে এবং মেরু প্রদেশে একই প্রকারের জলবায়ু অনুভূত হয় না। জলবায়ু আবার স্থানীয় মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; আবার উদ্ভিজ্জ প্রকৃতিই বহুলাংশে জৈব প্রকৃতির নিয়ামক। এই সমস্তই মানবজীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবার আঞ্চলিক জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে অধিবাসীদের কর্মশক্তি ও কর্মপদ্ধতি বহুলাংশে নিরূপিত হয়। উত্তর গোলার্ধের প্রায় $\frac{৪}{৫}$ অংশ ভূমিভাগই ৩০° হইতে ৬০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত থাকায় ঐ অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে শ্রমশিল্পে এবং বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অপর পক্ষে দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত তিনটি মহাদেশের $\frac{৪}{৫}$ অংশ ভূমিভাগই উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এই সমস্ত স্থান শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, দেশবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান তথাকার **ব্যবসা-বাণিজ্য** সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ জলপথে দূর-দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ। অপর পক্ষে সমুদ্রপ্রান্তিক অবস্থানবশতঃ নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন এবং বাল্টিক রাজ্যসমূহের অধিবাসীরা সহজেই জলপথে দূর-দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। এইরূপ দ্বৈপ অবস্থানবশতঃ জাপান ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং উপদ্বীপীয় অবস্থানবশতঃ ভারত, ইতালী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বাণিজ্যে উৎকর্ষ লাভ সহজ ও স্বাভাবিক। সমুদ্রবেষ্টিত দেশের অধিবাসীরা নৌ-ব্যবসায়ে খ্যাতি লাভ করে, উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হয় এবং মৎস্য ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। তবে একথাও সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশবিশেষের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বাদ দিয়া কেবলমাত্র এক এক প্রকারের ভৌগোলিক অবস্থানের বিচার করার সার্থকতা নিতান্তই সামান্য। সোভিয়েট রুশিয়ার অবস্থান মহাদেশীয়, আবার এশিয়ার তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থানও মহাদেশীয় কিন্তু এই সমস্ত দেশের পারস্পরিক অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। আবার নৌবিদ্যায় উন্নতিশীল নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক কিন্তু কোচিন-চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক হইলেও এই দেশগুলি নৌ-বিদ্যায় সেরূপ পারদর্শী নহে। মূলকথা হইল এই যে গণিতের দৃষ্টিতে

ভৌগোলিক অবস্থান অপরিবর্তনীয় কিন্তু মানবিক জগতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই অবস্থান গতিশীল। অবস্থানের এই গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতেই মানব জীবনের উপর ইহার প্রভাব বিচার করা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দিক হইতেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। দ্বৈপ অবস্থানবশতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে স্বাভাবিক **রাজনৈতিক নিরাপত্তা** বর্তমান রহিয়াছে, মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই ঈর্ষার বস্তু।

বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location favourable to economic activities)—কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান যদি ঐরূপ হয় যে দেশটির **সীমান্তরেখা** পাহাড়-পর্বত, সাগর, মরু, নদী বা জলাভূমির দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত; উহার **জলবায়ু** মৃদুভাবাপন্ন; দেশটি পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহের **কেন্দ্রস্থলে** অবস্থিত এবং দেশটি চতুষ্পার্শ্বস্থ ঐ সমস্ত দেশের সহিত অনুকূল সাংস্কৃতিক ও আর্থিক **যোগসূত্রে** আবদ্ধ তবেই ঐ দেশের অবস্থানকে উহার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল বলা যাইতে পারে।

দেশের **সীমান্তরেখার প্রকৃতি** উহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাতীয়তা বোধের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সীমান্তরেখা প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হইলে দেশটির রাজনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়, দেশের অধিবাসীরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং দেশটির আর্থিক জীবনও স্থিতিশীল হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, দেশের সীমান্ত রেখা যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি বা চুক্তির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে নির্দিষ্ট হইলে দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইয়া থাকে।

দেশের অবস্থান যদি **স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে** হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেন ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটেন পৃথিবীর স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান কোন অঞ্চলই ব্রিটেন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে এবং দেশটি উপযুক্ত বাণিজ্য পথের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত জাপানের অবস্থানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও আমেরিকার অন্তর্বর্তী প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের প্রান্তে দেশটির অবস্থান ইহার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে। অবশ্য ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানবিক জগতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই অবস্থান গতিশীল এবং অবস্থানের এই গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতেই

মানব জীবনের উপর অবস্থানের প্রভাব বিচার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ভারত এককালে ছিল প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রভাগে কিন্তু কালক্রমে ভারত সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া এশিয়ার প্রান্তবর্তী হইয়া পড়ে। আরব সাগরের বাণিজ্যে আরবদের একাধিপত্য স্থাপিত হয় এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারত তাহার স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থান হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যে একটি কৃত্রিম ও নগণ্য স্থান অধিকার করে মাত্র। ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসানের পর হইতে অবশ্য ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান পুনরায় এক পরিবর্তনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আশা করা যায় যে ভারত পুনরায় প্রাচ্যজগতের কেন্দ্রভাগ অধিকার করিতে সক্ষম হইবে।

এখন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহুবিধ সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সহিত সংযোগ সাধনই সভ্যতার বিকাশ ও প্রসারের অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। অতএব দেশগত ভৌগোলিক অবস্থান যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক **সংযোগ স্থাপনের প্রেরণা** দেয় তবে বৈষয়িক ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নিকটবর্তী শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় জাপানের সমাজজীবনে যে নবচেতনা, উৎসাহ ও কর্মোদ্যম [illegible] প্রসার ঘটে তাহার ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই দেশটি শিল্পে [illegible] উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। অপর পক্ষে, নানাবিধ প্রতিকূলতার [illegible] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ [illegible] চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও আর্থিক [illegible] উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। গ্রীনল্যাণ্ড, চিলি, আলাস্কা প্রভৃতি দেশের অনুন্নতির কারণও অনুরূপ ভাবেই বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান-এর প্রভাব (**Influence of geographical location of India**) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানটি বিশেষ লক্ষণীয়। ৮° উঃ অক্ষাংশ হইতে ৩৭° উঃ অক্ষাংশ এবং ৬৮° পূঃ দেশান্তর হইতে ৯৭° পূঃ দেশান্তর দ্বারা আবদ্ধ ভারত পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। ২৩½° উঃ অঃ ভারতকে উত্তর দক্ষিণে এবং ৮২½° পূঃ দেঃ পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর দক্ষিণে দেশটির দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল এবং পূর্ব পশ্চিমে বিস্তার ১৭০০ মাইল। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ভারত প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রস্থলে এবং ভারত মহাসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর দেশটিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের

সংযোগসূত্রের মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে ভারত কর্তৃক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল তৎকালীন সভ্যজগতের কেন্দ্রভাগে ভারতের এই স্বাভাবিক অবস্থান।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে বর্তমানকালেও **ভারতের এই অবস্থানের গুরুত্ব** উপলব্ধি করা যাইবে। প্রথমতঃ, পূর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় যে কোন অঞ্চলের সহিত ভারতের পক্ষে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত মহাসাগরের শীর্ষে অবস্থিত থাকায় ভারতের পক্ষে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পূর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রভাগে অবস্থান এবং ভারত মহাসাগরের উপর
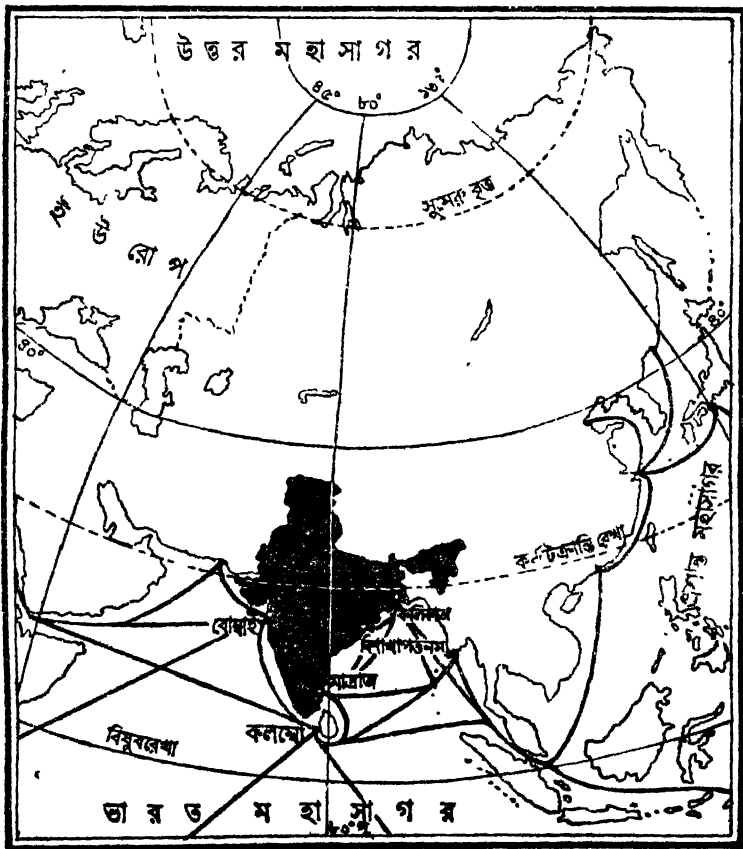
১২ নং চিত্র—ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান

অধিকার স্থাপনের সুযোগ ভারতীয় অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। চতুর্থতঃ, উত্তর-গোলার্ধে অবস্থান হেতু উত্তর-গোলার্ধের অন্যান্য দেশগুলির

সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ভারতের পক্ষে সহজ হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বত-প্রাচীর, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ভারতের সীমান্ত রেখা স্বাভাবিকভাবেই সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হইয়াছে ; ফলে, ভারতের রাজনৈতিক নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত ভারতের সীমান্ত রেখা কৃত্রিম। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রটির দক্ষিণার্ধ উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরার্ধ উপক্রান্তীয় মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের জলবায়ুও বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পরিপন্থী নহে।

অর্থনৈতিক জীবনে সৈকতরেখার প্রভাব (Influence of coast-line on man's economic life)—কোন দেশের সৈকতরেখা সেই দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সৈকতরেখা সবল, উচ্চ, নিম্ন অথবা ভগ্ন প্রভৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে, তবে দেশগত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তীরভূমি ভগ্ন, নিম্ন, গভীর, সুবিস্তৃত ও তরঙ্গক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত হইলে **বন্দর ও পোতাশ্রয়** গঠন সহজ হইয়া উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের তটভূমি ভগ্ন হইলেও তটদেশ পর্বতময় বলিয়া তথায় উল্লেখযোগ্য বন্দরের উৎপত্তি হয় নাই। ব্রিটেনের সৈকতরেখা অতিশয় ভগ্ন, দেশটির কোন স্থানই সমুদ্রোপকূল হইতে একশত মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। দেশটির সৈকতরেখা ভগ্ন, নিম্ন, গভীর এবং দেশাভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত নাব্য অবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট থাকায় দেশটিতে বহু স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় রহিয়াছে। এই কারণেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী ব্রিটিশ জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রপথে দূর দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আবার বাণিজ্যের এই স্বাভাবিক সুবিধার জন্য ব্রিটেনের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হওয়ায় দেশটিতে শ্রমশিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে, ভারত, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় তীরভূমি অভগ্ন হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়া থাকে।

ভারতের সৈকতরেখার প্রভাব (Influence of coast line of India)—ভারতের তটরেখার দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৫৩৫ মাইল, অর্থাৎ আয়তনের তুলনায় (আয়তন ১,২৫৯,৭৯৯ বর্গ মাইল) প্রতি ৪০০ বর্গমাইলে ১ মাইল মাত্র। ভারতের এই উপকূল ভাগ প্রায় অভগ্ন। পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূল সংকীর্ণ, উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র

সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময়। সেইজন্য এ অঞ্চলে পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাণ্ডলা, বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন এই চারিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে। আবার কাণ্ডলা, বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলাঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। পূর্ব উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর ও তরঙ্গসংকুল হওয়ায় পূর্ব উপকূলে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলিকাতা বন্দরের পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর। আবার ভারতের সৈকতরেখা ভগ্ন নহে বলিয়া সমুদ্র দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে নাই, ফলে ভারতের অভ্যন্তরস্থিত রাজ্যগুলি সমুদ্রতীরের বা সমুদ্রপথের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না।

পোতাশ্রয় ও বন্দরের স্বল্পতাহেতু ভারতবাসীরা নৌবিদ্যায় অপটু। পণ্য পরিবহনের জন্য এদেশকে বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। বিদেশে ভারতীয় শ্রমশিল্পজাত পণ্যের বাজার নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই কারণে ভারতে শ্রমশিল্পের তুলনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য স্বাধীনতালাভের পর হইতে ভারতের এই অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আয়তন-এর প্রভাব (Influence of size of a country on man's economic life)—দেশের আয়তন ক্ষুদ্র* এবং জনসংখ্যা অধিক হইলে (যেমন ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ) কৃষিজমির স্বল্পতাহেতু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের দ্বারা দেশগত চাহিদা মিটান সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ঐরূপ দেশে সযত্ন কৃষি-পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং শ্রমশিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অপর পক্ষে, বৃহদায়তন দেশে (যেমন রুশিয়া) রেলপথ ও রাজপথ বিস্তারের, একচ্ছত্র শাসনের এবং শ্রমশিল্প ও কৃষিকার্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আবার দেশের আয়তন বৃহৎ এবং জনসংখ্যা অধিক হইলে (যেমন চীন, ভারত ইত্যাদি) বস্ত্রশিল্প ও কৃষিকার্য উভয়ই প্রসার লাভ করে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে যে স্থানে উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই দেশাভ্যন্তরে জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে ব্যয়িত হইয়া যায়, তথায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিরল বসতিযুক্ত বৃহদায়তন দেশসমূহে (যেমন অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি) পশুচারণ শিল্পের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

* ১০ লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক আয়তনযুক্ত দেশগুলিকে অতিবৃহদায়তন (gigantic), ১ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনযুক্ত দেশগুলিকে বৃহদায়তন (large), ৪০ হাজার হইতে ১ লক্ষ বর্গ মাইল আয়তনযুক্ত দেশগুলিকে মধ্যমায়তন (medium), এবং ৪০ হাজার বর্গমাইলের অনধিক আয়তনযুক্ত দেশগুলিকে ক্ষুদ্রায়তন (small)-এর দেশ বলা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আকার-এর প্রভাব (**Influence of form of a country on man's economic life**)—দেশের আকার ও প্রকৃতি সুসংবদ্ধ (compact) হইলে (যেরূপ ভারত, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি) দেশে রেলপথ, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও বসতি বিস্তারের, একচ্ছত্র শাসনের এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের সুযোগ ঘটে। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া গঠিত (fragmented) দেশের (যেমন গ্রীস, পাকিস্তান) আর্থিক উন্নতি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। আবার অধিক দৈর্ঘ্য ও অল্প বিস্তার যুক্ত সংকীর্ণ (attenuated) দেশে (যেমন চিলি) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অল্প।

অর্থনৈতিক জীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব (**Influence of topography or land forms on man's economic life**)—ভূপৃষ্ঠ বন্ধুর। ইহার কোন অংশ পর্বতময়, কোন অংশ সমতল, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও ভূমিভাগ সমুদ্রতল হইতে নিম্নে অবস্থিত। ভূ-প্রকৃতি যে কেবল জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরোক্ষভাবে মানবের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে তাহাই নহে, পরন্তু, ভূ-প্রকৃতি মানবজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। ভূ-প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব অতি সামান্য। তাহাকে ভূ-প্রকৃতির সহিত সর্বদাই অভিযোজন (adaptation) সাধন করিয়া চলিতে হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, ভূমিক্ষয়, মৃত্তিকার অনুর্বরতা এবং সমতল কৃষিভূমির স্বল্পতাহেতু **কৃষিকার্য** এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি কোন কোন স্থলে, পর্বতগাত্রে থাক কাটিয়া সামান্য চাষ-আবাদ করা হয়। এতদঞ্চলে **যানবাহন** চলাচলেরও বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতাহেতু এখানে নদীসমূহ খরস্রোতা—নাব্য নহে। রেলপথ এবং আধুনিক ধরনের হাটাপথ নির্মাণও কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য। পার্বত্য অঞ্চলে **লোকবসতি** বিরল। অধিবাসীরা দরিদ্র এবং অনুন্নত। বিরল লোকবসতি, নিপুণ শ্রমিকের অভাব, উৎপন্ন দ্রব্য এবং চাহিদার স্বল্পতা, পরিবহনের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি পার্বত্য অঞ্চলে **শিল্প ও বাণিজ্যের** প্রসারকে ব্যাহত করে।

তবে বর্তমান মানব সভ্যতার পরিপোষণে পার্বত্যভূমির অবদানও নিতান্ত সামান্য নহে। পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ **বনভূমি** অবস্থিত। সমভূমির অধিকাংশ বন বর্তমানে বিলুপ্ত। এই কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ পর্বতাঞ্চলই অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্বতসানুদেশে তৃণভূমি অঞ্চলে নানাপ্রকার **পশু-পালন** এবং মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে **পশু-শিকারের** যে সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর অন্যত্র তাহা দুর্লভ। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্বতসানুদেশে চারণক্ষেত্রের

প্রাচুর্যহেতু পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। খনিজদ্রব্য-সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলে **খনিজ শিল্পের** প্রসার দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের বহু পার্বত্য অঞ্চল খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্যহেতু জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। স্রোতস্বতী নদী ও জলপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এক্ষণে **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদন করা হইতেছে এবং এই জলবিদ্যুৎকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলেরও পত্তন হইয়াছে। পর্বতশ্রেণী বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধাস্বরূপ হইয়া **বৃষ্টিপাতের** স্থান ও পরিমাণ নিরূপণ করে আবার কখনও কখনও শীতল ও শুষ্ক বায়ুর গতিরোধ করিয়া দেশকে রক্ষাও করে। পর্বতশৃঙ্গ হইতে দুর্বারবেগে পলিমাটি লইয়া **নদী** সমভূমির দিকে নামিয়া আসে এবং সমভূমিকে উর্বর করিয়া তোলে। পৃথিবীর অধিকাংশ নদনদীর উৎসই হইল এই পার্বত্যভূমি। বহুক্ষেত্রে পর্বতশ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দেশকে **বহিরাক্রমণ** হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। আবার বহু পার্বত্য অঞ্চলে মনোরম শৈলাবাসও গড়িয়া উঠে।

পৃথিবীর সমস্ত মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমশ্রেণীর নহে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন **মালভূমি অঞ্চলে** মানুষের কর্মতৎপরতারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা অনুর্বর হওয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে **কৃষিকার্যের** বিশেষ প্রসার পরিলক্ষিত হয় না, তবে জলবায়ু অনুকূল হইলে অপেক্ষাকৃত সমতল মালভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্য পরিচালিত হইতে পারে। মালভূমির বিস্তীর্ণ অংশ তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে তথায় **পশুচারণ** শিল্পের প্রসার ঘটে। বহুক্ষেত্রে মালভূমি অঞ্চলগুলিকে **খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ** হইতে দেখা যায়, এইরূপ অঞ্চলে খনিজ শিল্পের প্রসার ঘটিয়া থাকে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে দস্তা, সীসক ও স্বর্ণ প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এতদঞ্চলে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। নিরক্ষীয় ও উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত নিম্নভূমি অঞ্চলসমূহের উষ্ণ, আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর তুলনায় মালভূমি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু ঐগুলিকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে ইউরোপীয় অধিবাসীদের **বসতি**-ঘনত্ব নিবিড়। অবশ্য তিব্বতের ন্যায় উচ্চ মালভূমিসমূহে পরিবেশের প্রতিকূলতাহেতু লোকবসতি অতিশয় বিরল। সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় মালভূমি অঞ্চলে **পরিবহন** ব্যবস্থার প্রসার ততটা সহজসাধ্য না হইলেও নাতিউচ্চ মালভূমি অঞ্চলসমূহে পরিবহন ব্যবস্থা সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে। তবে স্থূল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে মালভূমি অঞ্চলসমূহে মানুষের আর্থিক অবস্থা ততটা সচ্ছল নহে।

সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্যই জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। পরিমিত বৃষ্টিপাত না হইলেও কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে উর্বর সমভূমিতে প্রচুর শস্য

উৎপাদন করা যায়। এই কারণে পরিমিত উত্তাপ ও জমির উর্বরাশক্তিসমন্বিত সমভূমি অঞ্চলসমূহেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিবলয়গুলি অবস্থিত রহিয়াছে। এতদঞ্চলের **পরিবহন**-ব্যবস্থা উন্নত ধরণের বলিয়া ভাব-বিনিময়ও সহজ। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ রেলপথই সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলিও সুনাব্য। সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ লোক সমভূমি অঞ্চলেই **বসতি** স্থাপন করিয়াছে। কারণ, প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাহেতু সমভূমি অঞ্চলেই মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। এই সমস্ত কারণে নদীতীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলগুলিতেই প্রাচীন চৈনিক, ভারতীয়, ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ও শিল্প-শ্রমিকের প্রাচুর্য, পরিবহনের সুবিধা, অধিবাসীদের চাহিদার বাহুল্য ও জটিলতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রের সান্নিধ্য-হেতু বর্তমানে এই সমভূমি অঞ্চলে **শ্রমশিল্পও** বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। অবশ্য সমস্ত সমভূমি অঞ্চলই মনুষ্যবাসের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকা, সাহারা ও তুন্দ্রার মরুঅঞ্চল সমভূমি হইলেও জলবায়ুর প্রতিকূলতা হেতু এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল।

ভারতের ভূপ্রকৃতির প্রভাব (Influence of topography of India) ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বের **পার্বত্যভূমি** বহুবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ। চিরতুষারাবৃত বলিয়া হিমালয় পর্বত বহু নদনদীকে সারাবৎসরই জলদান করিয়া পুষ্ট করিতেছে এবং নদীর জলের সহিত পলল বিতরণ করিতেছে। এই সকল নদনদী সুনাব্য এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী। এই পর্বতমালা দঃ-পঃ মৌসুমী বায়ুকে বাধা দিয়া বৃষ্টিপাতের সহায়তা করিতেছে এবং উত্তরের শীতল মরু বায়ু হইতে
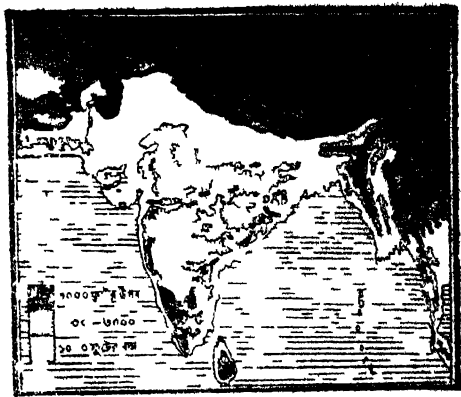
৩ নং চিত্র—ভারতের ভূপ্রকৃতি

ভারতকে রক্ষা করিতেছে। হিমালয়ের পাদদেশে খনিজ তৈল, কয়লা, লবণ ও তাম্র পাওয়া যায়। এই পার্বত্যভূমি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা হেতু ইহাদের ব্যবহার অতি সামান্য। উচ্চতর অংশে আল্পীয় তৃণভূমিতে পশুপালন চলে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে সামান্য পরিমাণে ধান ও ভুট্টা এবং প্রচুর চা ও ফল উৎপাদিত হয়। পর্বতের গিরিপথসমূহ

অতিশয় উচ্চ ও তুষারাচ্ছন্ন থাকায় কোন শত্রুই এই পথে সহসা ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতের মধ্যভাগের নদীবিধৌত **সমভূমির** পশ্চিমাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র অংশেরই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, মৃত্তিকা উর্বর। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি অঞ্চল। জমির প্রগাঢ় চাষই সাধারণ রীতি। ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, পাট, শণ, তিসি, চীনাবাদাম, তামাক প্রভৃতি ফসল ও নানাবিধ ফল এতদঞ্চলে প্রচুর জন্মে। চারণযোগ্য বিস্তৃত তৃণভূমির অভাবে গৃহপালিত পশু সাধারণতঃ রুগ্ন। নদীসমূহ নাব্য ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদ নাই বলিলেই চলে। অরণ্য অঞ্চল হইতে শাল, বাঁশ, সেগুন প্রভৃতি নানা জাতীয় কাষ্ঠ আহরণ করা হয়। ভূপ্রকৃতি সমতল হওয়ায় এই অঞ্চলে রাস্তা ও রেলপথ জালের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। কাঁচামাল, শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুর্য এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু ইহা ভারতের অন্যতম শিল্পপ্রধান অঞ্চল। প্রাথমিক উৎপাদনে, যানবাহন ব্যবস্থার প্রবর্তনে, গৌণ উৎপাদনে, বাণিজ্যে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে এই সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল এবং ইহা নিবিড়তম বসতিপূর্ণ অঞ্চল। ভারতের প্রধান প্রধান শহরসমূহের অধিকাংশই এই অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলও উর্বর এবং কৃষি ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ। এতদঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং লোকবসতিও নিবিড়।

ভারতের দক্ষিণাংশের **মালভূমির** অনুকূল পরিবেশযুক্ত অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দেখা যায়। চন্দন, সেগুন, আবলুস, শাল প্রভৃতি এই অঞ্চলের অরণ্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। সুপ্রাচীন শিলাস্তরে গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলে স্বর্ণ ও অভ্র প্রচুর রহিয়াছে। লৌহ আকরিক, বক্সাইট, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, গ্রাফাইট, ইলমেনাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজও এই অঞ্চলে প্রচুর। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর, বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অপরিমিত এবং ভূমির ক্ষয় অধিক। সেই কারণে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনও অতি সামান্য। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে কাপাস, ধান, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, ইক্ষু ও তামাক প্রধান। পর্বতের ঢালে চা ও কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ প্রান্তে এলাচ, দারুচিনি, মরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা জন্মে। পঃ ঘাটের বহু গিরিপথের (পাল ঘাট, থল ঘাট, ও ভোর ঘাট) মধ্য দিয়া প্রসারিত রাস্তা ও রেলপথ পশ্চিম উপকূলের সহিত মালভূমির পূর্ব অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে। মালভূমির পূর্বদিকের ভূ-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প বন্ধুর হওয়ায় যানবাহন চলাচল বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তবে নদীসমূহ বর্ষাকালে অত্যন্ত খরস্রোতা হয় এবং শীতকালে শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া ইহারা বিশেষ নাব্য নহে। সম্প্রতি এই মালভূমি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতীয়

যন্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র-সমূহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। মালভূমি অঞ্চলের আর্থিক সঙ্গতি অল্প বলিয়া লোকবসতিও অল্প।

অর্থনৈতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব (Influence of climate on man's economic life)—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব অতুলনীয়। (১) জলবায়ুর উপর **কৃষিকার্য** বহুলাংশে নির্ভর করে। সেই কারণে কৃষিজ ও অরণ্যজাত দ্রব্যসমূহ এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে স্থান বিশেষে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। **পশুচারণ** শিল্পও বহুলাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী ও দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে বহুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। **মৎস্যচারণ** শিল্পেও জলবায়ুর প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত সমুদ্রে, বিশেষতঃ শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনস্থলে প্রচুর খাদ্য ও নানাপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায় বলিয়া মৎস্য শিল্প ঐ মণ্ডলেই সংবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। **মৃত্তিকা** গঠনেও জলবায়ুর প্রভাব অসামান্য।

(২) **যন্ত্রশিল্পের** উপরও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাপক। সাধারণতঃ মৃদু-জলবায়ুসম্পন্ন অঞ্চলই এই শিল্প গঠনের অনুকূল। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ শিল্পগুলি অধিক পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। **প্রত্যক্ষভাবে** জলবায়ু শিল্পের **একদেশতাকে** নির্দেশ করে। বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন, কারণ শুষ্ক আবহাওয়ায় কার্পাস তন্তু সহজেই ছিন্ন হইয়া যায়। তাই সমুদ্রের সান্নিধ্যে আর্দ্র আবহাওয়ায় **কার্পাস** শিল্পের প্রচলন ও প্রসার এত অধিক। বোম্বাই, ওসাকা, ম্যাঞ্চেস্টার, আমেদাবাদ প্রভৃতি শহর এই কারণেই কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। ময়দার কল আবার শুষ্ক অঞ্চলেই ভাল চলে, কারণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ময়দা সহজেই পচিয়া যায়। তাই করাচী, মিনিয়াপোলিস, বুদাপেস্ট প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলে ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সর্ববর্ণোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। তাই ক্যালিফোর্নিয়া, ইটালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

যন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর **পরোক্ষ প্রভাব** অনেক। (ক) জলবায়ু মানুষের **চাহিদা**কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিল্প সংগঠন নির্দিষ্ট করে। শীতপ্রধান অঞ্চলে সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক। সুতরাং কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান অঞ্চলের শিল্প প্রচেষ্টা সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, বঙ্গদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক থাকায় এ সমস্ত অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়।

(খ) জলবায়ু শিল্পে-ব্যবহৃত **কাঁচা মালের** উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিল্পের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, যে অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে পাট উৎপন্ন হয়, সে অঞ্চলে পাটকে কেন্দ্র করিয়া পাটশিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক।

(গ) **শ্রমিকের সরবরাহ** এবং তাহাদের **কর্মনৈপুণ্য** নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলবায়ু শিল্পের গঠন ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রিত করে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে প্রধানতঃ জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির উপর। কিন্তু এই জনসংখ্যা-বণ্টনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। প্রতিকূল জলবায়ুবশতঃ উষ্ণ ও হিম মরু অঞ্চলে এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের বহু স্থানে লোকবসতি অতি বিরল। অপর পক্ষে দঃ পূঃ এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বহুস্থানে অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন এবং শ্রমিকের সরবরাহও অধিক। আবার, অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের শ্রমশক্তি ও কর্মদক্ষতা উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। এই কারণে উষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলি অপেক্ষা শিল্পে ও বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ

(ঘ) উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে কাঁচা মাল শিল্পকেন্দ্রে আনয়ন এবং উৎপাদিত শিল্প-সামগ্রী শিল্পকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রে প্রেরণের জন্য **পরিবহন-ব্যবস্থা** সম্যক্ গঠিত না হইলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। কিন্তু এই পরিবহন-ব্যবস্থাও জলবায়ু এবং আবহাওয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে রেলপথ ও নদীপথ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। উষ্ণ মরু-অঞ্চলে বালিয়াড়ির আধিক্য ও উহার অনবরত পরিবর্তন হেতু রেলপথ নির্মাণ সম্ভব নহে। বিমানপথে যাতায়াত-ব্যবস্থা অনেক স্থানেই প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ব্যাহত হয়।

(ঙ) জলবায়ু **শিল্পাগারের আয়তন** নিয়ন্ত্রণ করে। সুইজারল্যাণ্ড পর্বতসঙ্কুল ও শীতপ্রধান দেশ। বৎসরের অধিকাংশ সময় এদেশে তুষারপাত হয় বলিয়া ঘরের বাহিরে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য এখানে প্রধানতঃ কুটির শিল্পই গড়িয়া উঠিয়াছে। অপর পক্ষে, অনুকূল জলবায়ুযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রসারই অধিক।

(৩) **উপনিবেশ স্থাপন** জলবায়ুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কারণ যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে সেই দেশের জলবায়ু যদি ঔপনিবেশিকের দেশের জলবায়ুর অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে উপনিবেশ স্থাপন সাধারণতঃ সম্ভব হইয়া উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের উপযুক্ত নয়; সেই কারণে অধুনা-প্রবর্তিত 'শ্বেত-অস্ট্রেলিয়া নীতি' এই অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ-বসতি স্থাপনে যে কতদূর সহায়ক হইবে, তাহা বলা কঠিন।

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই, করিবার আশাও খুব অল্প।

অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদ-এর প্রভাব (Influence of natural resources on man's economic life)—মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থানিচয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সচরাচর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও জৈব প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৃত্তিকা (Soils)—মৃত্তিকা প্রাথমিক উৎপাদনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের মৃত্তিকা উদ্ভিদের খাদ্য উপকরণে সমৃদ্ধ, সে অঞ্চলে কৃষিকার্যের অন্যান্য অবস্থাগুলি অনুকূল হইলে কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এই কারণেই কৃষিজ সম্পদে এত সমৃদ্ধ। অপর পক্ষে, চাষের অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মৃত্তিকা অনুর্বর হইলে কৃষিকার্য স্বাভাবিক ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে না। আবার মৃত্তিকার প্রকৃতি ও গুণ অনুসারেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের এবং কৃষিজাত দ্রব্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নিরক্ষীয় অঞ্চলের মৃত্তিকায় জন্মে, তাহা শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকায় জন্মে না। পাট বঙ্গদেশে জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশের অনুরূপ মৃত্তিকা পাঞ্জাবে না থাকায় তথায় পাট জন্মে না।

খনিজ (Minerals)—খনিজ পদার্থ মানব-সভ্যতাকে নানারূপে প্রভাবান্বিত করে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে এবং কালক্রমে সেই সমস্ত অঞ্চল জনসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও সাকচী ছিল মনুষ্যবাসের অযোগ্য একটি নিবিড় বনাঞ্চল। কিন্তু টাটা কোম্পানীর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার পর হইতে উহা বর্তমানে জনসমৃদ্ধ জামসেদপুর শহররূপে পরিচিত হইয়াছে। যে সমস্ত খনিজ সম্পদ মনুষ্য-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়লা ও লৌহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লা-খনি অঞ্চল বর্তমানে জনসমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি (Plant life)—মৃত্তিকার প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রকারভেদে পৃথিবীর নানাস্থানে নানা প্রকারের উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। তৃণাঞ্চলসমূহ পশুপালন ও শস্যোৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু

উল্লেখ করিতে পারি। **মিশর** দেশটির অধিকাংশই মরুভূমি—সাহারার অনুবৃত্তি। কেবলমাত্র উত্তরের বদ্বীপাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দৃষ্ট হয়। তথাপি মিশর একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি। দেশের মধ্যভাগ দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত নীলনদ মিশরের সৌভাগ্যের মূল ; এই কারণে মিশরকে "নীলনদের দান" (gift of the Nile) বলা হয়।

নীল (৪০০০ মাইল) নদের উৎপত্তিস্থল নিরক্ষরেখায় অবস্থিত হওয়ায় এই জলস্রোত সারাবৎসরই জলপূর্ণ থাকে। প্রায় ১০° উঃ অক্ষরেখার নিকট পশ্চিমদিক হইতে বাহর্-এল-গজল এবং পূর্বদিকে আবিসিনিয়ার উচ্চভূমি হইতে উত্থিত সোবাত নীল নদের সহিত মিলিত হয়। এস্থান হইতে নীলনদ সমভূমির উপর দিয়া খার্টুম শহর পর্যন্ত প্রবাহিত। আবিসিনিয়ার মালভূমির অন্তর্গত টানা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া ব্লু-নীল নদ খার্টুম নগরের নিকট এবং আটবারা নদী বারবারের নিকট নীলের সহিত মিলিত হয়। বাহর্-এল-গজল হইতে ব্লু-নীল সঙ্গম পর্যন্ত নদীটিকে হোয়াইট নীল বলা হয়। গ্রীষ্মকালে আবিসিনিয়া অঞ্চলে প্রবল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে এই নদীসমূহে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং পর্বতগাত্র বহিয়া আগ্নেয়শিলাচূর্ণসহ জলরাশি প্রবলবেগে নীলনদে ঢালিয়া দেয়। ফলে মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে নীল নদের দুই কূল প্লাবিত ও পলিসমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বর্ষাকালে শ্বেতনীল নদের জল খার্টুম শহরের উত্তরাংশে ব্লু-নীল নদের প্রবল জলস্রোতকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু শীতকালে যখন ব্লু-নীলের জলপ্রবাহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে তখন শ্বেতনীলের জলপ্রবাহ মিশরে পৌঁছে। এই কারণে মিশরের অন্তর্গত নীলনদে সারাবৎসরই জলপ্রবাহ বর্তমান থাকে।

নীলনদ হইতে বন্যার জল লইয়া মিশরে এই নদের তীরবর্তী ভূমিভাগে **জলসেচ** করা হয় বলিয়া মিশর শস্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। মিশরে বর্তমানে দুই পদ্ধতিতে জলসেচ করা হইয়া থাকে। যথা, (১) **আধার জলসেচ**—এই পদ্ধতি অনুসারে নদীতীরবর্তী কৃষিক্ষেত্রগুলিকে ৪-৫ ফুট উঁচু মাটির বাঁধ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে বহু জলাধারে পরিণত করা হয় এবং জলাধারগুলিকে সঙ্কীর্ণ নালার সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বন্যার জল বৃদ্ধি পাইলে এই সঙ্কীর্ণ নালাপথে জল বহুদূর পর্যন্ত যায় এবং জলাধারগুলিতে সঞ্চিত হয়। নভেম্বর মাসে জল চলিয়া গেলে জমিতে পলি পড়িয়া থাকে এবং সিক্তক্ষেত্রে ভুট্টা, শীতকালীন গম, যব, ডাল, মুসুরী, খড়, প্রভৃতির চাষ করা হয়। এই সমস্ত শস্য কাটা হইবার পর পরবর্তী বর্ষাকাল পর্যন্ত জমি পতিত রাখা হয়। মিশরের দক্ষিণাংশে এই সেচ পদ্ধতির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। (২) **নিত্যবহ খাল**—বর্তমান কালে নিত্যবহ খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে

উত্তর মিশরেই এইরূপ জলসেচ ব্যাপক। নিত্যবহ খালের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কার্পাস, ধান, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি গ্রীষ্ম-

১৪নং চিত্র—নীলনদের গতিপথ
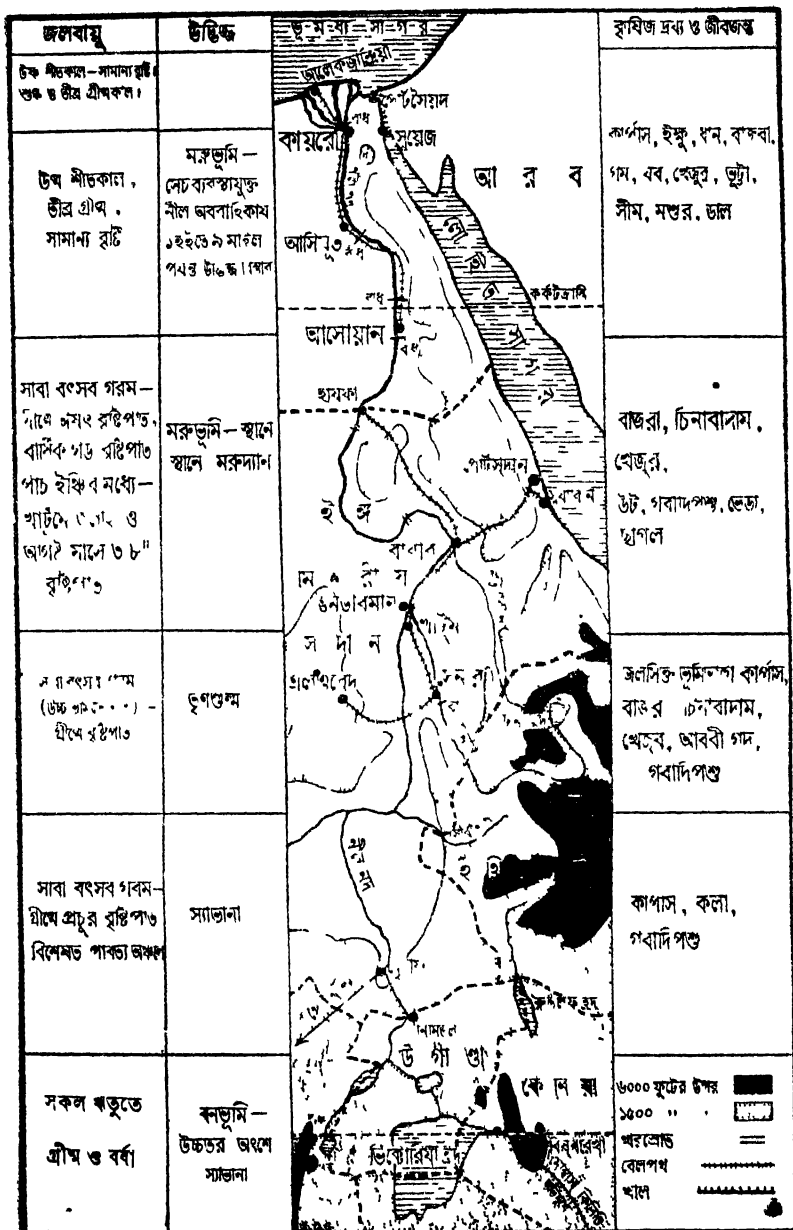
কালীন ফসলের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসোয়ানের নিকট নীলনদের উপর ৩৬৫' উচ্চতা ও ৩ মাইল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বাঁধ বাঁধিয়া ৭ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিভূমিতে সম্বৎসর জলসেচ করার একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা মিশর সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বাঁধের নিকট অবস্থিত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা হইতে উদ্ভূত ৭৫ লক্ষ কিঃওঃ পরিমিত জলবিদ্যুৎ নিকটবর্তী একটি সার উৎপাদন কারখানা ও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হইবে। নীলনদের উপত্যকাভূমি পৃথিবীর নিবিড়তম বসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের অন্যতম। প্রতি বর্গমাইলে এস্থানে ১৫০০ লোক বাস করে। কার্পাস মিশরের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ফসল। মিশরের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৭৫% কার্পাস। ইহা দীর্ঘতন্তু-বিশিষ্ট। মিশরের বিঘাপ্রতি ফসল উৎপাদনের হারও অধিক। নীলনদই মিশরের একমাত্র নাব্য জলপথ। এই নদীপথের তীরে তীরে ও মোহানায় বহু সমৃদ্ধ নগর ও বন্দরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে মিশরকে "নীলনদের দান" বলা হয়।

অর্থনৈতিক জীবনে সমুদ্রস্রোত-এর প্রভাব (Influence of ocean currents on man's economic life)—সমুদ্রস্রোত দুই প্রকারের—উষ্ণ ও শীতল। মানব জীবনের উপর ইহাদের প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আবার বহু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। (১) সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে স্রোতের অনুকূলে যেরূপ জাহাজ চালাইবার সুবিধা হয় স্রোতের প্রতিকূলে তেমন উহা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হইয়া উঠে। বর্তমানে অবশ্য যন্ত্রচালিত জাহাজের চলাচলের ক্ষেত্রে সমুদ্রস্রোত বিশেষ প্রভাব বিস্তার না করিলেও পাল-তোলা জাহাজগুলি আজও পর্যন্ত অনুকূল সমুদ্রস্রোতের সুযোগ লয় ও প্রতিকূল সমুদ্রস্রোত এড়াইয়া চলে। (২) সমুদ্রতীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। শীতল স্রোত উপকূল-সন্নিহিত স্থানসমূহের উত্তাপ হ্রাস করে এবং উষ্ণ স্রোত উত্তাপ বৃদ্ধি করে। শীতল ল্যাব্রাডোর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদী ও মোহানা বৎসরের নয় মাসই প্রায় বরফাবৃত থাকে, কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই সমাক্ষ রেখায় অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলাঞ্চল কখনও তুষারাবৃত থাকে না। (৩) উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক থাকে বলিয়া উহা স্থলভাগের দিকে চালিত হইলে বৃষ্টিপাত হয়। পক্ষান্তরে শীতল স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হইয়া থাকে বলিয়া উহাতে বৃষ্টি হয় না। (৪) শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনস্থান সর্বদাই ঘন কুয়াসাবৃত থাকে। এই জন্য সুমেরু মহাসাগরীয় শীতল স্রোতের সহিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট উপ-সাগরীয় উষ্ণ স্রোত এবং জাপান উপকূলে উষ্ণ কুরোশিয়ো স্রোত মিলিত

হওয়ায় ঐ দুইটি স্থানে প্রায়ই নিবিড় কুয়াসা এবং প্রবল ঝড়-তুফানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। (৫) শীতল সমুদ্রস্রোতের সহিত প্রচুর মাছ আসে এবং যেখানে উষ্ণ স্রোতের সহিত শীতল স্রোতের মিলন হয় মাছগুলি সেখানেই থাকিয়া যায়। এই কারণে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে ও জাপানের উপকূলে মৎস্য ব্যবসায় ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৬) হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গলিয়া যায় এবং উহার সহিত আনীত মাটি কাদা, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি জলের তলদেশে জমিয়া চড়া বা মগ্নভূমির সৃষ্টি করে। এই অগভীর জলে মৎস্য খাদ্য প্ল্যাংকটন প্রচুর জন্মে এবং এই সমস্ত স্থানেই মাছেরা ডিম পাড়ে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ

অর্থনৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of cultural environment on man's economic life)—মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থানচয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সচরাচর প্রভাবান্বিত করে বলিয়া অনেকে মনে করেন তাহাদের মধ্যে প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনযন্ত্র এবং জনসংখ্যাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবংশের (Race) তারতম্য অনুসারে মানুষের বৈষয়িক উন্নতিরও তারতম্য হয়—এইরূপ একটা সংস্কার কোন কোন ভৌগোলিকের মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ তাহারা বৈষয়িক সভ্যতায় অনুন্নত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষ্ণকায় জাতিদের কথা প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে উত্তর-পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় জাতিদের তুলনায় কিছুটা উন্নতিশীল। তাহারা মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ রুশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, আরব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতবর্ণ ককেশীয় অধিবাসীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই মত বিচারসহ নয়। নৃতত্ত্ব-শাস্ত্রে আজিও এরূপ কোনও মতবাদ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ প্রবংশ কোথাও আছে কি না ঘোর সন্দেহের বিষয়। তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের দুরবস্থার কারণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জাতিসঙ্ঘ হইতে স্পষ্ট ভাষায় প্রবংশগত পার্থক্য অস্বীকৃত হইয়াছে।

ধর্ম (Religion) মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এইরূপ আর একটা সংস্কারও ভৌগোলিকদের মধ্যে আছে।

কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বিচারসহ নয়। গরু এবং শূকরের মাংস বৌদ্ধ চীনাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য, চীনে এ সব জিনিসের কারবারও যথেষ্টই আছে। ইসলামে লগ্নীর কারবার নিষিদ্ধ, কিন্তু আমাদের দেশে কাবুলীওয়ালাদের প্রধান উপজীবিকাই হইল লগ্নীর কারবার। এইসব ব্যবসায়ে চীনারা বা কাবুলীরা যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদের মতো উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাজনৈতিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অনেকের বিশ্বাস, ভারতে যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের আশানুরূপ প্রসার না হওয়ার কারণ এখানে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথার অস্তিত্ব, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরূপ নয়। ভারতের সুদীর্ঘ কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং তদপেক্ষাও দীর্ঘতর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনযন্ত্র (Government) মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র যেরূপ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক, নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনযন্ত্র সেইরূপ অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। মেক্সিকো এবং এতাবৎকাল পর্যন্ত চীন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও শাসনযন্ত্রের স্থিতিশীলতার অভাবে শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে জাপান ও জার্মানী এই দুইটি দেশ নিজ নিজ সরকারের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাহাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পাকা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।.

জনসংখ্যার (Population) পরিমাণ, বৃদ্ধির হার ও বসতি-ঘনত্ব মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জনসংখ্যার পরিমাণের দ্বারা দেশে শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ নির্ধারিত হয়। জনবহুল স্থানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার যেরূপ ব্যাপক, জনবিরল স্থানে সেরূপ নহে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলও জনবিরল হইলে তথায় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। অস্ট্রেলিয়া জনবিরল হওয়ায় ঐ দেশে পশুচারণ শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু গ্রেটব্রিটেন জনবহুল হওয়ায় ঐ দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসারই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of man's relation to geographical location, coast-line, area and form of a country. Explain your answer with the help of examples drawn from Indian conditions. (C. U. '53, '60)

(ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতরেখা, দেশগত আয়তন ও আকার-এর সহিত মানব-জীবনের কি সম্পর্ক তাহা ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখ।) (পৃঃ ৩০-৩৭)

2. What type of geographical location is considered favourable to a country and why?

(দেশগত বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থান অনুকূল তাহা বুঝাইয়া লিখ।) (পৃঃ ৩২-৩৩)

3. Examine the effects of topography on man's economic life Explain your answer with examples drawn from Indian conditions.

(ভূপ্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা ভারতীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বুঝাইয়া লিখ।) (পৃঃ ৩৭-৪১)

4. Examine the effects of climate on man's economic life in general and on industries in particular

(জলবায়ু সাধারণভাবে মানবজীবনের উপর এবং বিশেষভাবে শিল্পের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪০-৪২)

5. "Rivers play a vital role in the economic development of a country"—Discuss. (C. U 56. '57)

("দেশগত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে নদনদীসমূহ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।"—এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় কর।) (পৃঃ ৪৪-৪৬)

6. "Egypt is the gift of the Nile"—Discuss

("মিশর নীলনদের দান"—এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় কর।) (পৃঃ ৪৩-৪৮)

7. Select any two regions of India with contrasting physical features and indicate their influence on the economic development of these regions. (C. U 60)

(ভারতের যে কোন দুইটি বিপরীতধর্মী ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চল নির্বাচন করিয়া আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে উহাদের প্রভাব নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৩৯-৪১)

8 What do you mean by environment in economic geography? Show with suitable examples that the economic activities of man are greatly influenced by his environment (H S '61)

(পরিবেশ কাহাকে বলে? মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে তাহার পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।)

চতুর্থ অধ্যায়

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

জলবায়ু (Climate)—কোন স্থানের দৈনিক বৃষ্টিপাত, বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি, সূর্যালোকের পরিমাণ ইত্যাদির সমষ্টিগত অবস্থা ঐ স্থানের ঐদিনের **আবহাওয়া** (weather) নির্দেশ করে। কোন স্থানের ঐ সকল অবস্থার ত্রিশ বা ততোধিক বৎসরের গড় ফলকে ঐ স্থানের **জলবায়ু** (climate) বলা হয়।

স্থানীয় জলবায়ু নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার উপর নির্ভর করে—(১) **অক্ষাংশ**—সাধারণতঃ নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে প্রতি ডিগ্রী অক্ষাংশে ½° ফাঃ উষ্ণতা হ্রাস পায়। (২) **উচ্চতা**—প্রতি ৩০০' উচ্চতায় ১° ফাঃ উষ্ণতা হ্রাস পায় বলিয়া উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও অধিক উচ্চতা হেতু কোন স্থানের জলবায়ু শীতল হইতে পারে। যেরূপ নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হইলেও আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের শিখর দেশ সর্বদাই তুষারাবৃত থাকে। (৩) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানসমূহের জলবায়ু সমভাবাপন্ন কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানসমূহের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে প্রায় একই অক্ষরেখায় অবস্থিত হইলেও গ্রীষ্মকালে গয়া অপেক্ষা করাচী শীতলতর। (৪) **সমুদ্রস্রোত**—উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহের ফলে উপকূল-সন্নিহিত স্থান-সমূহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতল স্রোত প্রবাহিত হইলে উত্তাপ হ্রাস পায়। (৫) **বায়ুপ্রবাহ**—কোন স্থানের উপর দিয়া উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে ঐ স্থান উষ্ণ হয় এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে সেই স্থান শীতল হইয়া পড়ে। (৬) **বৃষ্টিপাত**—বৃষ্টিপাতের ফলে স্থানীয় উত্তাপ হ্রাস পায়। (৭) **পর্বতশ্রেণীর অবস্থান**—পর্বত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দিয়া জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করে। হিমালয় পর্বতের অবস্থান হেতু মৌসুমীবায়ু উত্তর ও পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে সক্ষম হয়। আবার এই পর্বতের অবস্থান হেতু ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র কিন্তু তিব্বতের জলবায়ু শুষ্ক ও শীতল। (৮) **ভূমিভাগের ঢাল**—ভূমিভাগ বিষুব রেখার দিকে ঢালু হইলে ঐ স্থান অধিক উষ্ণ হয় কিন্তু বিপরীত দিকে ঢালু হইলে ঐ স্থান অধিক উষ্ণ হইতে পারে না। (৯) **অরণ্যের অবস্থিতি**—গভীর অরণ্যাকীর্ণ স্থানে জলীয় বাষ্প সহজেই ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় বলিয়া তথাকার জলবায়ু আর্দ্র থাকে। (১০) **ভূমির প্রকৃতি**—যে স্থানের ভূমিভাগ বালুকাময় বা প্রস্তরাকীর্ণ সে স্থান শীঘ্র উত্তপ্ত ও শীতল হয়, কিন্তু কর্দমাক্ত ভূমিভাগ সহজে অধিক শীতল বা উষ্ণ হইতে পারে না।

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল (Natural Regions)—অবস্থান, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পার্থিব পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে এই সকল পার্থিব পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাব একই প্রকারের সেই অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বা অঞ্চল বলা হয়। অধ্যাপক হার্বার্টসন বলেন, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল (Natural Region) বলিতে বুঝায়, "ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত এরূপ একটি ক্ষেত্র যেখানে মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচয় মূলতঃ একই প্রকৃতির" ("An area of the earth's surface which is essentially homogeneous with respect to the conditions that

affect human life")। আরব দেশের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে, উত্তর-চিলির অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তটে। স্থান-দুটির মধ্যে বিপুল ব্যবধান—একটি উত্তর-গোলার্ধে, অন্যটি দক্ষিণ-গোলার্ধে, একটি পূর্ব-গোলার্ধে, অন্যটি পশ্চিম গোলার্ধে। তবুও আরব ও উত্তর চিলির ভৌগোলিক অবস্থানে মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে—দু'টি দেশেরই অবস্থান ভূমিভাগ হইতে প্রবাহিত জলকণাবিহীন রুক্ষ আয়নবায়ুর গতিপথে। ইহারই জন্য এ দু'টি দেশ বৃষ্টিহীন উষ্ণ মরুভূমি। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া যেমন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অন্যান্য দিক দিয়াও তেমনই দূর-দূরান্তরের নানা দেশ মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচয়ে মূলতঃ সমপ্রকৃতির হইতে পারে। এইরূপ দেশগুলিকে তাই সমশ্রেণীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যায়।

সমশ্রেণীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্য না থাকিলে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা মূলতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় যেরূপ চাষ-আবাদের বা যে সকল শ্রমশিল্পের পত্তন হইতে পারে, আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে কিংবা এশিয়ার সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতিতেও সে সব ব্যাপারের প্রবর্তন সম্ভবপর।

বিবেচ্য বিষয় (Factors to be noted)—প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখা' ত হইবে—(১) পৃথিবীকে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করার অর্থ হইতেছে প্রায় সমানধর্মী কয়েকটি অঞ্চলে পৃথিবীকে ভাগ করা। সেই হেতু যে কোন একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ অপেক্ষা সাদৃশ্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে হইতে অপর একটি অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়। বহুক্ষেত্রে একাধিক প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে সন্ধিক্ষেত্রও (transitional zone) দৃষ্ট হয়। (৩) ভূ-সংস্থান, অবস্থান প্রভৃতির পার্থক্যের দরুন হয়ত একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। (৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল গঠিত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ (Major Natural Regions of the World)—জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় উত্তাপের তারতম্য অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রত্যেকটিকে চারিটি **তাপ-মণ্ডলে** বিভক্ত করা যাইতে পারে (২য় অধ্যায় দেখ); যথা—(১)

প্রায় ৩০° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ **উষ্ণমণ্ডল,** (২) সাধারণতঃ ৩০° উঃ হইতে ৪৫° উঃ এবং ৩০° দঃ হইতে ৪৫° দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ **গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ** বা **উপক্রান্তীয়** বা **উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল,** (৩) ৪৫° উঃ হইতে সুমেরুবৃত্ত এবং ৪৫° দঃ হইতে কুমেরুবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ **শীত-প্রধান নাতিশীতোষ্ণ** বা **হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল,** এবং (৪) মেরুবৃত্তদ্বয় হইতে পর্যায়ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত **হিমমণ্ডল।**

ভৌগোলিক হার্বার্টসন আবার প্রত্যেকটি তাপমণ্ডলের অন্তর্গত ভূমিভাগকে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এই তিনটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিকস্থ পরিমণ্ডলসমূহের অবস্থান সমুদ্র-প্রান্তীয় কিন্তু মধ্যভাগের পরিমণ্ডলসমূহের অবস্থান মহাদেশীয়। বিখ্যাত জার্মান ভৌগোলিক ক্যাই্‌প্লেনও পৃথিবীকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন (এই অধ্যায়ের শেষ অংশ দেখ)। তবে ক্যাই্‌প্লেনের এই বিভাগগুলি ভূপৃষ্ঠে জলবায়ুর প্রকৃত ছবিটি কোন দিনই পরিস্ফুট করিতে পারে নাই। আধুনিক কালের ভৌগোলিকেরা ক্যাই্‌প্লেন বা হার্বার্টসনকে মোটামুটি অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অধ্যাপক হার্বার্টসনের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, তবে উহা হইতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে, পৃথিবীকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—

(ক) নিম্ন অক্ষাংশের (low latitudes) বা উষ্ণমণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চল-সমূহ—(১) নিরক্ষীয় বা আমাজনীয় পরিমণ্ডল (Equatorial বা Amazon type), (২) মধ্যভাগে ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা সুদানী পরিমণ্ডল (Tropical Grassland বা Sudan বা Savannah type), (৩) পূর্বপ্রান্তীয় ক্রান্তীয় মৌসুমী পরিমণ্ডল (Tropical Monsoon type), (৪) ইকুয়েডর দেশীয় উপমণ্ডল (Equador type), (৫) পশ্চিমপ্রান্তীয় উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডল (Hot Desert বা Sahara type)।

(খ) মধ্য অক্ষাংশের* (middle latitudes) উপক্রান্তীয় মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) পূর্ব-প্রান্তীয় চৈনিক পরিমণ্ডল (Warm Temperate East Coast বা China type), (২) পশ্চিম-প্রান্তীয় ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল (Mediterranean type), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিম্নভূমি বা তুরানী জলবায়ু অঞ্চল (Interior Lowland বা Turan type), (৪) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা ইরানী জলবায়ু অঞ্চল (Interior Highland বা Iran type), (৫) মধ্যভাগে তিব্বতীয় জলবায়ু অঞ্চল (Tibet type)। শেষোক্ত তিনটি অঞ্চলকে একত্রে 'মন্দোষ্ণ মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল' (Mid-latitude deserts and semi-deserts)-ও বলা হয়।

*৩০° উঃ হইতে ৬০° উঃ এবং ৩০° দঃ হইতে ৬০° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

(গ) মধ্য অক্ষাংশের শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চল-সমূহ—(১) পূর্ব-প্রান্তীয় লরেন্সীয় বা হিমশীতোষ্ণ পূর্ব-উপকূলীয় পরিমণ্ডল (Cool Temperate East Coast বা St. Lawrence type), (২) সমগ্র উত্তরাংশ ব্যাপিয়া সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল (Cold Temperate বা Taiga type), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিম্ন তৃণভূমি অঞ্চল (Mid-latitude Continental বা Steppe type), (৪) পশ্চিম-প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক পরিমণ্ডল (Cool Temperate Oceanic বা British type), (৫) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা আল্টাই পরিমণ্ডল (Interior Highlands বা Altai type)।
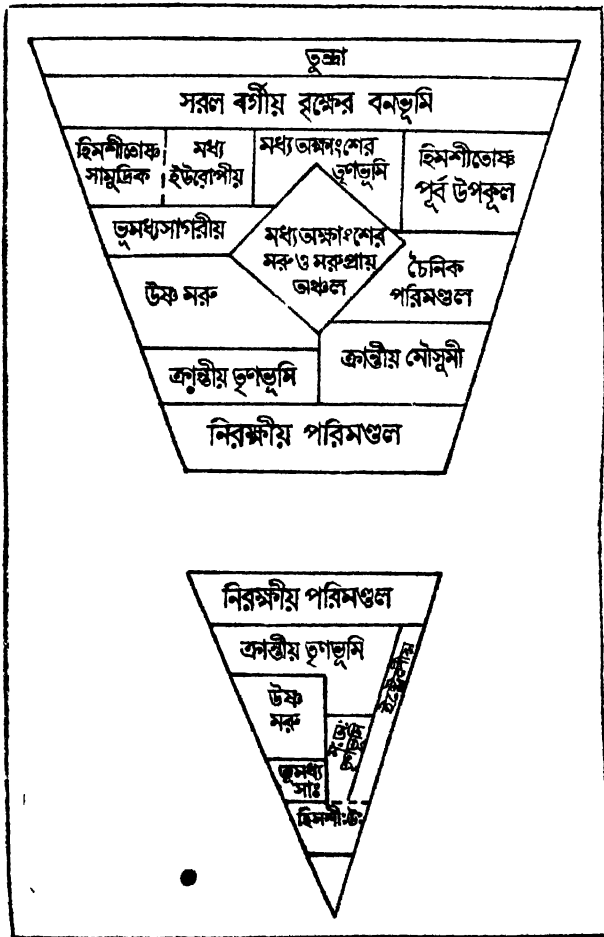
১৫নং চিত্র—বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক
লক্ষ্য কর যে উত্তর গোলার্ধের ভূমিভাগ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ভূমিভাগ ক্রমশঃ সংকীর্ণ

(ঘ) উচ্চ অক্ষাংশের* বা হিম মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) তুন্দ্রা অঞ্চল (Tundra type), (২) মেরুদেশীয় উচ্চভূমি অঞ্চল (Polar Ice Caps)।

ক (১) নিরক্ষীয় জলবায়ু অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণে সাধারণতঃ ৫°-১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই জলবায়ু অঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা ; মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলাঞ্চল ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বীপ ও প্রধান ভূভাগ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ এবং মালয় এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই এই জলবায়ু সমধিক পরিস্ফুট বলিয়া নিরক্ষীয় জলবায়ুকে **আমাজনীয়** (Amazon type) জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে (ক) সারা বৎসর গড় উত্তাপ ৭৫° ও ৮০° ফাঃ-এর মধ্যে থাকে। বার্ষিক ও দৈনিক তাপপ্রসর যথাক্রমে ৫° ও ২০° ফাঃ-এর অনধিক। (খ) বৎসরের অধিকাংশ দিনই বৈকালে বজ্রপাতের সহিত পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৮০", তবে স্থানবিশেষে ২০০"-ও হইয়া থাকে। (গ) নিরক্ষীয় শান্তবলয়ে অবস্থিত হওয়ায় বৎসরের কোন সময়েই প্রবল বাত্যা অনুভূত হয় না। (ঘ) বায়ু সর্বদাই উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। (ঙ) উষ্ণ ও আর্দ্র ঋতু ভিন্ন অন্য কোন ঋতু নাই। তবে বৎসরে যে দুইবার (মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে) সূর্য নিরক্ষবৃত্তের উপর লম্ব হয় তাহারই নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ আধিক্য ঘটে, আর যে দুইবার সূর্য ক্রান্তি-বৃত্ত দুইটির উপর লম্ব হয় (জুন ও ডিসেম্বর মাসে) তাহার নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ স্বল্পতা অনুভূত হয়।

নিরক্ষীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : মানাওস (অঃ ৩°১৫´দঃ), ব্রাজিল , উচ্চতা : ১৩১´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৯	৭৯	৭৯	৮০	৮০	৮১	৮০	২°৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৯৮	৯৬	১১৮	১০০	৭৫	৫১	৩০	১'৮	১৫	৩৯	৬'৪	১০৩		৮৩৭

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—নিরক্ষীয় অঞ্চল বৎসরের সকল সময়েই উত্তাপের প্রাবল্য ও বৃষ্টির প্রাচুর্য হেতু কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যে (hardwood evergreen forests) আবৃত। এখানকার গুল্মসমূহও অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট, তবে তৃণভূমির একান্ত অভাব রহিয়াছে। নদীতীরবর্তী বন্যাপ্লাবিত নিম্নভূমি অঞ্চলে **ইগাপু**, অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভূমিতে **কা-ওয়াজু** বা

*৬০° উঃ হইতে ৯০° উঃ এবং ৬০° দঃ হইতে ৯০° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।
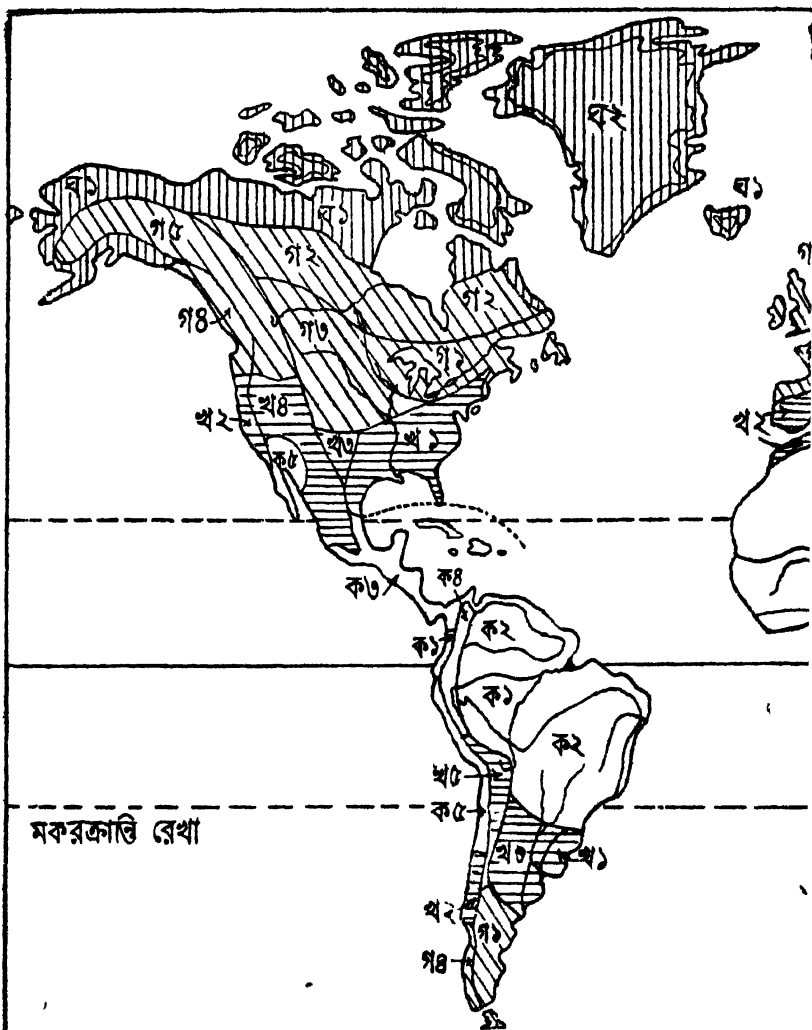
১৬ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধা
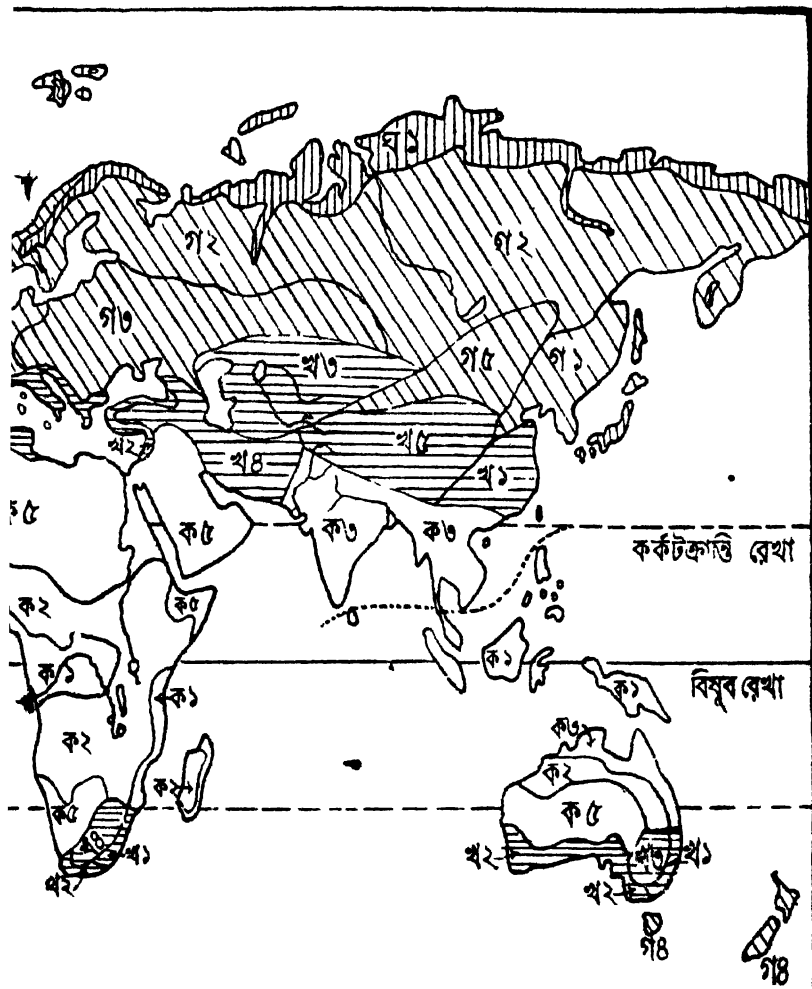
মণ্ডল   গ শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল   ঘ. মেরুমণ্ডল

গ১ লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চল   ঘ১ তুন্দ্রা অঞ্চল

গ২ মহাদেশীয় নিম্নভূমি অঞ্চল   ঘ২ মেরুদেশীয় উচ্চভূমি

ঞ্চল   গ৩ মহাদেশীয় নিম্নতৃণভূমি অঞ্চল

ঞ্চল   গ৪ বৃটিশ জলবায়ু তাঞ্চল

ঞ্চল   গ৫ আল্টাই জলবায়ু অঞ্চল

প্রধান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ

-সেলুতা এবং উপকূল অঞ্চলে তালজাতীয় বৃক্ষ এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। এতদঞ্চলে অরণ্যের উপরিভাগে বৃক্ষশাখার আচ্ছাদন এত নিবিড় যে উহা ভেদ করিয়া সূর্যালোক বনের তলদেশে পৌছিতে পারে না, ফলে অরণ্যের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারময় এবং অতিকায় লতা ও অন্যান্য আগাছাতে পরিপূর্ণ থাকে। এতদঞ্চলের উদ্ভিদ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মরক্ষার জন্য ঊর্ধ্বদেশের ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিতে থাকে বলিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃক্ষাদি অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে। অরণ্যের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত প্রাণীই বৃক্ষশাখায় বসবাস করে। তাই সরীসৃপ ও বানর এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। তবে বরাহ, টেপির, জাগুয়ার, পুমা, নানাপ্রকারের পক্ষী ও কীটপতঙ্গ অরণ্যাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা—সংবৎসরব্যাপী প্রবল উত্তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকার ধাতব উপাদানের ক্ষয় ও অপসারণ হেতু নিরক্ষীয় পরিমণ্ডলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত রক্তবর্ণের ল্যাটেরাইট জাতীয়। তবে সামান্য অম্লধর্মী নূতন লাভার দ্রুত আবহবিকারের ফলে গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা (যেরূপ যবদ্বীপের মৃত্তিকা) এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে নবগঠিত পলিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা অথবা পর্বতের সানুদেশে সঞ্চিত শাংকব পলিভূমির মৃত্তিকা বিশেষ উর্বর হইয়া থাকে।

বৈষয়িক অবস্থা—বৈষয়িক দিক দিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত অনুন্নত। কারণ, (১) এই অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু মনুষ্যবাসের প্রতিকূল, (২) এই অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর অত্যন্ত অভাব থাকায় পশুচারণ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই, (৩) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলে এত শীঘ্র আবার জন্মাইয়া উঠে যে অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্য করাও অসম্ভব, (৪) এই অঞ্চল গভীর অরণ্যাকীর্ণ হওয়ায় যানবাহনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য নহে, (৫) এতদঞ্চলের মৃত্তিকা বিশেষ উর্বর নহে এবং ভূমিক্ষয়ও ব্যাপক। এই সমস্ত অন্তরায় থাকায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আদিম অবস্থা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুর্বল, অসভ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের দাস। নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ হইলেও কাষ্ঠের ব্যবসায়ে নিরক্ষীয় অঞ্চল তেমন উন্নত নহে (১১শ অধ্যায় দেখ)। অধিবাসীরা প্রধানতঃ উঞ্ছ ও শিকারজীবী। তবে স্থানে স্থানে 'মিলপা' বা 'ফ্যাঙ'প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলের রবার, গাটাপার্চা, তালতৈল, নারিকেলের শাঁস, কোকো, হস্তিদন্ত, নাট, গঁদ, চিক্‌ল্, কুইনাইন, সার্সাপ্যারিলা, ভ্যানিলা, কফি, চিনি প্রভৃতি কৃষিজ ও বনজ দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এত অধিক প্রয়োজনীয় এবং ইহাদের চাহিদা শিল্পপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এত ব্যাপক যে, এই

সমস্ত দ্রব্য আহরণের জন্য এতদঞ্চলে বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষিকার্য আরম্ভ হইয়াছে। নিরক্ষীয় এশিয়ার মালয়বাসী, জাভার অধিবাসী এবং বোর্নিওর অধিবাসীরা উঞ্ছ ও শিকার-বৃত্তির পরিবর্তে কৃষিকার্যেই বর্তমানে মনোনিবেশ করিয়াছে কিন্তু কঙ্গো ও আমাজন নদী অববাহিকার অন্তর্গত অধিবাসীরা অদ্যাবধি অনুন্নতই রহিয়া গিয়াছে।

শ্রমিক সরবরাহ এই অঞ্চলের প্রধানতম সমস্যা। কারণ, এই **দুর্বলতার অঞ্চলে** (Regions of Debilitation) বৈদেশিকদের পক্ষে বসতি-স্থাপন সম্ভব নহে এবং এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাম করিয়া উৎপাদন ও রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৈষয়িক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ অঞ্চলে ধান্য ও ভুট্টা ভাল জন্মে এবং বর্তমানে রবার, চা, চিনি ও কোকোর চাষ ভালই হইতেছে। এই অঞ্চলে কঙ্গো প্রভৃতি খরস্রোতা নদী হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও সুবিধা রহিয়াছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্থানবিশেষে মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে মালয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাং ; মাদাগাস্কার এবং সিংহলের গ্রাফাইট , ঘানার বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ এবং আফ্রিকার কাটাঙ্গা ও উত্তর রোডেশিয়ার তাম্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক (২) স্যাভানা জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—নিরক্ষীয় ও উষ্ণমরু অঞ্চলের মধ্যভাগে সুদানী জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত। ইহা যেন দুইটি বিপরীত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত এক বিস্তীর্ণ সন্ধিক্ষেত্র। নিরক্ষীয় জলবায়ুর উত্তর ও দক্ষিণ সীমা হইতে অল্পাধিক ১৫° পর্যন্ত এই পরিমণ্ডলটির প্রসার পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার সুদান, রোডেশিয়া ও অ্যাঙ্গোলা ; দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার উত্তরাংশ (ল্লানো) ও দক্ষিণাংশ (ক্যাম্পো) এবং উঃ ও উঃ-পূঃ অস্ট্রেলিয়া (কুইন্স্ল্যাণ্ডের মধ্যভাগ) এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে (১) দৈনিক ও ঋতুগত উষ্ণতার পার্থক্য অধিক (স্থানভেদে ১০ ফাঃ হইতে ৩০ ফাঃ পর্যন্ত)। (২) গ্রীষ্মকালীন গড়-উত্তাপ ৮০° হইতে ৯০° ফাঃ পর্যন্ত, শীতকালও উষ্ণ (গড়-উত্তাপ ৭০° হইতে ৭৮° ফাঃ পর্যন্ত)। (৩) স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দৃষ্ট হয়। বিষুব রেখার দিকে ১০০" বা ততোধিক, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ৪০" হইতে ৬৫" পর্যন্ত এবং মরুভূমির প্রান্তদেশে ১৫" বা তদপেক্ষাও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে বায়ুমণ্ডল শুষ্ক থাকে। (৪) সারাবৎসরই প্রবল ধূলিঝড় সঞ্চালিত হয়। (৫) বৎসর সাধারণতঃ তিনটি ঋতুতে বিভক্ত— শুষ্ক শীত ঋতু, শুষ্ক উষ্ণ ঋতু এবং উষ্ণ আর্দ্র ঋতু। ইহারা পর্যায়ক্রমে আসে।

এই জলবায়ু আফ্রিকার সুদানপ্রদেশে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে **সুদানী জলবায়ু** বলা হয়।

সুদানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: তিমবক্তু (অঃ ১৬° ৩৭ উঃ), ফরাসী পঃ আফ্রিকা, উচ্চতা: ৮২০´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৭১	৭৪	৮৩	৯২	৯৩	৯৪	৮৯	৮৬	৮৭	৮৯	৮১	৭১	২৩·৪	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০	০	০·১	০	০·৩	০·৯	৩·৫	২·৮	১·১	০·৪	০	০		৯·০

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ **দীর্ঘ তৃণ*** নিবিড়ভাবে জন্মে এবং মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষও দেখা যায়। এই তৃণভূমিকে **স্যাভানা** বা **ক্রান্তীয় তৃণভূমি** বলে। মরু-সন্নিহিত অঞ্চলে সামান্য ঘাস ও কাঁটার ঝোপ, ৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষযুক্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, এবং ৬০" হইতে ৮০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে শাল, সেগুন প্রভৃতি পত্রমোচী বৃক্ষ জন্মে। নিরক্ষীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলসন্নিহিত দেশসমূহে তৃণক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বনভূমি দৃষ্ট হয়। বাবলা গাছ হইতে উৎপন্ন আরবী গঁদ এই অঞ্চল হইতে প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। তৃণভূমিতে জিরাফ, হরিণ, জেব্রা, অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত সঞ্চরণশীল তৃণভোজী প্রাণী এবং সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীই প্রধান।

মৃত্তিকা—ক্রান্তীয় তৃণমণ্ডলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত রক্ত বা পীত বর্ণের ল্যাটেরাইট বর্গীয়। উষ্ণতা ও আর্দ্রতার একত্র সম্মিলনে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুত হয় বলিয়া মৃত্তিকার জৈবাংশের প্রচুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের আর্দ্রতম অংশ হইতে শুষ্কতম অংশ পর্যন্ত মৃত্তিকার নানারূপ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত শুষ্কাঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পশুপালক ও শিকারী। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এবং কৃত্রিম জলসেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলসমূহে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, বাদাম, নানাপ্রকার তৈলবীজ এবং উষ্ণমণ্ডলের ফল জন্মে। সুদানী অঞ্চলকে **পরিশ্রমের অঞ্চল** (Regions of Effort) বলা হয়; কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা অর্জন করিতে পারে না। ক্রান্তীয় তৃণভূমিসমূহের মধ্যে আফ্রিকার সুদান অঞ্চলই অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যপরায়ণ।

শ্রমিক সমস্যা, যানবাহনের অসুবিধা, ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে দূরত্ব এবং রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের আর্থিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। গ্রীষ্মকাল উত্তপ্ত এবং শীতকাল নাতিতীব্র হওয়ায়, জলসরবরাহের ব্যবস্থা

* বৃক্ষের জন্য সারাবৎসর ধরিয়াই আর্দ্রতার প্রয়োজন, কিন্তু তৃণের জন্য বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বৃষ্টির এবং অন্যান্য সময়ে বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতার প্রয়োজন।

করিতে পারিলে সারা বৎসর ধরিয়াই শস্যোৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে এই অঞ্চলে কার্পাস ও তামাকের চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। চামড়া, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, কফি, কার্পাস, তৈলবীজ, আরবী গঁদ, তামাক প্রভৃতি এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পদ।

(৩) ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম এবং দক্ষিণ চীন সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমীবায়ু প্রভাবান্বিত অঞ্চল। মাদাগাস্কার দ্বীপ, পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলাঞ্চল, ক্যারিবীয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপ-সাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, জাপান এবং পশ্চিম ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিয়দংশেও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু দৃষ্ট হয়। মহাদেশসমূহের পূর্বপ্রান্তে আয়নবায়ুবলয়ের মধ্যেই এই জলবায়ু পরিস্ফুট (২য় অধ্যায়—মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দেখ)।

জলবায়ু* —এই অঞ্চলে (১) সারা বৎসর ধরিয়া প্রবল উত্তাপ অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০° ও ৬০° ফাঃ। (২) মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের ফলে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকাল প্রায় শুষ্ক থাকে। বার্ষিক গড-বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০″-৭৫″। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। (৩) তিনটি মূল ঋতুর সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল, রুক্ষ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষকাল।

ক্রান্তীয় মৌসুমী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত
স্থান: বোম্বাই (অঃ ১৮° ৫৫′ উঃ) ভারত, উচ্চতা: ৩৭′

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৭৫	৭৫	৭৮	৮২	৮৫	৮২	৭৯	৭৯	৭৯	৮১	৭৯	৭৬	১০'১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০'১	০	০	০'১	০'৫	২০'৬	২৪ ৬	১৪ ৯	১০'৯	১'৮	০'৫	০'১		৭৪'১

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—এতদঞ্চলে ৮০″র অধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, ৮০″-৪০″ পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং ৪০″র অনধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে নাতিদীর্ঘ তৃণগুল্ম পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে ধান, জোয়ার, বাজরা, পাট, চা, ইক্ষু, কার্পাস, কফি, কোকো, নীল, তামাক, রবার, তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি প্রধান। গভীর বনে ব্যাঘ্র,

* ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু মূলতঃ একই প্রকৃতির। দুইটিই ক্রান্তীয় অঞ্চলে পরিস্ফুট এবং দুইটিতেই আর্দ্র ও শুষ্ক শীতকাল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সূর্য ও চাপ বলয়ের স্বাভাবিক স্থান পরিবর্তন হেতু ঘটিয়া থাকে আর ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের বৃষ্টিপাত হয় স্থানীয় কারণে স্বাভাবিক বায়ু বলয়ের সম্পূর্ণ বিপর্যয় হেতু।

ভল্লুক, চিতাবাঘ, প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এবং হরিণ, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তু বাস করে।

মৃত্তিকা—অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের ন্যায় মৌসুমী অঞ্চলের মৃত্তিকাও নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তবে রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার প্রাধান্যই এতদঞ্চলে অধিক।

বৈষয়িক অবস্থা—কৃষিকার্য মৌসুমী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যের সুবিধা এবং জীবনধারণের উপযোগী সর্বপ্রকার খাদ্যের প্রাচুর্য থাকায় মৌসুমী অঞ্চলে **লোকবসতি** অত্যন্ত ঘন। কৃষিশিল্পে এবং জনসংখ্যা-বণ্টনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে **বনজ শিল্পের** প্রসার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের সেগুন কাষ্ঠ এবং ভারতের চন্দন কাষ্ঠ ও লাক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘন লোক-বসতি এবং বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব এই অঞ্চলের **পশুচারণ** শিল্পের প্রসারকে ব্যাহত করে। ব্রহ্মদেশ, ভারত এবং চীনদেশে **খনিজ শিল্প** ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। মৌসুমী অঞ্চলে **যন্ত্রশিল্প** তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া শিল্পপ্রধান পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানী করা এবং আঞ্চলিক ভোগের জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করা মৌসুমী অঞ্চলসমূহের প্রধান কার্য। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের শিল্প-চেতনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলকে **বৃদ্ধির অঞ্চল** (Regions of Increment) বলা হয়, কারণ অতি সামান্য পরিশ্রমেই মানুষ প্রকৃতি হইতে প্রচুর ফল লাভ করিয়া থাকে।

ক (৪) ইকুয়েডর দেশীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত উপমণ্ডল

দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর ও কলাম্বিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য **অবস্থান** হেতু এই অঞ্চলের উত্তাপ নিম্নভূমি অঞ্চল অপেক্ষা কম। উত্তাপ সারাবৎসর ধরিয়াই প্রায় সমান থাকে। বৃষ্টিপাতও সামান্য। তবে বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

ইকুয়েডর দেশীয় উপমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : কুইটো (অঃ ০°১৪´ দঃ), ইকুয়েডর , উচ্চতা : ৯৩৫০´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫৬	৫৫	৫৫	[illegible]	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৪	৫৫	০'৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩'২	৩'৯	৪'৮	৭'০	৪'৬	১'৮	১'১	২'২	২'৬	৩'৯	৪'০	৩'৬		৪২'৩

পর্বতগাত্রের যে সমস্ত স্থানে আরামপ্রদ **চিরবসন্ত** বিরাজমান, সাধারণতঃ সেই সকল স্থানেই অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক

উদ্ভিদ্ অতি সামান্য। **কৃষিজ উদ্ভিদের** মধ্যে গম, যব এবং ভুট্টাই প্রধান। পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্রে গবাদি পশু ও মেষ প্রতিপালিত হয়।

ক (৫) উষ্ণমরুদেশীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—২০° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে কর্কটক্রান্তির নিকটে অবস্থিত আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, এশিয়ার আরবের মরুভূমি ও ভারতবর্ষের থর মরুভূমি, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও মেক্সিকোর মরুভূমি এবং মকরক্রান্তির নিকটে অবস্থিত পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমি ও দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অধিকাংশ উষ্ণ মরুভূমি মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চলসমূহ যথাক্রমে দঃ পূঃ ও দঃ পূঃ আয়ন বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। এই বায়ু ভূমিভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিম প্রান্তে পৌছিবার বহু পূর্বেই জলকণাহীন হইয়া পড়ে। সেই হেতু আয়ন বায়ু বলয়ের পশ্চিমাংশে উষ্ণ মরু অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে এই উষ্ণ মহাদেশীয় পরিমণ্ডলকে আয়ন বায়ু বলয়ের অন্তর্গত মরুভূমিও (Trade wind deserts) বলা হয়।

জলবায়ু—চরমভাবাপন্ন জলবায়ু উষ্ণ মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড়-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০° ফাঃ এবং ৬০° ফাঃ। আকাশ মেঘহীন থাকায় এ অঞ্চলে দিবাভাগ অত্যন্ত গরম এবং রাত্রিকাল শীতল। দৈনিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উত্তাপের তারতম্য ৬০° ফাঃ বা তদূর্ধ্ব। সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চল সমূহের এবং দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণমরু অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদু। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০"র কম—অনেক স্থান বৃষ্টিহীন। কোন কোন স্থানে পাঁচ ছয় বৎসরে ৫"-১০" বৃষ্টিপাত হয়। মরু অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে শীতকালে এবং দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : জাকোবাবাদ (অঃ ২৮° ১৭ উঃ), পঃ পাকিস্তান, উচ্চতা : ১৮৬'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫৭	৬২	৭৫	৮৬	৯২	৯৮	৯৫	৯২	৮৯	৭৯	৬৮	৫৯	৪১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	•৩	•'৩	•৩	•২	•১	•২	১•১	[illegible]	•৩	•'•	•'১	•১		৪'•

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—উষ্ণ মরুভূমিতে শুষ্ক তৃণ ও ছোট কাঁটা ঝোপ জন্মিয়া থাকে। উষ্ণ মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌সমূহ দীর্ঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মরুদ্যান অঞ্চলে খেজুর, কার্পাস, ধান, ইক্ষু, বাজরা, জোয়ার,

টোমাটো, তামাক এবং তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ ফল জন্মে। উষ্ণ মরুভূমির প্রধান জন্তু উট। ছাগল ও অশ্বতর এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়।

মৃত্তিকা—উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রধানতঃ ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্গত পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকাই পরিলক্ষিত হয়। ইহা লঘু ও মিহি এবং প্রায় জৈবাংশ বর্জিত। তবে মরু অঞ্চলের প্রত্যন্ত ভাগে ঈষৎ বাদামী আভাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও জৈবাংশের ভাগ অতি সামান্য। সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যবহার-দ্বারা এই অঞ্চলের মৃত্তিকায় কৃষিকার্য সম্ভব।

বৈষয়িক অবস্থা—মরুভূমি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। জীবিকা অর্জনের পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধানতঃ যাযাবর, মরূদ্যানের স্থায়ী অধিবাসী এবং খনির শ্রমিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মরূদ্যানের স্থায়ী অধিবাসীরা কৃষিকার্য ও পশুপালনের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত অনুন্নত। দক্ষিণ গোলার্ধের কোন কোন উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, সীসক ও দস্তা, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলির নাইট্রেট ও তাম্র; পেরুর খনিজ তৈল এবং আফ্রিকার কিম্বার্লীর তাম্র ও হীরক খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর গোলার্ধের সাহারা মরু অঞ্চলে লবণ, কলোরাডো অঞ্চলে স্বর্ণ এবং ইরাকে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। উষ্ণ মরু অঞ্চলকে **স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল** (Regions of Lasting Difficulties) বলা হয়।

খ (১) চৈনিক জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে মোটামুটিভাবে ৩০° হইতে ৪৫° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ; দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল ও উরুগুয়ে; আফ্রিকার নাটাল; অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলাঞ্চল এবং উত্তর ও মধ্য চীন এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জলবায়ু বর্তমান। তবে মোটামুটি-ভাবে বলা যাইতে পারে যে এই অঞ্চলে—(১) বার্ষিক তাপপ্রসর ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। (২) সারাবৎসর ধরিয়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক এবং শীতকালে প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে অতি অল্প পরিমাণ ঘূর্ণিবৃষ্টি হইয়া থাকে। (৩) এই অঞ্চলে প্রায়শঃই ক্ষতিকারক প্রবল বাত্যা অনুভূত হয়; চীন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলাঞ্চলে 'টাইফুন'; দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে 'নর্দার্স';

আর্জেন্টিনার পূর্বপ্রান্তে 'প্যাম্পেরো' ও 'জোণ্ডা' ; অস্ট্রেলিয়ার 'সাদার্লিবাস্টার' ভিক্টোরিয়ার 'ব্রিকফিল্ডার্স' প্রভৃতি ঘূর্ণিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বাংশে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালে উঃ আমেরিকার মধ্যভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে জলকণাসম্পৃক্ত উপসাগরীয় বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটিয়া থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০"-৬০" পর্যন্ত। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড-উত্তাপ যথাক্রমে ৮০° ও ৪৭° ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবায়ুকে 'উপসাগরীয় জলবায়ু'ও বলা হয়।

উপসাগরীয় জলবায়ু—মাসিব গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : চার্লসটন (অঃ ৩২° ৪৮' উঃ), দক্ষিণ ক্যারোলিনা, যুক্তরাষ্ট্র

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫০	৫২	৫৮	৬৫	৭৩	৭৯	৮২	৮১	৭৭	৬৮	৫৮	৫১	৩১	৪
াত (ইঞ্চি)	৩·০	৩·১	৩·৩	২·৪	৩·৩	৫·১	৬·২	৬·৫	৫·২	৩·৭	২·৫	৩২		৪৭·৩

উত্তর ও মধ্য চীনে গ্রীষ্মকালে মহাসাগরীয় আর্দ্র মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হইবার কালে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড ২৫"-৪৫" পর্যন্ত। এদিকে শীতের প্রাধান্য ভারত অপেক্ষা অধিক। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড উত্তাপ যথাক্রমে ৮০° ও ২৫° ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবায়ুকে 'চৈনিক জলবায়ু' বলে। অস্ট্রেলিয়ার

চৈনিক জলবায়ু—বার্ষিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : সাংহাই (অঃ ৩১° ১৫ উঃ), চীন

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩৮	৩৯	৪৬	৫৬	৬৬	৭৩	৮০	৮০	৭৩	৬৩	৫২	৪২	৪২·৮	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	২·৮	২·০	৩·৯	৪·৪	৩·৩	৯·৬	৭·৪	৪·৭	৩·৯	৩·৭	১·৭	১·৯		৪৫·৮

দঃ পূঃ উপকূলভাগের এইরূপ জলবায়ুকে 'ইস্ট্রেলীয় জলবায়ু' বলা হয়। এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত দঃ গোলার্ধের দেশসমূহে স্থলভাগের সংকীর্ণতা হেতু বার্ষিক তাপপ্রসর সামান্য।

ইস্ট্রেলীয় জলবায়ু—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : সিডনী (অঃ ৩৩° ৫৫' দঃ), অস্ট্রেলিয়া

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৭২	৭১	৬৯	৬৫	৫৯	৫৪	৫২	৫৫	৫৯	৬২	৬৭	৭০	২০	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩·৬	৪·৪	৪·৯	৫·৪	৫·১	৪·৮	৫·০	৩·০	২·৯	২·৯	২·৮	২·৮		৪৭·৭

এই জলবায়ু বহুলাংশে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর ন্যায় বলিয়া ইহাকে **উপক্রান্তীয় মৌসুমী** বা **নাতিশীতোষ্ণ পূর্ব উপকূলীয়** (Warm Temperate East Coast) **জলবায়ু** বলা হয়।

উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলের সমভূমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ ও পার্বত্য অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। ওক, মেপ্‌ল, আকরোট, হিকোরী প্রভৃতি বহু মূল্যবান কাষ্ঠ এবং ফার্ন, কর্পূর, বাঁশ প্রভৃতি সম্পদ এই অঞ্চলের অরণ্যে পাওয়া যায়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানে ধান্য, কার্পাস, ইক্ষু, চা এবং শীতল ও অপেক্ষাকৃত অল্পবৃষ্টিযুক্ত স্থানে গম, ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান।

মৃত্তিকা—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর রক্ত ও পীতবর্ণের 'পেডালফার' বর্গীয়। মৃত্তিকায় কৃত্রিম সারের ব্যবহার ব্যতীত বাণিজ্যিক কৃষিকার্য সম্ভব নহে। তবে বদ্বীপ ও প্লাবনভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ বলিয়া বিশেষ উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—বসতিস্থাপন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে এই অঞ্চলের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তর ও মধ্য চীনে প্রচুর ধান, কার্পাস, চা এবং রেশম উৎপন্ন হয় এবং ইহা পৃথিবীর অন্যতম বসতিপূর্ণ অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ কাপাস এবং ভুট্টা উৎপন্ন হয়। নাটালে ইক্ষু, চা, ধান, আনারস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই পশুপালক, যদিও সামান্য পরিমাণে দ্রাক্ষা, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। একসঙ্গে পশুপালন, কৃষি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণ জাপান ভিন্ন এই অঞ্চলের অন্তর্গত অন্য কোন দেশে যন্ত্রশিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নাই। ধান, গম, ইক্ষু, কাপাস, তামাক, চা, এবং রেশম এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য।

(২) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে মোটামুটি ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ (স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালী, যুগোস্লাভিয়া, বল্কান উপদ্বীপ, সিরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা), উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া; দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য-চিলি, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং নিউ-জীল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু--(১) ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আয়ন বায়ু এবং শীতকালে আর্দ্র প্রত্যায়ন বায়ুবলয়ের অন্তর্গত হওয়ায় এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকাল আর্দ্র। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত স্থানভেদে ১০" হইতে ৪০" পর্যন্ত হইয়া থাকে। মরুভূমি-সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ১০" বা তৎস্থানীয়। (২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল গ্রীষ্মকালে গরম,

(গড়-উত্তাপ প্রায় ৯০° ফা:), কিন্তু শীতকালে মৃদু শীতল (গড়-উত্তাপ প্রায় ৫০° ফা:)। (৩) সারা বৎসর ধরিয়া, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, আকাশ মেঘমুক্ত থাকে এবং দিনগুলি সূর্যকিরণোজ্জ্বল। (৪) এই অঞ্চলে বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে প্রবল বাত্যা অনুভূত হয়। সিসিলি ও ইতালীর 'সিরোক্কো', ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওয়া' প্রভৃতি বাত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই সময়ে উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত শুষ্ক শীতল বায়ুর প্রকোপ দেখা যায়। ফ্রান্সে ইহাকে 'মিস্ট্রাল' এবং ডালমাসিয়া অঞ্চলে ইহাকে 'বোরা' বলা হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: আলজিয়াস (অ: ৩৬°৪′ উ:), উ: আফ্রিকা, উচ্চতা: ৭২′

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফা:)	৫৩	৫৫	৫৪	৬১	৬৬	৭১	৭৭	৭৮	৭৫	৬৮	৬২	৫৬	২৪ ১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৪·২	৩৫	৩৫	২৩	১৩	০·৬	০১	০৩	১১	৩·০	৪৬	৫৪		৩০·০

উদ্ভিদ্—শীতকালেই এখানকার বৃক্ষলতাদি জন্মে। ছোট ছোট বৃক্ষ এবং ঝোপঝাড়ই এতদঞ্চলে অধিক। যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক জল পাওয়া যায় সেখানে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতা হেতু উদ্ভিদ্-দেহে নিয়ত প্রস্বেদন চলে বলিয়া এতদঞ্চলের উদ্ভিদসমূহ প্রস্বেদন রোধ করিবার জন্য দীর্ঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, তুঁত, ভুট্টা এবং আঙ্গুর, আপেল, কমলালেবু, জলপাই, ন্যাসপাতি, লেবু, পীচ প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও বহুপ্রকারের ফুল এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ ফলের জন্য প্রসিদ্ধ।

মৃত্তিকা—এতদঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানতঃ ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল বর্গীয়। মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্‌খাদ্য খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকিলেও জৈবাংশের পরিমাণ অতি সামান্য। তবে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যিক কৃষিকার্য সম্ভব। ভূমিক্ষয় অধিক হওয়ায় পর্বতগাত্রের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর তবে নিম্নভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পর্বতগাত্র-বাহিত পলির দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশেষ উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অরণ্যসমূহ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য হইতে 'জারা' কাষ্ঠ, পর্তুগালের অরণ্য হইতে 'কর্ক' এবং অন্যান্য অরণ্যাঞ্চল হইতে নানা শ্রেণীর বাদাম ও সুপারি জাতীয় ফল আহরণ উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক জলবায়ুর প্রভাবে এতদঞ্চলে ফল আহরণ ও শুষ্কীকরণ এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **কৃষিই** ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে তৃণ ভাল জন্মে না বলিয়া **পশুচারণ** লাভজনক নহে। অনুকূল জলবায়ু-যুক্ত অঞ্চলে অতি সামান্য পরিমাণে গবাদি পশু, মেষ, অশ্ব, শূকর

প্রভৃতি পালিত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কয়লা একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বৃহদাকারের **যন্ত্রশিল্প** এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে নাই। মদ্য তৈয়ারী, সাবান, দস্তানা ও রেশম শিল্পের প্রসার এই অঞ্চলে ব্যাপক। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে (যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বর্ণ ও খনিজ তৈল, ইটালীতে মর্মর, গন্ধক প্রভৃতি) খনিজ শিল্প সঙ্ঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জলবায়ু অনুকূল বলিয়া চলচ্চিত্র শিল্প এখানে ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেল্‌স্-এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-কেন্দ্র হলিউড্ অবস্থিত। মৌসুমী অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলকেও **বৃক্ষের অঞ্চল** বলা হয়। কাষ্ঠ, কর্ক, রেশম, মদ্য, ফল ও ফুল এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ।

খ (৩-৫) মধ্য-অক্ষাংশের মরুমণ্ডল

এই পরিমণ্ডলটির অবস্থান সম্পর্কে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহা মহাদেশীয় ভূমিভাগের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা শৈলভূমি অধিকার করিয়া বিদ্যমান। চারিদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইহা যেন **জলবায়ুর** একটি বিরাট সন্ধিক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫"এর অনধিক এবং বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। উচ্চতর ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৭০° ও ২৫° ফাঃ, তবে স্থানভেদে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। দৈনিক ও বার্ষিক তাপপ্রসর অত্যন্ত অধিক। এই অঞ্চলের **মৃত্তিকা** পিঙ্গলবর্ণের পেডোক্যাল বর্গীয়। এই মৃত্তিকা উদ্ভিদ্‌খাদ্য খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইলেও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রে জৈবাংশ-প্রধান সারের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই পরিমণ্ডলটির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উচ্চাবচতা ও দেশান্তরের পার্থক্য অনুযায়ী জলবায়ুরও নানারূপ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে বলিয়া এই পরিমণ্ডলটিকে তুরানী, ইরানী ও তিব্বতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

খ (৩) তুরানী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

ইউরেশিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান ও আরল সাগর হইতে মধ্য-এশিয়ার পর্বতাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নভূমি (তুর্কীস্তান বা তুরান), দক্ষিণ আমেরিকার পারানা নদীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নিম্নভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকার অন্তর্গত নিম্নভূমির কিয়দংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কতক স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই অঞ্চলের

জলবায়ুর বিশেষ তারতম্য অনুভূত হয়, তবে এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর এবং শীতকালীন উত্তাপ হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। (২) এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অতি সামান্য এবং তাহা গ্রীষ্মকালেই সীমাবদ্ধ।

তুরানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: লুকচুন (তারিম অববাহিকা), তুর্কীস্তান, চীন ; উচ্চতা: ৫০´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	১৩	২৭	৪৬	৬৬	৭৫	৮৫	৯০	৮৫	৭৪	৫৬	৩৩	১৮	৭৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	পরিমাণ অজ্ঞাত													

বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে **তৃণ** এবং বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে **গুল্ম** জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহ অত্যন্ত **অনুন্নত**। **পশুচারণই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে সেচব্যবস্থার সাহায্যে সামান্য পরিমাণে ভুট্টা, গম, যব, কার্পাস, ফল প্রভৃতি **কৃষিজ** দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

খ (৪) ইরানী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

মধ্য-মেক্সিকো, দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনার পশ্চিমাংশ এবং এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান, পারস্য, গোবি মরুভূমি, আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের মধ্যভাগের উচ্চ মালভূমি (ইরান) অঞ্চলসমূহ ইহার অন্তর্গত। জলবায়ু হিসাবে প্যাটাগোনিয়াকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই অঞ্চলের

ইরানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: তেহরান (অঃ ৩৫°৪১´ উঃ), পারস্য ; উচ্চতা: ৪০০২´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩৪	৪২	৪৮	৬১	৭১	৮০	৮৫	৮৩	৭৭	৬৬	৫১	৪২	৫১·৩	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	১·২	০·৯	২·৪	০·৯	০·৪	০·০	০·৪	০·০	০·১	০·১	১·২	১·৩		৮·৯

জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল স্থানে **তৃণ** এবং অল্পবৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে **গুল্ম** ও ঝোপঝাড় দৃষ্ট হয়। **কৃষিজ** দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, ফল, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু, বীট ও গোলাপ ফুলই প্রধান। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহ অত্যন্ত **অনুন্নত**। দক্ষিণ-আফ্রিকার কিয়দংশে কৃষিকার্য চলে, কিন্তু অন্যান্য অংশে **পশুচারণই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক ও মূলধনের অভাবহেতু **খনিজ শিল্প** তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই।

খ (৫) তিব্বতী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

এশিয়ার তিব্বত ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার মালভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তিব্বতের **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন। **শীতকাল দীর্ঘ** ও তীব্র,

গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী ও উষ্ণ। বলিভিয়ার মালভূমি অঞ্চলে শীতপ্রধান নাতি-

তিব্বতী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: লা পাজ (১৬°৩১´ দঃ) বলিভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উচ্চতা : ১২১০০´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫২	৫১	৫১	৪৯	৪৭	৪৪	৪৫	৪৬	৪৮	৫০	৫৩	৫২	৮ ৬	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩ ৯	৪ ৫	২ ৬	১'৫	০'৫	০ _	০ ২	১ ১	০ ৮	১ ৩	১ ৫	৪ ৩		২১ ২

শীতোষ্ণ জলবায়ু বর্তমান। মালভূমির উচ্চাংশে ও ঢালে **পশুচারণ** এবং উপত্যকাতে সামান্য পরিমাণ **কৃষিকার্যই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

ইরানী, তুরানী ও তিব্বতী জলবায়ু অঞ্চলকে একত্রে **স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল** (Regions of Lasting Difficulties)-ও আখ্যা দেওয়া হয়।

গ (১) লরেন্সীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—পশ্চিমা বায়ুবলয়ে ৪৫° হইতে ৬৮½ উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষ-রেখার মধ্যে মহাদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত ক্যানাডার পূর্বাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ, সাইবেরিয়ার আমুর নদীর অববাহিকার দক্ষিণাংশ, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তবে সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় জাপানের জলবায়ু অনেকটা 'ব্রিটিশ জলবায়ু'র অনুরূপ। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া এইরূপ অক্ষরেখায় অবস্থিত হইলেও ইহা সংকীর্ণ হওয়ায় এবং পশ্চিমে আন্দিজ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত থাকায় ইহা মরুভূমিপ্রায়।

জলবায়ু—(১) পশ্চিমা বায়ুবলয়ে অবস্থিত হওয়ায় শীতকালে অভ্যন্তরস্থ শীতলতম প্রদেশ হইতে শীতল বায়ুপ্রবাহ এখানে আসে বলিয়া এই অঞ্চলে শীতের আধিক্য বেশী (প্রায় ১০° ফা.). আবার গ্রীষ্মকালে পূর্বসমুদ্র হইতে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় গ্রীষ্মের তীব্রতা হ্রাস পায়—গড়ে ৮৫° ফাঃ। অনুরূপ অক্ষাংশের অন্তর্গত পশ্চিম প্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চল (গ৪) অপেক্ষা

লরেন্সীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : মন্ট্রীল (অঃ ৪৫°৩১ উঃ), কুইবেক, ক্যানাডা।

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	১৩	১৫	২৫	৪১	৫৫	৬৫	৬৯	৬৭	৫৯	৪৭	৩৩	১৯	৫৬	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩ ৭	৩ ২	৩ ৭	২'৪	৩ ১	৩ ৫	৩ ৮	৩'৪	৩ ৫	৩ ৩	৩'৪	৩ ৭		৪০ ৭

স্থান : হারবিন (অঃ ৭৫°-৪৬´উঃ), মাঞ্চুরিয়া।

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	—২	৫	২৪	৪২	৫৬	৬৬	৭২	৬৯	৫৮	৪০	২১	৩	৭৩'৮	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০ ১	০'২	০'৪	০'৯	১'৭	৩ ৮	৭ ৫	৪ ১	১'৮	১ ৩	০'৩	০'২		১৯ ৩

এতদঞ্চলে বার্ষিক তাপপ্রসর অধিক। (২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০"-৪০"

পর্যন্ত। প্রায় সকল মাসেই সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকার জলবায়ু হইতে লরেন্সীয় জলবায়ু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে মাঞ্চুরিয়া ও আমুরিয়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন বলিয়া এতদঞ্চলে গ্রীষ্মেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই কারণে অনেকে এতদঞ্চলের জলবায়ুকে মাঞ্চুরীয় জলবায়ুও বলিয়া থাকেন।

উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং শীতলতর অংশে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যই প্রধান।

মৃত্তিকা—এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বৃষ্টিবহুল স্থানের মৃত্তিকা অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনুর্বর পোডসল্ জাতীয়। তবে বৃষ্টিবিরল অংশে ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্গত উবর কৃষ্ণ ও বাদামী বর্ণের মৃত্তিকাও পরিলক্ষিত হয়।

বৈষয়িক অবস্থা—পশুশিকার এবং কাঠের ব্যবসায়ই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। তবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের বহু অরণ্যাঞ্চল বর্তমানে কৃষি ও চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলে কৃষি, খনিজ, কাষ্ঠ ও যন্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এশিয়ার পূর্বপ্রান্তিক দেশসমূহ যানবাহনের অব্যবস্থা, খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা, শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে দূরত্ব, শাসনযন্ত্রের অব্যবস্থা, বিরল লোকবসতি প্রভৃতি কারণে এখনও অনুন্নত রহিয়াছে। শারীরিক শ্রম ব্যতীত এতদঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা অর্জন করিতে পারে না বলিয়া এই অঞ্চলকে "পরিশ্রমের অঞ্চল" (Region of Effort) বলা হয়। সয়াবীন, গম, যব, রাই ও বার্লি এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ।

এই পরিমণ্ডলকে অনেকে **হিমশীতোষ্ণ পূর্ব-উপকূলীয়** (Cool Temperate East Coast) বা **আর্দ্র মহাদেশীয়** (Humid Continental) পরিমণ্ডলও বলিয়া থাকেন।

গ (২) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বা 'তৈগা' অঞ্চল

অবস্থান—উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উত্তরে এই অঞ্চল অবস্থিত। ক্যানাডার পূর্বাংশ, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, উত্তর রুশিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশে স্থলভাগ নিতান্ত অল্প। তবে দঃ আমেরিকার প্রান্তদেশে এবং নিউজীল্যাণ্ডের পার্বত্য ভূমিভাগে এই জাতীয় জলবায়ু অনুভূত হয়।

জলবায়ু—(১) বার্ষিক গড় উত্তাপ ৪০° সেঃ-এর অনধিক। শীতকাল অতি দীর্ঘ ও তীব্র এবং গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব (২।৩ মাসের অনধিক) ও উষ্ণ। শীতকালে দিন হ্রস্ব ও রাত্রি দীর্ঘ এবং গ্রীষ্মকালে রাত্রি হ্রস্ব ও দিন দীর্ঘ হয়। মহাদেশীয় ভূমিভাগের অভ্যন্তরে উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের উত্তাপের

পার্থক্য প্রায় ১০০° ফাঃ। তবে সমুদ্রপ্রান্তীয় স্থানসমূহে তাপপ্রসর অল্প। (২) বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। উপকূলাঞ্চল ব্যতীত বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ২০"র অধিক নহে। এই অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষা তুষারপাতই অধিক।

তৈগা অঞ্চল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : ভারখয়ানস্ক (অঃ ৬৭°৫০´ উঃ) রুশিয়া, উচ্চতা : ৩৩০

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফাঃ)	-৫৯	-৪৭	-২৪	৭	৩৫	৫৪	৬০	৫০	৩৬	৫	-৩৪	-৫৩	১:৮৬	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	·২	·১	·০	·১	·২	·৫	[illegible]	·৯	·২	·২	·২	·৩		৩৯

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে কোমল কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ সরলবর্গীয় (soft wood evergreen coniferous) বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। পাইন, ফার, লার্চ, স্প্রুস, ডীল, হেমলক প্রভৃতি এই অরণ্যাঞ্চলের মূল্যবান কাষ্ঠ। এই সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি কোমল হওয়ায় ইহা হইতে দিয়াশলাই-এর কাঠি, বাক্স ও কাগজের মণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। স্থানে স্থানে নাতি-শীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের উত্তর দিকে বৃক্ষসমূহ ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। সেবল্, আরমিন প্রভৃতি লোমশ পশু এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই পশুর লোম পরিচ্ছদ তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল। পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ, কাষ্ঠশিল্প এবং তার্পিন, রজন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। শীতের তীব্রতা হেতু কৃষিকার্য সম্ভব নহে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে রাই, যই এবং যব উৎপন্ন হয়। এতদঞ্চলের **মৃত্তিকা** অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোডজল্ জাতীয়।

গ (৩) মহাদেশীয় নিম্নভূমি বা 'স্তেপ' অঞ্চল

অবস্থান—মহাদেশসমূহের অভ্যন্তরে মোটামুটি ভাবে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত মধ্য ক্যানাডা এবং উত্তর যুক্ত-রাষ্ট্রের নিম্নভূমি, মধ্য ইউরোপ হইতে সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নভূমি, মঙ্গোলিয়া, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং অব-বাহিকার অংশবিশেষ ও দঃ আফ্রিকার উচ্চভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—সমুদ্র হইতে দূরত্বের জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্মকাল নাতিদীর্ঘ, কিন্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত (৭০° হইতে ৮০° ফাঃ-এর মধ্যে) এবং শীতকাল দীর্ঘ ও অত্যন্ত তীব্র (০° অপেক্ষাও অল্প)।

(২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০" হইতে ৩০"র মধ্যে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ বসন্ত-কালে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই হইয়া থাকে।

স্তেপ অঞ্চল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : বার্নাউল (অঃ ৫৩°২৩´উঃ), রুশিয়া ; উচ্চতা : ৪৮০´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	-২	১	১৩	৩৩	৫১	৬২	৬৭	৬২	৫০	৩৫	১৬	৪	৬৯·৩	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০·৩	০·২	০·৯	০·৩	১·০	১·৪	১·৮	১·৬	০·৯	০·৯	০·৭	০·৬		১০·১

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—সাধারণতঃ বৃক্ষবর্জিত কোমল হ্রস্ব তৃণই এতদঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। তবে স্যাভানা অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলের তৃণ দীর্ঘ বা নিবিড় নহে। এই তৃণভূমিকে ইউরেশিয়ায় 'স্তেপ', উঃ আমেরিকায় 'প্রেয়রী', দঃ আমেরিকায় 'পম্পা', দঃ আফ্রিকায় 'ভেল্ড' এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্স' বলে। এই পরিমণ্ডলকে **মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি** (Midlatitude grassland) অঞ্চলও বলা হয়। অশ্ব, গর্দভ, মেষ প্রভৃতি তৃণভোজী পশু এবং মাংসাশী হিংস্র জন্তুও এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা—এতদঞ্চলে ক্ষারধর্মী 'পেডোক্যাল' শ্রেণীর অন্তর্গত উর্বর কৃষ্ণ-বর্ণের (Chernozem) মৃত্তিকারই প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা জৈবাংশে সুসমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকার মধ্যে উৎপাদিকা শক্তির জন্য সুবিখ্যাত। তবে অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবিরল অংশের মৃত্তিকা ঈষৎ বাদামী বর্ণেরও হইয়া থাকে, তবে ইহারাও অতিশয় উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর পশুপালক। তবে বর্তমানে এতদঞ্চলে বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রের প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং কৃষি-কার্যেরও সমূহ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ক্যানাডার 'প্রেয়রী', সাইবেরিয়ার 'স্তেপ', দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পা', আফ্রিকার 'ভেল্ড' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স' অঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে। এই তৃণভূমি অঞ্চলকে বর্তমানে পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার বলা চলে। যব, যই ও রাই এই অঞ্চলে জন্মে। এই অঞ্চল জনবিরল হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মাঞ্চুরিয়ার নিম্নভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে কৃষিশিল্পে অপেক্ষাকৃত উন্নত। সয়াবিন এবং রেশম মাঞ্চুরিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। গোমাংস, মেষ-মাংস, পশম, গম, যব, ভুট্টা, রাই, যই ও বীট এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য।

গ (৪) শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মোটামুটিভাবে ৪৫° উঃ হইতে ৬০° উঃ ও ৪০° দঃ হইতে ৫৫° দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ নিয়ত বায়ুবলয়ের অন্তর্গত মহাদেশের পশ্চিমাংশে

অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম ক্যানাডা, উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ চিলি, টাস্মানিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই জলবায়ু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে পরিস্ফুট বলিয়া এই অঞ্চলকে **ব্রিটিশ জলবায়ু** অঞ্চলও (British type) বলা হয়।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে (১) প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে সারা বৎসর ধরিয়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে শীতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০"-৩০" পর্যন্ত তবে স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। (২) গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা স্বল্প, গড়ে ৬০° ফাঃ এবং উপকূলাঞ্চলে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহের ফলে শীতকালেও শীত তীব্র নহে—গড়ে ৪০° ফাঃ। বার্ষিক তাপপ্রসর সামান্য (৩) আবহাওয়ার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন এই জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য

ইউরোপে এই পরিমণ্ডলের জলবায়ুকে অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ন উঃ পঃ ইউরোপীয় জলবায়ু এবং অপেক্ষাকৃত চরম ভাবাপন্ন মধ্য ইউরোপীয় জলবায়ু এই দুইটি অংশে বিভক্ত করা হয়।

বিটিশ জলবায়ু—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : লণ্ডন (অঃ ৫১°৩০ উঃ) যুক্তরাজ্য উচ্চতা : ১৮´

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩৯	৪০	৪৩	৪৭	৫[illegible]	৫৯	৬[illegible]	৬২	৫৭	৪৯	৪৮	৩৯	২৪.১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	.৮	.৭	.৭	.৭	৮	[illegible]	.২৬	[illegible]	[illegible]	.২৭	[illegible]	[illegible]		২[illegible]১

স্থান : বার্লিন (অঃ ৫২°৩২ উঃ) জার্মানী উচ্চতা : .৬৫

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩১	৩২	[illegible]৭	৪৬	৫৫	৬[illegible]	৬৫	৬৩	৫৭	৪৮	[illegible]৮	৩[illegible]	৩৭.৩	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	১.৫	১.৫	.৯	১.৭	৭	৫.৭	[illegible]	.৭	২.০	.৯	.৯	[illegible]		২[illegible]৯

উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলে ওক, এল্‌ম, মেপ্‌ল্, বীচ বার্চ প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং পার্বত্য অংশে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়।

মৃত্তিকা—এই পরিমণ্ডলটির অন্তর্গত অধিকাংশ অঞ্চলের মৃত্তিকা অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোড্‌সল জাতীয়। কৃত্রিম সার প্রযুক্ত হইলে ইহা শস্যপ্রসূ হইয়া থাকে। বদ্বীপ ও প্লাবনভূমি অঞ্চলসমূহের মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ হওয়ায় অতিশয় উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় এই অঞ্চল পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন হওয়ায় অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্মঠ ও উন্নত। বর্তমানে বহু অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। গমই এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূখণ্ডে এবং শীতল আবহাওয়ায় যই, রাই, যব, আলু এবং বীটের চাষ হয়। তৃণভূমিতে পশুপালন ও সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলে মৎস্য আহরণ এই অঞ্চলের

উল্লেখযোগ্য শিল্প। কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, কয়লা ও অন্যান্য শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, শ্রমনিপুণ, কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সরবরাহ এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে কাষ্ঠশিল্প, মৎস্যশিল্প, খনিজশিল্প ও ফলের চাষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাসমানিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান অঞ্চল। দক্ষিণ চিলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলকে পরিশ্রমের অঞ্চল (Region of Effort) বলা হইয়া থাকে। গম, যব, যই, রাই, বীট, অতসী, শণ, আলু, ফলপাতি, পিয়াব, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কাষ্ঠ এই পরিমণ্ডলের প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য।

গ (৫) আলটাই জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

উত্তর আমেরিকার শৃঙ্খলিত পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশ (ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল) এবং দক্ষিণ পূর্ব সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্য হিসাবে এই অঞ্চলে জলবায়ুরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এতদঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য বিদ্যমান। ডগলাস্, ফার, স্প্রুস, এবং লার্চই অরণ্যের প্রধান কাষ্ঠ। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দুইটি স্থানের মধ্যে উত্তর আমেরিকার পর্বতাঞ্চলই বিশেষ উন্নতিশীল। পূর্বে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শিকার ও উঞ্ছজীবী ছিল, কিন্তু বর্তমানে খনিজ, কাষ্ঠ, পশুচারণ এবং কৃষিশিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। পশুচারণ ও খনিজ শিল্পই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই সমস্ত অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচব্যবস্থা দ্বারা সামান্য কৃষিকার্য চলে।

ঘ (১) তুন্দ্রা অঞ্চল

এই অঞ্চল সুমেরু বৃত্ত হইতে, সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। রুশিয়া এবং সাইবেরিয়ার উত্তরের নিম্নভূমি এবং আলাস্কা ও ক্যানাডার উত্তরাঞ্চল তুন্দ্রা নামে অভিহিত। দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশ মনুষ্যবর্জিত। এতদঞ্চলে (১) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ যথাক্রমে ৫০° ও ১০° ফাঃ-এর অনধিক। গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব এবং শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র। (২) গড় বৃষ্টিপাত ১০"র অধিক নহে; তাহা গ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে তুষারপাত হইয়া থাকে। শীতকালে এই অঞ্চল বরফাবৃত থাকে বলিয়া এ অঞ্চলে কোন প্রকার তৃণ দৃষ্ট

হয় না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে এই সমস্ত অঞ্চল একপ্রকার গুল্মে আবৃত হইয়া যায়। কৃষিকার্য এই অঞ্চলে অসম্ভব। মৃত্তিকাও অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোডসল জাতীয়। এস্থানের অধিবাসীরা যাযাবর। মৎস্য ও পশু শিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত।

ঘ (২) মেরুদেশীয় উচ্চভূমি অঞ্চল

উত্তর আলাস্কা, উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড আণ্টার্কটিকা কামসাট্‌কা এবং ইহাদের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ সারা বৎসর ধরিয়াই তুষারাবৃত থাকে। এই তুষারের গভীরতা কোথাও বা ১ ফু॰ আবার কোথাও ৩,০০০ ফুট। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ একেবারেই দৃষ্ট হয় না।

ক্যুইপ্লেন পদ্ধতি অনুসারে জলবায়ুর বিভাগ—বিখ্যাত জার্মান ভৌগোলিক ক্যুইপ্লেন (Koppen) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ ও বৃষ্টি-পাতের পরিমাণগত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ সাধন করিয়াছেন। ক্যুইপ্লেনের পদ্ধতি পরিমাণজ্ঞাপক এবং এই পদ্ধতিতে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের দ্বারা সমজলবায়ু অঞ্চলসমূহের সীমারেখা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্যুইপ্লেন পৃথিবীকে প্রথমতঃ কয়েকটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করেন এবং তদুদ্দেশ্যে কয়েকটি সাঙ্কেতিকের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা A=নিরক্ষ রেখার নিকট অবস্থিত ক্রান্তীয় শৈত্যহীন অঞ্চল শীতকালীন সর্বনিম্ন তাপ ৬৪.৪ ফাঃ-এর অধিক, B—শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চল, বর্ষণ অপেক্ষা বাষ্পীভবন অধিক C=আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, শীতকালীন সর্বনিম্ন তাপ ৬৪.৪°-২৬.৬° ফাঃ এর মধ্যে, D=উচ্চ অক্ষাংশের অন্তর্গত উষ্ণ গ্রীষ্ম এবং দীর্ঘ ও তীব্র শীতকাল যুক্ত মহাদেশীয় অঞ্চল। শীতকালীন সর্বনিম্ন তাপ ২৬.৬ ফাঃ-এর অনধিক এবং গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ ৫০ ফাঃ-এর অধিক E=গ্রীষ্মহীন মেরু-দেশীয় অঞ্চল, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ ৫০ ফাঃ এর অনধিক।

উপরোক্ত তাপমণ্ডলগুলির প্রত্যেকটির বিস্তার এত অধিক যে ক্যুইপ্লেন অনুশীলনের সুবিধার জন্য উহাদের প্রত্যেকটিকে আবার ঋতুগত বৃষ্টিপাতের তারতম্য হিসাবে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যেও আবার কতকগুলি সাঙ্কেতিকের ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা, F=প্রতি মাসেই বৃষ্টিপাত ২.৪"র অধিক; m=মৌসুমী প্রকার, w=অন্ততঃপক্ষে ১ মাসে ২.৪"র অনধিক বৃষ্টি, W=মরুভূমি; S=স্তেপ, h=বার্ষিক উত্তাপ ৬৪.৪° ফাঃ-এর উপর, n=অহর্নিশ তুহিন ও কুয়াশা; k=বার্ষিক গড় উত্তাপ

৬৪.৪° ফাঃ-এর অনধিক, s=শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও আর্দ্র শীতকাল, b=মৃদু গ্রীষ্ম-কাল, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ ৭১.৬° ফাঃ-এর অনধিক কিন্তু অন্যূন ৪ মাস কাল ৫০° ফাঃ-এর অধিক, a=প্রখর গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ ৭১.৬ ফাঃ-এব অধিক, c=মৃদু গ্রীষ্মকাল, মাত্র ১-৩ মাস কাল উত্তাপ ৫০° ফাঃ এব অধিক, d=তীব্র শীতকাল, শীত-কালীন সর্বনিম্ন তাপ ৩৬.৪° ফাঃ, ET=তুন্দ্রা, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ ৫০° ফাঃ এর অনধিক কিন্তু ৩২° ফাঃ এব অধিক ; EF=গ্রীষ্ম কালীন সর্বোচ্চ তাপ ৩২ ফাঃ এব অনধিক।
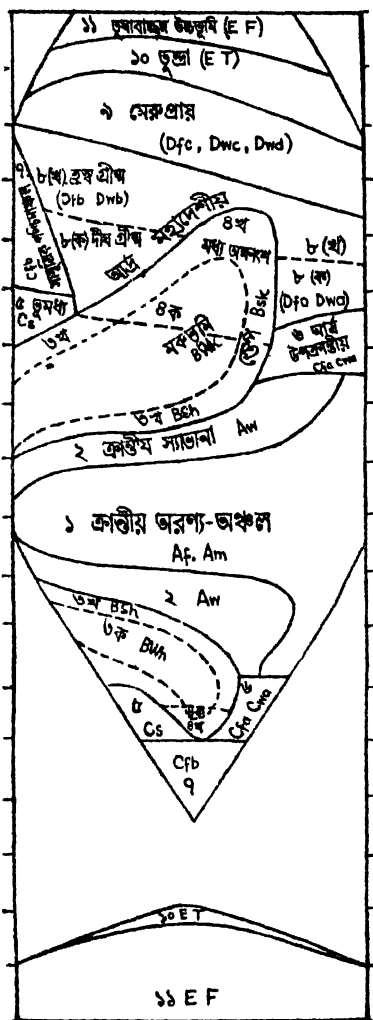
১৭ নং চিত্র—ভূপৃষ্ঠে ক্যাইপ্লেন জলবায়ু অঞ্চল সমূহের অবস্থান

উপরোক্ত সাঙ্কেতিকসমূহেব ব্যবহাব করিয়া ভৌগোলিক ক্যাই্প্লেন নিম্নলিখিত ভাবে পৃথিবীব জলবায়ুকে বিভক্ত কবিয়াছেন (১৭নং চিত্র)—

(ক) নিম্ন অক্ষাংশেব ক্রান্তীয় আর্দ্র (A) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ :—(১) ক্রান্তীয় অবণ্যাঞ্চল (Af=সারা বৎসবই আর্দ্র, Am=মৌসুমী প্রকাব), (২) ক্রান্তীয় স্যাভানা (Aw=আর্দ্র ও শুষ্ক)। (খ) নিম্ন অক্ষাংশেব শুষ্ক (B) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ :—(৩ক) নিম্ন অক্ষাংশের মরুভূমি (BWh=শুষ্ক), এবং ইহাব প্রকারভেদ (৩ক১) পশ্চিম-প্রান্তীয় শীতল সামুদ্রিক (BWn=তুহিন ও কুয়াশাযুক্ত), (৩) নিম্ন অক্ষাংশের স্তেপ (BSh=শুষ্কপ্রায়)। (গ) মধ্য অক্ষাংশের শুষ্ক (B) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ :—(৪ক) মধ্য অক্ষাংশের মরুভূমি (BWk=শুষ্ক), (৪খ) মধ্য অক্ষাংশের স্তেপ (BSk=শুষ্কপ্রায়)। (ঘ) মধ্য অক্ষাংশের আর্দ্র-নাতিশীতোষ্ণ (C) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ :—(৫) ভূমধ্যসাগরীয় (Cs=উপক্রান্তীয়

শুষ্কগ্রীষ্ম), (৫ক) সমুদ্রপ্রান্তিক অবস্থান (Cbs), (৫খ) আভ্যন্তরীণ অবস্থান (Csa), (৬) আর্দ্র উপক্রান্তীয় (Cfa, Cwa), (৭) সামুদ্রিক পশ্চিমাঞ্চল (Cfb)। (ঙ) মধ্য অক্ষাংশের আর্দ্র শীতপ্রধান (D) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ :— (৮ক) আর্দ্র মহাদেশীয় দীর্ঘ গ্রীষ্মযুক্ত (Dfa, Dwa), (৮খ) আর্দ্র মহাদেশীয় হ্রস্ব গ্রীষ্মযুক্ত (Dfb, Dwb) (৯) মেরুপ্রায় জলবায়ু (Dfc, Dwc, Dwd)। (চ) উচ্চ অক্ষাংশের মেরুদেশীয় (E) জলবায়ু অঞ্চসমূহ :—(১০) তুন্দ্রা (ET). (১১) তুষারাচ্ছন্ন উচ্চভূমি (EF), (ছ) পার্বত্য জলবায়ু (H) অঞ্চলসমূহ।

ভারতের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ

ভারতের জলবায়ু—কর্কট ক্রান্তি ভারতকে উত্তর দক্ষিণে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সুতরাং অক্ষাংশ অনুসারে ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ এবং দাক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ও সমুদ্রসান্নিধ্যহেতু দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। আবার নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও হিমালয় পর্বত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকায় উত্তরের শীতল বায়ু এদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই কারণে উত্তর ভারতের মালভূমি গ্রীষ্মকালে কতকটা উষ্ণ থাকে এবং শীতকালেও শীত তীব্র হয় না। দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ নিম্নভূমি হওয়ায় মালভূমি অপেক্ষা উষ্ণতর। আবার সিন্ধু গঙ্গার সমভূমির পূর্বাংশ নিম্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রসান্নিধ্য ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হেতু মৃদুভাবাপন্ন। কিন্তু সমভূমির পশ্চিমাংশের জলবায়ু উষ্ণ মরুপ্রকৃতির।

শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে উষ্ণতার পার্থক্য ভারতের সর্বত্রই অধিক হয় সত্য, কিন্তু পার্থক্যের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। সিমলা ও উতকামন্দ একই উচ্চতায় (৭০০০ ফুট) অবস্থিত, কিন্তু সমুদ্রসান্নিধ্য হেতু উতকামন্দের উষ্ণতা গ্রীষ্মকালে ৭০° ফাঃ, শীতকালে ৫৪° ফাঃ, আর সিমলার উষ্ণতা হিমালয়ের প্রভাবে গ্রীষ্মকালে ৬২° ফাঃ ও শীতকালে ৪০° ফাঃ।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এ দেশের জলবায়ুর নিয়ামক বলিয়া ভারতের জলবায়ু মূলতঃ ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। আরবী 'মৌসিম' শব্দ হইতে মৌসুমী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ ঋতু। সুতরাং ঋতুভেদে যে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় তাহাকে মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উপর ভারতের **বৃষ্টিপাত** তথা জলবায়ু নির্ভর করে। ঋতুভেদে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ভারতের জলবায়ু ও আবহাওয়ার ঋতুগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ভারতে চারিটি ঋতুর প্রভাব অনুভূত হয়। ঋতু অনুসারে ভারতের বৃষ্টিপাত, তথা জলবায়ু, নিম্নে বিবৃত হইল।

(ক) **শীতকাল (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী)**—শীতকালে জানুয়ারী মাসের

প্রারম্ভে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই সময় মধ্য এশিয়ার উচ্চচাপবলয় হইতে উত্তরপূর্বাভিমুখী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নচাপ-বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই বায়ু-প্রবাহকে **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** বলে। শীতল স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া আসে বলিয়া এই বায়ু শুষ্ক, শীতল ও তীব্র। তবে ইহার কতক অংশ হিমালয় অঞ্চল হইতে দক্ষিণে আসিবার সময় তুষার হইতে সামান্য জলীয় বাষ্প আহরণ করে বলিয়া শীতকালে উত্তর ভারতে কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হয়।
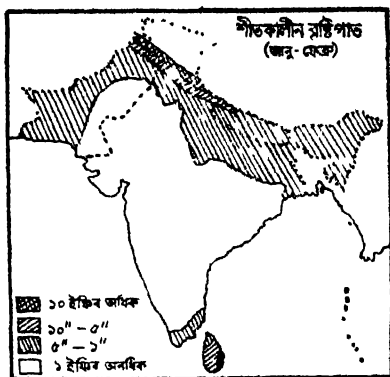
১৮ নং চিত্র

শীতকালে ও বসন্তের প্রারম্ভে ইরাণ মালভূমি হইতে আগত শীতল উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে সামান্য ঘূর্ণিবৃষ্টি হয়। তবে এই সামান্য বৃষ্টিপাতও গম, যব প্রভৃতি রবিশস্য চাষের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এই সময়ে আকাশ প্রায়ই নির্মেঘ থাকে।

(খ) **গ্রীষ্মকাল** (মার্চ-মে)—মার্চ মাস হইতে সূর্য মকরক্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃই কর্কটক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে ভারতের ভূমিভাগের উপর উত্তাপের আধিক্য ক্রমশঃই অনুভূত হইতে থাকে এবং ক্রমে মে মাসে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং জুন মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে (১২০° ফাঃ) একটি বিরাট নিম্ন-চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম-বঙ্গে ("কালবৈশাখী") ও আসামে("ধান্যবর্ষণ") অপরাহ্নের দিকে মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের সহিত ঝড় ও বৃষ্টি হয়।
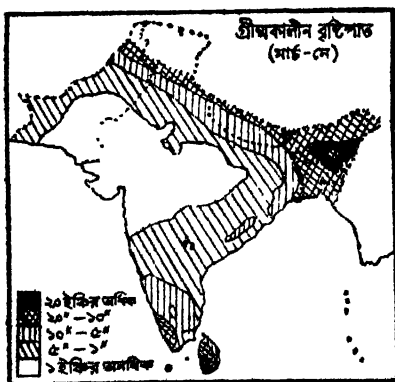
১৯ নং চিত্র

এই বৃষ্টি আউশ ধান্যোৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে এই সময়ে মধ্যে মধ্যে, বৃষ্টিহীন ধূলিঝড় ("আঁধি") বহিয়া

থাকে। দক্ষিণ ভারতেও স্থানে স্থানে এই সময় বজ্রপাতের সহিত বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি আম ও কফি উৎপাদনের সহায়তা করে বলিয়া স্থানভেদে ইহাকে "আম্রবর্ষণ" ও "কফিবর্ষণ" আখ্যা দেওয়া হয়।

(গ) **বর্ষাকাল** (জুন-অক্টোবর)—গ্রীষ্মকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বায়ুমণ্ডলে যে নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয় সেই নিম্নচাপের দিকে জলীয়বাষ্পসম্পৃক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে থাকে। ইহাই **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। এই বায়ুপ্রবাহ দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতে প্রবেশ করে—একটি **আরবীয় শাখা**, অপরটি **বঙ্গোপসাগরীয় শাখা**।

আরবীয় দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুর এক অংশ পঃ ঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর (১০০"-১৫০") বারিবর্ষণ করে। কিন্তু পঃ ঘাটের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশ, অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণাংশে বৃষ্টির পরিমাণ বার্ষিক ৪০"-র অধিক নহে। ইহার দ্বিতীয় শাখা সিন্ধু প্রদেশ (পাকিস্তান) ও রাজস্থানের উপর দিয়া বহিয়া যাইবার সময় কেবলমাত্র আরাবল্লী পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহার দক্ষিণ অংশে প্রায় ৪০"-৬০" বারি বর্ষণ করিয়া উত্তর-পূর্বদিকে পাঞ্জাবের উপর দিয়া বহিয়া উহার উত্তর-পূর্বাংশে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহার তৃতীয় শাখা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নর্মদা ও তাপ্তীর উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর বারি বর্ষণ করে। অতঃপর এই বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্ব মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পথিমধ্যে বঙ্গোপসাগরীয় শাখার সহিত মিলিত হয়।

বঙ্গোপসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিহত হওয়ায় তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ করে। খাসিয়া পর্বতের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০"-৫০০"। তবে শিলং, গৌহাটি প্রভৃতি খাসিয়া পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প। এই বায়ুপ্রবাহের ফলে বঙ্গদেশেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

২০ নং চিত্র

অতঃপর এই সম্মিলিত বায়ুপ্রবাহ উত্তরদিকে যাইবার সময়ে হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বঙ্গদেশের সর্বত্র বারিবর্ষণ করে। অবশেষে এই বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ক্রমক্ষীয়মাণ
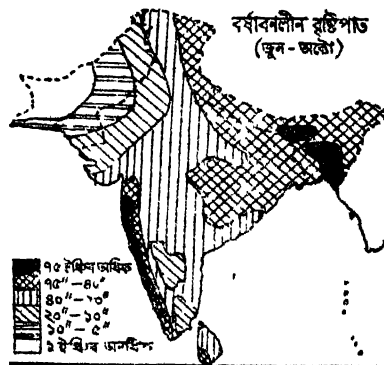
বারিবর্ষণ করিতে করিতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবে পৌছিলে প্রায় বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিলে বর্ষাকাল ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঋতু। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০।৯০ ভাগ এই সময়েই পতিত হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। বৃষ্টির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এই সময়ে খারিফ শস্যের উৎপাদন হয় এবং খারিফ শস্যের উৎপাদনই ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক।

তবে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে ভারতে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার তিনটি উল্লেখযোগ্য **বৈশিষ্ট্য** পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—(১) মৌসুমী বায়ুর বিলম্বে আগমন, (২) নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে বা বহু পূর্বে মৌসুমী বায়ুর তিরোভাব, এবং (৩) জুলাই বা আগস্ট মাসে দীর্ঘ বিরতি বা প্রবল বর্ষণ। ইহার-সব কয়টিই কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ বর্ষাকাল বিলম্বে আরম্ভ হইলে বীজ বপনের কাজ বন্ধ থাকে। বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী হইলে দেশে বন্যার প্রকোপ দেখা যায় আবার ক্ষণস্থায়ী হইলে বাড়ন্ত ফসল শুকাইয়া যায়। জুলাই ও আগস্ট মাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবল বর্ষণ হইলে ফসলের চারাগুলি জলে ডুবিয়া পচিয়া যায় আবার ঐ সময়ে দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হইলে চারাগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) **শরৎ ও হেমন্তকাল** (নভেম্বর-ডিসেম্বর)—শীতের প্রারম্ভে, নভেম্বর মাসে সূর্যের মকর ক্রান্তির দিকে প্রত্যাগমন হেতু উত্তর ভারতে ক্রমশঃই উচ্চচাপবলয়ের সৃষ্টি হইতে থাকে। উত্তর ভারতে এই উচ্চচাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরবীয় ও বঙ্গোপসাগরীয় দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ হইতে পশ্চাৎ দিকে সরিতে বাধ্য হয়। উত্তর ভারত হইতে অপসরণ করিলেও এই বায়ু মাদ্রাজ উপকূলাঞ্চলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময় উত্তর ভারতে নিয়ত উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ু ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বহু ঘূর্ণিবাত পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মাদ্রাজের উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর-ভারতে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না কিন্তু অপসারমান দক্ষিণ-পশ্চিম
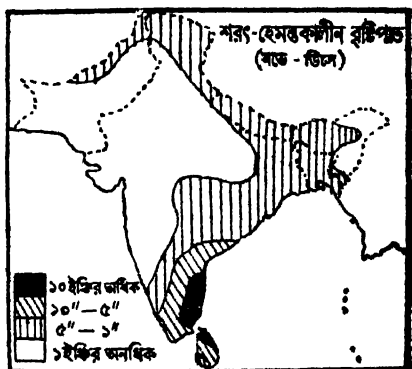
২১ নং চিত্র

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ভারতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪২"। কিন্তু বৃষ্টিপাত সকল বৎসর সমান হয় না। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সৃষ্টি করে। আবার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অপরিমিত ও অনিশ্চিত।

বৃষ্টিপাত-অঞ্চল—বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:—(১) ১৫০"-এর অধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—মালাবার উপকূল, আসাম উপত্যকার অংশবিশেষ, দার্জিলিং ও বক্সাদুয়ার। (২) ১০০" হইতে ১৫০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলের অংশবিশেষ, আসাম উপত্যকার অবশিষ্টাংশ, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল। (৩) ৭৫" হইতে ১০০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ, আসাম, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশ, কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল। (৪) ৫০" হইতে ৭৫" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল-পশ্চিম ঘাট, অবহিমালয় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ। (৫) ২৫" হইতে ৫০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল, রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বাংশ এবং উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল। (৬) ১০" হইতে ২৫" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশ। (৭) ৫" হইতে ১০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—উষ্ণ মরু অঞ্চল।
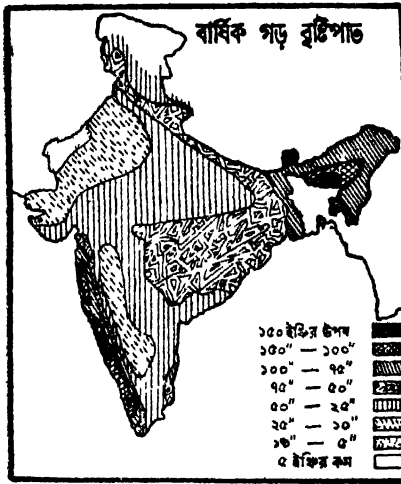
২২নং চিত্র—বৃষ্টিপাত অঞ্চল

ভারতের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ—ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা অনুসারে ভারতকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমি, (খ) মধ্যভারতের নদীবিধৌত সমভূমি, (গ) দক্ষিণের মালভূমি এবং (ঘ) উপকূলবর্তী অপ্রশস্ত নিম্নভূমি।

(ক) **উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমি**—উত্তর-পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত শৃঙ্গ হইতে উত্তর-পূর্বে নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ ও ১৫০/২০০ মাইল প্রস্থযুক্ত হিমালয়ের সমগ্র অংশই ভারতের অন্তর্গত। এই

পর্বতমালা প্রধানতঃ তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মালভূমি রহিয়াছে। তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ দিকের অল্প উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শ্রেণীকে **অবহিমালয় শ্রেণী,** মধ্যভাগের ৬০০০′—১২,০০০′ পর্যন্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে **মধ্যহিমালয় শ্রেণী,** এবং সর্বোত্তরে গড়ে প্রায় ২০,০০০′ উচ্চতা-বিশিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীটিকে **প্রধান হিমালয় শ্রেণী** বলে। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে গড়ে প্রায় ১৮,০০০′ উচ্চতা-বিশিষ্ট কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে একটি পর্বতশ্রেণী পাতকোই, চীন, নাগা ও লুসাই নামে বিস্তৃত। নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বরাইল পর্বত হইতে পশ্চিম দিকে আসামের জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড় নির্গত হইয়াছে। উত্তর ও পূর্বের এই বিশাল পার্বত্য প্রাচীরের মধ্যে বহু গিরিপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। (১৩শ অধ্যায়—ভারতের সীমান্ত পথ দেখ)

হিমালয়ের পার্বত্যভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল**—আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের ৬০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পাতকোই, নাগা, লুসাই, খাসিয়া, গারো ও জয়ন্তিয়া পর্বত লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক এবং চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য বিদ্যমান। উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিও দেখা যায়। ধান, চা, কার্পাস, আনারস ও কমলা এতদঞ্চলের প্রধান কৃষিজদ্রব্য। তুঁত গাছে রেশম কীট পালিত হয়। খনিজ তৈল ও কয়লা পাওয়া যায়। যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও লোক-বসতি বিরল। **শিলং, চেরাপুঞ্জী, ইম্ফল** প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। পূর্ব সীমান্তে টুজু, মণিপুর, আন ও টোনগুপ গিরিদ্বার দিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার পথ রহিয়াছে। (২) **পূর্ব হিমালয় অঞ্চল**—হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৫০০০ ফুটের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর, উত্তাপ অল্প। নিম্নতর অংশে চিরহরিৎ বৃক্ষের ও উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য এবং সর্বোচ্চ অংশে আল্পীয় তৃণভূমি দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অসুবিধা হেতু বনজ সম্পদের আহরণ অতি সামান্য। লোকবসতি অল্প ও কৃষিকার্য কষ্টসাধ্য। চা, কমলা ও সিঙ্কোনার আবাদ রহিয়াছে। সামান্য কয়লা ও তাম্র পাওয়া যায়। **কাঠমাণ্ডু, দার্জিলিং** ও **কালিম্পং** বিখ্যাত শহর। দার্জিলিং হইতে চুম্বি উপত্যকার উপর দিয়া জেলেপ্ লা ও নাথু লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। (৩) **পূর্ব অবহিমালয় অঞ্চল**—পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত ৫০০০ ফুটের অনধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নিম্ন পার্বত্যভূমি লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পূর্বে ১০০″ হইতে পশ্চিমে ৪০″ পর্যন্ত।

এই অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের ও স্থানে স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। অরণ্য হইতে প্রচুর শালকাঠ পাওয়া যায়। উপত্যকা অংশে ধান, চা ও ভুট্টা জন্মে। লোকবসতি পুর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা ঘন। **সাহারানপুর, পিলভিত, খেরী, বারাইচ, মতিহারী,** ও **জলপাইগুড়ি** প্রধান শহর। ইহারা রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। (৪) **পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল**—নেপাল রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হইতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ৫০০০ ফুটের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট পার্বত্য-প্রদেশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু পুর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক ও শীতল। সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ আহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, গম ও নানাবিধ ফল জন্মে। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উল্লেখযোগ্য। পশম শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়। **নৈনিতাল, মুসৌরী, সিমলা, শ্রীনগর** প্রভৃতি প্রধান শহর। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোটাং, বরালাচা লা', জোজিলা, কারাকোরাম, বানিজল, সপ কি এবং নিতি গিরিবর্ত্মের সাহায্যে সীমান্তবর্তীয় দেশসমূহে যাতায়াত চলে। (৫) **পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চল**—পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত শিবালিক ও বহিঃহিমালয়ের অন্তর্গত ৫০০০ ফুটের অনধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নিম্নপর্বতশ্রেণী লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। বৃষ্টিপাত ৩০"-৪০" পর্যন্ত। শিবালিক পর্বতাঞ্চলে মৌসুমী অরণ্যের অরণ্য, বাঁশ ও তৃণভূমি এবং বহিঃহিমালয় অঞ্চলে চিরশাহন বৃক্ষই প্রধান। সেচব্যবস্থার সাহায্যে গম, ভুট্টা, ছোলা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ফসল উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড়। গঙ্গাতীরে **হরিদ্বার** প্রধান শহর। (৬) **লাদাক অঞ্চল**—কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে তিব্বতীয় মালভূমির শীততীব্র অংশ ইহার অন্তর্গত। পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। যানবাহন ব্যবস্থা অনুন্নত। লোকবসতি বিরল। **লেহ** এই অঞ্চলের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র।

(খ) **মধ্যভাগের নদীবিধৌত সমভূমি**—উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ১৫০০ মাইল দীর্ঘ ও ১৫০।২০০ মাইল বিস্তারযুক্ত এই সমভূমি সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের উপনদী ও শাখানদী কর্তৃক বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। ইহার কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০।৬০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে, তবে পূর্বাংশ ক্রমশঃ পূর্বদিকে ঢালু। মধ্যে আরাবল্লী পর্বত ও উহার উত্তর-পূর্বের অনুচ্চ শৈলশিরা এই সমভূমির জলবিভাজিকা।

এর সমভূমিকে নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—

(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি**—সিন্ধুনদের চারিটি প্রধান উপনদীর পলিগঠিত উর্বর অববাহিকা লইয়া এই সমভূমি গঠিত। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত অন্যত্র গড়ে ২০"-৩০"; জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, মৃত্তিকা উর্বর। কৃত্রিম

সেচব্যবস্থার সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু, ভুট্টা, ধান, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য উৎপাদিত হয়। অরণ্যভূমিতে দেবদারু জন্মে। সামান্য খনিজ লবণ পাওয়া যায়। উত্তরের চারণভূমিতে বহু পশু পালিত হয়।

২৩ নং চিত্র—প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ

রেশম ও পশম বস্ত্র, চর্ম, শর্করা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা, সিমলা প্রভৃতি প্রধান শহর। (২) **উত্তরগঙ্গার সমভূমি**—পশ্চিমে দিল্লী হইতে পূর্বে এলাহাবাদের পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমভূমি অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ২৫" হইতে পূর্বাংশে ৪০" পর্যন্ত। জলবায়ু পাঞ্জাবের সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় চরমভাবাপন্ন নহে। এই অঞ্চল গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বহু নদীপ্রবাহে বিধৌত, পাললিক মৃত্তিকায় উর্বর এবং জলসেচে সমৃদ্ধিশালী। কৃষিকার্যই অধিবাসীদের প্রধান
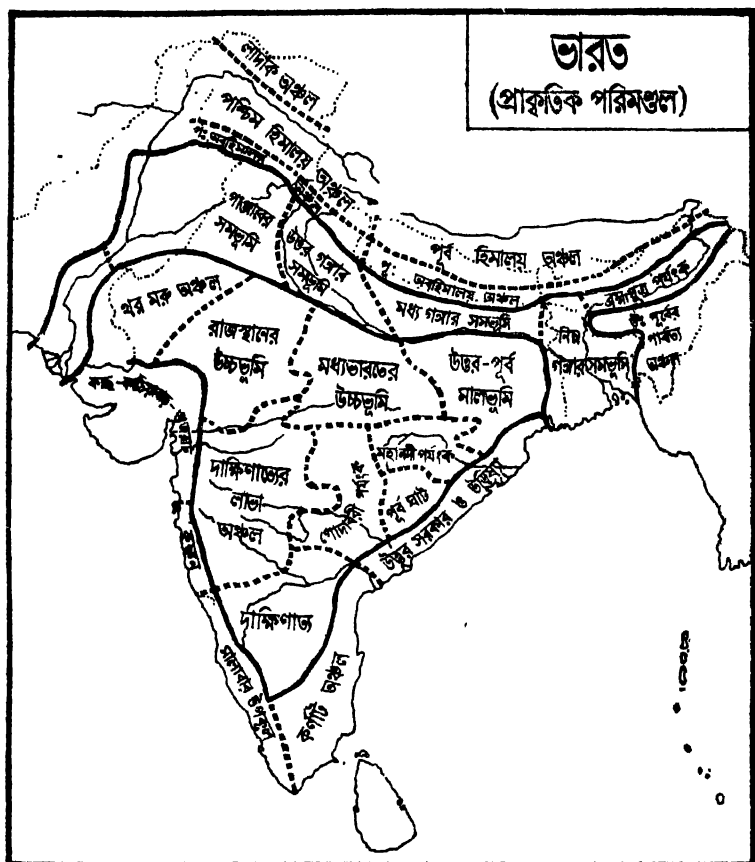
উপজীবিকা। গম, ইক্ষু (সর্বপ্রধান), জোয়ার, বাজরা, যব, ধান, ভুট্টা, ছোলা, কার্পাস, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। লোকবসতি ঘন। এই অঞ্চলের কার্পাস, ইক্ষু, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাচ, কাগজ, দিয়াশলাই, প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মথুরা, ফররুকাবাদ, কানপুর, মীবাট, মোরাদাবাদ, আলীগড় প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। (৩) **মধ্যগঙ্গার সমভুমি**—এলাহাবাদের পূর্বাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উত্তরস্থিত উত্তর প্রদেশ ও বিহারের প্রায় সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চল পলিসমৃদ্ধ ও উর্বর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পশ্চিমাংশে ৪০" হইতে পূর্বাংশে ৭০" পর্যন্ত। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। স্থানে স্থানে সেচ-ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, যব, জোয়াব, বাজরা, রাই, তিসি, ইক্ষু, কার্পাস, ভুট্টা, তামাক, ছোলা, মটর, অড়হর, মসুর, আফিং, নীল, আম, লিচু প্রভৃতি প্রধান। লোকবসতি নিবিড়। ভাগলপুরের কেওলিন ও রেশম শিল্প বিখ্যাত। বারাণসী, গোবক্ষপুব, মির্জাপুর, ফয়জাবাদ, পাটনা, ভাগলপুব, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা মজঃফবপুর, ছাপরা প্রভৃতি প্রধান শহর। (৪) **নিম্নগঙ্গার সমভুমি**—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিদ্বারা গঠিত এই সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক, জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র এবং ভূমি উর্বর। ধান, গম, জোয়ার, বাজবা, ভুট্টা, পাট, তৈলবীজ, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি এই অঞ্চলের ফসল। স্থানে স্থানে তুঁতগাছে রেশমকীট পালিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। শর্করা, রাসায়নিক দ্রবা, কাগজ, দিয়াশলাই, সিগারেট, চীনামাটিব বাসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের শিল্প এই অঞ্চলে রহিয়াছে। কলিকাতা, ভাটপাড়া, টিটাগড়, শ্রীবামপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প-কেন্দ্র। (৫) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**—ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত আসামের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত ৫০০ মাইল দীর্ঘ ৫০ মাইল প্রস্থ-যুক্ত এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ সমতল ও পাললিক শিলায় গঠিত, বৃষ্টিপাত ৮০"র উপব, জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য; খনিজ তৈল, চুন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য; শাল, শিশু প্রভৃতি বনজ দ্রব্য এবং রবার, সিঙ্কোনা প্রভৃতি নানাবিধ ফসল এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রই প্রধান নদীপথ। গৌহাটি হইতে শিলং এবং ডিমাপুর পর্যন্ত মোটর পথ রহিয়াছে।

(গ) **দক্ষিণের মালভূমি**—সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম-পূর্বে বিস্তৃত বিন্ধ্য-রাজমহল পর্বতাঞ্চল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ একটি বিশাল মালভূমি। এই মালভূমি দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরে বিন্ধ্য-রাজমহল ও দক্ষিণে সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল-পরেশনাথ পাহাড়ের অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্রতর মালভূমিকে **মধ্য ভারতের মালভূমি** এবং ইহার দক্ষিণাংশের বৃহত্তর ত্রিভুজাকৃতি

ভূমিভাগকে **দক্ষিণাপথের মালভূমি** বলা হয়। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট (গড় উচ্চতা ১৫০০′) ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট (গড় উচ্চতা ৩০০০′) পর্বতশ্রেণী। এই দুইটি পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের মালভূমি প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ এবং পূর্বদিকে ঢালু; এই কারণে পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত নদীসমূহ পূর্ববাহিনী।

মধ্য ভারতের মালভূমিকে নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **মধ্য ভারতের উচ্চভূমি**—উত্তরে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং দক্ষিণে নর্মদা-শোন অববাহিকার অন্তর্বর্তী কেলাসিত শিলাস্তরে গঠিত উচ্চভূমি ইহার অন্তর্গত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪০″; জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। ধান, কার্পাস, তৈলবীজ, জোয়ার প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য এবং মর্মর এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ। **ঝাঁসী** ও **জব্বলপুর** বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। (২) **রাজস্থানের উচ্চভূমি**—আরাবল্লীপর্বত এবং উহার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অনুবৃত্তি, দক্ষিণ রাজস্থানের পর্বত, পূর্ব রাজস্থানের উপত্যকাভূমি এবং নর্মদার উপত্যকাভূমি লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন; বৃষ্টিপাত অপরিমিত ও অনিশ্চিত। সেচব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা নাই। জোয়ার, বাজরা, ছোলা, গম, যব, ভুট্টা, তৈলবীজ ও কার্পাস প্রধান ফসল। লোকবসতি অল্প। পশুচারণ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এ অঞ্চলের কার্পাস ও পশম বয়ন-শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই উচ্চভূমির মধ্য দিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ বোম্বাই হইতে আগ্রা ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। **আজমীর, জয়পুর, আবু** ও **উদয়পুর** এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। (৩) **থর মরু অঞ্চল**—উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু-বিধৌত সমভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরাবল্লী পর্বত দ্বারা আবদ্ধ উষ্ণ মরুপ্রকৃতির ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। জোয়ার ও বাজরা প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। **বিকানীর** উল্লেখ-যোগ্য নগর।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে তিনটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায় (১) **দাক্ষিণাত্য অঞ্চল**—বর্তমান মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণাংশ এবং মাদ্রাজের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, মৃত্তিকা সাধারণতঃ লোহিতবর্ণের ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২০″ হইতে ৪০″ পর্যন্ত। কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পাদিত হয়। ইহা ভারতের অন্যতম দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। এ অঞ্চলের সেগুন, চন্দন, শাল প্রভৃতি বনজ; স্বর্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, কয়লা প্রভৃতি খনিজ এবং ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, তৈলবীজ, কফি, চা প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তৃণভূমিতে গবাদি পশু ও মেষ প্রতিপালিত হয়। বিভিন্নস্থানে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। বয়ন শিল্প, সিমেণ্ট, বিমানপোত নির্মাণ, সাবান, চন্দনতৈল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতির শিল্প এ অঞ্চলে রহিয়াছে। মহীশূর,

ব্যাঙ্গালোর, বেলারী, কুর্নুল ও হায়দরাবাদ শিল্পপ্রধান অঞ্চল। (২) **দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল**—বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রদেশের সমগ্র কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, মহীশূর রাজ্যের উত্তরাংশ ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণের, উর্বর ও জলসঞ্চয়ী। বৃষ্টিপাত অল্প এবং জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। কার্পাস, জোয়ার, বাজরা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। সহ্যাদ্রির পূর্ব ঢালে বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সোলাপুর, গুলবর্গা, আকোলা, অমরাবতী, পুণা ও নাগপুর প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। (৩) **উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল**—ছোটনাগপুরের মালভূমি, মধ্য ভারতের উচ্চভূমির পূর্বাংশ, পূর্বঘাটের উত্তরাংশ এবং মহানদী ও গোদাবরীর উপত্যকা লইয়া ইহা গঠিত। বৃষ্টিপাত ৪০" হইতে ৬০" পর্যন্ত। এই মালভূমি অরণ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। অরণ্য হইতে শাল, লাক্ষা ও রেশমকীট আহৃত হয়। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে ধান, ভূট্টা, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতি জন্মে। কয়লা, লৌহ, অভ্র, প্রভৃতি খনিজ এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়।

(ঘ) **উপকূলভূমি**—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অপ্রশস্ত এবং পূর্ব উপকূলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমভূমি রহিয়াছে। উভয় উপকূলের পশ্চাদ্‌ভাগেই পর্বতমালা অবস্থিত। তবে, পশ্চিম উপকূলের পশ্চাদভাগে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা একটি উচ্চ অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের ন্যায় কিন্তু পূর্ব উপকূলের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত পূর্বঘাট পর্বতমালা অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ ও বিচ্ছিন্ন পর্বতসমষ্টি লইয়া গঠিত। পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু পূর্ব উপকূলে শীত ও গ্রীষ্মে দুইবার মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উভয় উপকূলাঞ্চলই প্রায় অভগ্ন এবং উভয় উপকূলেই কতকগুলি লবণাক্ত উপহ্রদ রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহ হ্রস্ব ও খরস্রোতা বলিয়া উহাদের মোহানায় বিশেষ বদ্বীপ নাই কিন্তু পূর্ব উপকূলাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও মন্দস্রোতা বলিয়া উহাদের মোহানায় বহু বদ্বীপ রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূলের মৃত্তিকা বালুকা-প্রধান কিন্তু পূর্ব-উপকূলাঞ্চলের মৃত্তিকা পলিপ্রধান। তবে সামগ্রিক বিচারে বলা যাইতে পারে যে ভারতের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল উর্বর, এবং কৃষি ও শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ। এতদঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং লোকবসতি নিবিড়।

পশ্চিম উপকূলের সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **কচ্ছ-কাঠিয়াবাড়-গুজরাট অঞ্চল**—ইহা একটি বৃষ্টিহীন, অনুর্বর ও বন্ধুর ভূখণ্ড। অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে গম, ধান, জোয়ার, বাজরা ও কার্পাস জন্মে। চুনাপাথর ও লবণ প্রধান খনিজ। গুজরাটের পূর্বাঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ। দমন, সুরাট, ব্রোচ, বরোদা, আমেদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগর; **কাণ্ডলা** নবনির্মিত বন্দর। (২) **কঙ্কণ উপকূল**—

বোম্বাই হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমির জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০"। পার্বত্য অংশে সেগুন, শাল ও আবলুস্ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে। সমভূমি অঞ্চলে নারিকেল, সুপারী ও ধান প্রচুর জন্মে। নদীসমূহ খরস্রোতা হওয়ায় নাব্য নহে, তবে কাষ্ঠ পরিবহন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লোকবসতি ঘন। **বোম্বাই** বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত রেলপথ-দ্বারা সংযুক্ত। (৩) **মালাবার উপকূল**—গোয়া হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমির জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। পার্বত্য ভূমিতে সেগুন, চন্দন, আবলুস্, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বৃক্ষের বন ও সমভূমি অঞ্চলে ধান, নারিকেল, রবার, সুপারী, এলাচ, মরিচ প্রভৃতি জন্মে। লোকবসতি ঘন। নারিকেল সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প, মৎস্য ও রবার শিল্প এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মালাবার উপকূলাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। কালিকট, ত্রিবান্দ্রাম, আলেপ্পী, কুইলন প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র।

পুর্ব-উপকূলের সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **কর্ণাট বা তামিল অঞ্চল**—পশ্চিমে কার্ডামম পর্বত, উত্তর-পশ্চিমে মালভূমির প্রান্তভাগ, পুর্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কৃষ্ণা নদী ও দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত পাললিক শিলাস্তরে গঠিত কর্ণাট অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সেচব্যবস্থার সাহায্যে জোয়ার, বাজরা, ধান, বাদাম, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, চা, নারিকেল প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। শুষ্ক পার্বত্যভূমিতে মেষ পালিত হয়। পার্বত্য বনভূমিতে চন্দন, আবলুস্, সেগুন ও সিঙ্কোনা বৃক্ষ জন্মে। অভ্র ও লবণ খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান। উপকূলের সর্বত্র শঙ্খ, মৎস্য এবং স্থানে স্থানে মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসায় আছে। লোকবসতি ঘন। মাদ্রাজ, তুতিকোরিন, কুদ্দালোর, নেগাপত্তম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, তিনেভেলী, মাদুরা, পন্দীচেরী প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। পাট, তৈল, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, চুরুট, সাবান, দিয়াশলাই প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প এ অঞ্চলে রহিয়াছে। (২) **অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল**—কৃষ্ণা নদীর উত্তর হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ও উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত এই অঞ্চলের জলবায়ু অন্যান্য উপকূলাঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক। ধান, জোয়ার, বাজরা, মশলা, নারিকেল, ইক্ষু, প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য ; ম্যাঙ্গানীজ, লবণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ; পার্বত্য বনভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। কলিকাতা হইতে বিশাখাপত্তনম্ পর্যন্ত উপকূলাঞ্চল দিয়া রেলপথ প্রসারিত রহিয়াছে। এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ, লবণ ও মৎস্য শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপত্তনম্, কটক, পুরী প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।

প্রশ্নোত্তর

1. Define a natural region (C. U '55, '60) What are the primary considerations in a study of natural regions ?

(প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল কাহাকে বলে? প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের সময় কি কি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন?) (পৃঃ ৫২-৫৩)

2. Into how many natural regions can the world be divided ? Name them and indicate their position in a diagram (C U '60)

(পৃথিবীকে কয়টি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যায়? উহাদের নাম লিখ এবং চিত্র অঙ্কন করিয়া উহাদের অবস্থান নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৫৩-৫৬)

3. Describe the natural region where hardwood evergreen forests are the prevailing natural vegetation (C U '59)

(কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহার বর্ণনা কর।) (নিরক্ষীয় পরিমণ্ডল, পৃঃ ৫৬-৫৮)

4 Locate, classify, and account for the chief areas of natural grasslands in the world Examine the nature of economic development of these regions

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৃণভূমি অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন পূর্বক উহাদের প্রত্যেকটির অবস্থান ও উৎপত্তির কারণ নির্দেশ কর। প্রত্যেকটি তৃণভূমি অঞ্চলের বৈষয়িক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (স্যাভানা জলবায়ু, পৃঃ ৫৮-৬০, ও স্তেপ-জলবায়ু, পৃঃ ৭১-৭২)

5 Locate, classify and give a brief account of the chief deserts of the world.

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মরু অঞ্চল সমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর, অবস্থান নির্দেশ কর এবং উহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।) [উষ্ণমরু পৃঃ ৬২-৬৩, মধ্য অক্ষাংশের মরুমণ্ডল পৃঃ ৬৭-৬৯ এবং হিমমরু (তুন্দ্রা ও মেরুদেশীয় উচ্চভূমি) পৃঃ ৭৪-৭৫]

6. Distinguish between cool temperate east coast and cool temperate oceanic climates and indicate the main features of their economy.

(হিমশীতোষ্ণ পূর্ব উপকূলীয় ও পশ্চিম প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক পরিমণ্ডল দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং ঐ দুইটি পরিমণ্ডলের অন্তর্গত দেশসমূহের বৈষয়িক অবস্থার আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬২-৭০, ৭২-৭৪)

7. Describe and account for the characteristics of climate of the region where soft wood evergreen forests are the prevailing natural vegetations.

(কোমলকাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহার বর্ণনা কর এবং তদঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।)

(তৈগা অঞ্চল, পৃঃ ৭০-৭১)

8 Explain the Koppen system of the classification of world climates. (C. U '51)

(ক্যোইপেন পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর জলবায়ুর বিভাগ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৭৫-৭৭)

9. Compare and contrast the Mediterranean type of climate with the monsoonal type. (H. S. '63)

(মৌসুমী ও ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য দেখাও।)

[নির্দেশ : ভূমধ্যসাগরীয় ও মৌসুমী জলবায়ুর তুলনা]

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু	মৌসুমী জলবায়ু
অবস্থান—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৩০° হইতে ৪৫° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে শীতকালে পশ্চিমা এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুবলয়ে অবস্থিত।	**অবস্থান**—মৌসুমী অঞ্চল মহাদেশের পূর্ব-প্রান্তে প্রায় ২০° হইতে ৩০° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে আয়নবায়ুবলয়ে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার বায়ুপ্রবাহ আয়নবায়ু অপেক্ষা স্থানীয় কারণে অন্যদিক হইতে অধিক প্রবাহিত হয়।
জলবায়ু—(১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং গ্রীষ্মকাল সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। (২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০"। (৩) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমাবায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়। (৪) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ পর্যায়ক্রমে ৯০° ফাঃ ও ৫০° ফাঃ। (৫) বৎসরের অধিকাংশ দিনই আকাশ নির্মেঘ থাকে।	**জলবায়ু**—(১) মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকাল শুষ্ক থাকে। (২) মৌসুমী অঞ্চলে বার্ষিক গড়বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০"-৭০"। (৩) মৌসুমী অঞ্চলে আয়নবায়ু অপেক্ষা স্থানীয় কারণে অন্যান্য দিক হইতে আগত বায়ু প্রবাহের দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। (৪) মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ পর্যায়ক্রমে ৯০ ফাঃ ও ৬০ ফাঃ। (৫) বৎসরের অধিকাংশ দিনই আকাশ মেঘাবৃত থাকে।
উদ্ভিদ—(১) প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মধ্যে ছোট ছোট বৃক্ষ ও ঝোপ-ঝাড়ই অধিক। পর্যাপ্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। (২) কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে আঙ্গুর, পীচ, ডুমুর, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি ফল, গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং রেশম প্রধান। (৩) কৃষিকার্য সাধারণতঃ শীতকালে হয়।	**উদ্ভিদ**—(১) সেগুন, শাল প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চল বনজসম্পদে সমৃদ্ধ। (২) কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, শণ, অতসী, যব, তৈলবীজ, চা, কফি, তামাক সিনকোনা, রবার, ডাল প্রভৃতি প্রধান। (৩) কৃষিকার্য সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে হয়।

10. Account for the variety in the distribution of rainfall in India and show its effect on the chief products. (C. U. '58)

(ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর এবং শস্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের প্রভাব নির্ধারণ কর।) (পৃঃ ৭৭-৮১)

11. Explain the factors accounting for the winter rainfall in India,

(ভারতে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণসমূহ নির্দেশ কর।)

(ভারতের 'শরৎ ও হেমন্তকাল' এবং 'শীতকাল' অংশ দুইটি দেখ। পৃষ্ঠা ৮০-৮১, ৭৭-৭৮)

12. Divide India into natural regions. Describe and account for the climate, products and industries of each region. (C. U. '48)

(ভারতকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কর এবং প্রত্যেকটি পরিমণ্ডলের জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প সংগঠন সম্পর্কে লিখ।) (পৃঃ ৮১-৮৮)

13 Illustrate with reference to the valley of the Ganga, the influence of environment on the economic activities of the dwellers of this valley. (C. U, '59)

(নদী উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলটির সাহায্যে বুঝাইয়া লিখ।)

(পৃঃ ৮৩-৮৫)

14. Compare and contrast the east coast of India with the west coast. (C. U. '58)

(ভারতের পূর্ব-উপকূলের সহিত পশ্চিম-উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৮৭-৮৮)

15 Examine the main features of the economy of the southern plateau of India (দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক সঙ্গতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃঃ ৮৫-৮৭)

16 Describe the climate of the *Equatorial Region*. Indicate the different types of agriculture and agricultural products in such a climatic region (H S '61)

(নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ুর বিবরণ লিখ। এই অঞ্চলের কৃষিকার্য ও কৃষিজ দ্রব্যের নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৫৬-৫৮)

পঞ্চম অধ্যায়

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বসতিঘনত্ব

অর্থনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিতে পৃথিবী মনুষ্য নিরপেক্ষ একটি জড়পিণ্ড মাত্র নহে, ইহা হইল মানবজাতির বাসভূমি। মানুষের আবাসস্থল হিসাবে পৃথিবীর উপযোগিতার বিচার বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তু। এই শাস্ত্রের আলোচনায় মানুষ হইল মুখ্য। কারণ, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয় তাহার কর্মকর্তা মানুষ নিজেই। মানুষই নিজ প্রয়োজনের তাগিদে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ও ভোগ করিয়া থাকে। সর্বদাই কর্মতৎপর ও উদ্যমশীল মানুষ আজ পৃথিবীর নানাস্থানে বসতি বিস্তার করিয়া স্থানীয় সম্পদ আহরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বসতিঘনত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর লোকবসতি সম্পর্কিত আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত।

১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪০ কোটি বলিয়া রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক অনুমিত হয়। তবে লোকবসতি পৃথিবীর সকল অংশে সমভাবে বণ্টিত

পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন ও জনসংখ্যা

মহাদেশ	আয়তন কোটি বর্গমাইল	জনসংখ্যা (১৯৫০) (কোটি)	বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল (১৯৫০)
এশিয়া	১ ৭০	১৩২ ০	৫৮
আফ্রিকা	১ ১৬	১৯ ৮	১৭
উঃ আমেরিকা	০ ৯৪	২১·৬	২৩
দঃ আমেরিকা	০ ৬৯	১১·০	১৬
ইউরোপ	০ ৩৯	৫৫ ০	১৪২
ওশিয়ানিয়া	০·৩৩	১·৩	৪
অ্যাণ্টার্কটিকা	০·৫১	—	—
মোট	৫·৭২	২৪০·৭	৪৬

নহে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসী দঃ পূঃ এশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে। এই সমস্ত অঞ্চলের মিলিত আয়তন সমগ্র স্থলভাগের প্রায় ১৪%। পৃথিবীর প্রায় ২৫% অধিবাসী ইউরোপ মহাদেশে বসবাস করে—মোট স্থলভাগের মাত্র ৭% অংশে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মিলিত আয়তন এশিয়ার আয়তনের প্রায় সমান হইলেও পূর্বোক্ত অঞ্চল দুইটিতে মিলিতভাবে এশিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% বসবাস করে।

বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ (Causes of the variation of population densities)—আঞ্চলিক জনসংখ্যা বণ্টন যে সমস্ত কারণগুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদিগকে আমরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। (১) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইল স্থানীয় অবস্থান, জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি। ইহাদের প্রভাব সর্বকালীন ও সর্বস্থানীয়। এই সমস্ত পার্থিব পরিবেশ মানুষের সম্পদ আহরণ পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া জনসংখ্যার বণ্টন ও ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলি বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল (বা প্রতিকূল) হইলে স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইল খনিজ দ্রব্য, জল, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্, জীবজন্তু প্রভৃতি স্থানীয় সম্পদ। ইহারা কখনও ব্যষ্টিগত ভাবে আবার কখনও বা সমষ্টিগত ভাবে আঞ্চলিক জনসংখ্যার বণ্টন ও ঘনত্ব নিরূপণ করিয়া থাকে। তবে ইহাদের প্রভাব সর্বকালীন বা সর্বস্থানীয় নহে। কেবল মাত্র যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের এই সমস্ত উপাদান পর্যাপ্ত (বা সামান্য) পরিমাণে রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোকবসতি নিবিড় (বা বিরল) হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর, জলবায়ু কৃষিকার্য ও মনুষ্যবাসের উপযোগী, পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত ধরণের এবং যে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য, জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোকবসতি নিবিড় হইয়া উঠে। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইল মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ। উন্নত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি, ধর্মমত, রাষ্ট্ররূপ প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে যে সমস্ত অঞ্চল স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া পার্থিব সম্পদের পরিপূর্ণ আহরণ ও ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলের বসতিঘনত্ব স্বভাবতই নিবিড় হইয়া থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান আঞ্চলিক বসতিবণ্টনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহাদিগকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করিতে পারি। (ক) শিল্প সংগঠনে কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ—যে দেশ শিল্প সংগঠনে যত উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে

সেই দেশের লোকবসতি তত নিবিড় হইয়াছে। (খ) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ—জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে যে দেশ যত অগ্রণী সেই দেশে সাধারণতঃ মৃত্যুহারের স্বল্পতা হেতু লোকবসতিও তত নিবিড় হইয়া থাকে। (গ) পারিবারিক আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ—এক একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সভ্যসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কিত মতবাদও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির সহায়তা করে। (ঘ) বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা ও উহার পরিমাণ—ইহা সাধারণতঃ অদৃশ্য রপ্তানী, নিজদেশে বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশে নিযুক্ত লগ্নী হইতে আয় এবং বিদেশাগত ঋণ ও দানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এইরূপ বহিরাগত আয়ের সাহায্যে দেশগত বর্ধিত জনসাধারণের চাহিদা মিটান সম্ভব বলিয়া ইহা আঞ্চলিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। এই কারণে যে দেশের বহিরাগত আয়ের ক্ষমতা ও পরিমাণ অধিক (বা অল্প), অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হইলে সেই দেশের জনসংখ্যাও অধিক (বা অল্প) হইয়া থাকে। (ঙ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সংকীর্ণতা বা প্রসার বিভিন্ন উপনিবেশ অঞ্চল হইতে খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া মূল দেশের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ করিয়া থাকে। বসতিঘনত্ব-তারতম্যের উপরোক্ত কারণগুলি কখনও বা ব্যষ্টিগত ভাবে আবার কখনও বা সমষ্টিগতভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক বসতিঘনত্ব নির্ধারণ করিয়া থাকে।

উদাহরণ (Example)—বসতিঘনত্ব-তারতম্যের উপরোক্ত কারণসমূহ পৃথিবীর বিভিন্নদেশে কি ভাবে বসতিবণ্টন ও ঘনত্ব নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা জনসংখ্যার দিক হইতে দুইটি বিপরীতধর্মী দেশ—অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের জনসংখ্যা ও বসতিবণ্টনের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বণ্টন (Distribution of population in Australia)—অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বণ্টন প্রসঙ্গে ইহা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য যে অস্ট্রেলীয় সরকার "শ্বেত-অস্ট্রেলীয় নীতি" (White Australian Policy) প্রবর্তন করিয়া এদেশে অশ্বেতজাতির বসবাস নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু শ্বেতজাতির বসবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। "শ্বেত-অস্ট্রেলীয় নীতি" সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই দুইটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, সামাজিক দিক হইতে অস্ট্রেলিয়ায় বাসেচ্ছু যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ তাহাদের সমাজ জীবনকে অস্ট্রেলীয় সমাজ জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে না পারিবে তাহাদিগকে, এবং দঃ ও পূঃ ইউরোপ এবং এশিয়ার কোন অধিবাসীকেই এই দেশে বসবাসের অধিকার দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে জীবনযাত্রার নিম্নমান-সম্পন্ন অধিবাসীরা এদেশে আসিলে অস্ট্রেলীয় জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইবে, এই কারণেও অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের এদেশে বসতিস্থাপনের অধিকার

নাই। বর্তমানে ইংরেজপ্রধান ইউরোপীয়গণই এখানকার অধিবাসী ও শাসনকর্তা। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমানের জীবনমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অস্ট্রেলিয়ার ২ কোটি পরিমিত লোকের বাসস্থানের সুবিধা রহিয়াছে।

১৯৫৪ সালের আদম সুমারী অনুসারে অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ, আয়তন ২,৯৭৪,৫৮১ বর্গমাইল; প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৩ জন। এই কারণে অস্ট্রেলিয়াকে পৃথিবীর সভ্যদেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবিরল দেশ বলা হয়। আঞ্চলিক জনসংখ্যার ঘনত্ব স্থানীয় বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, সেচকার্যের সুযোগ-সুবিধা, খনিজ দ্রব্যের বিদ্যমানতা, যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। যে অঞ্চলে কৃষিকার্যের সুবিধা, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও সমতল ভূপ্রকৃতি রহিয়াছে, সেই অঞ্চলে লোকবসতি ঘন হয়; আবার যে অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, অরণ্য-সংস্থান নিবিড়, জলবায়ু মনুষ্যবাসের প্রতিকূল, কৃষিকার্য ও শিল্প-বাণিজ্য অনুন্নত, সে অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হইয়া থাকে।

বহুবিস্তৃত অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। একমাত্র খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দঃ পঃ প্রান্তদেশ ব্যতীত পশ্চিমাংশের মালভূমি ও মধ্য-ভাগের অধিকাংশই শুষ্ক ও মরুপ্রায় হওয়ায় এই অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল*—প্রতি বর্গমাইলে ১ জনেরও কম। উত্তরের ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলসমূহ শ্বেতাঙ্গ-বসবাসের উপযোগী নহে। এই অঞ্চলে জন-সংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১ জন। কেবলমাত্র দঃ পূঃ ও দঃ পঃ প্রান্তে এবং পুব উপকূলাঞ্চলে লোকবসতি নিবিড়। কারণ—(১) অস্ট্রেলিয়ার দঃ পূঃ ও দঃ পঃ প্রান্তে বৃষ্টিপাত অধিক, উত্তাপ অল্প এবং জলবায়ু শ্বেতাঙ্গ-বসবাসের উপযোগী; (২) নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের পোর্ট জ্যাকসন নামক স্থানে সর্বপ্রথম শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের বসতিবিস্তার হয় এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া দঃ পূঃ উপকূলেই বসতি বিস্তার লাভ করে; (৩) দঃ পূঃ উপকূলের অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও ভিক্টোরিয়া প্রদেশে প্রথম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তী কালে এতদঞ্চলের নানাবিধ খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া বসতি গড়িয়া উঠে; (৪) দঃ পূঃ অংশ মেষপালনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেজন্য এ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন; (৫) সমগ্র দঃ পূঃ অংশে, বিশেষতঃ ভিক্টোরিয়া রাজ্যে কৃষিকার্যের অনুকূল জলবায়ু, মৃত্তিকা ও সেচব্যবস্থা বিদ্যমান

*অর্থনৈতিক সঙ্গতি হিসাবে অস্ট্রেলিয়াকে একজন বিখ্যাত ভৌগোলিক একটি কাল্পনিক রেখাদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই রেখাটি পঃ অস্ট্রেলিয়ার জেরাল্ডটন ও দঃ অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট অগাস্টা, নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্রোকেনহিল এবং তথা হইতে কার্পেন্টারিয়া উপসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। এই রেখার উত্তর-পশ্চিমাংশ শুষ্কমরু বা মরুপ্রায় এবং অনুন্নত অঞ্চল এবং ইহার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ বিশেষ সমৃদ্ধ।

থাকায় লোকবসতি নিবিড ; (৬) পূর্ব উপকূলাঞ্চলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান বন্দর ও রাজধানীসমূহ অবস্থিত, এই কারণে ঐ অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড় ; (৭) অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র অংশের মধ্যে পূর্বাংশেই রেলপথের প্রসার অধিক এবং লোকবসতিও ঘন ; (৮) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-সেবিত দঃ পঃ প্রান্তে অনুকূল জলবায়ু, কৃষিকাযের সুবিধা, খনিজ দ্রব্যের—বিশেষতঃ স্বর্ণের বিদ্যমানতা ও বনজ শিল্পের প্রসার হেতু লোকবসতি ঘন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার ৫১% ব্রিসবেন, সিডনী, মেলবোর্ন, এ্যাডিলেড, পার্থ, এবং হোবার্ট শহরেই বসবাস করে।

ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন (Distribution of population in India)—১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩৭২ (পরিবর্তন সাপেক্ষে) কোটি, আয়তন ১,২৬১,৪১১ বর্গমাইল (১৯৬২) এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে ৩৮৪ (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত)। কিন্তু বৃহৎ বিস্তৃত ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবত্র সমান নহে। রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরালায় প্রতি বর্গ মাইলে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক বাস করে—১১২৫ জন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে প্রতি বর্গ মাইলে লোকবসতি অতি অল্প—মাত্র ৫১ জন (অনুমিত)। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পঃ বঙ্গে যথাক্রমে গড় ঘনত্ব ৩৩২, ২৮৬, ৬৫০, ১৮৯, ৬৯১ ও ১০৩১। বসতি বণ্টনের তারতম্য অনুসারে ভারতকে নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গাঙ্গেয় সমভূমি, মালাবার ও কঙ্কণ উপকূলাঞ্চল, মাদ্রাজের উত্তরাংশ এবং উড়িষ্যার উপকূলভূমি নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল (বসতি-ঘনত্ব প্রায় ৬৬০)। (২) গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, এবং পূর্বপাঞ্জাবের সমভূমি—নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল (বসতি-ঘনত্ব প্রায় ২৬৬)। (৩) মরুঅঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, ছোট-নাগপুর এবং মধ্য ভারতের মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চলসমূহ বিরল বসতিযুক্ত (বসতি-ঘনত্ব প্রায় ১২৯)। নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিবিড় বা বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

নিবিড় লোকবসতির কারণ—ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত নিবিড়। ইহার কারণ—(১) কৃষিকাযের সুযোগসুবিধা ও উন্নতি—সমতল ভূপ্রকৃতি, পরিমিত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা ও জমির উর্বরা শক্তির উপর কৃষিশিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে কৃষিকার্যের এই সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। গাঙ্গেয় ভূমির পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে (৪৩১) এবং মাদ্রাজের (৬৭১) বদ্বীপাঞ্চল ও উড়িষ্যার (২৯২) সমতলভূমিতে বৃষ্টিপাত

অল্প। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। সেই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি ঘন, তবে গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতি অল্প। (২) খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য—খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলেও লোকবসতি নিবিড় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। (৩) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি—লোকসংখ্যার ঘনত্ব আঞ্চলিক শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করে। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হেতু বোম্বাই, আমেদাবাদ, আসানসোল এবং কলিকাতা অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র গ্রাম জামসেদপুর জনসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। (৪) সমতল ভূপ্রকৃতি—ভূপ্রকৃতি সমতল হইলে কৃষিকার্যের ও যানবাহন চলাচলের সুবিধা হয়। এই কারণে সমতল ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। গাঙ্গেয় সমভূমি এই কারণেই নিবিড় লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

ভারতের **গাঙ্গেয় সমভূমিতে** লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ইহার কারণ—(১) কৃষিকার্যের সুযোগসুবিধা ও উন্নতি—গাঙ্গেয় সমভূমি পলিগঠিত হওয়ায় মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত পরিমিত এবং কৃষিকার্যের উপযোগী। এই সমভূমি অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচনের সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। এই স্থানের ভূপ্রকৃতি সমতল। এই সমস্ত কারণে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই সমভূমিই ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি অঞ্চল। কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ খুব সহজ হওয়ায় এই অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত নিবিড়। আবার এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমতল হওয়ায় নদীসমূহ সুনাব্য এবং জলপথে পণ্য ও যাত্রী চলাচল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ অত্যন্ত সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ। (২) পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রচুর কয়লা এবং উহার সন্নিহিত অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে জলবিদ্যুতের উৎপাদনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। (৩) কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু এই অঞ্চল শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল শিল্প-সম্পদে উন্নত হওয়ায় এই সমস্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল অগণিত লোক এই অঞ্চলে বাস করে। (৪) বহু প্রাচীনকাল হইতে আর্যগণ এই সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, এবং সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন অঞ্চল। এই কারণেও এ অঞ্চলের লোকবসতি ঘন।

বিরল লোকবসতির কারণ—ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। ইহার কারণ—(১) বন্ধুর ভূপ্রকৃতি—বন্ধুর ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে কৃষিকার্য ও যানবাহন চলাচল সহজসাধ্য নহে। সেই কারণে ভারতের পার্বত্য

অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। হিমালয় ও কাশ্মীরের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অতি সামান্য। (২) নিবিড় অরণ্য—অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হয়। আসাম (২৫২) ও সুন্দরবন অরণ্যাকীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ঐ সমস্ত স্থানে লোকবসতি অল্প। (৩) স্বল্প বৃষ্টিপাত ও মরুপ্রায় জলবায়ু—রাজস্থান (১৫২), দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত অতিসামান্য এবং জলবায়ুও চরমভাবাপন্ন। সেই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অল্প। কিন্তু ভারতের মরুপ্রায় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে লোকবসতিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। (৪) কৃষিকার্যের অসুবিধা ও অনুন্নত অবস্থা—মধ্যপ্রদেশের ভূমি বন্ধুর ও অরণ্যাকীর্ণ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর, কিন্তু ভূমি তত উর্বর না হওয়ায় এবং এ অঞ্চলে অরণ্য ও পর্বতের জন্য কৃষিকার্যের সুবিধা না থাকায় লোকসংখ্যা অল্প। আবার অন্ধ্র (৩৩৯) ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে বৃষ্টিপাত অল্প এবং কৃত্রিম সেচব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগও অল্প। সেই কারণে এই সকল অংশে লোকবসতিও অল্প।
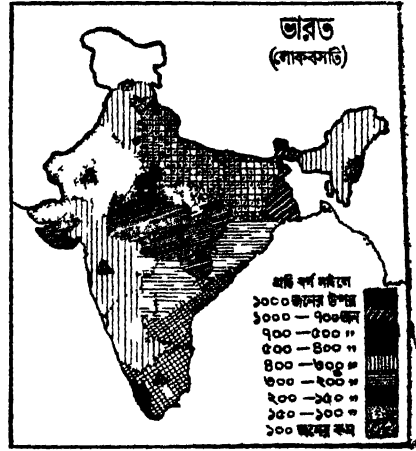
২৪নং চিত্র—ভারতের লোকবসতি

পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন (World Distribution of Population)—বসতিঘনত্বের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) **প্রায় বসতিহীন অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২ জনের অনধিক)—পৃথিবীর স্থলভাগের অর্ধাংশই পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব হেতু প্রায় বসতিহীন। চারিটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এই অঞ্চলসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। (ক) শীতল মেরুদেশীয় জলবায়ু প্রভাবিত সাইবেরিয়া, উঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উঃ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল এবং অ্যান্টার্কটিকা প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। শস্যোৎপাদন কালের স্বল্পতাহেতু এই সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিতান্তই অসম্ভব। আবার পশুপালনের উপযোগী চারণযোগ্য তৃণভূমিরও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই কারণে এই সমস্ত অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (খ) মরু ও মরুপ্রায় জলবায়ু সেবিত আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারী, এশিয়ার আরব, তুর্কীস্তান, পারস্যের অংশবিশেষ,

ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ ; অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটবেসিন ও পর্বতান্তর্গত মালভূমিসমূহ এবং দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা ও প্যাটাগোনিয়া প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (গ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা এবং নিউগিনি দ্বীপও প্রায় বসতিহীন। প্রবল বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত উত্তাপ, অনুর্বর মৃত্তিকা, নিবিড় বনভূমি ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এই সমস্ত অঞ্চলে বসতি বিস্তারের অন্তরায় স্বরূপ। (ঘ) পার্বত্য জলবায়ু সেবিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, শস্যোৎপাদন কালের স্বল্পতা ও বিরল বৃষ্টিপাত হেতু প্রায় বসতিহীন।

(২) **বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২-২৫ জন)—উঃ ও দঃ আমেরিকার বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহের মধ্যে 'প্রেয়রী' ও 'পম্পা' তৃণভূমি অঞ্চলসমূহই প্রধান। এই সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে সংঘবদ্ধভাবে চারণশিল্প ও কৃষিকার্য পরিচালিত হইতেছে। উঃ ইউরোপের শীতল ও বনাকীর্ণ অংশ এবং এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ পার্বত্য বা শুষ্ক অঞ্চলও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা হেতু বিরলবসতিযুক্ত। মালভূমি অংশে অবস্থান হেতু মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তবে, অনুরূপ অক্ষাংশে অবস্থিত আমাজনীয় নিম্নভূমি অঞ্চল অপেক্ষা এই স্থানের
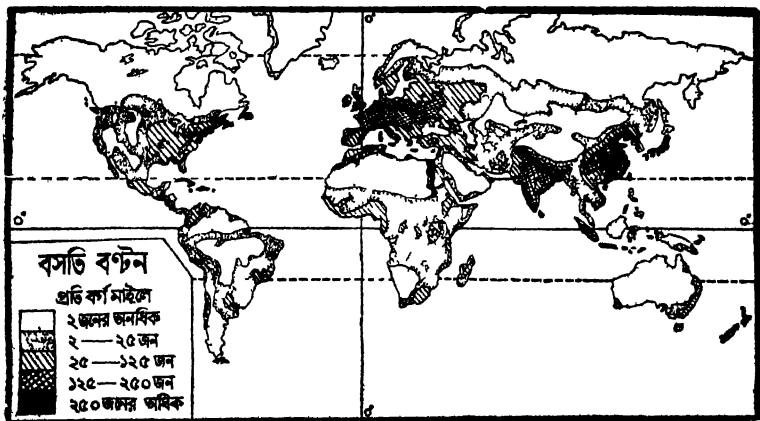
২৫ নং চিত্র—পৃথিবীর বসতি বণ্টন

লোকবসতি নিবিড়। ইউরোপ ও দঃ পূঃ এশিয়ার কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল, ক্রান্তীয় আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলসমূহেও লোকবসতি বিরল। তবে সন্নিহিত নিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মিটাইবার জন্য অনুরূপ অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা এই সমস্ত অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড়।

(৩) **নাতিনিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২৫-১২৫ জন)—দঃ পূঃ এশিয়ার অন্তর্গত ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চল; পশ্চিম এশিয়ার উপত্যকা ও মালভূমি অঞ্চলসমূহ; প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফিলিপিন, সুমাত্রা ও টিমোর দ্বীপ; ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-সেবিত দঃ ও পূঃ ইউরোপীর সমভূমির অন্তর্গত দঃ পঃ রুশিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, স্পেন ও ইতালী; সুইডেনের দক্ষিণার্ধ, উঃ আলজেরিয়া এবং মরক্কো প্রভৃতি দেশের বসতিঘনত্ব নাতিনিবিড। এই দেশগুলি মূলতঃ কৃষিপ্রধান; তবে ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ রপ্তানী করিয়া থাকে আবার কোন কোনটি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ এবং উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত ঈষৎ আন্দোলিত মালভূমি অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড। এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকার্য ব্যতীতও খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন, যন্ত্রশিল্প ও অন্যান্য নানাবিধ বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানের বিশেষতঃ উপকূল-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দঃ আমেরিকার সান্টোস্, বুয়েনশ আয়ার্স, ভ্যাল-প্যারাইজো, ক্যালাও ও ক্যারাকাস; আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, নাইজেরিয়া, ঘানা ও লাইবেরিয়া; অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, সিডনী ও মেলবোর্ন এবং নিউজীল্যাণ্ডের বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২৫-১২৫ জন।

(৪) **নিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ১২৫ জনের অধিক)—মৌসুমী ও চৈনিক জলবায়ু সেবিত দঃ পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, ব্রিটিশ জলবায়ু সেবিত উঃ পঃ ও মধ্য ইউরোপ এবং লরেন্সীয় জলবায়ু সেবিত উঃ পঃ যুক্তরাষ্ট্রের লোকবসতি অতিশয় নিবিড়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭% এই তিনটি অঞ্চলেই বসবাস করে।

দঃ পূঃ এশিয়াতেই পৃথিবীর অর্ধেক লোক বাস করে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ভারত (৩৮৪) ও চীনের (১৪০) নদী অববাহিকা ও উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল এবং জাপান (৫৩০) ও জাভাতেই (৯৪০) বসতিঘনত্ব নিবিড়তম। তবে এই অঞ্চলের দেশগত সামগ্রিক বসতিঘনত্বের সংখ্যাসমূহ ভ্রান্ত ধারণামূলক, কারণ এই দেশগুলির উর্বর ভূমিভাগের স্থানে স্থানে বসতিঘনত্ব ১০০০ জনেরও অধিক হইয়া থাকে।

উঃ পঃ ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিকে বসতিঘনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইংল্যাণ্ডের (৭৫০) স্থান হইয়া দাঁড়ায় সর্বপ্রথম। উহার পরে যথাক্রমে বেলজিয়াম (৭১১), নেদারল্যাণ্ড (৬৬১), জার্মানী (৪৩২), ইতালী (৩৭২), সুইজারল্যাণ্ড (২৬৭), ও ডেনমার্কের (২২৭) স্থান। অবশ্য পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী দেশের বসতিঘনত্বও প্রতি বর্গ মাইলে ২০০-৩০০ জনের মধ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের উঃ পূঃ অঞ্চলের অন্তর্গত বাল্টিমোর হইতে বোস্টন পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের বসতিঘনত্ব উঃ পঃ ইউরোপের ন্যায়। রোড আইল্যাণ্ড (৬১৪), নিউ জার্সি (৫৯০) এবং ম্যাসাচুসেট্স্ (৫৬১) অঞ্চলের বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ৫০০ জনেরও অধিক। নিউইয়র্ক হইতে শিকাগো পর্যন্ত বিস্তৃত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্ব উপরোক্ত অঞ্চলসমূহেরই অনুরূপ, তবে রাজ্যসমূহের সামগ্রিক বসতিঘনত্ব উহা অপেক্ষা অল্প (কনেকটিকাট ৩৯৫, নিউইয়র্ক ২৮৬, পেন্সিলভ্যানিয়া ২৩২, মেরীল্যাণ্ড ২০২, ওহিও ১৮৬ এবং ইলিনয় ১৪৯)।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান প্রধান অঞ্চল ব্যতীতও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও নিবিড় বসতিঘনত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বারমুডা (১,৭৫৯), বারবাডোস (১, ২৬৬), ও পেটোরিকো (৫৪৪) দ্বীপসমূহ; বৃহদায়তন শহরসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ, এবং নীলনদের অববাহিকার ন্যায় উর্বর, সেচসমন্বিত ও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিবিড় লোকবসতির কারণ (Causes of high density of population)—উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে নিবিড় লোকবসতির কারণগুলি আমরা নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করিতে পারি:—(১) অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ও পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য। দঃ পূঃ এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলির জনসমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ উহাদের অনুকূল জলবায়ুযুক্ত উর্বর মৃত্তিকার উপর। জাভার উর্বর আগ্নেয় মৃত্তিকা, উষ্ণ জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এই দেশটিকে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং অববাহিকা এবং ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অতিশয় উর্বর এবং জলবায়ু কৃষিকার্য ও মনুষ্যবাসের অনুকূল হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চল নিবিড় বসতিপূর্ণ। জাপানে লোকবসতি নিবিড় হইবার কারণ দেশটির নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা এবং শিল্পসমৃদ্ধি। এই দেশগুলি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এতদঞ্চলে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন অতি সামান্য এবং ইহাদের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও নাম মাত্র।

উঃ পঃ ইউরোপের জনবহুল দেশসমূহের জলবায়ু ও মৃত্তিকা কৃষিকার্যের

পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, যন্ত্রশিল্প সংগঠনের সুযোগ সুবিধা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই দেশগুলির অনুকূল অবস্থান ও স্বাভাবিক বন্দরের প্রাচুর্য এই সমস্ত দেশের জনসমৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় বসতিঘনত্ব প্রধানতঃ এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ, শিল্প সংগঠনের সুযোগ সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অঞ্চলটির অনুকূল অবস্থান ও উর্বর কৃষিভূমির উপর নির্ভরশীল।

(২) অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। উন্নত শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মমত, রাষ্ট্ররূপ প্রভৃতি অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্র ও পঃ ইউরোপের দেশসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া পার্থিব সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চল নিবিড় বসতিপূর্ণ। তবে সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত প্রধান প্রধান উপাদান এতদঞ্চলে নিবিড় বসতিঘনত্বের সহায়তা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—(ক) যন্ত্রশিল্পে উন্নতি কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ ও প্রসারহেতু উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্র ও উঃ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অংশ জনসমৃদ্ধ (খ) উঃ পূঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রে এবং ঐ সমস্ত দেশ কর্তৃক শাসিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহেও উন্নত জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারহেতু মৃত্যুহারের স্বল্পতা ও তজ্জনিত জনসংখ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। (গ) উঃ পঃ ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে বাহিরাগত আয়ের পরিমাণ অধিক হওয়ায় এবং এইরূপ আয়ের সাহায্যে দেশগত বর্ধিত জনসাধারণের চাহিদা মিটান সম্ভব বলিয়া এই সমস্ত দেশে জনসংখ্যার চাপও অধিক। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে পঃ ইউরোপের দেশগুলির ক্ষেত্রে এইরূপ আয়ের উৎস বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উহা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। (ঘ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার হেতু গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে জনসংখ্যার চাপ অধিক। কারণ উপনিবেশসমূহ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানীর দ্বারা মূল দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটান সম্ভব। তবে, সম্প্রতি এই সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া নিবিড় বসতিপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জীবনযাত্রার মানও নিম্নমুখী হইতে চলিয়াছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Trend of World Population growth) :—১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৫৫ কোটি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় (এশিয়ায় ৩৩ কোটি, ইউরোপে ১০ কোটি, আফ্রিকায় ১০ কোটি, এবং অন্যান্য স্থানে ২ কোটি)। পরবর্তী কালে পৃথিবীর জনসংখ্যা

বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১৮০০ সালে ৯০ কোটি ; ১৯০০ সালে ১৬০ কোটি এবং ১৯৫০ সালে কিঞ্চিদধিক ২৪০ কোটিতে দাঁড়ায়।

পৃথিবীর জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলীর মতে ১৯২০ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা গড়ে বার্ষিক ১'১৫% হারে (বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোট ২'৫ কোটি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের (FAO) মতে ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা গড়ে বার্ষিক ০'৮৫% হারে (বার্ষিক জনসংখ্যা-বৃদ্ধি মোট ১'৮৫ কোটি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সামগ্রিক বিচারে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে বিভিন্ন প্রকার।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে টাসমানিয়া এবং ওশিয়ানিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত বহু দ্বীপের জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং শিল্পপ্রধান উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলির যেরূপ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল হইতে চলিয়াছে। অপর পক্ষে দঃ ইউরোপের দেশসমূহ, রুশিয়া, উঃ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা অল্প হারে এবং দঃ পূঃ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার অংশবিশেষের জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি

মহাদেশ	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)			গড় বার্ষিক বৃদ্ধি (১৯০০-৪০) শতকরা
	১৮০০	১৯০০	১৯৪০	
ইউরোপ	১৯'০	৪০'১	৫৭'৫(১)	.'১
উঃ আমেরিকা	০'৬	৮'১	১৪ ৩	১ ৯
মধ্য ও দঃ আমেরিকা	১ ৯	৬'৩	১৩ ০	২ ৭
ওশিয়ানিয়া	০ ২	০'৬	.'১	২ ১
আফ্রিকা	৯'০	১২'০	১৫'৮	০'৮
এশিয়া	৬০'০	৯৩'৭	১১৫ ২৩	০ ৬
মোট	৯০'৭	১০'৮	২১৭'৪	০'৯

(১) সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সমেত

জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিভিন্ন হারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা নিম্নরূপে নির্দেশ করিতে পারি—

বিভিন্ন বৃদ্ধির হারে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)						
সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার					
	০·২৫% (১)	০·৫০% (২)	০·৭৫% (৩)	১·০০% (৪)	১·২৫% (৫)	১·৫০% (৬)
১৯৭৫	২৫০·১	২৬৬·২	২৮৩·১	৩০১·৪	৩১৯·৮	৩৪১·০
২০০০	২৬৬·২	৩০১·৬	৩৪১·৪	৩৮৬·৫	৪১৬·৩	৪৯৪·৭
৫০০০	৪৭৬·৯ $\times$ ১০^{৩}	৯৪৯·৬ $\times$ ১০^{৬}	১৮২·৬ $\times$ ১০^{১০}	৩৫৫·৮ $\times$ ১০^{১৩}	৩২৮·৯ $\times$ ১০^{১৫}	১২৩·৭ $\times$ ১০^{২০}

(১) উল্লেখযোগ্য কোন দেশেরই বৃদ্ধিহার এত অল্প নহে।

(২) ব্রিটেন ও উঃ পঃ ইউরোপীয় দেশসমূহের বৃদ্ধির হার (১৯২১-৫১)।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধিহার (১৯৩০-৪০) অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক এবং FAO কর্তৃক অনুমিত পৃথিবীর বৃদ্ধিহার অপেক্ষা ঈষদল্প।

(৪) ক্যানাডার (১৯৩১-৪০) ও অস্ট্রেলিয়ার (১৯৩৩-৪৭) বৃদ্ধিহার।

(৫) ডাঃ হাক্সলী কর্তৃক অনুমিত পৃথিবীর (১৯০০-৪০) এবং রুশিয়ার (১৯২৬-৩৯) বৃদ্ধিহার।

(৬) দক্ষিণ আমেরিকার বৃদ্ধিহার অপেক্ষা অল্প ও ভারতের বৃদ্ধিহার অপেক্ষা অধিক।

অতিজনাকীর্ণতা (Over-population)—কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের অধিবাসীরা মিলিতভাবে তাহাদের আয়ত্তাধীন সমকালীন কর্মদক্ষতা ঐ দেশের সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিয়াও যদি তাহাদের জীবনযাত্রার মান সম্যকরূপে উন্নত করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে সেই সময়ে সেই দেশকে অতিজনাকীর্ণ (over-populated) বলা যাইতে পারে। 'অতিজনাকীর্ণতা'—এই সংজ্ঞাটি সময়ানুগ বলিয়া স্থিতিশীল নহে, নিয়তই গতিশীল।

খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেনেট এইরূপ অনুমান করেন যে একটি সাধারণ জীবনমান রক্ষার পক্ষে মাথাপ্রতি ২·৫ একর পরিমিত সাধারণ উর্বরতা সম্পন্ন কৃষিজমিতে উৎপাদিত মোট খাদ্য সামগ্রীর বার্ষিক ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ৬০% ই মনুষ্যবাসের পক্ষে অযোগ্য (অ্যান্টার্কটিকা ও চিরতুষারাবৃত অঞ্চলসমূহ ২০%, উষ্ণ মরু অঞ্চলসমূহ ২০% এবং অতিশয় বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলসমূহ ২০%)। অবশিষ্ট ৪০% স্থলভাগের মধ্যেও বর্ষণবহুল ও অনুর্বর মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ড বাবদ ১০% বাদ দিলে মনুষ্যবাসের উপযোগী ভূমিভাগের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩০%—১·৭ কোটি বর্গমাইল, অথবা প্রতি বর্গমাইল ৬৪০ একর হিসাবে প্রায় ১১০০ কোটি একর জমি। তবে ইহার মধ্যে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৩০০।৪০০ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমি কিঞ্চিদধিক ২৪০ কোটি লোকের অধিকারে রহিয়াছে—অর্থাৎ মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ২ একর অপেক্ষাও অল্প। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সামগ্রিকভাবে আমাদের পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ। তবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর কতকগুলি দেশ জনবিরল আর কতক-

গুলি দেশ অতি জনাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ব্যতীত পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ২.৫ একর বা ততোধিক। এই দেশগুলির খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন উদ্বৃত্তপ্রদায়ী। সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ব্যতীত পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ১—২.৫ একর। মিশ্রখাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থার প্রচলন হেতু এই দেশগুলিও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, পঃ জার্মানী প্রভৃতি দেশে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ১ একর। এই দেশগুলিও মোটামুটিভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করিয়া থাকে। ইউরোপের অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড; এশিয়ার অন্তগত ভারত, চীন, জাপান ও দঃ পূঃ এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল এবং আফ্রিকার অন্তর্গত মিশব দেশে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ১ একর অপেক্ষাও অল্প। এশিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরাই অত্যন্ত নিম্নজীবনযানসম্পন্ন তবে শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপীয় দেশসমূহে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ১ একরের অল্প হইলেও এই দেশগুলি নানা উপায়ে খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া নিজ-দেশের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে।

অতিজনাকীর্ণতার সমাধান (Remedies for over-population): —অতিজনাকীর্ণতার সমাধান কল্পে দুই প্রকার ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।—(১) দেশগত আভ্যন্তরীণ সম্পদের অধিকতর ও উন্নততর ব্যবহার —এতদুদ্দেশ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথার কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের অন্তর্গত খাদ্য ও কৃষিদপ্তর (FAO) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাহাতে উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তাহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। আশা করা যায় যে বিশ্বের খাদ্যোৎ-পাদন অদূর ভবিষ্যতেই বৃদ্ধি পাইবে। দেশগত শিল্প সংগঠনের দ্বারা জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী করিয়াও অতিজনাকীর্ণতার সমাধান হইতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান তাহাদের অতিজনাকীর্ণতা এই ভাবেই সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তবে, একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশগত শিল্পায়নের প্রথম অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় দেশসমূহ এই স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভারত ও চীনের নূতন শিল্প প্রেরণা দেশগত জনসংখ্যার অধিকতর বৃদ্ধির সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়।

(২) জনসংখ্যার ক্ষীণায়ন—ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে সাধন করা যাইতে পারে—(ক) বিরলবসতিযুক্ত দেশসমূহে অভিবাসন (immigration) দ্বারা সাময়িকভাবে দেশগত বসতিঘনত্বের হ্রাস করান যাইতে পারে। তবে

বর্তমান কালে অভিবাসনের প্রসার ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। নানারূপ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণবশতঃ পৃথিবীর জনবিরল দেশসমূহ অন্য দেশ হইতে আগত অভিবাসকদের (immigrants) গ্রহণ করিতে ক্রমেই অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। (খ) নিম্ন জীবনমান প্রবর্তনের দ্বারাও দেশগত জনাকীর্ণতা হ্রাস করান যাইতে পারে, তবে, দারিদ্র্য, অনাহার ও দুর্দশাই এরূপ সমাধানের শেষ পরিণতি। (গ) পরিবার পরিমিতায়ন ব্যবস্থার দ্বারাও দেশগত জনাকীর্ণতার সমাধান করা যাইতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নিবিড় বসতিপূর্ণ দেশগুলিতে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যুর হার প্রায় সমান হওয়ায় এই সমস্ত দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধিও প্রায় স্থগিত রহিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব যুক্তরাষ্ট্রেও জন্ম ও মৃত্যুর হার প্রায় সমান ছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন জন্ম ও মৃত্যুর হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে রুশিয়ার জন্মহার বিশেষভাবে হ্রাস পায়। প্রাচ্যের জনবহুল দেশগুলিতে জন্মহারের নিয়ন্ত্রণ যে আঞ্চলিক ও সামগ্রিকভাবে মঙ্গলের সূচনা করিবে তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

প্রশ্নোত্তর

1 Give an account of the fact rs determining the world distribution of population.

(পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণসমূহ লিখ।)

(পৃঃ ৯২-৯৩)

2. Where do the great masses of population live in the world? How do you account for their concentration?

(পৃথিবীর কোন্ কোন অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব নিবিড়? ঐ সমস্ত অঞ্চলে নিবিড় বসতির কারণসমূহ লিখ।) (পৃঃ ৯৯-১০১)

3. Give an account of the distribution of population in Australia. (C. U '51)

(অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বণ্টন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৯৩-৯৫)

4. Account for the irregular distribution of population in India. (C. U. '50, '51)

(ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বণ্টনের বিভিন্নতার কারণসমূহ লিখ।) (পৃঃ ৯৫-৯৭)

5. Give an account of the world distribution of population

(পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন প্রসঙ্গে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৯৭-১০০)

6. What is over-population? Do you consider the world to be over-populated? If so, give reasons and suggest remedies for over-population.

(অতিজনাকীর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? বর্তমান পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ কিনা,—এ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া লিখ। পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ হইয়া থাকিলে ইহার সমাধান-সমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১০৩-১০৫)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাথমিক উৎপাদন

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষিকার্য

অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন-ক্ষেত্রের চারিটি অংশের মধ্যে (প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য) প্রাথমিক উৎপাদনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাথমিক উৎপাদন আবার পাঁচ প্রকারের হইতে পারে— কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন, বনজ দ্রব্যের উৎপাদন এবং শিকার-বৃত্তি হইতে উৎপাদন। পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কাঁচামাল এবং জনসাধারণের ভোগে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনের সাহায্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাথমিক উৎপাদন বন্ধ হইলে পৃথিবীর সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপও বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রাথমিক উৎপাদনের পাঁচটি বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনই হইল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আজও মানুষের বৈষয়িক জীবনের ভিত্তি হইতেছে কৃষিকার্য (farming)। এই কাজ প্রধানতঃ দুই রকমের— (ক) শস্যাদি (crop farming) ও ফলমূলের (fruit farming) চাষ বা ভূমিকৃষি (agriculture) এবং (খ) পশুপালন (pastoral farming)।

কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব (Influence of environment on agriculture)—নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির উপর কৃষিকার্য বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে —

(১) **উত্তাপ**—গ্রীষ্মকালেই অধিকাংশ শস্যের জন্ম ও বৃদ্ধি হয় বলিয়া দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল শস্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সমস্ত অঞ্চলের গ্রীষ্ম কালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ ৫০° ফাঃ-এর অনধিক সেই সমস্ত অঞ্চলে কোন প্রকার কৃষিকার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তবে উচ্চতর অক্ষাংশে দিনমান দীর্ঘ হওয়ায় অল্প উত্তাপেও কৃষিকার্য চলিয়া থাকে।

(২) **বৃষ্টিপাত**—কৃষিকার্যের জন্য মৃত্তিকার পরিমিত আর্দ্রতা আঞ্চলিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। যে অঞ্চলে বাষ্পীভবন অধিক এবং

আবহাওয়া শুষ্ক, সে অঞ্চলে শস্য উৎপাদনের জন্য অন্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ১০" এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে ২০"-র অনধিক বৃষ্টিপাত হইলে শস্য উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হয় না। ঐরূপ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য অনুসারে কৃষিকার্যের নিম্নরূপ প্রকারভেদ ঘটিয়া থাকে। (ক) যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৩০" বা তদূর্ধ্ব সে সমস্ত অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে কৃষিকার্য চলিয়া থাকে। এই কৃষিপ্রথাকে **আর্দ্র কৃষি** (humid farming) বলা হয়। (খ) যে সমস্ত অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টি হয় না, জলসেচন করিয়া কৃষিকার্য করিতে হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলের কৃষির প্রণালীকে **সেচন কৃষি** (irrigation farming) বলে। (গ) যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২০"-র অনধিক, এবং কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধা নাই সেই সমস্ত অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাতের সাহায্যে কিছু কিছু কৃষিকার্য চলে। এই প্রণালীর কৃষিকে **শুষ্ক কৃষি** (dry farming) বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের অপরিমিত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়।

[শুষ্ক কৃষি প্রণালী অনুসারে কৃষিক্ষেত্র বৃষ্টিপাতের পূর্বে গভীরভাবে কর্ষণ করা হয় এবং প্রতি পশলা বৃষ্টির পরই ক্ষেত্র হইতে জলের বাষ্পীভবন নিবারণের জন্য সূক্ষ্ম ধূলিচূর্ণ (mulch) দ্বারা ক্ষেত্রকে আবৃত করা হয়। এইরূপ কয়েক পশলা বৃষ্টির পর ক্ষেত্র আর্দ্র হইলে ক্ষেত্রের আগাছা নষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের ফসল, যথা—গম, ভুট্টা, যই যব রাই প্রভৃতির চাষ করা হয়। আর্দ্র ও সেচন কৃষি অপেক্ষা শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থায় উৎপন্ন পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক এবং পরিমাণ কম হয়।]

(৩) **মৃত্তিকা**—কৃষিকার্যের উপযোগী জমির মূল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ মৃত্তিকা ও বৃষ্টিপাতের উপর। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে (২য় অধ্যায়—মৃত্তিকা দেখ) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকার গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং সকল মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিও সমান নহে কৃষিকার্য সম্পর্কিত আলোচনায় সেই কারণে মৃত্তিকা সম্বন্ধেও বিচার করা প্রয়োজন।

(৪) **ভূ-প্রকৃতি**—ভূ প্রকৃতি কৃষিকার্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমভূমি অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে ইহা সম্ভব নহে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়পর্বতের গায়ে থাক কাটিয়া কাটিয়া ক্ষেত তৈয়ারী করা হয় এবং উহাতে অতি সামান্য পরিমাণে কৃষিকার্য চলিয়া থাকে।

এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত কয়েকটি **অর্থনৈতিক অবস্থার** উপরও কৃষিকার্যের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। জনসংখ্যা বণ্টন, শ্রমিক

সরবরাহ, শ্রমিকের বুদ্ধি ও কর্মনৈপুণ্য, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা, পণ্য পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের সান্নিধ্য বা দূরবর্তিতা প্রভৃতি অবস্থাগুলির উপরও কৃষিকার্য নির্ভর করিয়া থাকে।

কৃষি-প্রণালী (Systems of agriculture)—পরিবেশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী অনুসৃত হয়। (১) আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকার, উঃ পূঃ ভারতের পার্বত্য অংশের এবং মধ্য এশিয়ার অংশবিশেষের নিম্ন জীবনমানসম্পন্ন আদিম অধিবাসীরা কেবলমাত্র নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্যই যে কৃষিপ্রথা অবলম্বন করে তাহাকে **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপ্রণালী** (self-sufficient agriculture) বলে। (২) কোন কোন দেশের ভূমিভাগ হইতে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন করা হয়। এই কৃষিপ্রণালীকে **এক-ফসলী চাষ** (one crop agriculture) বলে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে **আবাদী** (plantation) প্রথায়* যে কৃষিকার্য পরিচালিত হয় তাহা প্রায়শঃই এক-ফসলী হইয়া থাকে। চা, কফি, রবার, ইক্ষু, তামাক, কলা, আনারস প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যগুলি প্রধানতঃ আবাদী প্রথাতেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবাদী প্রথায় চাষ করিলে ফসল উচ্চস্তরের হয় এবং একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রথা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এক-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থার বিশেষ **সুবিধা** এই যে ইহা অল্পব্যয় ও শ্রমসাধ্য এবং উৎপাদিত ফসল সংশ্লিষ্ট শিল্প-সংগঠনের সহায়ক। তবে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের অনিশ্চয়তা নূতন নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব, পরিবর্ত-সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ফসল নষ্ট হইয়া গেলে দেশের আর্থিক দৈন্য, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ রপ্তানীর অসুবিধা প্রভৃতি এই প্রথার বিশেষ বিশেষ **অন্তরায়**। ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রথা বিদ্যমান। (৩) এক-ফসলী চাষের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমানে পঃ ও মধ্য ইউরোপ, রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের কৃষিকে **বহুমুখী কৃষিতে** (diversified agriculture) পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ কৃষি ব্যবস্থায় দেশে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয় এবং রাজনৈতিক গোলযোগ ও আর্থিক মন্দা সমস্ত কৃষিব্যবস্থাকে একত্রে বিপর্যস্ত

* সংকীর্ণ-অর্থে আবাদী প্রথায় কৃষিকার্য বলিতে বৈদেশিক মূলধন, নিপুণ শ্রমিক এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৈদেশিক শিল্পপতিগণ যে কৃষিপ্রথা পরিচালনা করেন তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্যে ইউরোপীয় শিল্পপতিগণ কর্তৃক আসাম ও পশ্চিম বঙ্গে বিদেশে রপ্তানীর জন্য যে চা উৎপাদিত হয় তাহাকে আবাদী ফসল (plantation crop) বলা হয়; কিন্তু অনুরূপক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পপতিগণ কর্তৃক স্থানীয় শ্রমিকের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য যে চা উৎপাদিত হয় তাহাকে বাগিচা ফসল (garden crop) বলা হইয়া থাকে।

করিতে পারে না। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশসমূহে **মিশ্রকৃষি** প্রথা (mixed farming) প্রবর্তিত হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে কৃষিক্ষেত্রের এক অংশে পশুপালন এবং অবশিষ্টাংশে চাষ আবাদ হয়। মিশ্রকৃষি প্রথায় কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সম্বৎসর ব্যবহার, স্বাভাবিক শস্যাবর্তন, অল্পব্যয়ে পর্যাপ্ত উৎপাদন প্রভৃতি **সুবিধা** দর্শে। তবে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, উন্নত ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ না থাকিলে এই প্রথা অবলম্বিত হয় না।

কর্ষণযোগ্য ভূমির সরবরাহ ও কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার তারতম্য অনুসারে কৃষিকার্যের নিম্নরূপ প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়—(১) ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে অধিবাসীর তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ অধিক এবং যে-সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অল্প, ভূমিভাগ সাধারণতঃ অনুর্বর জলবায়ু কৃষিকার্যের প্রতিকূল, যানবাহন ব্যবস্থাও উন্নত নহে সেই সমস্ত স্থানে শ্রম ও পুঁজি ব্যাপকভাবে ব্যবহার না করিয়াই বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে চাষ করা হয়। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে **ভূমিপ্রধান** বা **ব্যাপক কৃষি** (extensive cultivation) বলে। (২) পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, চীন প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সামান্য এবং যে সমস্ত দেশে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত অধিক, যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত, ভূমিভাগ উর্বর, এবং অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলসমূহের সহিত প্রতিযোগিতাও তীব্র সেই সমস্ত অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য একই ক্ষেত্রে বারংবার প্রচুর অর্থ ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এই প্রকার কৃষিকে **শ্রম ও পুঁজিপ্রধান** বা **সযত্ন কৃষি** (intensive cultivation) বলা হয়।

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য (Features of Indian agriculture)— ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে সমগ্র অধিবাসীদের ৭০% প্রত্যক্ষভাবে এবং ২০% পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি হইতেই উপার্জিত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩২·৩৬ কোটি একর—মাথাপ্রতি ১ একরেরও কম। কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ভারতীয় কৃষি-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত **অনুন্নত**। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমির বিভক্তীকরণ ও বিক্ষিপ্ত বণ্টন, কৃষিক্ষেত্রে সারের অব্যবহার, জমির উর্বরা শক্তির হ্রাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে শস্যোৎপাদন এবং যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অভাব, কৃষিকার্যে নিযুক্ত গবাদি পশুর হীনস্বাস্থ্য, পশুখাদ্য হিসাবে

কোন ফসল উৎপাদন করার বিধিসম্মত প্রচেষ্টার অভাব, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে চাষীদের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি চাষীদের নিরক্ষরতা ও

ভারতের ভূমিব্যবহার [কোটি একরে]

	১৯৫০-৫১	১৯৫৮-৫৯*
মোট আয়তন	৮০'৬৩	৮০ ৬৩
সংখ্যা সরবরাহক অঞ্চলসমূহের আয়তন	৭০'২৫	৭২ ৪১
বনভূমি	১০'০০	১২ ৮১
কৃষির অনুপযুক্ত		
(১) অন্য কার্যে ব্যবহৃত	২ ৭৭	৩'১৫
(২) ঊষর জমি	৮ ৯৭	৮'২১
মোট	১১ ৭৪	১১ ৫৬
পতিত ব্যতীত অনাবাদী জমি		
(১) চারণ ভূমি	১ ৬৫	৩ ১৪
(২) ফলবৃক্ষ সমন্বিত জমি	৪'৯০	১ ৪২
(৩) কর্ষণযোগ্য	৫ ৬৭	৫'০৮
মোট	১১ ২২	৯ ৭৪
পতিত জমি		
(১) চলতি	২ ৬৪	২ ৯৪
(২) অন্যান্য	৪ ৩১	৩'০০
মোট	৬ ৯৫	৫ ৯৪
নীট কৃষি জমি	২৯ ৩৪	৩২ ৩৬
মোট আবাদী জমি	৩২ ৫৯	৩৭ ২০
একাধিকবার ফসল উৎপাদক জমি	৩ ১৫	৪'৮৬

দারিদ্র্য ভারতীয় কৃষিশিল্পের প্রসার ও উন্নতির অন্তরায়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষিশিল্পের অনুন্নতির দরুণ ভারতে একরপ্রতি ফসল উৎপাদনের হার পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশ অপেক্ষা অল্প।

ভারতের কৃষিকার্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা জীবিকা অর্জনের একটি উপায় মাত্র। খাদ্যশস্যের উৎপাদন করাই ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রধান কার্য। কৃষিকার্যে প্রযুক্ত ভূমিভাগের প্রায় ৮৬% অংশেই খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় এবং মাত্র ১৬% অংশে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। মোট কৃষিভূমির ৮৬% অংশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও ভারত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিষয়ে স্বাবলম্বী নহে। প্রতি বৎসর ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তাহাতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮৮% অংশের চাহিদা মিটান সম্ভব। তথাপি কৃষিজ প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার

* পরিবর্তন সাপেক্ষ

করে। ইক্ষু, লাক্ষা, চা ও বাদাম উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম এবং ধান, পাট, রেড়ী, কার্পাস, তিল, তিসি, জোয়ার ও বাজরা উৎপাদনে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে।

ফসলের ঋতু (Crop season)—ভারতের উৎপন্ন শস্যকে খারিফ ও রবি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বর্ষার প্রারম্ভে বীজবপন করিয়া হেমন্তকালে যে শস্য সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **খারিফ শস্য** বলে। ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, পাট, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, বাদাম, রেড়ি, তিল প্রভৃতি খারিফ শস্য। শীতের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া যে শস্য গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **রবি শস্য** বলে। গম, যব, মটর, ছোলা, সরিষা, অতসী প্রভৃতি রবি শস্য।

কৃষি পদ্ধতি (Types of cultivation)—জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, ও জনসংখ্যার তারতম্য হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। ৮০"-র অধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে **আর্দ্র কৃষি** প্রথায় ধান, পাট, চা ও ইক্ষুর চাষ হয়, ৪০'-৮০" পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলসমূহে **অনার্দ্র কৃষি** প্রথায় কার্পাস, গম, ভুট্টা ও তৈলবীজ জন্মে ; ২০"-৪০ পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল-সমূহে **সেচন কৃষি** প্রথায় কার্পাস, গম, ইক্ষু ও ভুট্টার চাষ হয় এবং ২০"-র অনধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে **শুষ্ক কৃষি** প্রথায় জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতি শস্যের চাষ হইয়া থাকে।

কৃষি অঞ্চল (Agricultural regions)—মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশই ভারতের **কৃষি-প্রধান অঞ্চল**। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও গভীর অরণ্য হেতু আসামে ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, মরু প্রকৃতির জলবায়ু হেতু রাজস্থানে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হেতু উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে এবং অনুর্বর মৃত্তিকা হেতু পূর্ব মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে কৃষিকার্য এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা (Irrigation system of India)—উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং পুষ্টিসাধনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন করা প্রয়োজন। কারণ মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ বিশীর্ণ সীমা (wilting point) অপেক্ষা অল্প হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, আবার জলের পরিমাণ ক্ষেত্রসীমার (field capacity) অধিক হইলে উহা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থান ও কালের দিক হইতে অনিশ্চিত বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলসেচন ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষির একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Irrigation)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের বৃষ্টিপাত নানা দিক দিয়াই ত্রুটি-

বহুল। যেমন—(১) ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টি হয় না। রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। আবার আসাম, পঃ উপকূল প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক, (২) এদেশে কেবলমাত্র বর্ষাকালেই অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়, শীতকাল সাধারণতঃ শুষ্ক। শীতকালীন রবিশস্য উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন, (৩) ভারতে কোন কোন বৎসর প্রচুর, আবার কোন কোন বৎসর অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার কখনো কখনো দীর্ঘকাল ধরিয়া অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিও দেখা যায়। এই সকল কারণে কৃষিকার্যের জন্য কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। জলসেচের দ্বারা শস্যক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয়; (৪) ধান, ইক্ষু প্রভৃতি কতকগুলি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের কয়েকটি স্থান ব্যতীত অন্যত্র নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় না। সেই কারণে কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এবং (৫) জলসেচের সাহায্যে শস্য উৎপাদনের হার বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায়।

সেচ-ব্যবস্থার প্রাকৃতিক সুবিধা (Geographical advantages for irrigation)—ভারতের কতকগুলি ভৌগোলিক সুবিধা থাকার ফলে সেচব্যবস্থা এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, যেরূপ—(১) উত্তর ভারতের নদীসমূহ গলিত তুষার ও বৃষ্টির জলের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় বার মাসই জলপূর্ণ থাকে। ইহাদের জল সেচকার্যের জন্য সম্বৎসরই ব্যবহার করা চলে। (২) ভারতের সমভূমি অঞ্চলসমূহ স্বভাবতই ঢালু বলিয়া খাল-নালা প্রভৃতির খননকার্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। (৩) আবার, ভূত্বক পলিগঠিত হওয়ায় বৃষ্টির জল সমভূমি অঞ্চলের পলিস্তর চুয়াইয়া অভ্যন্তরের কদমাক্ত স্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে কূপ খনন করিয়া সঞ্চিত জল সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। এই সকল সুবিধাহেতু কৃত্রিম সেচব্যবস্থার অনুশীলনে ভারতের ন্যায় দ্বিতীয় কোন দেশ পৃথিবীতে আর নাই বলিলেই চলে।

জলসেচ পদ্ধতি (Methods of irrigation)—ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানা বিষয়ের পার্থক্য হেতু ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচপদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই দেশে সাধারণতঃ চারি উপায়ে সেচকার্য চলে—(১) কূপ, (২) পুষ্করিণী, (৩) খাল ও (৪) ডোঙ্গা।

(১) **কূপ**—সেচকার্যে কূপের ব্যবহার ভারতের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ, কূপ খনন অন্যান্য সেচব্যবস্থা অপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের ভূত্বক কূপ খননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। উত্তরপ্রদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কাশী ও দিল্লীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, দক্ষিণ-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কূপের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানেও কূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থার প্রচলন দেখা

যায়। কিন্তু কূপের সাহায্যে সেচকার্যের কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। (১) কূপের জল দ্বারা বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে জলসেচ করা কঠিন; (২) কূপের জল লবণাক্ত হইলে শস্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়, (৩) গ্রীষ্মকালে বহু অগভীর কূপ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং (৪) একই কূপ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া জল তুলিলে কূপেব জল কমিয়া যায়। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে যথাক্রমে ভারতের মোট ১৪৭ ও ১৬৭ লক্ষ একর পবিমিত কৃষিজমি কূপের সাহায্যে জলসিক্ত হয়। বর্তমানে বহুস্থানে বিদ্যুচ্চালিত নলকূলের সাহায্যে জমিতে জলসেচ কবিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫০-১৯৫১ সালে বিহার ও উত্তর প্রদেশে এইরূপ প্রায় ২৫০০ নলকূপ ছিল।

(২) **পুষ্করিণী**—প্রধানতঃ মাদ্রাজ, মহীশূব, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রের বৃষ্টিবিবল স্থানে এবং বিহার ও উড়িষ্যাব স্থানে স্থানে জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচ কবা হয়। তবে পুষ্কবিণীর সাহায্যে জলসেচেব দুইটি প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে: (ক) গ্রীষ্মকালে বা অনাবৃষ্টি হইলে জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, এবং (খ) প্রতি বৎসবই এইগুলিব সংস্কাব না কবিলে এগুলি মজিয়া যায়। ১৯৫০ ৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে যথাক্রমে ভাবতেব মোট ৮৮ ও ১০৯ লক্ষ একর কৃষিজমি পুষ্কবিণীব সাহায্যে জলসিক্ত হয়।

(৩) **খাল**—নদী হইতে প্রসাবিত খালেব সাহায্যে জলসেচেব ব্যবস্থা এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে সবকারী খালের সাহায্যে যথাক্রমে ১৭৯ ও ১৯৮ লক্ষ একর এবং বেসবকারী খালেব সাহায্যে যথাক্রমে ২৮ ও ৩৪ লক্ষ একব কৃষিজমি জলসিঞ্চিত হয়। নদী-খালসমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা চলে; যথা—(ক) **প্লাবন খাল**—ইহারা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয় এবং বর্ষার শেষে শুষ্ক হইয়া যায়। শীতকালে প্লাবন খালেব সাহায্যে সেচকার্য চলে না। (খ) **নিত্যবহ** বা **স্থায়ী খাল**—এই সমস্ত খালে সারা বৎসবই জলপ্রবাহ থাকে। **পাঞ্জাবেব** শিরহিন্দ, উত্তব বারি-দোয়াব ও পশ্চিম যমুনা খাল; **উত্তর প্রদেশেব** পূর্ব যমুনা, গঙ্গা, সর্দা ও আগ্রাব খাল; **মাদ্রাজ** ও **মহীশূরের** পেরিয়ার, কাবেরী, মেতুর ও বাকিংহাম খাল; **পশ্চিমবঙ্গের** দামোদর খাল এবং
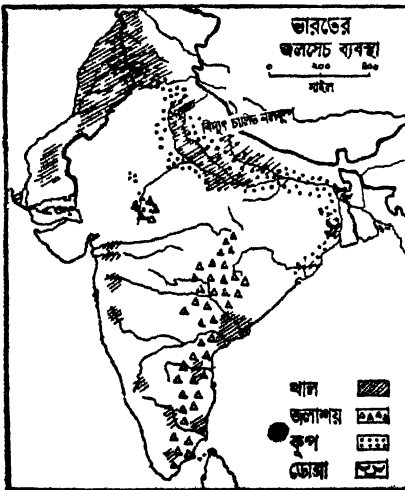
২৬নং চিত্র—ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা

উড়িষ্যার মহানদীর খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিত্যবহ খাল। বর্তমানে বহু প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিবর্তিত করা হইতেছে। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যপ্রদেশে গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষার জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় এবং পরে খাল কাটিয়া ঐ জল দ্বারা শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। এইরূপ খালকে **জলাধার** বা **"স্টোরেজ"** খাল বলে।

খালের সাহায্যে জলসেচ-ব্যবস্থায় দুইটি প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে: (১) কৃষকদের অসাবধানতা-বশতঃ প্রায়শঃই খালের জল বহুস্থানে আটকাইয়া যায় এবং জমিকে কৃষিকার্যের অনুপযোগী করিয়া তোলে, এবং (২) পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে ভূত্বকের নিম্নস্থিত লবণাক্ত জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া জমিকে লবণাক্ত ও কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে।

(৫) **ডোঙ্গা**—তাল বা নারিকেল বৃক্ষের গুঁড়ি চাঁচিয়া কিংবা টিন দিয়া অনেকটা নৌকার মত ডোঙ্গা প্রস্তুত করা হয়। ঐ ডোঙ্গা বাঁশের ডগায় ঝুলাইয়া তাহাদ্বারা নিকটবর্তী খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাধার হইতে জল তুলিয়া জমিতে জলসেচ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথায় জলসেচের ব্যবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ডোঙ্গা ও অন্যান্য প্রথায় জলসিক্ত জমির পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৭৩ ও ৫৪ লক্ষ একর।

১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১৫ ও ৫৬২ লক্ষ একর (নীট)—মোট কৃষিজমির মাত্র ১৭.৫% ও ২০%।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান সেচ খাল

(ক) **পাঞ্জাব**—পাঞ্জাবের ন্যায় এরূপ বিরাট এবং সুন্দর জলসেচের ব্যবস্থা ভারতের আর কোথাও নাই। অত্যল্প বৃষ্টিপাত (১০"-১৫"), উর্বর মৃত্তিকা এবং নিত্যবহ নদীসমূহের অবস্থিতি—এই তিনটি অবস্থার একত্র সংযোগ হওয়ায় এতদঞ্চলে জলসেচ-ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমানে সরকারী সহায়তাপুষ্ট খালের সাহায্যে জলসেচের ফলে বৃষ্টিহীন পাঞ্জাব শস্যশ্যামল হইয়াছে এবং এস্থানের লোকসংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঞ্জাবের নিম্নলিখিত খালসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—(১) **পশ্চিম যমুনা খাল** যমুনা নদী হইতে জল বহন করিয়া রোটক, দক্ষিণ-পূর্ব হিসার, পাতিয়ালা ও ঝিন্দের প্রায় ১০ লক্ষ একরেরও অধিক পরিমাণ জমিতে জলসেচ করে। (২) **সিরহিন্দ খাল** রূপারের নিকটবর্তী শতদ্রু নদী হইতে জল বহন করিয়া লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, নাভা ও হিসার জেলার প্রায় ১৪ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি-অঞ্চলসমূহে জলসেচ করে। (৩) **উচ্চ বারি দোয়াব খাল** মাধোপুরের

নিকটবর্তী ইরাবতী নদী হইতে জল বহন করিয়া বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী গুরুদাসপুর ও অমৃতসর অঞ্চলে জলসেচ করে। এই খালের কতক অংশ পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। (৪) সম্প্রতি **ভাক্রা-নাঙ্গাল** পরিকল্পনা আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে পাঞ্জাবের জলসিক্ত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি
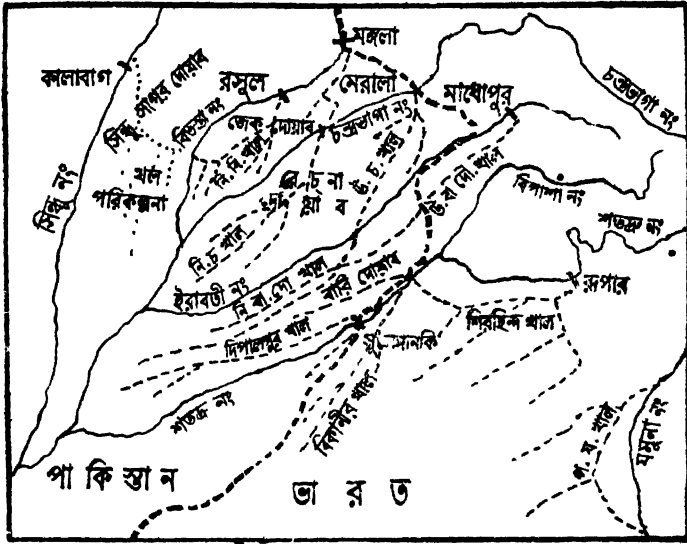
২৭ নং চিত্র—পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সেচখালসমূহ

পাইয়াছে। পাঞ্জাবের জলসিঞ্চিত অঞ্চলসমূহের প্রধান প্রধান ফসল হইল গম ও কার্পাস।

(খ) **উত্তর প্রদেশ***—বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং রবিশস্যের উৎপাদনের জন্য উত্তরপ্রদেশে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রদেশের খালসমূহের মধ্যে বর্তমানে পাঁচটি প্রধান :—(১) **পূর্ব-যমুনা খাল** ফয়জাবাদের নিকটবর্তী যমুনা নদী হইতে

* পূঃ পাঞ্জাব এবং উঃ প্রদেশের সেচ-ব্যবস্থায় দুস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। (১) পাঞ্জাবে সারাবৎসরই সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, কিন্তু উঃ প্রদেশে প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র বর্ষণবঞ্চিত ঋতুতেই। (২) সেচব্যবস্থার প্রবর্তনের পর হইতেই পাঞ্জাবের আর্থিক উন্নতি সূচিত হয়, কিন্তু উঃ প্রদেশের আর্থিক প্রসারের পর হইতেই সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। (৩) পাঞ্জাবের নদীসমূহের কেবলমাত্র উচ্চ অংশ হইতেই সেচখাল কাটা সম্ভব, কিন্তু উঃ প্রদেশের নদীসমূহের নিম্নাংশ হইতেও খাল কাটা চলে। (৪) কেবলমাত্র খালের সাহায্যেই পাঞ্জাবে জলসেচ করা হয়, কিন্তু উঃ প্রদেশের সেচকার্যে কূপ ও খাল উভয়ই ব্যবহৃত হয়। (৫ উঃ প্রদেশে খালসমূহ হইতে বর্ষার জল নির্গমের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পাঞ্জাবে এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনই হয় না।

জল বহন করিয়া এই প্রদেশের উত্তর-পূব অঞ্চলে ৪ লক্ষ একর কৃষিজমিতে জলসেচ করে। (২) **আগ্রা খাল** দিল্লীর নিকটবর্তী যমুনা নদী হইতে জল বহন করিয়া ২৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ করে। (৪) **উচ্চ গঙ্গা খাল** হরিদ্বারের নিকটবর্তী গঙ্গা নদী হইতে জল বহন করিয়া ১ লক্ষ একরেরও অধিক পরিমিত জমিতে জলসেচ করে। (৪) **নিম্ন গঙ্গা খাল** বুলন্দশর

২৮ নং চিত্র—উত্তর প্রদেশের সেচখালসমূহ

জেলার নারোরার নিকটবর্তী গঙ্গা হইতে জল বহন করিয়া উহার মধ্যবর্তী ৮ লক্ষ একর পরিমিত উপত্যকাভূমিকে জলসিক্ত করে। (৫) **সর্দা খাল** নেপাল-সীমান্তে বনবংশের নিকটবর্তী সর্দা নদী হইতে জল বহন করিয়া রোহিলাখণ্ড ও অযোধ্যার পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ১৪ লক্ষ একর পরিমিত ভূমিকে জলসিক্ত করে। গম, ইক্ষু, যব, কার্পাস প্রভৃতিই হইল উত্তর প্রদেশের জল-সিঞ্চিত অঞ্চলের প্রধান প্রধান ফসল।

(গ) **দাক্ষিণাত্য**—দাক্ষিণাত্যের নিম্নলিখিত খালসমূহই প্রধান—(১) **পেরিয়ার খাল**—কার্ডামন পর্বতের পাদদেশে পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়া পর্বতের মধ্য দিয়া ৫৭০০´ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কাটিয়া মাদুরার নিকটবর্তী শুষ্ক অঞ্চলে এই জল লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। (২) **কুর্ণুল-কুডাপ্পা খাল**—ইহা তুঙ্গভদ্রার সহিত পেনারকে সংযুক্ত করিতেছে। (৩) **গোদাবরী বদ্বীপের খাল**—

গোদাবরীর উপনদী বশিষ্ঠা ও গৌতমীর উপর বাঁধ দিয়া ১২.৫ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৪) **কৃষ্ণা বদ্বীপের খাল**—বেজওয়াড়া শহরের নিকটে কৃষ্ণা নদীতে বাঁধ দিয়া বহু খালের সাহায্যে ১০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। (৫) **পৈনী-পালার ও সৈয়ার খাল**—আর্কট শহরের দক্ষিণে এই তিনটি নদীতে বাঁধ দিয়া পশ্চিম মাদ্রাজের একটি সুবৃহৎ অঞ্চলে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। (৬) **কাবেরী বদ্বীপের খাল**—বর্তমানে ইহা হইতে বহু শাখা খাল কাটিয়া প্রায় ১০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। কাবেরী নদীর গতিপথে ৫৩০০′ দীর্ঘ ও ১৭৬ উচ্চ সেতুর বাঁধের সাহায্যে ৬০ বর্গমাইল পরিমিত এক হ্রদ নির্মাণ করিয়া তাহা হইতে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৭) **কৃষ্ণা নদীর বাকিংহাম খাল**—২৫০ মাইল দীর্ঘ এবং নাব্য এই খালের সাহায্যে ০½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচকার্য চলিতেছে।

(ঘ) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের খাল (৪১৪ মাইল), ইডেন খাল (৪৫ মাইল), বক্রেশ্বর খাল (২১ মাইল) ও দামোদর খাল (১৪০ মাইল) কাটা হইয়াছে। সম্প্রতি দামোদর ও ময়ূরাক্ষী বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির সাহায্যেও অধিকতর সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা—(Irrigation under Five Year Plans)—১৯৫০ সালের হিসাবে ভারতের নদীবাহিত জলসম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৩৫.৬ কোটি একর-ফুট। ইহার মধ্যে মাত্র ৪৫ কোটি একর-ফুট জল সেচকার্যে ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবহারোপযোগী জলসম্পদের ১৭% (৭.৬ কোটি একর-ফুট) সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার (১৯৫৫-৫৬-১৯৬০-৬১) শেষ বর্ষ পর্যন্ত এই ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭% (১২ কোটি একর-ফুট)। তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬০-৬১-১৯৬৫-৬৬) কার্যকালে সেচকার্যে এই জলসম্পদের ব্যবহার দাঁড়াইবে ৩৬% (প্রায় ১৬ কোটি একর ফুট)। প্রথম পরিকল্পনার (১৯৫০-৫১/১৯৫৫-৫৬) আরম্ভে, ১৯৫০-৫১ সালে, ভারতে মোট জলসিঞ্চিত কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ৫.১৫ কোটি একর। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বর্ষে, ১৯৫৫-৫৬ সালে, ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৬২ কোটি একর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বর্ষে, ১৯৬০-৬১ সালে, দাঁড়ায় প্রায় ৭.০ কোটি একর। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বর্ষে, ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট জলসিঞ্চিত কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯.০ কোটি একরে দাঁড়াইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মাঝারী ও বৃহৎ বৃহৎ সেচকার্যগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়। অবশ্য এই

সেচকার্যগুলি সম্পূর্ণ হইলে অতিরিক্ত ৩'৮ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমি জলসিঞ্চিত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে সেচব্যবস্থাগুলির রূপায়ণ বাবদ ব্যয় হয় যথাক্রমে ৩৮০ ও ৩৭০ কোটি টাকা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে ঐ বাবদ যথাক্রমে ৪৩৬ ও ২১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

মাঝারী ও বৃহৎ বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা হইতে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেচকার্যগুলি সম্পূর্ণ হইলে ভিত্তি বৎসর (১৯৫০-৫১) অপেক্ষা অতিরিক্ত সেচ জমির পরিমাণ দাঁড়াইবে ... ৩৭৫'৬ লক্ষ একর

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেচকার্যসমূহের রূপায়ণে—

(ক) ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ সেচ সুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ১৩২'৪৩ ,, ,,

(খ) ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ৯৯'৮৯ ,, ,,

(গ) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ সুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ২৭০'২৬ ,, ,,

(ঘ) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ২১৬'২৮ ,, ,,

(৩) তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নূতন নূতন সেচকার্যসমূহের রূপায়ণে—

(ক) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ সুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ২৪'৪৮ ,, ,,

(খ) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি ... ১১'৪৭ ,, ,,

(৪) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সর্বমোট—

(ক) সেচ সুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি [২ (গ) + ৩ (ক)] ... ২৯৪'৭৪ ,, ,,

(খ) সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি [২ (ঘ) + ৩ (খ)] ... ২২৭'৭৫ ,, ,,

(৫) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা—

(ক) সেচ সুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি [৪ (ক)—২ (ক)] ... ১৬২'৩১ ,, ,,

(খ) সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি [৪ (খ)—২ (খ)] ... ১২৭'৮৬ ,, ,,

উপরোক্ত সংখ্যামান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ যে পরিমাণ কৃষিজমি সেচসুবিধা-যুক্ত হয় তদপেক্ষা ৩২ লক্ষ একর পরিমিত অল্প জমি সেচব্যবস্থা-যুক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেচ কার্যগুলির সাহায্যে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অতিরিক্ত ১৩৭'৭৩ লক্ষ একর এবং তৃতীয় পরিকল্পনা কালে গৃহীত নূতন নূতন সেচ কার্যগুলির সাহায্যে অতিরিক্ত ২৪'৪৮ লক্ষ একর—এই মোট ১৬২'৩১ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিজমি সেচসুবিধা-যুক্ত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে মোট সেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়াইবে স্থূল হিসাবে ১২৮ লক্ষ একর বা ১১৫ লক্ষ একর নীট।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত সেচ কার্যগুলি বাবদ ৪৩৬ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত নূতন নূতন সেচকার্য বাবদ ১৬৪ কোটি টাকা এবং ৫০ লক্ষ একর পরিমিত জমির বন্যানিয়ন্ত্রণ, জল নিষ্কাশন, পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বাবদ ৬১ কোটি টাকা—এই

মোট ৬৬১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনায় ৯৫টি মাঝারী সেচ পরিকল্পনা, পাঞ্জাবের বিপাশা জলাধাব পরিকল্পনা এবং বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত সেচকার্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতের মৃত্তিকা (Indian Soils)—মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে প্রধানতঃ তিন **শ্রেণীর** মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা**—অবস্থান ও উচ্চতার উপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের মৃত্তিকাসমূহ উর্বরতায়, গঠনে ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা— (১) হিমরেখার ঠিক নিম্নাংশেই দেখা যায় বালুকা ও কঙ্করপ্রধান **হিমবাহ-প্রভাবিত মৃত্তিকা** (Glacial soils)। (২) উহারই নিম্নাংশে রহিয়াছে হিমবাহ-পরিবাহক **প্রস্তরবহুল কর্দম** (Boulder clay)। (৩) ইহার নিম্নাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে রহিয়াছে **পোডসল**-প্রধান অম্লধর্মী অনুর্বর মৃত্তিকা (Podzols)। এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রচুর আলু জন্মে। (৪) আরও নিম্নাংশের উপত্যকাসমূহের মৃত্তিকা উচ্চতাবিশেষে কোথাও বা কর্দমবহুল, আবার কোথাও বা উৎকৃষ্ট পলিবহুল। (৫) পর্বতের ঢালে অবস্থিত ক্ষেত্রসমূহ **অবশেষ-প্রধান মৃত্তিকা** (Residual soil) দ্বারা গঠিত।

(খ) **গাঙ্গেয় সমভূমির মৃত্তিকা**—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা পাললিক শিলা-স্তরে গঠিত, তবে প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই মৃত্তিকাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা- (১) **প্রাচীন পলিগঠিত মৃত্তিকা** (Old Alluvium)—ইহা প্রাচীন ও নিঃশেষিতপ্রায় ধাতব পদার্থযুক্ত হওয়ায় অনুর্বর। এই জাতীয় মৃত্তিকা নদীতীর হইতে দূরে পর্বতের সানুদেশে অথবা দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ মৃত্তিকা এই শ্রেণীর। (২) **নূতন পলিগঠিত মৃত্তিকা** (New Alluvium)—নদীতীরবর্তী প্লাবন-স্পর্শী ভূমিভাগে এই জাতীয় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। লবণ বা বালুকা প্রধান না হইলে ইহা অতিশয় উর্বর হয়। এই শ্রেণীর পলিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বালুকাপ্রধান মৃত্তিকা বা **বেলেমাটি** (Sandy soil)—ইহা জলধারণে অক্ষম বলিয়া জলসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী, (খ) কর্দমপ্রধান মৃত্তিকা বা **এঁটেল মাটি** (Clay soil)—ইহা চুন ও হিউমাস-প্রধান ও উর্বর, তবে অত্যন্ত জমাট বলিয়া জল সহজে অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিতে পারে না, (গ) **দোআঁশ মাটি** (Loamy soil)—বালুকা, পলি, কর্দম প্রভৃতির উৎকৃষ্ট সমাবেশে গঠিত এই মৃত্তিকা জলধারণক্ষম ও অতিশয় উর্বর। সমভূমির পশ্চিম প্রান্তের **মরু অঞ্চলে** লবণাক্ত, বালুকাময় ও ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে এই শ্রেণীর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহ শস্যসমৃদ্ধ হইতে পারে। নদীর মোহানায় ও বদ্বীপাঞ্চলে লবণাক্ত

ও ঘাসের চাপড়াযুক্ত **জলাভূমির মৃত্তিকা** দৃষ্ট হয়। উপকূলীয় সমভূমির মৃত্তিকা সাধারণতঃ কর্দমময় ও লবণাক্ত।
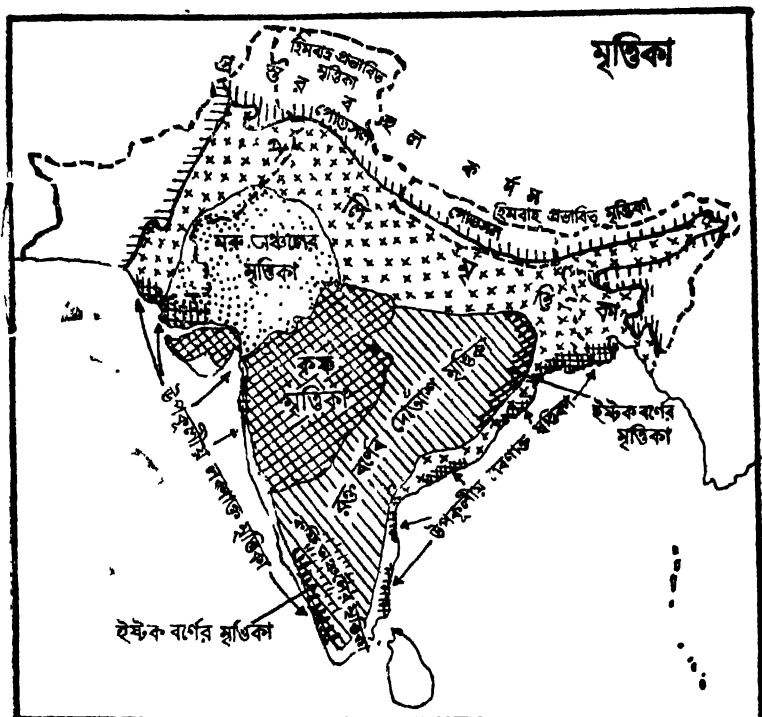
২৯ নং চিত্র—ভারতের মৃত্তিকা

(গ) **মালভূমির মৃত্তিকা**—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অবশেষ-প্রধান। বর্ণের তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) নাগপুর, সোলাপুর ও আমেদাবাদ দ্বারা বেষ্টিত এক ত্রিকোণাকার ভূভাগে আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ক্ষয়ীভূত লাভার দ্বারা গঠিত **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** (Regur) দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা নানা রাসায়নিক গুণযুক্ত, কর্দমবহুল, ভারী ও প্রচুর জলধারণক্ষম। কার্পাস, জোয়ার, গম, ছোলা, মসিনা প্রভৃতি এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলের প্রধান ফসল। (২) **রক্তবর্ণের দোআঁশ মৃত্তিকা** (Red loam)—মালভূমির অবশিষ্ট প্রায় সমগ্র অংশের মৃত্তিকা এই শ্রেণীর। ইহা হাল্কা, বালুকাপ্রধান ও জলধারণের ক্ষমতাহীন। জলসেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে ধান, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতির চাষ করা হয়। (৩) **ইষ্টক বর্ণের মৃত্তিকা** (Lateritic soil)—মালাবারে ও ছোটনাগপুর-মালভূমির পূর্বপ্রান্তে ইহা রক্তবর্ণের এবং লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ

এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) **কফি অঞ্চলের মৃত্তিকা** (Coffee soil)—নীলগিরি ও পঃ ঘাটের ক্রমনিম্ন গাত্রে হিউমাস-সমৃদ্ধ পঙ্কিল অরণ্যভূমির মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা কফি উৎপাদনের সহায়ক।

ভূমির ক্ষয় (Soil erosion)—জল ও বায়ুর দ্রুত প্রবাহের ফলে অবক্ষিত ভূমিভাগের উপরিস্থিত অতি প্রয়োজনীয় মৃত্তিকার অতিমাত্রায় অপসারণকে ভূমির ক্ষয় বলা হয়। উঃ পঃ ভারতের পর্বতসন্নিহিত প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে ভূমির ক্ষয় এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ভূমিক্ষয়ের ফলে ভারতের কৃষিভূমির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং বহুস্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিতেছে। আসাম, উঃ বিহার ও উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে ভূমির সমপরিমাণ ক্ষয় (Sheet erosion), বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (Gully erosion) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয়ের (Wind erosion) প্রকোপ অধিক। বর্তমানে ভারতের মোট ভূমিভাগের প্রায় এক-চতুর্থাংশেই (প্রায় ২০ কোটি একর) ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ভূমিক্ষয়ের **কারণ** হিসাবে বনোৎপাটন, অতিচারণ, অবৈজ্ঞানিক চাষ প্রণালী ও বিবেচনাহীন ভাবে মৃত্তিকা অপসারণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমিক্ষয় ভারতের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা, এবং ক্রমশঃ ইহা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। উপযুক্ত **প্রতিরোধক ব্যবস্থা** অবলম্বিত না হইলে অধিকতর শস্য উৎপাদন ও বহুমুখী পরিকল্পনা দ্বারা বন্যা নিরোধের কথা একেবারেই নিরর্থক। ভূমির ক্ষয়প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নূতন অরণ্য রচনা, নিয়ন্ত্রিত চারণ, বায়ুপ্রবাহ-রোধক অরণ্যবলয় রচনা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য ও ক্ষয় প্রণালীর পূরণ আশু কর্তব্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil conservation **programme under Five-Year Plans**) :—মৃত্তিকার সংরক্ষণ (Soil conservation) অর্থে ভূমির ক্ষয় নিবারণ ও নানা উপায়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করা বুঝায়। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে **প্রথম পরিকল্পনার** (১৯৫০/৫১-১৯৫৫/৫৬) পাঁচ বৎসরে মৃত্তিকা সংরক্ষণকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয় :—(১) ১৯৫৩ সালে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা (Central Soil Conservation Board) এবং প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া ২২টি "ভূমি ব্যবহার ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা" (Land Utilisation and Soil Conservation Board) স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত তথ্যাদির সংগ্রহ, মৃত্তিকা সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, বিভিন্ন রাজ্যগত সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে সর্বব্যাপারে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও রাজ্যসংস্থাগুলিকে নানাবিধ সাহায্য দান প্রভৃতিই কেন্দ্রীয় সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য। (২) কেন্দ্রীয় সংস্থাটির

পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে দেরাদুনে পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চলের, চণ্ডীগড়ে শিবালিক অঞ্চলের, কোটায় যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের, ভাসাদে উত্তর গুজরাট অঞ্চলের, আগ্রায় যমুনা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের, বেলারীতে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের, আগ্রায় কুশী অববাহিকা অঞ্চলের এবং উত্তাকামন্দে আলু চাষের উপযোগী অঞ্চলের মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আটটি আঞ্চলিক গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। (৩) ১৯৫২ সালে যোধপুরে মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা, ভূমিক্ষয়, অরণ্য রচনা প্রভৃতি সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রটি (Desert Afforestation Research Station) স্থাপিত হয়। পশ্চিম রাজস্থানের ১৫০ মাইল দীর্ঘ অঞ্চল ব্যাপিয়া বৃক্ষরোপণ করা হইয়াছে এবং চারণ ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পরীক্ষামূলকভাবে অবণ্য বচনার জন্য ১০৯ বর্গমাইল পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। (৪) প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কৃষি ও বন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ২৫০ জন লোককে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে এই পাঁচ বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে সমোন্নত বাঁধ ও খাল, ক্ষয়প্রণালীর পূরণ, ধাপ-সৃজন, নদীপরিকল্পনা প্রভৃতিব সাহায্যে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংবক্ষণ বাবদ ব্যয় হয় ১·৬ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫/৫৬-১৯৬০/৬১) (১) বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দরাবাদ (প্রাক্তন) ও সৌরাষ্ট্র (প্রাক্তন) এই কয়টি রাজ্যের মোট ২০ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিজমির সংরক্ষণ; কচ্ছ (প্রাক্তন) ও রাজস্থান প্রভৃতি মরু ও উপকূলাঞ্চলের ৩·৫ লক্ষ একর পরিমিত জমির বালিয়াড়িব অপসাবণ রোধ; উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম ও নীলগিরি অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদী অববাহিকার অন্তর্গত ৩·৩ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে নূতন অরণ্য রচনা, দাবাগ্নি রোধ, সমোন্নত বাঁধ প্রভৃতি ব্যবস্থার অবলম্বন; পার্বত্য অঞ্চলের মোট ১·৭ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে মৃত্তিকার সংরক্ষণ; যমুনা, চম্বল, সবরমতী, মাহে ও উহাদেব উপনদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের ১·৫ লক্ষ একর জমিতে নানাবিধ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবলম্বন এবং ১ লক্ষ একর পরিমিত পরিত্যক্ত ও ক্ষয়ীভূত জমিতে মৃত্তিকার সংরক্ষণ—এই মোট ৩১ লক্ষ একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। (২) সামুদ্রিক বন্যায় ক্ষয়ীভূত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের (বর্তমান কেরালার) উপকূলাঞ্চলে ৪৫ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বন্যা বোধ করার কার্যও আরম্ভ হয়। (৩) মৃত্তিকার ক্ষয়সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাযুক্ত প্রায় ১·২ কোটি একর পরিমিত জমি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। (৪) এই পরিকল্পনার কার্যকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে ১০৭০ জন লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। (৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষদিকে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ১০০০ একর সমন্বিত এইরূপ ৪০টি পরীক্ষা-কেন্দ্রের

স্থাপন করা হয়। (৬) এই পরিকল্পনার কার্যকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণ-সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণামূলক কার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। যোধপুরে মরুঅঞ্চলের অরণ্যরচনা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থাটিকে "কেন্দ্রীয় শুষ্কাঞ্চল গবেষণা সংস্থা"রূপে (Central Arid Zone Research Institute) পুনর্গঠিত করা হয়। রাজস্থান অঞ্চলে চারণ-ক্ষেত্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা এই সময়ে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে মৃত্তিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোট ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০/৬১-১৯৬৫/৬৬) (১) প্রায় ১১ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমিতে সমোন্নত বাঁধ-প্রথার এবং ২২ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমিতে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভাক্রা-নাঙ্গাল, দামোদর, হিরাকুড ও অন্যান্য কয়েকটি প্রধান প্রধান নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত নদী অববাহিকা অঞ্চল সমূহের অন্তর্গত প্রায় ১০ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিজমির সংরক্ষণ, প্রধানতঃ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও দিল্লীর অন্তর্গত প্রায় ২ লক্ষ একর পরিমিত জলা ও লবণাক্ত ভূমিভাগের পুনরুদ্ধার; যমুনা, চম্বল, মাহে ও উহাদের উপনদীর তীরবর্তী ৪০,০০০ একর পরিমিত ক্ষয়ীভূত ভূমিভাগের পুনরুদ্ধার, মরু অঞ্চল সন্নিহিত বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১ লক্ষ একর পরিমিত ভূমিভাগের সংরক্ষণ এবং ক্ষয়ীভূত পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত প্রায় ৭ লক্ষ একর পরিমিত ভূমিভাগে মৃত্তিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে। [১৯৬১ ৬২ সালে ২৭টি নূতন শুষ্ক কৃষি-ব্যবস্থার পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।] (২) মৃত্তিকার ক্ষয়-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাযুক্ত প্রায় ১৫ কোটি একর পরিমিত কৃষিভূমি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত আটটি আঞ্চলিক গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীতও উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে অতিরিক্ত দুইটি গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। অস্থায়ী কৃষিব্যবস্থা (shifting cultivation) সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণার জন্য আসামে একটি প্রধান গবেষণা-কেন্দ্র এবং মণিপুর, নেফা ও ত্রিপুরার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া তিনটি অতিরিক্ত গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। এই পরিকল্পনার কার্যকালে মৃত্তিকা-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত ১১০৫০ জন লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে। (৩) এই পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণকল্পে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্তৃক সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং মৃত্তিকা-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি যাহাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিচালনা করে তদুদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তনের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কার্যকালে মৃত্তিকা-সংরক্ষণ-কল্পে প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের শ্রেণীবিভাগ
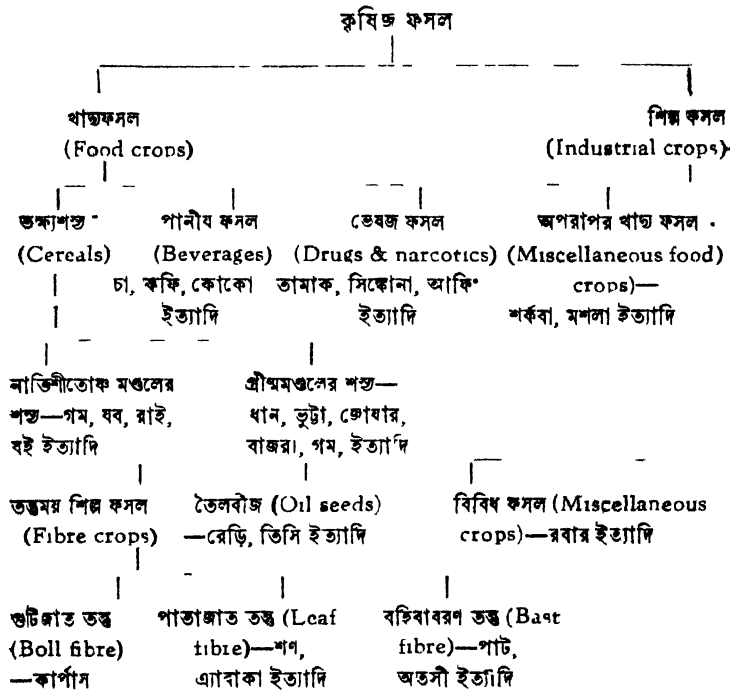
প্রশ্নোত্তর

1. Explain how agriculture is controlled by environmental factors.
(কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ১০৬-১০৮)

2. Write a short note on the effects of soils and climate on the agricultural activities of a country.
(দেশগত কৃষিকার্যের উপর স্থানীয় মৃত্তিকা ও জলবায়ু কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) (পৃঃ ১০৬-১০৮)

3. Discuss the importance of irrigation in India. What geographical advantages does India possess for the development of irrigation works? Explain the different systems of irrigation practised in the country.
(ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কি সে বিষয়ে আলোচনা কর। ভারতে সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তনে কি কি ভৌগোলিক সুবিধা রহিয়াছে? ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচ-পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহার বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১১১-১১৪)

4. Describe some of the important canal irrigation projects found in different regions of India.
(ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান সেচখালগুলির বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১১৪-১১৭)

5. Indicate briefly the achievements of the first and second Five Year Plans in the field of Indian irrigation. How is the area under irrigation going to be extended during the third Plan period ?

(প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় সেচ-ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে সে সম্পর্কে লিখ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার যে উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ১১৭-১১৯)

6. Give an account of the soils of India. What is soil erosion ? State the nature of soil conservation programme as embodied in the Five Year Plans of India

(ভারতের মৃত্তিকার বিবরণ লিখ। ভূমিক্ষয় বলিতে কি বুঝায়? ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে মৃত্তিকার সংরক্ষণ ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সে বিষয়ে লিখ।)

(পৃঃ ১১৯-১২৩)

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিজ ফসল

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল

(১) খাদ্যফসল

গম (Wheat)—গম প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ গম ক্ষেত্র ৩৫° দঃ এবং ৬০° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গম চাষের অনুকূল অবস্থা (**Conditions of growth for wheat**)—গম উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি অনুকূল—(১) অঙ্কুর উদ্গমের সময় ও বৃদ্ধি পাইবার কালে প্রায় ২০" হইতে ৪০" বৃষ্টিপাত। (২) উত্তাপের পরিমাণ ৫০° ফাঃ হইতে ৭০° ফাঃ পর্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। (৩) অঙ্কুর উদ্গমের সময় আর্দ্র ও শীতল আবহাওয়া, বৃদ্ধির সময়ে শুষ্ক ও মন্দোষ্ণ আবহাওয়া, ফসল পাকবার অব্যবহিত পূর্বে সামান্য বৃষ্টিপাত ও কাটিবার সময় প্রচুর উত্তাপ, সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। (৪) উর্বর, নরম কাদামাটি, অথবা ভারী দো-আঁশ মাটি গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (৫) বড় বড় কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার সুবিধার জন্য এবং জলনিকাশের উত্তম ব্যবস্থার জন্য সমতল অথবা কিঞ্চিৎ ঢালু জমিই গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (৬) গম-ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৭) গম চাষের পক্ষে ১১০টি তুহিনমুক্ত দিবসের প্রয়োজন,

তবে কয়েক প্রকার গম অল্প দিনেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। (৮) গম চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন হয় না—কারণ বর্তমানকালে যন্ত্রপাতির সাহায্যেই ভূমিকর্ষণ হইতে শস্যকর্তন পর্যন্ত প্রায় সমুদায় কাযই সাধিত হইতেছে।

উপক্রান্তীয় মণ্ডলে শীতকালে এবং শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে গমের চাষ হইয়া থাকে। ঋতুভেদে উৎপাদিত গমকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (ক) **শীতকালীন গম** (winter wheat)—শরৎকালে ইহার বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মকালে শস্য আহরণ করিতে হয়। উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই ইহার চাষ ব্যাপক। (খ) **বাসন্তিক গম** (spring wheat)—বসন্তকালে ইহার বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মের শেষে শস্য আহরণ করা হয়। শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই ইহার চাষ ব্যাপক।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বণ্টন ও ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর গম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) পশ্চিম ইউরোপের জনবহুল দেশসমূহ, যথা—গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি। মিলিত ভাবে এই দেশগুলি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গম উৎপাদন করে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুপাতে ইহাদের উৎপাদন এত অল্প যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এই দেশগুলিতে গম আমদানী করিতে হয়। (২) অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশসমূহ, যথা—রুশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, পঃ পাকিস্তান ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় বিশেষভাবে রপ্তানীর জন্যই এই সমস্ত দেশে গমের চাষ হইয়া থাকে।

ইউরোপ—দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ প্রচুর গম উৎপাদন করে, তবে জলবায়ু শুষ্ক হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ অল্প। শীতপ্রধান সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের অপেক্ষাকৃত রৌদ্রোজ্জ্বল অংশে গমের চাষ ব্যাপক। ব্রিটেনের পূর্ব ও দঃ-পূর্ব অংশের ২০"—৩০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রচুর গম জন্মে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল আর্দ্রতর এবং স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাংশ শীতলতর হওয়ায় এই সমস্ত অংশে গমের চাষ অল্প। রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্সে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গমের চাষ হয়। উত্তর-পূর্বের খড়িমাটি-সংকুল অঞ্চলে এবং উত্তর-পশ্চিমের শুষ্কতর অংশেই ফ্রান্সের অধিকাংশ গম জন্মিয়া থাকে। হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামেও গমের চাষ ব্যাপক। অপেক্ষাকৃত চরমভাবাপন্ন মধ্য-ইউরোপীয় জলবায়ুযুক্ত জার্মানী, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার সমতল ভূমিভাগেও প্রচুর গম জন্মিয়া থাকে।

রুশিয়া—রুমেনিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল

এবং কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়া সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে রুশিয়ার অধিকাংশ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে উত্তর রুশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়া, ওরেনবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও গমের চাষ প্রসারলাভ করিতেছে। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত ওডেসা ও খেরসন বন্দর হইতে রুশিয়ার গম বিদেশে রপ্তানী হয়। গম উৎপাদনে পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়াব স্থান প্রথম। রুশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ব্যাপিয়া শীতকাল তীব্র হওয়ায় এতদঞ্চলে বাসন্তিক গমেব চাষই অধিক।

উত্তর আমেরিকা—এই মহাদেশের অন্তর্গত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেই গমের উৎপাদন সর্বাধিক। **ক্যানাডা**র অন্তর্গত ম্যানিটোবা, স্যাসকাচুয়ানও আলবার্টা প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বিস্তৃত ৭০০ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ মাইল প্রস্থযুক্ত প্রেয়রী গম-বলয়ে প্রচুর বাসন্তিক গম উৎপাদিত হয়। ক্যানাডার মোট গম উৎপাদনের প্রায় ৯২% গমই এই অঞ্চল হইতে আসে। লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে শীতকালীন গমেব চাষ হয়। শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। ক্যানাডার উইনিপেগ-ই বিখ্যাত গম-কেন্দ্র। গমের মূল্য, শ্রেণীবিভাগ ও সরবরাহ সাধারণতঃ এই দেশেব 'গম-সংঘ'সমূহ (Wheat Pools) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। গম রপ্তানীতে ক্যানাডা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকাব করে। পোর্ট আর্থার, চার্চিল, ফোর্ট উইলিয়ম, উইনিপেগ, মণ্ট্রীল, হ্যালিফ্যাক্স, ভ্যানকুভাব প্রভৃতি বন্দর হইতে ক্যানাডীয় গম যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে রপ্তানী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে। ক্যানাডার বাসন্তিক গমবলয়ের দক্ষিণাংশ হইতে মিসিসিপি অববাহিকার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই কৃষিবলয়টিতে শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র, গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব ও মৃদু এবং বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরণের হওয়ায় এতদঞ্চলে প্রচুর বাসন্তিক গম উৎপাদিত হয়। বাসন্তিক গম-বলয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিমে উঃ-পূঃ কলরাডো হইতে পূর্বে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে শীতকাল মৃদু হওয়ায় প্রচুর শীতকালীন গম জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত নেব্রাস্কা, কানসাস্ এবং ওকলাহামা রাজ্যেই গমের চাষ সমধিক। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত ক্যালিফোর্নিয়া, সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ এবং শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। মিনিয়াপোলিসে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ময়দার কলসমূহ অবস্থিত। নিউইয়র্ক বন্দর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্তানী হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের অন্তর্গত আর্জেন্টিনাতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। বর্তমানে আর্জেন্টিনা গম রপ্তানীর (রপ্তানী বন্দর বুয়েনস আয়ার্স) ক্ষেত্রে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চিলিতেও অল্পাধিক গম উৎপন্ন হয়।

অস্ট্রেলেশিয়া—**অস্ট্রেলিয়ার** কর্ষিত ভূমির অর্ধেকেরও অধিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রপ্তানীর জন্যই গমের চাষ হয়। উহাই দেশের প্রধান শস্য। অস্ট্রেলিয়ার দুইটি গম-বলয়ই—একটি দক্ষিণ-পূর্বভাগে (ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চল) এবং অপরটি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মোটামুটি ১০"-৩০" সমবর্ষণরেখার মধ্যে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ার উৎপন্ন গমের উদ্বৃত্তাংশ প্রধানতঃ এডিলেড, সিডনী ও মেলবোর্ন বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। গম রপ্তানীতে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান অধিকার করে। **নিউজীল্যাণ্ডের** দক্ষিণ দ্বীপে অবস্থিত ক্যান্টারবেরীর সমভূমিতে প্রচুর গম জন্মে।

উত্তর **আফ্রিকার** নীলনদের নিম্ন অববাহিকায়, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত মরক্কো, আলজেরিয়া ও টিউনিস অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলের মালভূমির কোন কোন অংশে গমের চাষ হয়।

এশিয়া—**জাপান** ও **চীন** দেশের উত্তরাংশে প্রধানতঃ দেশাভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্যই প্রচুর গমের চাষ হয়। মাঞ্চুরিয়াতেও গমের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ভারতের শুষ্ক ও উষ্ণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ) এবং মধ্যপ্রদেশে গমের চাষ হইয়া থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকাতে (পঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ) এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে জলসেচের দ্বারা প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৭৫%-এরও অধিক গম যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন, ক্যানাডা, ফ্রান্স, ভারত, আর্জেন্টিনা, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, পঃ পাকিস্তান মিলিতভাবে উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (**Trade**)—পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র গমের প্রায় ১২% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার প্রায় ৮৮% ক্যানাডা (২৩%), যুক্তরাষ্ট্র (৪২%), আর্জেন্টিনা (১০%), এবং অস্ট্রেলিয়া (১৩%) মিলিতভাবে **রপ্তানী** করিয়া থাকে। গমের ব্যবসায়ে দক্ষিণ গোলার্ধের গম উৎপাদক স্থানসমূহের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে; কারণ—(১) উত্তর গোলার্ধে উৎপাদন অপেক্ষা চাহিদা অধিক, কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক। (২) দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গম পাকে উত্তর গোলার্ধে তখন গম নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে তৎস্থানে গমের দাম বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গম রপ্তানীকারকদের বিশেষ সুবিধা হয়।

পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান ও জনবহুল দেশসমূহ, যথা—গ্রেটব্রিটেন, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা অধিক গম **আমদানী** করে। গ্রেটব্রিটেন তাহার প্রয়োজনীয় গমের অধিকাংশই ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা হইতে লইয়া থাকে। ভারত, চীন, জাপান এবং ব্রাজিলও অত্যধিক গম আমদানী করে। বিশ্ব-বাণিজ্যে ব্যবহৃত গমের প্রায় ৩০%ই যুক্তরাজ্য গ্রহণ করে।

[১৯৪৯ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব গম সম্মেলনে' চারি বৎসরের জন্য (১৯৪৯-৫৩) ৩৬টি আমদানীকারক ও ৫টি রপ্তানীকারক দেশের মধ্যে বিশ্বের গম-বাণিজ্য সম্পর্কে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ক্যানাডা ২০৩, যুক্তরাষ্ট্র ১৬৮, অস্ট্রেলিয়া ৮০, ফ্রান্স ৩ এবং উরুগুয়ে ২ মিঃ বুশেল গম প্রতি বৎসর রপ্তানী করিতে পারিত। ১৯৫৩ সালে পুনরায় ৩ বৎসরের জন্য এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, তবে এই নূতন চুক্তিতে রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে উরুগুয়ে এবং আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য বাদ যায়। এই চুক্তির অন্তর্গত রপ্তানীকারক দেশগুলির মোট বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১৬'২১ মিঃ টন এবং ৩৫টি দেশের মোট আমদানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় বার্ষিক ১১'৩৯ মিঃ টন।]

ধান (Rice)—চাউল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্যশস্য।

ধান চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for Rice)—ধান ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলই ইহার পক্ষে সর্বোত্তম ক্ষেত্র। ধান উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্ন-লিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল : (১) গ্রীষ্মকালে ধান গাছ বৃদ্ধির সময় প্রচুর উত্তাপ (৬০°-৮০° ফাঃ) এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত (৪০"-৮০") প্রয়োজন। (২) জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় ধান্যক্ষেত্র প্লাবিত হওয়া দরকার। (৩) ধানচাষের জমির বহিঃস্তরের মাটি উর্বর পলিস্তর দ্বারা গঠিত এবং আভ্যন্তরীণ স্তরের মাটি কঠিন বা আংশিকভাবে অপ্রবেশ্য হওয়া দরকার, কারণ ইহা ধান্যক্ষেত্র প্লাবনের পক্ষে সুবিধাজনক। (৪) ধান জন্মাইবার জন্য, অঙ্কুরকে স্থানান্তরিত করিয়া রোপণের জন্য, এবং সর্বদা উহার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে বীজ ছড়াইয়া এবং প্রচুর শ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে রোপণপ্রথায় ধানের চাষ করা হয়। রোপণপ্রথায় ধান উৎপন্ন হয় অধিক, তবে উহার উৎপাদন-ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে। (৫) ধান পাকিবার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু বিশেষ হিতকর। উপরোক্ত অবস্থাগুলি অনুশীলন করিলে প্রতীয়মান হয় যে চাষের অবস্থা অনুকূল হওয়ায় মৌসুমী অঞ্চলের বদ্বীপগুলিতে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং সামুদ্রিক জলবায়ুযুক্ত উষ্ণ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মিয়া থাকে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—উপরে বর্ণিত অবস্থায় যে সমস্ত ধান জন্মিয়া থাকে তাহাকে **জলাভূমির ধান** (swamp rice) বলা হয়। উচ্চভূমিতে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অবস্থায় আর একপ্রকার ধান জন্মে। তাহাকে **উচ্চভূমির ধান** (upland rice) বলা হয়। ইহার পরিমাণ অতি অল্প। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা এবং আমেরিকা ও আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলের আদিম অধিবাসীরা ধানের চাষ করিয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ব্যবহার ও জন্মের

দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবহুল দেশসমূহ, যথা—ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি। উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন ধান উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং উহার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের স্থান। চীন, জাপান, ভারত এবং পাকিস্তান মিলিতভাবে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র ধানের প্রায় ৭০% উৎপাদন করে। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর থাকায় এই সমস্ত দেশগুলিকে বাহির হইতে অল্পবিস্তর চাউল আমদানী করিতে হয়। (২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলসমূহ, যথা—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় ও
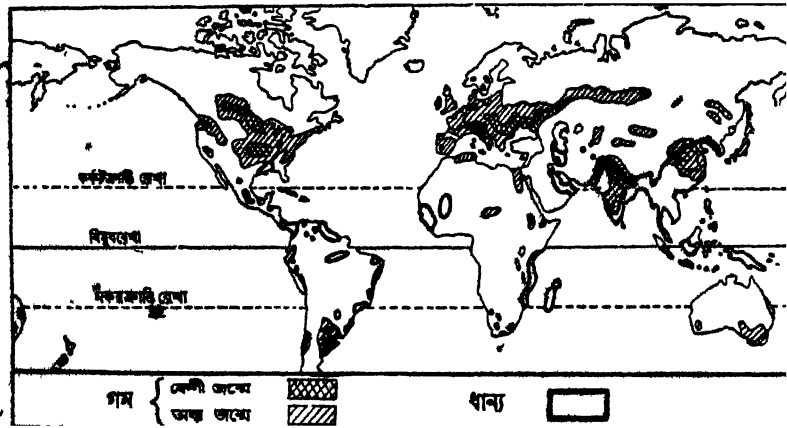
৩০ নং চিত্র—পৃথিবীর ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

ইন্দোচীন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় এই সমস্ত দেশ উৎপাদিত ধানের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। (৩) এশিয়েতর দেশসমূহ, যথা—(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বদ্বীপে এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসে; (খ) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল উপকূলে, ব্রিটিশ গিয়ানাতে এবং পেরুর মরু অঞ্চলে; (গ) আফ্রিকা মহাদেশের মিশর এবং সিয়েরালিয়নে; (ঘ) ইতালীর পো নদীর সমভূমির দক্ষিণ-পূর্বে; (ঙ) যুগোস্লাভিয়ার নিম্ন-ভূমিতে; স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে; (চ) অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং রুশিয়াতেও ধানের চাষ হয়। এশিয়েতর অঞ্চলগুলিতে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হয়। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে প্রধানতঃ জলসেচের সাহায্যেই ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন শক্তি অল্প এবং ইহা কমিয়া গিয়াছে

যে উচ্চতর অক্ষাংশের দেশগুলিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন নিম্নতর অক্ষাংশের দেশসমূহের উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীতে উৎপন্ন চাউলের মাত্র ৭% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় এবং ইন্দোচীন প্রধান প্রধান চাউল রপ্তানীকারক দেশ। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, বেসিন ও আকিয়াব, শ্যামের ব্যাংকক, ইন্দোচীনের সাইগন ও হাইফং চাউল রপ্তানীর প্রধান প্রধান বন্দর। সিংহল, মালয়, ভারত, জাভা ও জাপান প্রধান চাউল আমদানীকারক দেশ। আমদানীকারক বন্দরগুলির মধ্যে সিংহলের কলম্বো, ভারতের কলিকাতা ও মাদ্রাজ, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, পাকিস্তানের চট্টগ্রাম এবং জাপানের কোবে ও ইয়োকোহামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভুট্টা (Maize)—ইহা প্রধানতঃ পশুর খাদ্য, তবে অনেক স্থলে মনুষ্যের খাদ্যরূপে এবং রুটি, মদ্য, শ্বেতসার, গ্লুকোজ প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভুট্টা চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for maize)—ভুট্টা প্রধানতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শস্য। নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ভুট্টা চাষের পক্ষে অনুকূল:—(১) গ্রীষ্মকালে গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মাস কাল উষ্ণ আবহাওয়ার (গড় উত্তাপ ৬৬° ফাঃ-এর অধিক) বিশেষ প্রয়োজন। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণতার অধিক কাল স্থায়িত্বহেতু ভুট্টা ভাল জন্মায় না। (২) প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষের পক্ষে হিতকর। ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চলসমূহে বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ২০"র অধিক হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টি ৮"-র অনধিক সেই সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টা ফলে না। (৩) উর্বর দো-আঁশ মাটি ভুট্টা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জমিতে জল নিষ্কাশনের উত্তম বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। (৪) তুহিন ভুট্টা উৎপাদনের পক্ষে প্রতিকূল। এই কারণে প্রায় ১৪০টি তুহিন-মুক্ত দিবস ভুট্টা চাষের পক্ষে অনুকূল। (৫) শীতের প্রারম্ভেই ভুট্টা ক্ষেত্র হইতে তুলিবার উপযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন। (৬) আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তন ভুট্টাচাষের পক্ষে ক্ষতিকারক।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভুট্টাক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ ৪৫° উত্তর এবং ৪০° দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি পৃথিবীর অধিকাংশ ভুট্টা উৎপাদন করে—(১) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যদেশীয় রাষ্ট্রগুলি, যথা—মিশৌরি, ইণ্ডিয়ানা, নেব্রাস্কা, ওহিও এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, (২) দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজপর্বত-সংলগ্ন পূর্ব অঞ্চলসমূহ, আর্জেন্টিনার আর্দ্র পাম্পা অঞ্চল, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দানিয়ুব নদীর অববাহিকার অন্তর্গত দেশসমূহ এবং দক্ষিণ রুশিয়া, (৪) ইতালীর উত্তরদিকস্থ সমভূমি অঞ্চল, (৫) চীন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, (৬)

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড এবং নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ অঞ্চল। ভুট্টা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম (পৃথিবীর প্রায় ৮০%) এবং আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

বাণিজ্য (Trade)—আর্জেন্টিনা, রুমেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথিবীর প্রধান ভুট্টা **রপ্তানীকারক** দেশ। যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ক্যানাডা প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা **আমদানী** করে।

(২) পানীয় ফসল

চা (Tea)—এক জাতীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের পত্রকে শুকাইয়া চা প্রস্তুত করা হয়।

চা চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for tea)—চা-গাছ মূলতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌। চা-গাছের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিই বিশেষ অনুকূল :

(১) দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর উত্তাপ (৫৪°-৮০° ফাঃ) এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত (৬০"-১০০") চা-গাছের বৃদ্ধির ও প্রচুর পাতা উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। (২) চা-ক্ষেত্রে উত্তম জলনিষ্কাশন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ চা-গাছের মূলে জল সঞ্চিত হইলে চাষা নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে পর্বতের ঢালেই সাধারণতঃ চা-এর চাষ হয়। (৩) হাল্কা, উর্বর, জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং লৌহকণিকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (৪) তুহিন চা-গাছের বিশেষ ক্ষতি না করিলেও, একর প্রতি চা-এর উৎপাদন-হার কমায়। (৫) চা-গাছ জমির উর্বরাশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দেয় বলিয়া, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রে কৃত্রিম সার দিবার প্রয়োজন হয়। (৬) চা-পাতা হাত দিয়া তুলিতে হয় বলিয়া, পর্যাপ্ত ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—চা সাধারণতঃ ৩২° উত্তর ও ৮° দক্ষিণ সমাক্ষরেখা এবং ৮০° পূর্ব ও ১৪০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর চা-উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে উৎপাদন ও রপ্তানীর তারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ**—চা-উৎপাদনে **চীন** (ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকার উত্তরাঞ্চল) পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ চা-ই চীন দেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ অতি সামান্য। ভারত চা-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় এবং চা-রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের আসাম অঞ্চলেই (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) চা-এর উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। তবে

দার্জিলিং-সন্নিহিত হিমালয়ের পর্বতগাত্রে যে চা উৎপন্ন হয় তাহা অতি সুগন্ধযুক্ত এবং উচ্চশ্রেণীর। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চতর অংশেও চা উৎপন্ন হয়। পশ্চিম হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় সবুজ চা উৎপন্ন হয়। মধ্য ও দক্ষিণ **জাপানের** পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে প্রচুর চা জন্মে। জাপানে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য সবুজ চা উৎপন্ন হয়। **ফরমোজার** উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। এখানকার উলং চা স্বাদে
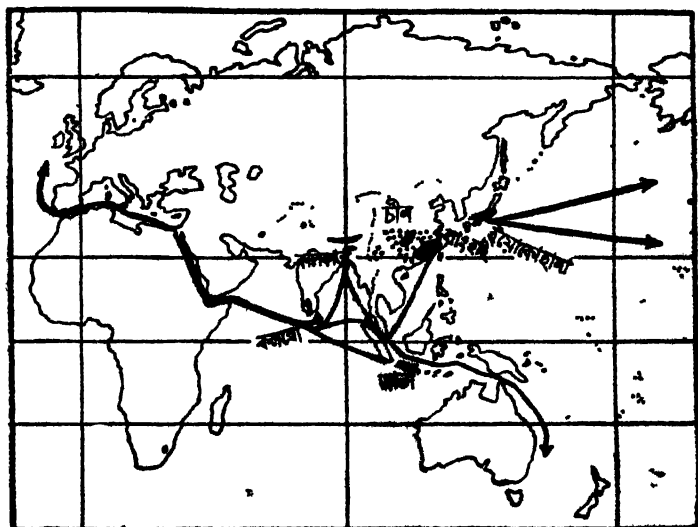
৩১নং চিত্র—চা উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক দেশ ও বন্দরসমূহ

ও গন্ধে অতুলনীয়। এই চা প্রচুর পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া যায়। **ইন্দোনেশিয়ার** অন্তর্গত জাভা দ্বীপের পশ্চিমাংশে আগ্নেয় পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে। জাভার চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অধুনা সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও উচ্চশ্রেণীর প্রচুর চা উৎপন্ন হইতেছে। **সিংহলের** দক্ষিণ দিকের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। **পূর্ব পাকিস্তানের** শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। (২) **আমেরিকা**—দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রভৃতি অঞ্চলে জলবায়ু অনুকূল হইলেও, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য-হেতু চা-এর উৎপাদন অতি সামান্য। (৩) **অন্যান্য অঞ্চলসমূহ**—পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ফিজি, ট্রান্সককেশিয়া, জ্যামেইকা, দক্ষিণ ব্রহ্ম, টংকিং, প্রণালী উপনিবেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—চা-রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম এবং সিংহল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চীন, জাপান এবং জাভাও চা রপ্তানী করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও দঃ আফ্রিকা

চা-এর প্রধান আমদানীকারক দেশ। বর্তমানে রুশিয়া চা-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন চা-এর প্রধান ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ্র। ভারতের কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ; সিংহলের কলম্বো; এবং ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা বিখ্যাত চা-রপ্তানীর বন্দর।

চা-এর শ্রেণীবিভাগ (Classification of tea)—বহির্বাণিজ্যে যে সমস্ত চা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—কালো চা ও সবুজ চা। ইহাদের পার্থক্য চা তৈয়ারীর প্রণালীর উপর নির্ভর করে। ভারত, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানতঃ কালো চা প্রস্তুত হয়। জাপান প্রচুর পরিমাণে সবুজ চা প্রস্তুত করে। চীনদেশে কালো ও সবুজ চা প্রায় সমপরিমাণে উৎপন্ন হয়।

চা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ পরিকল্পনা (International Tea Restriction Scheme)—১৯২৯ সালের পর হইতে পৃথিবীতে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাস পাইতে থাকায় পৃথিবীর চা-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে চা-এর উৎপাদন, রপ্তানী এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণকল্পে ভারত, সিংহল ও জাভা এই তিনটি দেশ 'আন্তর্জাতিক চা বিধিনিষেধ পরিকল্পনা' নামক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সালে এই পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়, এবং ঐ বৎসরই এই পরিকল্পনার মেয়াদ আবার পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে এই পরিকল্পনা ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯৫২ সালে ভারত এই পরিকল্পনার সভ্যপদ ত্যাগ করে। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং "টি কাউন্সিল অফ্ ইউ. এস. এ." নামক একটি সঙ্ঘও স্থাপিত হয়। বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক চা-এর বাজার অনুসন্ধানী সঙ্ঘ' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক প্রচার-কার্য চালাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাতে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থও হইয়াছে।

কফি (Coffee)—কফি এক জাতীয় উদ্ভিদের ফল।

কফি চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for coffee)—চা-এর ন্যায় কফিও উষ্ণমণ্ডলের ফসল। কফি চাষের পক্ষে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল :—(১) বাৎসরিক গড় উত্তাপ অন্ততঃ ৭০° ফাঃ এবং উত্তাপের তারতম্য ৪১° ফাঃ—৯৫° ফাঃ-এর মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। (২) প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮৫" হইতে ১২০" পর্যন্ত) কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গাছের বৃদ্ধি এবং ফল ধরিবার সময়ই বেশী বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। (৩) কফিক্ষেত্র উর্বর জৈব ও উদ্ভিজ্জপদার্থযুক্ত হওয়া দরকার। ক্ষেত্রে উত্তম মাটির জিবার এবং জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকা অত্যন্ত

প্রয়োজন। (৪) তুহিন, প্রখর রৌদ্র এবং প্রবল ঝাড়্যা কফি-গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই কারণে কফিগাছ, অন্ততঃপক্ষে চারা-অবস্থায়, অন্যান্য গাছের ছায়ায় অথবা আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। (৫) ফল পাকিবার ও তুলিবার সময় প্রচুর সূর্যকিরণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। (৬) ফল তুলিবার জন্য এবং ফলের বীজকে চূর্ণ করিয়া পানীয় কফি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। (৭) উচ্চতর ভূখণ্ডে উত্তমস্বাদযুক্ত কফি প্রস্তুত হয়।

কফি-গাছের বৃদ্ধি এবং ফলধারণের জন্য তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন। কফি-গাছে একবার ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে একযোগে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ফল দিতে থাকে। ফলের বীজগুলিকে রৌদ্রে ও ছায়ায় শুকাইয়া পরে উহাকে অল্প আঁচে ভাজিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—কফি চাষের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত মহাদেশগুলির পূর্বপ্রান্তের পর্বতগাত্রে অথবা মালভূমির ঢালে অবস্থিত। দঃ আমেরিকার ব্রাজিলে
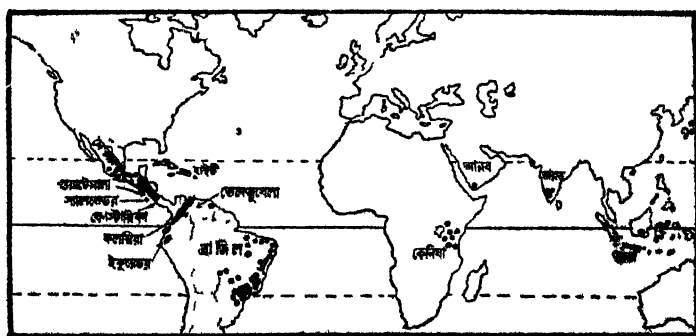
৩২নং চিত্র—কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে (পৃথিবীর প্রায় ৬০%) কফি জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ ব্রাজিলের সাওপলো অঞ্চলেই ব্রাজিলের অধিকাংশ কফি জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, গিয়ানা এবং বলিভিয়া রাজ্যে, মেক্সিকোয়; মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা, স্যান স্যালভেডর, ও কোস্টারিকায়; পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জ্যামেইকা ও হাইতীতে, আফ্রিকার কেনিয়া, লাইবেরিয়া, ট্যাঙ্গানিকা ও অ্যাঙ্গোলাতে, সিংহলে; জাভায়; আরবের ইয়েমেন প্রদেশে ও ভারতের দক্ষিণাংশে কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন প্রদেশের 'মোকা' কফি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। তবে জলসেচ-ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, যানবাহনের অসুবিধা, অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং

শাসনতন্ত্রের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে যোকা কফির উৎপাদন অতি সামান্ত। পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র কফির প্রায় ৭৫ ভাগই দক্ষিণ আমেরিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত কফির প্রায় ৬০%ই ব্রাজিল **রপ্তানী** করিয়া থাকে। কলম্বিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, ভারত প্রভৃতি দেশও কফি রপ্তানী করিয়া থাকে। পৃথিবীতে উৎপন্ন কফির অর্ধেকেরও অধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **আমদানী** করে। ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে কফি আমদানী করে।

১৯৪৬ সালে "আন্তরামেরিকান কফি বোর্ড" পৃথিবীর কফি-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমদানীকারক দেশসমূহের অনুন্নত জীবনমান ও ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস, রপ্তানীর ব্যয়বৃদ্ধি, ইউরোপীয় দেশসমূহে মুদ্রামূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আমদানী-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য পানীয় ফসলের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা এবং অল্প মূল্যে পরিবর্ত সামগ্রীর বিপুল ব্যবহার এই শিল্পের প্রসারের পক্ষে **অন্তরায়** হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৩) অপরাপর খাদ্য ফসল

চিনি (Sugar)—নানাপ্রকার গাছের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রধানতঃ ইক্ষু এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীট হইতে অধিক চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট চিনির প্রায় ⅔ ভাগ ইক্ষু হইতে ও ⅓ ভাগ বীট হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

ইক্ষু (Sugarcane)—ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

ইক্ষু চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for sugarcane)—নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ইক্ষু-চাষের পক্ষে অনুকূল: (১) সারা বৎসর ধরিয়া প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৬০°-৮০° ফাঃ পর্যন্ত হওয়া দরকার। (২) বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ৪০"-৭০" পর্যন্ত হওয়া দরকার। বৃষ্টিপাত ইহা অপেক্ষা অল্প হইলে জলসেচব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অত্যধিক বৃষ্টি হইলে ইক্ষুর রস পাতলা হয় এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। (৩) চুন ও লবণ যুক্ত ফাঁপা, উর্বর, দো-আঁশ মাটি ইক্ষু চাষের উপযোগী। জমিতে মাঝে মাঝে সার দিবার বন্দোবস্ত থাকা ভাল। ইক্ষু ক্ষেত্রে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। (৪) ইক্ষু ক্ষেত্র তুহিনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৫) ফসল পাকিবার ও কাটিবার সময় আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৬) প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। (৭) সমুদ্রবায়ুর প্রভাব ইক্ষু-চাষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও বিশেষ অনুকূল। উপরোক্ত অবস্থাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত স্থানে

ধান-চাষ হইতে পারে সেই সমস্ত স্থানে ইক্ষুও জন্মে। কিন্তু ইক্ষুক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে ইক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রান্তীয় নিম্ন অঞ্চল, বিশেষতঃ ক্রান্তীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উপকূলাঞ্চল, ইক্ষু চাষের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

উৎপাদক অঞ্চল (**Areas of production**)—পৃথিবীর ইক্ষু চাষের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি ৩০° উঃ এবং ৩০° দঃ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ভারত, কিউবা, জাভা, হাওয়াই, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মরিসাস, সুমাত্রা ও জ্যামেইকা ইক্ষু চাষের প্রধান কেন্দ্র। চীন দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে, ব্রাজিলের উষ্ণ ও আর্দ্র পূর্ব উপকূলে; যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে ও মিসিসিপির বদ্বীপে, আফ্রিকার নাটালে ও মিশরে; অস্ট্রেলিয়ার কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে, এবং ডোমিনিকা ও ফরমোসাতেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

ইক্ষু-উৎপাদনে ভারত প্রথম এবং কিউবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু জাভা, মরিসাস প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতের একর-প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। একর প্রতি ভারত মাত্র ১৫ টন, কিন্তু কিউবা ১৭ টন, জাভা ৫৬ টন ও হাওয়াই ৬২ টন ইক্ষু উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (**Trade**)—কিউবা, ব্রাজিল, হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ফরমোসা, মরিসাস, পোর্টোরিকো, জ্যামেইকা ও মিশর ইক্ষু-চিনি **রপ্তানী** করে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু-চিনি **আমদানী** করে। ভারত ইক্ষু-উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও, আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর থাকায় উৎপন্ন চিনির অতি সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে।

(খ) **বীট** (**Sugar beet**)—বীট নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ফসল। এই গাছের মূল হইতে চিনি উৎপন্ন হয়।

বীট চাষের অনুকূল অবস্থা (**Conditions of growth for sugar beet**)—নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বীট চাষের পক্ষে অনুকূল :—(১) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ গড়ে ৬৭°-৭২° ফাঃ হওয়া প্রয়োজন। (২) গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত (২০″-৪০″) এবং প্রায় ৫ মাস কাল উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন। (৩) সূর্যকিরণ অধিক হইলে বীটের মূলে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। (৪) চুন-সংযুক্ত, কংকরহীন, উর্বর দো-আঁশ মাটি বীট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রতিবৎসরই বীটের জমিতে সার দিলে ভাল হয়। (৫) বীট তুলিবার জন্য প্রচুর সূর্যালোকযুক্ত দিন প্রশস্ত। (৬) প্রচুর নিপুণ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন। মহাদেশীয় জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত নিতান্ত অল্প নহে এবং যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল, সেই সমস্ত স্থানেই বীটের চাষ হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বর্তমানে ইউরোপে ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী (ম্যাগডেবার্গ সন্নিহিত অঞ্চল), চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমেনিয়ার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম রুশিয়া, (ট্রান্স-ককেশিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া, এবং দক্ষিণ ও মধ্য রুশিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বীটের চাষ হইতেছে। দঃ সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইতালীতেও বীটের চাষ হইয়া থাকে। বর্তমানে বীট উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার প্রেয়রী অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে বীটের চাষ হয়।

৩৩ নং চিত্র—পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ
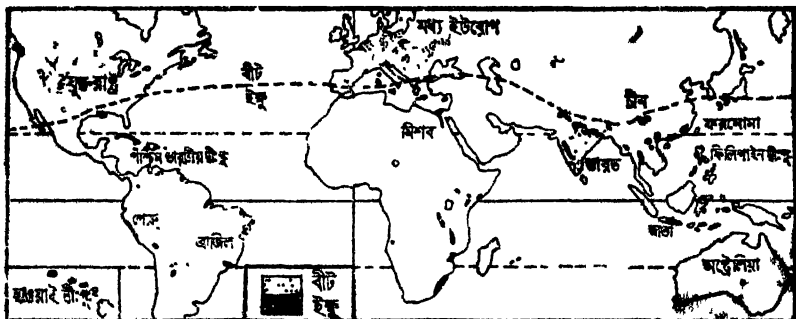
বাণিজ্য (Trade)—বীট প্রধানতঃ স্থানীয় প্রয়োজনেই উৎপন্ন ও ব্যয়িত হইয়া থাকে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার তেমন প্রসিদ্ধি নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরী ব্যতীত অন্যান্য বীট-উৎপাদক অঞ্চলগুলি স্ব স্ব উৎপাদনের অধিকাংশই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যয় করে বলিয়া উহারা বীট চিনি বিদেশে **রপ্তানী** করিতে পারে না। যুক্তরাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বীট-চিনি **আমদানী** করে।

[বর্তমানে চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সংরক্ষিত বাণিজ্য ও অবাধ বাণিজ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রতিবৎসর গড়ে ১২ মিঃ টন চিনি বহির্বাণিজ্যের পণ্যরূপে ব্যবহৃত হয় (বার্ষিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ৩৫ মিঃ টন)। তবে, ইহার মধ্যে মাত্র ৫ মিঃ টন অবাধ বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৩ সালের আগষ্টমাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তির দ্বারা চিনির এই অবাধ বাণিজ্যের অংশটি নিয়ন্ত্রণ করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে মোট রপ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৫·৩৯ মিঃ টন এবং ইহার মধ্যে কেবলমাত্র কিউবার-ই রপ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ২·২৩ মিঃ টন। পৃথিবীর সর্বপ্রধান শর্করা-আমদানীকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র কিউবা, পোর্টোরিকো ও হাওয়াই হইতে সংরক্ষিত বাণিজ্যের অংশ হিসাবে চিনি গ্রহণ করিয়া থাকে।]

(৪) তন্তুময় শিল্প ফসল

কার্পাস (Cotton)—কার্পাস ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

কার্পাস চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for

cotton)—কার্পাস চাষের পক্ষে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল: (১) অঙ্কুরোদ্গম ও প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ২০″ হইতে ৪৭″ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত এবং গাছে গুটি ধরিবার পর ক্রমক্ষীয়মাণ বৃষ্টিপাত। (২) অঙ্কুরোদ্গমের সময় গড়-উত্তাপ প্রায় ৭৫° ফাঃ। প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ক্রমবর্ধমান তাপ, এবং গাছ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ক্ষীয়মাণ তাপ বিশেষ কার্যকরী। (৩) উত্তম শ্রেণীর আঁশ জন্মাইতে হইলে গুটি বাহির হইবার পর হইতে পর্যাপ্ত উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়া। (৪) গুটি তুলিবার সময় অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়া (৫) উর্বর, হাল্কা, লবণাক্ত, চুনসম্পন্ন ও জলনিষ্কাশনক্ষম গভীর দো-আঁশ মাটি মাটি সর্বদা আর্দ্র থাকা প্রয়োজন, তবে জলদ্বারা পরিপ্লুত হইলে গাছ মরিয়া যায়। (৬) জমিতে মধ্যে মধ্যে সার দিবার ব্যবস্থা। (৭) উত্তম শ্রেণীর কার্পাস চাষের জন্য প্রায় সাত মাস কাল তুহিনমুক্ত আবহাওয়া। (৮) সামুদ্রিক বাতাস কার্পাস-গাছের পুষ্টিসাধন করে, এজন্য সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহেই সর্বোত্তম কার্পাসের চাষ হয়। (৯) কার্পাসের চাষ, জমির তত্ত্বাবধান এবং গুটি তুলিবার জন্য প্রচুর জনমজুরের সরবরাহ।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—আঁশের দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, মসৃণতা, ঔজ্জ্বল্য, রং, দৃঢ়তা প্রভৃতি বিচার করিয়া কার্পাসকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারিটি বর্গে ভাগ করা হয়। **১ম বর্গ:** তন্তুর দৈর্ঘ্য ১⅛″-২¼″। ইহা প্রায় রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও মসৃণ। ঔজ্জ্বল্য ও দৃঢ়তায়ও অদ্বিতীয়। ইহাকে **দীর্ঘতন্তু** বা **সাগরদ্বীপীয় কার্পাস** বলে। মিশর, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ইহার চাষ হইতেছে। **২য় বর্গ:** তন্তুর দৈর্ঘ্য ১⅛″-র উপরে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে **মধ্যতন্তু** বা **মিশরীয় কার্পাস**। মিশর, পেরু, উঃ ব্রাজিল, এবং পূঃ আফ্রিকার উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানিকার অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গের। **৩য় বর্গ:** তন্তুর দৈর্ঘ্য ⅞″-১⅛″। ইহা হইল **হ্রস্বতন্তু** বা **উচ্চভৌমিক কার্পাস**। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রুশিয়া প্রভৃতির অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গের। ভারত ও পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশের মতো কার্পাসও এই জাতীয়। চীন ও আফ্রিকায় যে কার্পাস জন্মে তাহার একাংশ এইরূপ। **৪র্থ বর্গ:**—তন্তুর দৈর্ঘ্য ⅞″ ইঞ্চিরও কম। ইহাকে **খর্বতন্তু কার্পাস** বলা চলে। চীন, ভারত এবং প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ কার্পাস এই বর্গের। চলতি ভাষায় (১) **সাগরদ্বীপীয়**, (২) **মিশরীয়**, (৩) **উচ্চভৌমিক** এবং (৪) **পেরুভৌমিক** নামে কার্পাসের যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাহা বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ নহে। তবে এ ভাবে ভাগ করিলে বলিতে হয় যে, সাগরদ্বীপীয় কার্পাস উৎকৃষ্টতম এবং পেরুভৌমিক কার্পাস নিকৃষ্টতম। পেরুভৌমিক কার্পাস অনেকটা পশমের ন্যায় রুক্ষ ও স্থূল, এবং উহা সাধারণতঃ পশম বস্ত্রাদির সহিত সংমিশ্রণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—**উত্তর আমেরিকা** মহাদেশের **যুক্তরাষ্ট্রই** পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসবলয়টি ঐ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের উপসাগরীয় জলবায়ুসেবিত অঞ্চলের অন্তর্গত। এই বলয়টি পশ্চিমে ২৩" সমবর্ষণরেখা, দক্ষিণে ৬০" সমবর্ষণরেখা, উত্তরে ৭৭° ফাঃ জুলাই সমোষ্ণরেখা (এই রেখার দক্ষিণাংশে বৎসরে প্রায় ২০০টি দিন তুহিনমুক্ত আবহাওয়া বর্তমান) এবং পূর্বে প্রায় আটলান্টিক উপকূলরেখার দ্বারা আবদ্ধ। এই বলয়টির অন্তর্গত টেকসাস ও আলাবামার কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল এবং মিসিসিপি অববাহিকার পলি-সমৃদ্ধ অঞ্চলেই কার্পাসের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসের অধিকাংশই হ্রস্বতন্তু উচ্চভৌমিক কার্পাস, তবে মিসিসিপি অববাহিকা এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনায় দীর্ঘতন্তু কার্পাসেরও চাষ হইয়া থাকে। এই কার্পাস-বলয়টির বহির্ভূত ক্যালিফোর্নিয়ার ইম্পিরিয়াল অববাহিকা এবং আরিজোনার
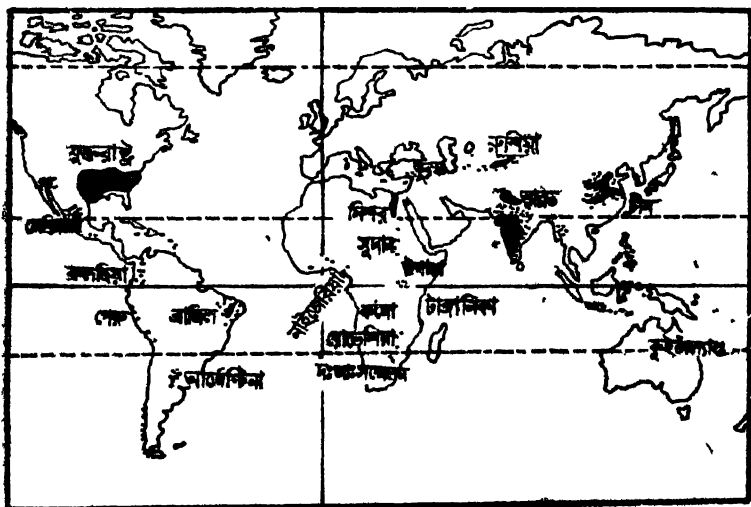
৩৪নং চিত্র—পৃথিবীর কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

সল্ট নদীর অববাহিকায় মিশরীয় ও দীর্ঘতন্তু কার্পাসের চাষ অধিক। শরৎকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং মৃত্তিকার অনুর্বরতা-হেতু উপসাগরীয় উপকূলাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ফ্লোরিডায় কার্পাসের চাষ অসম্ভব। **মেক্সিকোতে** প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রাজিল, পেরু ও আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। **এশিয়া** মহাদেশের অন্তর্গত ভারতে প্রধানতঃ হ্রস্বতন্তুযুক্ত ও পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে) দীর্ঘ এবং মধ্যম তন্তুযুক্ত কার্পাসের চাষ হয়। চীন দেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় এবং উত্তরের সমভূমিতে কার্পাস জন্মে। চীন দেশে

উৎপাদিত অধিকাংশ কার্পাস আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। চোজেন, তুরস্ক, ইরান এবং ইরাকও সামান্য পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন করে। সমগ্র **ইউরোপ** মহাদেশে কার্পাসের উৎপাদন অতি সামান্য। একমাত্র **রুশিয়াই** (২য়) তাহার আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় অনুরূপ পরিমাণ কার্পাস জন্মাইয়া থাকে। সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান, এবং ককেসাস, ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চল কার্পাস চাষের পক্ষে অনুকূল। **আফ্রিকা** মহাদেশে অবস্থিত মিশরের নীলনদের অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে। সুদান, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনেও প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। **অস্ট্রেলিয়ার** ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বিশেষতঃ কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যেও, কার্পাসের চাষ হয়।

বাণিজ্য (Trade)—বহির্বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত কার্পাসের প্রায় ৫০%ই যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিউ অরলিয়ঁ, স্যাভানা ও গ্যালভেস্টন বন্দর দিয়া বিদেশে **রপ্তানী** করে। পাকিস্তান, মিশর, ব্রাজিল, পেরু, উগাণ্ডা, সুদান প্রভৃতি দেশও কার্পাস রপ্তানী করে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, পাকিস্তানের করাচী, ব্রাজিলের স্যালভেডর ও রায়োডিজেনেরো বিখ্যাত কার্পাস রপ্তানীর বন্দর। যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালী প্রচুর পরিমাণে কার্পাস **আমদানী** করিয়া থাকে। মিশর ও পাকিস্তান হইতে ভারত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস আমদানী করে।

পাট (Jute)—পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের একচেটিয়া সম্পদ।

পাট চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for jute)—পাট চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল—(১) বার্ষিক গড় উত্তাপ ৮০° ফাঃ-এরও অধিক হওয়া প্রয়োজন। (২) বৃষ্টিপাত ৮০″-রও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বীজবপনের সময় ও চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে প্রবল বৃষ্টিপাত পাট চাষের-পক্ষে ক্ষতিকারক। (৩) উর্বর পলিমাটি বা দোআঁশ মাটি পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী। (৪) যে সমস্ত নিম্ন সমতল ক্ষেত্রে জল জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাট-চাষের অনুকূল। কিছু পাট উচ্চভূমিতেও জন্মে। (৫) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিক হওয়া পাট-চাষের পক্ষে অনুকূল। (৬) পাট-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। অতএব ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে লোকবসতি ঘন, বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা অধিক এবং মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর পাট-চাষ হয়। পাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্তু।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও গঙ্গার ব-দ্বীপাঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া এবং

রাজসাহী জেলাতেই ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ করা হয়। সম্প্রতি ভারতের উঃ প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এবং মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যেও পাটের চাষ করা হইতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের মোট ৯৫ ভাগ পাট উৎপাদন করে—তন্মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানই ৭০-৭৫ ভাগ। পূর্ব-পাকিস্তানের পাট অতি উচ্চশ্রেণীর। সিংহল, ফরমোসা, চীন, মালয়, মিশর, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাট বা পাটজাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বাণিজ্য (Trade)—পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্তানীকারক দেশ। এই দেশের চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর হইতে প্রচুর পাট ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা, জাপান, ইতালী এবং আর্জেন্টিনাতে **রপ্তানী** হইয়া যায়। ভারত হইতে পাটজাত সামগ্রী—চট, থলে প্রভৃতি—রপ্তানী হয়।

পাটের পরিবর্ত সামগ্রী (Substitutes for jute)—আজ পর্যন্ত পাটের নানাবিধ পরিবর্ত সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রুশিয়ায় শণ, যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের থলে; যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত তন্তু; জাভায় রোজেলা তন্তু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি চুকাই বৃক্ষের আঁশ হইতে পাটের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভারতে গবেষণা চলিতেছে। তবে এই সমস্ত পরিবর্ত সামগ্রীর বাণিজ্যিক সাফল্য এখনও নিরূপিত হয় নাই।

অতসী (Flax)—অতসীর বহিরাবরণ হইতে তন্তু উৎপন্ন হয়। এই তন্তু মসৃণ, সুদৃশ্য এবং কার্পাস অপেক্ষা দৃঢ়তর। সূক্ষ্ম তন্তু হইতে 'লিনেন' ও স্থূল তন্তু হইতে ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

অতসী চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for flax)—বীজের জন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং তন্তুর জন্য উপক্রান্তীয় ও শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই ইহার চাষ সীমাবদ্ধ। তন্তু-উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থায় অতসীর চাষ হইয়া থাকে :—(২) অতসী-চাষের জন্য আর্দ্র, প্রস্তরহীন, জলনিষ্কাশনক্ষম, উর্বর, অধিক বালিযুক্ত দো-আঁশ মাটি বিশেষ অনুকূল। (২) প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ১৫" হইতে ৩০" বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। (৩) উত্তাপ সাধারণতঃ ৩৫° ফাঃ হইতে ৫৫° ফাঃ-এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। (৪) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিক থাকা বাঞ্ছনীয়। (৫) অতসী ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সার দেওয়া প্রয়োজন। (৬) অতসী হইতে তন্তু বাহির করিতে প্রচুর জনমজুর আবশ্যক হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ইউরোপ মহাদেশের আয়র্ল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া হল্যাণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও বাল্টিক রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়া রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত

অতি বৃহৎ সমভূমিতে প্রচুর পরিমাণে অতসীর চাষ হয়। এই সমভূমির অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে রুশিয়া এবং পোল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অতসী উৎপাদন করে। বাল্টিক রাজ্যসমূহ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী, উত্তর ইতালী এবং আয়র্ল্যাণ্ডও অতসী উৎপাদন করে। বেলজিয়ামের ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে সর্বোৎকৃষ্ট অতসী জন্মে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে বীজের জন্য অতসীর চাষ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য (Trade)—অতসী তন্তুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অতি সামান্য। রুশিয়া, বাল্টিক রাজ্যসমূহ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম বহুল পরিমাণে অতসীর তন্তু **রপ্তানী** করে, এবং গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান ও বেলজিয়াম অতসী **আমদানী** করিয়া থাকে।

শণ (Hemp)—কয়েক শ্রেণীর শণের পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হয়। শণের তন্তু অত্যন্ত দৃঢ়। ইহার দ্বারা প্রধানতঃ রজ্জু, ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

শণ চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for hemp)—অতসীর ন্যায় বীজ এবং তন্তুর জন্য শণের চাষ হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রধানতঃ তন্তুর জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে। তন্তুর জন্য চাষ করা হইলে অতসী-তন্তুর চাষের অনুকূল অবস্থাগুলিই ইহার পক্ষে প্রযোজ্য, তবে শণের বৃদ্ধিকাল অল্প হওয়ায় (প্রায় ১১০ দিন) ইহার চাষ সাধারণতঃ অতসী-ক্ষেত্রের উত্তরাংশেই হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—রুশিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শণের চাষ করে। ইতালীতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর শণ উৎপন্ন হয়, তবে ইতালীর উৎপাদন অতি সামান্য। পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কোরিয়া এবং ভারতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শণের চাষ হয়। শণের পাতা হইতে ভারতে ভাঙ্গ ও গাঁজা প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—ইতালী প্রধান শণ-রপ্তানীকারক দেশ। গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স এবং জাপান প্রধান শণ-আমদানীকারক দেশ।

শণের শ্রেণীবিভাগ (Classification)—তন্তুপ্রদায়ী শণ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা—(১) **আসল শণ—(true hemp)**—রুশিয়া, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ হয়। এই শণ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) **ম্যানিলা শণ**—ইহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়। এই শণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহার দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জু ও কাগজ তৈয়ারী হয়। (৩) **সিসাল শণ**—মেক্সিকো, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই, কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকায় এই নামে উৎকৃষ্ট শণ উৎপন্ন হয়। ইহা ম্যানিলা শণ অপেক্ষা সস্তা, ইহা দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত হয়। (৪) **ফরমিয়াম্**—এই শণ নিউজীল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়।

রেশম : রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা—(**Conditions for the production of silk**)—গুটিপোকা হইতে কীটজ রেশম পাওয়া যায়। বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে গুটিপোকা পালন করিতে হইলে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৬০° ফা: হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইতে হইলে একাদিক্রমে এগার মাস ধরিয়া ডিমগুলিকে ৬৪° ফা: উত্তাপের মধ্যে রাখা দরকার। ডিম ফুটিয়া যে রেশম-কীট বাহির হয় উহা কিছুদিন পরে নিজের দেহ হইতে নিঃসৃত লালার দ্বারা একটি আবরণ বা গুটি (cocoon) সৃষ্টি করে (গুটির গড় আয়তন ১"×$\frac{3}{8}$")। এই গুটিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে রেশম বাহির করা হয়। এক একটি গুটি হইতে ৩০০-৫০০ গজ অতি সূক্ষ্ম রেশমী সূতা পাওয়া যায়। কয়েকটি গুটি হইতে সূতা বাহির করিয়া একত্রে পাক (reel) দিয়া বয়ন-উপযোগী সূতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

গুটিপোকা প্রধানতঃ তুঁত গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এক পাউণ্ড ওজনের ডিম হইতে যতগুলি গুটিপোকা বাহির হয় সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রায় ১০ টন তুঁত পাতার (mulberry leaves) প্রয়োজন হয়। প্রতি টন পাতার জন্য গড়ে ৩০।৪০টি তুঁত গাছের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় ৩৫° সমাক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তুঁতগাছ জন্মায়। তুঁত গাছের চাষ, গুটিপোকা পালন এবং গুটিপোকা হইতে রেশম উৎপাদন প্রভৃতি কার্যে বহু দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে ঘনবসতিপূর্ণ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে প্রচুর তুঁত গাছ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলেই কীটজ রেশম উৎপাদিত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—(**Areas of production**)—পৃথিবীতে তিনটি প্রধান কীটজ রেশম উৎপাদক অঞ্চল রহিয়াছে : (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ—ইহাদের মধ্যে (ক) চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকা, লোহিত পর্বত ও সাংটাং উপদ্বীপাঞ্চল ; (খ) জাপানের নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ ও সিওয়া নদীর মোহানা-সংলগ্ন অঞ্চল ; (গ) কোরিয়া ; (ঘ) ভারতের বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মহীশূর ও কাশ্মীর এবং (ঙ) ইন্দোচীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত এই দেশগুলি পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৮০% কীটজ রেশম উৎপাদন করে। কীটজ রেশম উৎপাদনে ও রপ্তানীতে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। (২) পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ, যথা—ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক ইত্যাদি। এই সমস্ত দেশে উৎপন্ন কীটজ রেশমের পরিমাণ অতি সামান্য। (৩) ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসমূহ—ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলিই উল্লেখযোগ্য : (ক) ইতালী—পো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে ইতালীর প্রায় সমুদয় এবং ইউরোপের প্রায় ৯০% কীটজ রেশম উৎপন্ন হয়। বোলোনা, মিলান ও লুকা ইতালীর বিখ্যাত রেশমকেন্দ্র।

(খ) ফ্রান্সের রোণ নদীর উপত্যকা অঞ্চলে রেশম উৎপন্ন হয়। লিয়ঁ এই অঞ্চলের প্রধান রেশম-কেন্দ্র। (গ) স্পেন, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও রুশিয়াও সামান্য পরিমাণে রেশম উৎপাদন করে। বর্তমানে দঃ আমেরিকার ব্রাজিলেও সামান্য পরিমাণে কীটজ রেশম উৎপন্ন হইতেছে।
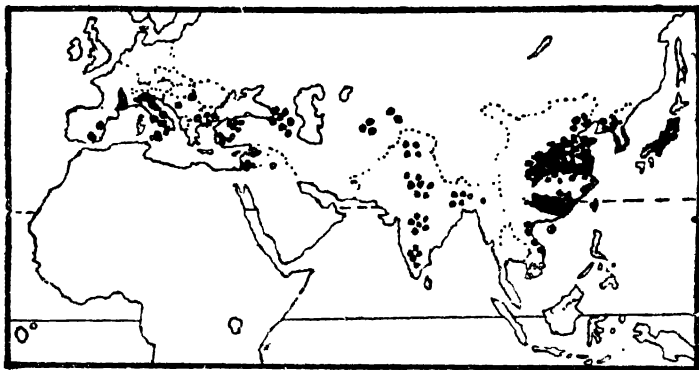
৩৫নং চিত্র—পৃথিবীর রেশম উৎপাদক দেশসমূহ

বাণিজ্য (Trade)—জাপান, চীন, ইতালী ও তুরস্ক কীটজ রেশম **রপ্তানীতে** পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড কীটজ রেশমের প্রধান **আমদানীকারক দেশ**।

[বয়নশিল্পে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান তন্তুময় ফসলগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) উদ্ভিজ্জ তন্তু। ইহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে, যথা—(ক) গুটিজাত তন্তু (কার্পাস) (খ) পাতাজাত তন্তু (শণ, এ্যাবাকা) এবং (গ) বহিরাবরণ তন্তু (পাট, অতসী) এবং (২) প্রাণীজ তন্তু, যথা—(ক) রেশম ও (খ) পশম। ব্যবহার হিসাবে এই তন্তুময় ফসলগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ; যথা—(১) বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত তন্তু—রেশম, পশম, কার্পাস, অতসী প্রভৃতি এবং (২) রজ্জুশিল্পে ব্যবহৃত তন্তু—পাট, শণ প্রভৃতি।]

(৫) অপরাপর শিল্প ফসল

তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল (Oilseeds & vegetable oil)—বহু প্রকার গাছের ফল ও বীজ হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল সংগৃহীত হয়। মোমবাতি, সাবান, মার্গারিন, রং প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য উদ্ভিজ্জ তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

জলপাই (Olive) **ও জলপাইয়ের তৈল**—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। জলপাই-এর তৈল সাবান ও মার্গারিন তৈয়ারীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেন এই তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি প্রধান **আমদানীকারক** দেশ।

বাদাম (Groundnut) ও বাদাম তৈল—পশ্চিম আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বাদাম হইতে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়। ভারত বাদাম তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** দেশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানী প্রধান **আমদানীকারক** দেশ। রন্ধনকার্যে ও সাবান তৈয়ারীর জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এরণ্ড (Castor) ও এরণ্ড তৈল—ভারত (১ম), জাভা, ব্রাজিল, ইন্দোচীন এবং মাঞ্চুরিয়াতে এরণ্ড ফলের বীজ হইতে প্রচুর এরণ্ড বা রেড়ির তৈল উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে এই বীজ ও তৈল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে **রপ্তানী** হইয়া যায়। ঔষধ ও সাবান তৈয়ারীর জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে এই তৈলের ব্যবহার ব্যাপক।

নারিকেল (Cocoanut) ও নারিকেল তৈল—উষ্ণমণ্ডলের দ্বীপসমূহে এবং সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। নারিকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে নারিকেল তৈল উৎপন্ন হয়। খাদ্য ও কেশতৈল হিসাবে, মার্গারিন ও সাবান তৈয়ারীর জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তিসি (Linseed) ও তিসির তৈল—আর্জেন্টিনা, ইতালী, রুশিয়া, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ডে তিসির চাষ অধিক। ঐ সমস্ত অঞ্চলেই তিসির বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। তবে তিসির তৈল উৎপাদনে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা, ভারত এবং রুশিয়া তিসি ও তিসির তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** এবং গ্রেট ব্রিটেন প্রধান **আমদানীকারক** দেশ। এই তৈল বার্নিশ, রং ও অয়েলক্লথ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তাল (Palm) তৈল—একপ্রকার তালজাতীয় উদ্ভিদের ফলের শাঁস হইতে তাল তৈল পাওয়া যায়। এই জাতীয় তাল গাছ নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরা লিয়ন ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর জন্মে। পৃথিবীর প্রায় ৯০% তাল তৈল নাইজেরিয়া, ঘানা এবং সিয়েরা লিয়ন হইতে আসে। সাবান, মোমবাতি, মার্গারিন প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে এই তৈল ব্যবহৃত হয়।

কার্পাস বীজের (Cotton seed) তৈল—যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর এবং উগাণ্ডাতে কার্পাস বীজ হইতে প্রচুর তৈল নিষ্কাশিত হয়। খাদ্য হিসাবে, এবং সাবান, মোমবাতি ও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারীতে এই তৈল ব্যবহৃত হয়।

সয়াবিন (Soyabean) ও সয়াবিনের তৈল—মাঞ্চুরিয়া, জাপান, চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর সয়াবিন ও উহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ সয়াবিন তৈল মাঞ্চুরিয়াতে উৎপন্ন হয়। চীনে এই

তৈল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্যও এই তৈলের ব্যবহার হয়।

রবার (Rubber)—নিরক্ষীয় অঞ্চলের কয়েকটি বৃক্ষের ঘনীভূত রস হইতে রবার উৎপন্ন হয়। ভূমিজ রবার দুই প্রকারের—বন্য রবার ও আবাদী বা কৃষিজ রবার। বন্য রবার-বৃক্ষ আমাজন ও কঙ্গো নদীর অববাহিকার অরণ্যে জন্মে।

বন্য রবার সংগ্রহের বহু অসুবিধা রহিয়াছে, যথা—(১) দুর্গম অরণ্য হইতে ইহার সংগ্রহ অতি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য, (২) এই সমস্ত অঞ্চলে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নাই এবং কোন কোন উৎপাদক অঞ্চল ক্রয়বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত; (৩) অরণ্যে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল। অপর পক্ষে বন্য রবার অপেক্ষা আবাদী রবার (ক) উৎকৃষ্ট; (খ) বৃক্ষ প্রতি ইহার উৎপাদন বন্য রবার অপেক্ষা অধিকতর, (গ) ইহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য; (ঘ) ইহার সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, (ঙ) আবাদী রবারক্ষেত্রগুলি জনবহুল অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় এই সমস্ত স্থানে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ প্রচুর, এবং (চ) আবাদী রবার অঞ্চলগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য-পথের অন্তবর্তী। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত রবারের শতকরা ৯০ ভাগই আবাদী রবার।

রবার চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for rubber)—রবার প্রধানতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল। ইহার চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল:—(১) সারা বৎসর ধরিয়া ৮০° ফাঃ বা ততোধিক উত্তাপ। মাসিক উত্তাপ ৭০° ফাঃ-এর অল্প হওয়া রবার বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক। (২) বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ৮০" হইতে ২০০"র মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাসিক বৃষ্টিপাত ২"র অধিক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অপরাহ্নে হইলেই ভাল হয়, কারণ ইহাতে প্রাতে রবার বৃক্ষ হইতে রবার-সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। একাদিক্রমে বহুদিন অনাবৃষ্টি রবার বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক। (৩) গভীর, উর্বর, দো-আঁশ মাটি রবার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (৪) রবার-ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইলে বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এই কারণে আবাদী রবারের ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ পর্বতের ঢালে অবস্থিত। (৫) রবার বৃক্ষের বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া নিপুণতার সহিত রস সংগ্রহ করিতে, ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিতে এবং সতত বৃক্ষের তত্ত্বাবধান করিতে প্রচুর সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৯৮ ভাগ আবাদী রবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয়, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সিংহল, ইন্দোচীন, শ্যাম ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কারণ (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় জলবায়ু রবার চাষের পক্ষে

আদর্শস্থানীয় অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা বা মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার ন্যায় অস্বাস্থ্যকর নহে ; (২) এই দেশগুলির অধিকাংশই পৃথিবীর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথসমূহের অন্তর্বর্তী ; (৩) এতদঞ্চলে সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিকেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং (৪) এতদঞ্চলে রবারের বৃহদায়তন আবাদগুলির অধিকাংশই বৈদেশিক (বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ) মূলধন সহায়তায় পুষ্ট। মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং সিংহল মিলিতভাবে পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ আবাদী রবার উৎপাদন করে।

৩৬নং চিত্র—পৃথিবীর রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

বাণিজ্য (Trade)—উৎপাদক দেশসমূহে রবার অতি সামান্যই ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেকেরও অধিক রবার ক্রয় করে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন এবং রাশিয়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রবার **আমদানী** করে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সমগ্র রবার চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ সরবরাহ করে। সিংহল, ব্রাজিল, বোর্নিও এবং ইন্দোচীন অন্যান্য প্রধান রবার **রপ্তানীকারক** দেশ।

রবার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ পরিকল্পনা (International Rubber Restriction Schemes)—১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর রবারের উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় যে আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময়ে রবারের সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ কল্পে 'ষ্টিভেন্সন পরিকল্পনা' (১৯২২-২৮) নামে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনাতে শুধু সিংহল, ভারত ও মালয় অংশ গ্রহণ করে। 'ষ্টিভেন্সন পরিকল্পনা'র ফলে রবারের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মূল্য-বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ধিত মূল্যের প্রেরণায় 'ষ্টিভেন্সন পরিকল্পনা'র বহির্ভূত দেশগুলি তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ফ'ল আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের মূল্য আবার হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত সমস্ত রবার উৎপাদক অঞ্চলগুলি রবারের উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্য আবার একটি আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু

বিগত যুদ্ধ ও জাপান কর্তৃক রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহের অধিকার এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কৃত্রিম বা বিশ্লেষিত রবার (Synthetic Rubber)—বিগত যুদ্ধের পূর্বে রবার সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জাপান, রুশিয়া এবং গ্রেটব্রিটেন কৃত্রিম রবার উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। আমেরিকাতে এ্যাসিটিলিন ('ডুপ্রেন' এবং 'থুপ্রেন') এবং পরিত্যক্ত খনিজ তৈল হইতে ('চেমিগাম'), জার্মানীতে ক্যালসিয়াম কারবাইড হইতে ('বুনা'), রুশিয়াতে 'সুরাসার' হইতে, জাপানে 'সয়াবিন' হইতে এবং যুক্তরাজ্যে 'কয়লা' হইতে কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে এই সমস্ত কৃত্রিম রবার সাধারণ রবারের মতই গুণসম্পন্ন। ১৯৫০ সাল হইতে বিশ্লেষিত রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাভাবিক রবারের চাহিদা ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল

(১) খাদ্য শস্য

ভারতের **খাদ্যশস্যের** মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব, রাই ও নানাপ্রকার ডাল প্রধান।

ধান—[চাষের অনুকূল অবস্থা পৃঃ ১২৯ দেখ] ভারতের কৃষিজ সম্পদগুলির মধ্যে ধানই প্রধান। 'মোট কর্ষিত ভূমির প্রায় ৩০% জমিতে প্রধানতঃ রোপণ পদ্ধতিতেই ধানের চাষ হইয়া থাকে। ভারতে উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমির ধানই অধিক।

উৎপাদক অঞ্চল—মাদ্রাজ (চিংলাপট্টি এবং তাঞ্জোর অঞ্চল), বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা (কটক, পুরী ও সম্বলপুর অঞ্চল), আসাম (কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল), মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—ভারতে তিন প্রকার ধানের চাষ হয়—(১) **আউশ** বা শরৎকালীন ধান, (২) **আমন** বা হৈমন্তিক ধান, এবং (৩) **বোরো** বা গ্রীষ্মকালীন ধান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে এই তিন শ্রেণীর ধানই উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশে আউশ ধানের উৎপাদন অধিক; তবে সমগ্র ভারতে আমন ধানের উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৭৬১'৪, ৭৭৮'৯ ও ৮৩৩'৪ লক্ষ একর জমিতে ২০২'৫, ২৭১'২ ও ৩৩৭'০ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন ধান জন্মে। ভারতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অতি সামান্য। তবে সম্প্রতি (১৯৫৩)

জাপানী প্রথায় ধান চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় একর প্রতি উৎপাদনের হার

৩৭নং চিত্র—ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত অধিক যে মাঝে মাঝে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ হইতে ধান ও চাউল আমদানী করিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন চাউল-উৎপাদক রাজ্যসমূহের মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসরই চাউলের ঘাটতি হয়। মাদ্রাজ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ আটা ও ময়দার ব্যবহার করিয়া চাউলের ঘাটতি মিটায়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হইলে ভারতে চাউলের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।
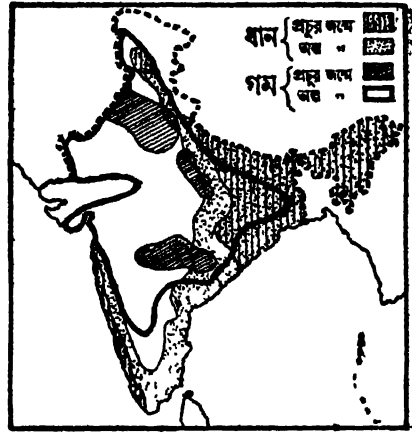
গম—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১২৫-২৬ দেখ] ভারতে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করিয়া মার্চ-এপ্রিল মাসে গম সংগ্রহ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—গম উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতে প্রথম এবং পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-ঘর্ঘরা এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপাদিত হয়। দেরাদুন, সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, সাহাজাহানপুর, বুদাউন, নৈনীতাল এবং গোরক্ষপুর এই রাজ্যের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে গম উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশ (নর্মদার অববাহিকা অঞ্চল ও মধ্যভারত), বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, রাজস্থান, পশ্চিম বঙ্গ (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ ও দিনাজপুর) প্রভৃতি স্থানেও গম জন্মে। আসাম ও উড়িষ্যায় বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে গমের চাষ হয় না।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (**Production, Consumption and Trade**)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ২৪০·৮, ৩০৫·৬ ও ৩১৭·৫ লক্ষ একর জমিতে ৬৩·৬, ৮৬·২ ও ১০৬·৫ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন গমের চাষ হয়। ভারতে একর প্রতি গম উৎপাদনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তবে কৃত্রিম জলসেচযুক্ত অঞ্চলে উৎপাদনের হার অধিক। পুসার "কেন্দ্রীয় গম গবেষণা সংস্থা" টিক

চেষ্টায় একর প্রতি গম উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ভারত ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে সামান্য পরিমাণে গম আমদানী করে।

ভুট্টা—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃ: ১৩১ দেখ] ভারতে ভুট্টা প্রধানতঃ দরিদ্র-শ্রেণীর লোকেদের খাদ্যরূপে এবং অতি সামান্য অংশ গ্লুকোজ ও শ্বেতসার প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূব, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভুট্টা উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৭৮·১, ৯১·৩ ও ১০৭·৬ লক্ষ একর জমিতে ১৭,২৫·৬ ও ৩৯·২ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়। ভুট্টার রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ অতি সামান্য।

জোয়ার ও বাজরা (Jowar & Bajra)—ভারতের বালুকাময়, প্রস্তরাকীর্ণ ও অনুর্বর ভূমিতে এবং উচ্চ তাপ অথচ অল্প বৃষ্টি (২০" র ও অল্প)-যুক্ত স্থানে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর জোয়ার ও বাজরা উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত জোয়ারের প্রায় ৫০% মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, ও মহীশূর রাজ্যেই জন্মিয়া থাকে।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩৮৪·৮, ৪২৯·০ ও ৪২১·১ লক্ষ একর জমিতে ৫৪·১, ৬৬·২ ও ৯০·৯ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন জোয়ার এবং ২২৩·০, ২৮০·২ ও ২৮০·৬ লক্ষ একর জমিতে ২৫·৫, ৩৩·৭ ও ৩১·৩ লক্ষ টন বাজরা উৎপন্ন হয়। জোয়ার ও বাজরার বহির্বাণিজ্য অতি সামান্য।

যব (Barley)—গম-চাষের অনুরূপ আবহাওয়া ও মৃত্তিকাতে যবের চাষ ভাল হয়। তবে ইহা গম অপেক্ষা শুষ্ক ও উষ্ণতর বা শীতলতর আবহাওয়ায় ও নিকৃষ্ট জমিতেও জন্মে এবং অল্প সময়ের মধ্যে উৎপন্ন হয়। যব ভারতের শীতকালীন শস্য। ইহা উত্তর ভারতের একটি প্রধান খাদ্যশস্য। মদ্য তৈয়ারীতেও যব ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—উত্তর প্রদেশের কাশী, কানপুর, গাজিপুর, বালিয়া, গাড়োয়াল, প্রতাপগড, আজমগড প্রভৃতি অঞ্চল; কাশ্মীরের মধ্যাঞ্চল এবং বিহারের শরণ, চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলায় প্রচুর যব উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত যবের মাত্র ৫%

ভারতে পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৭৬.৯, ৮৪.৫ ও ৭৯.২ লক্ষ একর জমিতে ২৩.৪, ২৭.৭ ও ২৭.৩ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন যব উৎপাদিত হয়। ইহার রপ্তানী বাণিজ্য অতি সামান্য।

যই (Oats)—গমক্ষেত্রগুলি অপেক্ষা আর্দ্রতর, শীতলতর এবং অনুর্বর ভূখণ্ডে যই জন্মিয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, দিল্লী ও উত্তর প্রদেশে অতি সামান্য পরিমাণ যই উৎপাদিত হয়। এদেশে যই অশ্ব ও অশ্বতরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাল (Pulses)—ছোলা, মুগ, মসুর, মটর, অড়হর প্রভৃতি নানাপ্রকার ডাল ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ শুষ্ক অঞ্চলের অনুর্বর ভূখণ্ডেই জন্মে। পশু ও মানুষের খাদ্য হিসাবে এবং শস্যাবর্তনের জন্য ইহাদের চাষ হয়। পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে ছোলা; বিহার, উঃ প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে মসুর, এবং উঃ প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে অড়হরের চাষ হইয়া থাকে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৪৭১.৮, ৫৭৩.৭ ও ৫৭৬.৭ লক্ষ একর জমিতে ৮২.৮, ১০৮.৭ ও ১২৪.৭ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন বিভিন্ন প্রকার ডালের চাষ হইয়াছিল।

ভারতের খাদ্য সমস্যা (Food Problem of India)—১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশাপ্রদ ছিল না। ১৯৩৭ সালে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই খাদ্যশস্য সম্পর্কে ভারত পাকাপাকিভাবেই বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইতে ভারতের খাদ্যসমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে থাকে। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতে যে সংকটজনক খাদ্য সমস্যা দেখা দেয় তাহার কারণ আমরা নিম্নরূপে নির্দেশ করিতে পারি। (১) ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত ভারতে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইত। কিন্তু উৎপাদিত খাদ্যশস্যের দ্বারা দৈনিক প্রতি পূর্ণবয়স্ককে মাত্র ১৩.৭১ আউন্স হিসাবে খাদ্যশস্য দিয়াও জনসাধারণের চাহিদা মিটান যাইত না এবং প্রতি বৎসরই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইত মোট উৎপাদনের ৬%-৭%। (২) আবার ভারতে প্রতি বৎসর শতকরা ১.৩ জন হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর আরও ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়। (৩) বীজ ও অপচয় বাবদ প্রতি বৎসর আরও ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়। (৪) আবার, ভারত বিভক্ত হইবার ফলে বার্ষিক ৭.৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের সরবরাহ হইতে ভারত বঞ্চিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ এত অধিক হইয়া উঠিল যে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বিদেশ হইতে মোট ৯৬৫ কোটি টাকা মূল্যের ১.৯৩ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়।

১৯৩৯ সাল হইতেই ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত খাদ্যসমস্যা সমাধান মূলক "অধিক খাদ্য ফলাও" নীতি, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কৃষিশিল্পের উন্নয়ন-মূলক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইতে থাকে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন-মূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ১৯৫৪ সালের শেষার্ধেই ভারত খাদ্যশস্য সম্পর্কে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বর্ষে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৬১৬ লক্ষ টন হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালেই ভারত এই সীমা অতিক্রম করিয়া মোট ৬৮৭'১৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ২৬৭৩'৩ ও ২৭৩২'০ লক্ষ একর জমিতে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৬৬'০৪ ও ৬৫৭'৯৪ লক্ষ টন। শুধু যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায় কেবল তাহাই নহে, খাদ্যশস্যের মূল্য এবং উহার আম-দানীর পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। ১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালে মোট খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৭'২ ও ১৪'২ লক্ষ টন। বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি গ্রহণ করে তাহাতে গড়ে দেহাভ্যন্তরে দৈনিক ২২০০ ক্যালরী পরিমিত তাপ সঞ্চারিত হয়। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ১৮'৩ আউন্স করিয়া খাদ্যশস্য গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহাতে দেহাভ্যন্তরে ২৪৫০ ক্যালরী পরিমিত উত্তাপ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়।

১৯৫৭ সালের আরম্ভ হইতেই ভারত এক গুরুতর খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হয়। এই সাম্প্রতিক খাদ্যসংকটের কারণ আমরা নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করিতে পারি। দেশের কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি ও/বা অনাবৃষ্টির দরুণ খাদ্যশস্যের নাশ, গত দুই বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, প্রসারণশীল আর্থিক ব্যবস্থায় বর্ধিত চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা, ঘাটতি অর্থসংস্থান হেতু মুদ্রা প্রচলনের আধিক্য, অসাধু ব্যবসায়িগণ কর্তৃক অধিক মুনাফার আশায় খাদ্যশস্যের মজুত রাখা, খাদ্যশস্য লইয়া আড়তদারদের ফাটকাবাজী, পূর্ববঙ্গে খাদ্যশস্যের চোরা চালান এবং সর্বোপরি শস্যোৎপাদনের অব্যবহিত পরেও সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য মজুত করার অক্ষমতা।

খাদ্যশস্যের এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নিম্নলিখিত পাঁচ দফা কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন—(১) দেশাভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের আমদানী-রপ্তানীর আঞ্চলিক বিধিনিষেধ স্থাপন, (২) ব্যাংকগুলি কর্তৃক খাদ্যশস্য দাদনের বিপক্ষে ঋণদান প্রথার নিয়ন্ত্রণ, (৩) অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য (সংশোধনী) আইন (১৯৫৭) প্রণয়নের বলে বড় বড় মজুতদারদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য পূর্ববর্তী ৬ মাসের গড়পড়তা মূল্যে হস্তগত করিতে ভারত সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকার-গুলিকে ক্ষমতা দান, (৪) বিদেশ হইতে গম ও চাউলের আমদানী ও ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে ইহাদের বিক্রয়-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং (৫) খাদ্যশস্যের

মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়ায় খাদ্যসমস্যা অনেকটা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬০-৬১ সালে যথাক্রমে ভারতের ২৭৯৮·৬ ও ২৭৯৬·০ লক্ষ একর জমিতে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় ৭৫৫·০ ও ৭৯২·৭ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন। ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ (জানু-নভে) সালে ভারতে মোট খাদ্যশস্যের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫·৯, ৩১·৭, ৩৮·১, ৫০·৬ ও ৩১·৯ লক্ষ টন।

(২) পানীয় ফসল

চা—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৩২ দেখ] চা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের উল্লেখযোগ্য চা-উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ৩৩° উঃ ও ১০° উঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। ভারতের সমগ্র চা-উৎপাদনের প্রায় ৭৩% আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে এবং ২০% দক্ষিণ ভারতে জন্মিয়া থাকে। তবে সর্বভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৬০% চা একমাত্র আসামেই উৎপাদিত হয়। ডারাং, শিবসাগর, লখিমপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট এবং সদিয়ার সীমান্ত অঞ্চল আসামের উল্লেখযোগ্য চা-উৎপাদন কেন্দ্র। ভারতে উৎপাদিত মোট চা-এর ২০%-২৫% পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চা-উৎপাদনের ক্ষেত্রই জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় সীমাবদ্ধ। দার্জিলিং-এর চা সর্বোৎকৃষ্ট। ত্রিপুরা রাজ্যেও সামান্য চা উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে সর্বভারতীয় উৎপাদনের মোট ১৮% চা উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাবের কাঙ্গড়া উপত্যকায়, উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল ও আলমোরায় এবং বিহারের পূর্ণিয়া, রাঁচী এবং হাজারিবাগ অঞ্চলে সামান্য চা উৎপাদিত হয়। ভারতে 'কালো চা'-এর উৎপাদন অধিক। কাঙ্গড়া উপত্যকায় সামান্য পরিমাণে 'সবুজ চা' উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে যথাক্রমে ৭·৭৭, ৭·৮০ ও ৭·৯৫ লক্ষ একর জমিতে ৬০৭, ৬২৮ ও ৬৯৯ লক্ষ পাঃ চা উৎপাদিত হয়। ভারতে চা-এর আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৬%-ই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত চা-এর ৫০% ভারতের অধিকারে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪০১০ লক্ষ পাঃ চা রপ্তানী হয়। ভারতীয় চা-এর প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড। বিদেশের বাজারে

ভারতের চা-কে চীন, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের চা-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি' অনুসারে চা-এর রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে (পৃঃ ১৩৪ দেখ)। ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালের এই চুক্তি অনুসারে ভারত হইতে মাত্র ৮০০ লক্ষ পাঃ চা বিদেশে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইত। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে যে নূতন 'আন্তর্জাতিক চা চুক্তি' অনুষ্ঠিত হয় তাহার মেয়াদ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারত হইতে চা রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে এই রপ্তানীর বরাদ্দ ছিল ৪৩৫০ লক্ষ পাঃ, ১৯৫০-৫১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫২০ লক্ষ পাঃ। ভারত হইতে রপ্তানীকৃত চা-এর ৮৬% কলিকাতা এবং অবশিষ্টাংশ মাদ্রাজ বন্দর হইতে রপ্তানী করা হয়। দেশাভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 'সেন্ট্রাল টি বোর্ড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রচারকার্যের দ্বারা এই সংস্থাটি স্বদেশে ও বিদেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

✓**কফি**—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৩৪-১৩৫ দেখ]। ভারতে বর্ষাকালে কফির বীজ বপন করা হয়। এই গাছে ৫/৭ বৎসর পরে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অক্টোবর মাসে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারী মাসে সংগ্রহ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কফি উৎপাদিত হয়। মহীশূরের কাদুর, সিমোগা, হাসান, কূর্গ এবং মহীশূর জেলায়, মাদ্রাজের উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, কেরালা এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে প্রচুর কফি উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত মোট কফির ৭৬%-এরও অধিক মহীশূর রাজ্যে এবং ২৩% মাদ্রাজ রাজ্যে উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে যথাক্রমে ২.২৪, ২.৪৯ ও ২.৬৭ লক্ষ একর জমিতে ৫৪, ৭৬ ও ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কিঞ্চিদধিক ৭০০০ কফি-বাগানে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। একমাত্র মহীশূর রাজ্যেই ৪৬০০টি কফি বাগান রহিয়াছে। ভারতের কফি-বাগানসমূহের প্রায় ৭০%ই ভারতীয়দের হাতে।

ভারতে উৎপাদিত কফির প্রায় অর্ধাংশ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী অর্ধাংশ পঃ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে ম্যাঙ্গালোর (৭৬%), তেলিচেরী (১১%), কালিকট (১০%) ও মাদ্রাজ (৩%) বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিলীয় কফির প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় ভারতের কফি-রপ্তানী-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভারতীয় কফির চাহিদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে "দি ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড" গঠিত হইয়াছে। এই "বোর্ড" উৎপাদিত ও রপ্তানীকৃত কফির উপর কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থের সাহায্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতীয় কফির চাহিদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বোর্ড দেশাভ্যন্তরে কফির চাহিদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও নয়া দিল্লীতে "কফি হাউস" স্থাপন করিয়াছে। উৎপাদিত কফির ৫০% দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়।
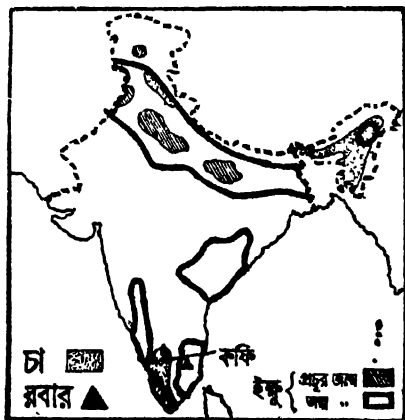
৩৮নং চিত্র—ইক্ষু, চা, কফি ও রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

(৩) অপরাপর খাদ্য ফসল

ইক্ষু—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৩৬-১৩৭ দেখ] ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে উৎপাদিত ইক্ষুর প্রায় ৬০% উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, সাহাজাহানপুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, কাশী এবং বুলন্দসর অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। বিহারের (২য় স্থান) চম্পারণ, শরণ, দ্বারভাঙ্গা এবং মজঃফরপুরে; পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও রোটাক অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলাতেও ইক্ষু জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের ইক্ষু উচ্চশ্রেণীর নহে এবং উৎপাদনের পরিমাণও অতি সামান্য। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলেও ইক্ষুর চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা চারিগুণ অধিক, আবার আখ মাড়াই করিবার সময়ের ব্যাপকতা উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে দ্বিগুণ। অতএব ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্যই ইক্ষু উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৪২·২, ৪৫·৬ ও ৫৭·৩ লক্ষ একর জমিতে ৫৬১·৫ ৫৯৫·৯ ও ৮৫০·৫ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন ইক্ষু জন্মে। ভারতে প্রতি একর জমিতে ইক্ষু

উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। ইক্ষুর মূল্য হ্রাস করিতে হইলে একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। "ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল সুগার কমিটি" ভারতে ইক্ষু চাষের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন।

(৪) তন্তুময় শিল্পফসল

কার্পাস—[চাষের অনুকূল অবস্থা —পৃঃ ১৩৮-১৩৯ দেখ] ভারত পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল।

উৎপাদক অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। উত্তর ভারতের উঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অংশবিশেষে এবং দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূর অঞ্চলেও প্রচুর কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। ভারতে কার্পাসের চাষে প্রযুক্ত জমির প্রায় অর্ধাংশই মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—ভারতে উৎপাদিত কার্পাসের অধিকাংশই হ্রস্ব আঁশযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কার্পাস। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে হ্রস্ব আঁশযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কার্পাস উৎপাদিত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে অতি সামান্য পরিমাণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত আমেরিকান কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৪৫'৪, ১৯৯৮ ও ১৮৯৭ লক্ষ একর জমিতে ২৯'১, ৪০০, ও ৫৩'৯ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৩৯২ পাউণ্ড) কার্পাস উৎপাদিত হয়। "দি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি" বর্তমানে ভারতে উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র বা মিশর অপেক্ষা ভারতে একর প্রতি কার্পাস উৎপাদনের হার অল্প। প্রতি একর জমিতে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০ পাঃ, মিশরে ৪৫০ পাঃ এবং ভারতে মাত্র ৮৫ পাঃ কার্পাস উৎপাদিত হয়। আবার কার্পাস বুনিবার সময় যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরীয় কার্পাস অপেক্ষা ভারতীয় কার্পাস শতকরা ১০ ভাগের অধিক নষ্ট হয়। অবিভক্ত ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় কার্পাস রপ্তানীকারক দেশ ছিল। ভারত বিভক্ত হইবার ফলে ভারত হইতে কার্পাসের রপ্তানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভারত পাকিস্তান, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতেছে।

পাট—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৪১ দেখ] পাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্তু (bast fibre)।

উৎপাদক অঞ্চল—পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা

রাজ্যে পাট উৎপাদিত হয়। বিহার প্রদেশে উৎপাদিত সমগ্র পাটের প্রায় ৯০% পূর্ণিয়া জেলা হইতে, উড়িষ্যার ৯২% পাট কটক জেলা হইতে এবং আসামের পাট ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি উঃ প্রদেশের অবহিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে পাট চাষ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা চলিতেছে।
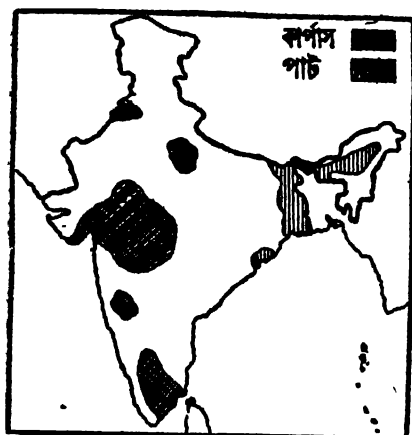
৩৯নং চিত্র—কার্পাস ও পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৪.১, ১৭.৪ ও ১৫.৩ লক্ষ একর জমিতে ৩২.৮, ৪২.০ ও ৪০.৩ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাঃ) পাট উৎপাদিত হয়। উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক।

অবিভক্ত ভারতে উৎপাদিত সমগ্র পাটের ৭৩.৪% পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে এবং অবশিষ্ট মাত্র ২৬.৬% ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইত। ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন রাজ্যে পাট চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ এবং একর প্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও পাটের উৎকর্ষ বৃদ্ধি সম্পর্কিত নানারূপ পরিকল্পনা অনুসৃত হইবার ফলে ভারতে পাটের চাষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এখনও পর্যন্ত ভারত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া উঠে নাই। "দি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান জুট কমিটি" পাট চাষের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সম্প্রতি পৃথিবীর বাজারে পাটের ও পাটজাত দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশর, ইরান, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকোতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার পাটের পরিবর্ত সমগ্রী হিসাবে আফ্রিকার কঙ্গোদেশে "ইউরিনা লোবাটা", জাভাতে "রোজেলা", মাঞ্চুকুয়োতে "কেনাফ", ফিলিপাইন অঞ্চলে "ম্যানিলা হেম্প" এবং ইন্দোচীনে "পলম্পনের" উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রেশম—ভারত একটি উল্লেখযোগ্য রেশম-উৎপাদক দেশ। প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ পাঃ রেশম এদেশে উৎপাদিত হয়। ভারতে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর রেশম দেখা যায়। (১) **গরদ**—তুঁত গাছে পালিত পোকা হইতে যে রেশম উৎপাদিত হয় তাহাকে গরদ বলে। মহীশূর, মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর

জেলা, পশ্চিম বঙ্গ (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা) ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর গরদ উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত গরদের ⅘ অংশ মহীশূর ও কোয়েম্বাটোর জেলা হইতে আসে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর তুঁত রেশম হইতে **মটকা** প্রস্তুত হয়। (২) **তসর**—মহুয়া, কুসুম, শাল, কুল প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া তসর পোকা বাঁচে এবং ঐ সকল গাছেই গুটি তৈয়ারী করে। ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ (বাঁকুড়া) অঞ্চলে তসর উৎপাদিত হয়। (৩) **এণ্ডি**—এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া এণ্ডির পোকা (ইরি পোকা) বাঁচিয়া থাকে এবং ঐ গাছেই গুটি তৈয়ারী করে। আসামের উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর এণ্ডি পাওয়া যায়। (৪) **মুগা**—জয়পত্র জাতীয় বৃক্ষের পাতা খাইয়া মুগা পোকা বাঁচিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত গাছে গুটি তৈয়ারী করে। আসাম, নীলগিরি পর্বত ও কাশ্মীর অঞ্চলে মুগা উৎপাদিত হয়। মুগা, এণ্ডি ও তসর ভারতের নিজস্ব সম্পদ। উহা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না।

শণ—মধ্যম প্রকারের উত্তাপ ও বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে শণ উৎপাদিত হয়। ভারতে আঁশ ও বীজের জন্য শণের চাষ হয়। ভারতে তিন শ্রেণীর শণ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে প্রচুর **শণ** উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার শণের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। (২) সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কাঙড়া প্রভৃতি স্থানে গাঁজা গাছের চাষ হয়। এই গাছের বহিরাবরণ হইতে **ভারতীয় শণ** প্রস্তুত হয়। তন্তু অপেক্ষা পাতা হইতে ভাঙ, গাঁজা ও চরস উৎপাদনের জন্যই ইহার চাষ অধিক হয়। (৩) ত্রিহুত, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে উৎপাদিত শিশল গাছের বহিরাবরণ হইতে **শিশল শণ** উৎপাদিত হয়। ভারতে শিশল শণের উৎপাদন অতি সামান্য। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামে ভারত হইতে শণ রপ্তানী করা হয়।

(৫) অপরাপর শিল্পফসল

তৈলবীজ—ভারতের তৈলবীজসমূহের মধ্যে বাদাম, এরণ্ড বা রেড়ী, তিসি বা মসিনা, সর্ষপ, তিল, নারিকেল ও কার্পাস বীজই প্রধান। তৈলবীজ উৎপাদনে ও রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তবে দেশাভ্যন্তরে তৈলবীজের ব্যবহার বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং ভারত হইতে রপ্তানীকৃত তৈলবীজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু সম্প্রতি ভারত হইতে তৈলবীজ রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ২৬৫.১, ২৯৮.৫ ও ৩২৯.৫ লক্ষ একর জমিতে মোট ৫০.৮, ৫৬.৪ ও ও ৬৫.৩ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন তৈলবীজ (বাদাম, রেড়ী, তিল, সর্ষপ ও তিসি) উৎপাদিত হয়।

চীনাবাদাম (Groundnut)—ভারত চীনাবাদাম উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। রন্ধনকার্যে, বনস্পতি তৈল, কেশ তৈল ও সাবান প্রস্তুত করিতে চীনাবাদাম ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র এবং মহীশূর অঞ্চলে ইহার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হইতেছে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১১১'১, ১২৬'৯ ও ১৫৪'৬ লক্ষ একর জমিতে ৩৪'৩, ৩৮'০ ও ৪৩'৫ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন চীনাবাদাম জন্মে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে প্রচুর চীনাবাদাম প্রতিবৎসরই ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, ইতালী এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া যায়।

এরণ্ড বা রেড়ী (Castor seed)—পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট এরণ্ড বীজের ৮০%-ই ভারতে উৎপন্ন হয়। এরণ্ড তৈল হইতে ঔষধ, সাবান, কেশ তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টার চাষ হয় সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর এরণ্ড বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৩'৭, ১৪'২ ও ১১'৪ লক্ষ একর জমিতে ১'০, ১'২ ও ১'০ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন রেড়ী বীজ জন্মে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর দিয়া রেড়ীর তৈল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ইতালী, জার্মানী এবং স্পেনে রপ্তানী হইয়া যায়।

তিসি বা মসিনা (Linseed)—তিসি বীজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তিসির তৈল দ্বারা উৎকৃষ্ট রং, বার্নিশ ও "অয়েল ক্লথ" প্রস্তুত হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান অঞ্চলে প্রচুর তিসি বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩৪'৭, ৩৭'৮ ও ৪২'৩ লক্ষ একর জমিতে ৩'৬, ৪'১ ও ৪'১ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন তিসি বীজের চাষ হয়। উৎপাদিত তিসি বীজের অধিকাংশই প্রধানতঃ বোম্বাই বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী এবং হল্যাণ্ডে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে তিসি বীজের আন্তর্জাতিক বাজারে আর্জেণ্টিনা ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী।
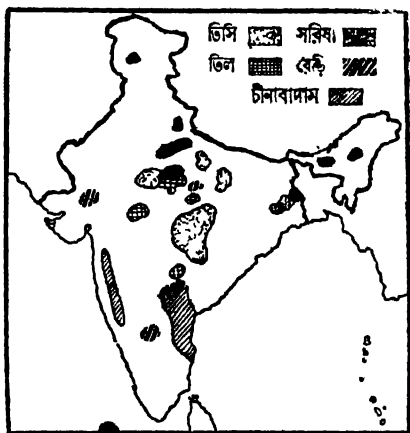
৪০নং চিত্র—প্রধান প্রধান তৈলবীজ উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

সর্ষপ (Rape & Mustard)—সর্ষপ বা সরিষা দুই শ্রেণীর—লাল ও সাদা। এদেশে সরিষার তৈল শরীরে মাখিতে, রন্ধন কার্যে এবং সাবান তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচুর সরিষা উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট উৎপাদিত সরিষার প্রায় অর্ধেকই উত্তরপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫১·২, ৬৩·২ ও ৭২·৭ লক্ষ একর জমিতে ৭·৫, ৮·৫ ও ১৩৮ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন সরিষা উৎপাদিত হয়। যুক্তরাজ্য, ইতালী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে প্রচুর সরিষা কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সরিষার তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

তিল (Sesamum)—ভারত তিল উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই তিলের চাষ দেখা যায় তবে উত্তর-প্রদেশেই সর্বাধিক। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচুর তিল জন্মে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫৪·৫, ৫৬·৭ ও ৪৮·৯ লক্ষ একর জমিতে ৪·৪, ৪·৬ ও ২.৯ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন তিলের চাষ হয়। ভারতে উৎপাদিত তিলের প্রায় ২৫% বোম্বাই বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইতালী, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। রন্ধনকার্যে তিলের তৈল ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল (Coconut)—উষ্ণ-মণ্ডলের সামুদ্রিক জলবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে নারিকেল জন্মে। পলি-মিশ্রিত বালি মাটি, উচ্চ তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত নারিকেল চাষের পক্ষে অনুকূল। সমুদ্র উপকূলেই ইহার চাষ ও উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। মাদ্রাজ (মালাবার), অন্ধ্র (পূর্ব গোদাবরী অঞ্চল), কেরালা (পশ্চিম উপকূল অঞ্চল), মহীশূর (কানাড়া, তানকুর, হাসান, চিতলদ্রুগ, ও কাডুর অঞ্চল), পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে প্রচুর নারিকেল জন্মে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৫·৪, ১৬·০ ও ১৬·৯ লক্ষ একর জমিতে ৩৫৮, ৪৩৭ ও ৪৬২ কোটি নারিকেল উৎপন্ন হয়।

রন্ধনকার্যে এবং সাবান, মোমবাতি, কেশ তৈল, খৈল ও সার, দড়ি, পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নারিকেলের শাঁস ও ছোবড়া ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত সমগ্র নারকেল তৈলের প্রায় ½ অংশ ভারত হইতে রপ্তানী হয়। কালিকট, আলেপ্পী, আর্ণাকুলাম ও পন্দিচেরীতে নারিকেল তৈল প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। ভারত হইতে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, ছোবড়া, পাপোষ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নারিকেলের এই শুষ্ক শাঁস হইতে মার্গারিন প্রস্তুত হয়। কোচিন নারিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর প্রধান বন্দর।

কার্পাস বীজ—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর এবং মাদ্রাজ

অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল রন্ধনকার্যে, ঔষধ প্রস্তুত করিতে এবং জলপাই-তৈলের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্পাসবীজের খৈল উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। বোম্বাই বন্দর হইতে অতি সামান্য পরিমাণে কার্পাসবীজ বিদেশে রপ্তানী হয়।

রবার—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৪৭ দেখ] ভারতের করোমণ্ডল উপকূলে রবার চাষের সমস্ত অনুকূল অবস্থাই বিদ্যমান। এই অঞ্চলে মে হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০" বৃষ্টিপাত, বৎসরের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময় ৭০° হইতে ৮০° ফাঃ পর্যন্ত উত্তাপ এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা থাকায় মাদ্রাজের দক্ষিণাংশ, কেরালা ও মহীশূর রাজ্যে রবার উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১·৪, ১·৭ ও ৩·৩ লক্ষ একর জমিতে ৩২, ৫০ ও ৫২ লক্ষ পাঃ রবার উৎপাদিত হয়। ইহা সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত রবারের মাত্র ১%। রবার উৎপাদনে ভারত প্রায় আত্মনির্ভরশীল। 'ভারতীয় রবার বোর্ড" (১৯৪৭) দেশাভ্যন্তরে রবার উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় কৃষি (Indian agriculture under Five Year Plans)—মুখ্যতঃ তৎকালীন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ দ্রব্যের অধিকতর উৎপাদনের জন্য **প্রথম পরিকল্পনায়** (১৯৫০/৫১-১৯৫৫/৫৬) কৃষির উন্নতি বিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য বহুবিধ কাযসূচী গৃহীত হয়। প্রথম পরিকল্পনার কাষ-কালে কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনের তাগ (target) ও প্রকৃত উৎপাদন পরপৃষ্ঠার পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে।

কৃষিজ দ্রব্যের এই অতিরিক্ত উৎপাদন প্রথম পরিকল্পনার কাযকালে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলির দ্বারাই সাধিত হইয়াছে :—(১) বিভিন্ন প্রকারের সেচব্যবস্থার সাহায্যে অতিরিক্ত ৪৭ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি জমিতে জলসেচ; (২) এ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যাপকতর ব্যবহার (১৯৫০ সালে বার্ষিক ২·৭৫ লক্ষ টন হইতে ১৯৫৫ সালে বার্ষিক ৬·১ লক্ষ টন); (৩) ১৬ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের প্রবর্তন; (৪) কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টর সংস্থা কর্তৃক ১০ লক্ষ একরের অধিক, রাজ্য ট্র্যাক্টর সংস্থাগুলির সাহায্যে প্রায় ১৪ লক্ষ একর এবং কৃষকগণ কর্তৃক নিজ নিজ চেষ্টায় প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন; এবং (৫) কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি। পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে ৩২·৬ কোটি একর পরিমিত জমিতে কৃষিকার্য চলিত কিন্তু ১৯৫৪/৫৫ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫·২ কোটি একর। এই কয় বৎসরে খাদ্যশস্য চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ ২৫·৭ কোটি একর হইতে ২৭·২ কোটি একর এবং বাণিজ্যিক ফসল চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ ৪·৯ কোটি একর

হইতে ৬'০ কোটি একর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যান্য শস্য চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ (২ কোটি একর) পূর্ববৎ-ই থাকে।

প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের তাগ ও প্রকৃত উৎপাদন

কৃষিজ দ্রব্য	একক	ভিত্তি বৎসরের* উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদনের তাগ	প্রকৃত উৎপাদন (১৯৫৫-৫৬)
ধান	মিঃ টন	২৩ ২	৪ ০	২৭ ১
গম	,,	৬ ৩	২ ০	৮ ৬
জোয়ার ও বাজরা	,,	৮ ৫	০ ৬	১০ ০
অন্যান্য খাদ্যশস্য	,,	৮ ০		৯ ২
ছোলা ও ডাল	,,	৮ ০	১ ০	১০ ৯
মোট খাদ্যশস্য	,,	৫৪ ০	৭ ৬	৬৫ ৮
তৈলবীজ	,,	৫ ১	০ ৪	৫ ৬
ইক্ষু (গুড়)	,,	৫ ৬	০ ৭	৬ ০
কার্পাস	মি. গাঁঃ	২ ৯	১ ৩	৪ ০
পাট	,,	৩ ৩	২ ১	৪ ২

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫/৫৬—১৯৬০/৬১) জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু অধিকতর খাদ্যশস্যের উৎপাদন, শিল্প-প্রসারের সহায়তা এবং রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্তের জন্য অধিকতর কাঁচামাল উৎপাদনের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতীয় কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন কল্পে মোট ব্যয় হয় ৬৬৬ ৬৫ কোটি টাকা (কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনে ৯৮ ১০ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ৯৪ ৯৪ কোটি টাকা, মৃত্তিকা সংরক্ষণে ১৭ ৬১ কোটি টাকা, সমবায় ব্যবস্থার প্রসারণে ৩৩'৮৩ কোটি টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থায় ৫০'০০ কোটি টাকা, মাঝারী ও বৃহৎ বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ৩৭২'১৭ কোটি টাকা)। এই পরিকল্পনায় কয়েকটি প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের তাগ ও প্রকৃত উৎপাদন নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে। কৃষিজ দ্রব্যের এই অতিরিক্ত উৎপাদন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সাধিত হইয়াছে। (১) স্থূল হিসাবে মাঝারী ও বৃহৎ বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ৬৯ লক্ষ একর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ৯০ লক্ষ একর অতিরিক্ত কৃষি জমিতে জলসেচ; (২) ২০ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, (৩) ১২

* খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ১৯৪৯-৫০, অন্যক্ষেত্রে ১৯৫০-৫১

লক্ষ একর পরিমিত কৃষিভূমির পুনরুদ্ধার; (৪) ৫৫০ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিজমিতে উন্নত ধরণের বীজের ব্যবহার: (৫) কৃষিকার্যে ৩ লক্ষ টন

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৫৫-৫৬—১৯৬০-৬১) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের ভাগ ও প্রকৃত উৎপাদন

কৃষিজদ্রব্য	একক	ভিত্তিবৎসরের উৎপাদন (১৯৫৫-৫৬)	অতিরিক্ত উৎপাদনের তাগ (১৯৬০-৬১)	প্রকৃত উৎপাদন ১৯৬০-৬১ (পরিবর্তন সাপেক্ষে)
খাদ্যশস্য	মি: টন	৬১.৮	৮০·৫	৭৬·০
তৈলবীজ	,,	৫·৬	৭ ৬	৭·১
ইক্ষু (গুড়)	,,	৬·০	৭ ৮	৮·০
কার্পাস	মি: গাঁইট	৪ ০	৬ ৫	৫·১
পাট	,,	৪·২	৫·৫	৪·০
নারিকেল তৈল	লক্ষ টন	১·৩	১·১	৪৫০০[1]
সুপারী	লক্ষ মণ	২২ ০	২৭·০	৯৬[2]
লাক্ষা	,,	১২·০	১৬ ০	৫০[2]
মরিচ	০০০ টন	২৬·০	৩৬·০	২৬
কাজুবাদাম	,,	৬০·০	১০৬·০	৭৩
চা	মি: পাউণ্ড	৬২৮	৭০০·০	৭২৫

রাসায়নিক সারের (২·৩ লক্ষ টন নাইট্রোজেন ঘটিত এবং ০·৭ লক্ষ টন ফসফেট ঘটিত সার), ৮৬০ লক্ষ টন কম্পোস্ট (compost) সারের এবং ১১৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে সবুজ সারের ব্যবহার, (৬) প্রায় ৭০ লক্ষ একব পরিমিত কৃষি জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের প্রবর্তন; (৭) এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষদিকে শুষ্ককৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন কল্পে প্রত্যেকটি ১০০০ একর ভূমি সম্বলিত এইরূপ ৪০টি প্রতিপাদন কেন্দ্রের স্থাপন; (৮) প্রায় ১৬০ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি ভূমিতে গাছের যত্ন ও সংরক্ষণ মূলক কার্যসূচীর গ্রহণ ও ১৪টি কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক এই কার্যের তত্ত্বাবধান; (৯) কৃষকদিগকে উন্নত ধরণের কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কৃষিপদ্ধতির অবলম্বনে উৎসাহদান; (১০) প্রায় ১·৩২ লক্ষ একর পরিমিত পুরাতন ফলের বাগানের পুনরুন্নয়ন এবং ১·৬৬ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে নূতন বাগানের পত্তন; (১১) সজীর উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায় পদ্ধতিতে সজী ও ফলের বিক্রয় ব্যবস্থার

১। মিলিয়ন নারিকেল
২। হাজার টন

প্রবর্তন, ফল ও সব্জীর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ইহাদের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা* ; (১২) কৃষিজ দ্রব্যের কৃষি-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয় এবং ইহাদের আর্থিক দিক সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আরও দুইটি (১৯৫৪/৫৫ সালে ৪টি কেন্দ্রে স্থাপিত হয়) গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, (১৩) কৃষি বিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ, উত্তর প্রদেশের পন্থনগরে (রুদ্রপুরে) একটি কৃষি বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ, কৃষিজ দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি (১৯৫৫/৫৬ সালে ৪৭০টি হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ৭২৫টি), রপ্তানীযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যাদির সুষ্ঠু শ্রেণী বিভাজন, এবং কৃষিজ দ্রব্যের জন্য একটি "নিখিল ভারত ক্রয়-বিক্রয় সংবাদ সংস্থা" গঠন করা হয় , এবং (১৪) সরকার, মজুতঘর সংস্থা ও সমবায় সংস্থা সমূহের মাধ্যমে শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ করা হয়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৪৯/৫০—১৯৬০/৬১

কৃষিজ দ্রব্য	একক	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯ (১)	৫৯-৬০ (২)	১৯৬০-৬১ (৩)
ধান	মিঃ টন	২৩ ৭	২০ ৯	২৭ ১	২৮ ৬	২৪ ৯	৩০ ৪	২৯ ৩	[illegible]২ ০
গম	"	৬ ৬	৬ ৬	৮ ৬	৯ ৩	৭ ৭	৯ ৮	৯·৭	১০ ০
অন্যান্য খাদ্য শস্য	"	৪৮ ৯	৫৩ ৭	৫১ ৯	৫৭ ৪	৫৩ ০	৬২ ৬	৬০·৫	৬৪ ০
ডাল	"	৯ ২	৮ ৫	১০ ৯	১১ ৭	৯ ৫	১২ ৯	১১ ২	১[illegible] ০
মোট খাদ্যশস্য	"	৫৭ ৬	৫২ ২	৬৫ ৮	৬৮ ৮	৬২ ৫	৭৫ ৫	[illegible]১ ৭	৭৬ ০
তেল বীজ	"	৫	৫ .	৫·৬	৬ ৭	৬ ১	৬ ৯	৬ ৪	৭ ১
ইক্ষু (গুড়)	"	৬ ৯	৫ ৬	৬ ০	৬·৮	৬·৯	৭ ১	৭ ৬	৮ ০
কার্পাস	মিঃ গাঁট	২ ৭	২ ৯	৪ ০	৪ ০	৪ ৩	৪ ৭	৩ ৮	৫ ১
পাট	"	৩ ১	৩ ৩	৪ ২	৭ ৩	৪ ১	৫ ২	৪ ৩	৪ ০
কৃষিজ উৎপাদনের সূচক সংখ্যা									
(ক) সমস্ত কৃষিজ দ্রব্য		১০০	৯৫ ৬	১১৬ ৮	১২৪ ০	১১৭ ৬	১৩২ ৩	১২৭ ২	১৩৫·০
(খ) খাদ্যশস্য		১০০	৯১	১১৫					১৩২
(গ) অন্যান্য শস্য		১০০	১০৬	১২০					১৪

(১) আংশিক পরিবর্তন, (২) সর্বশেষ হিসাব, (৩) পরিবর্তিত সাপেক্ষে।

*১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ফল ও সব্জীর মোট উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০,০০০ ও ৪০,০০০ টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার পরিমাণ ১ লক্ষ টন দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬১—১৯৬৫-৬৬) খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংপূর্ণতা লাভ এবং নানাবিধ বাণিজ্যিক ফসলের বিশেষতঃ তৈল বীজ, কার্পাস ও পাটের অধিকতর উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে কৃষি উন্নয়ন বাবদ ১২৮১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে (কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে ২২৬·০৭ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ১৭৬·৭৬ কোটি টাকা, মৃত্তিকা সংরক্ষণে ৭২·৭৩ কোটি টাকা, সমবায় ব্যবস্থার প্রসারে ৮০·১০ কোটি টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থায় ১২৬ কোটি টাকা, এবং মাঝারী ও বৃহদায়তন সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ৫৯৯·৩৪ কোটি টাকা)। ইহা ব্যতীতও সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষিকাযে লগ্নীর পরিমাণও বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, মৃত্তিকার সংরক্ষণ, শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও কৃষিজমির পুনরুদ্ধার, কৃষিক্ষেত্রে সারের অধিকতর প্রয়োগ; উন্নত ধরণের বীজের অধিকতর সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবহার; গাছের যত্ন ও সংরক্ষণ এবং উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় উপরোক্ত কার্যসূচীর নিম্নলিখিত ভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

কার্যসূচী		একক	ভাগ
১। সেচ ব্যবস্থা			
(ক) মাঝারী ও বৃহদায়তন	...	মিঃ একর	১২ ৮
(খ) ক্ষুদ্রায়তন	...	,,	১১·৮
২। মৃত্তিকা সংরক্ষণ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার ইত্যাদি			
(ক) কৃষি জমির মৃত্তিকা সংরক্ষণ	...	,,	১১·০
(খ) শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থা	...	,,	২২·৫
(গ) পতিত জমির পুনরুদ্ধার	...	,,	৩·৬
(ঘ) লবণাক্ত জমির পুনরুদ্ধার	...	,,	০ ২
৩। উন্নত ধরণের বীজ সংযুক্ত অতিরিক্ত জমি (খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিযুক্ত)	...	,,	১৪৮·৫
৪। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার			
(ক) নাইট্রোজেন ঘটিত সার	...	০০০ টন	১০০০
(খ) ফসফেট ঘটিত সার	...	,,	৪০০
(গ) পটাশ ঘটিত সার	...	,,	২০০
৫। কৃষিক্ষেত্রে জৈব ও সবুজ সারের ব্যবহার			
(ক) সহরাঞ্চলের কম্পোষ্ট সার	...	মিঃ টন	৫·০
(খ) গ্রামাঞ্চলের কম্পোষ্ট সার	...	,,	১৫০·০
(গ) সবুজ সার	...	মিঃ একর	৪১·০
৬। ফসল উৎপাদক গাছের যত্ন ও ফসলের সংরক্ষণ		,,	৫০·৮

উপরোক্ত কার্যসূচী ব্যতীতও কৃষিকার্যে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাবদ ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন। পশ্চিম গোদাবরী (অন্ধ্র প্রদেশ), সাহাবাদ (বিহার), তাঞ্জোর (মাদ্রাজ), রায়পুর (মধ্য প্রদেশ), লুধিয়ানা (পাঞ্জাব), পালি (রাজস্থান) এবং আলিগড় (উত্তর প্রদেশ)—এই সাতটি জেলার অন্তর্গত ১০০টি ব্লকের মোট ৫৮ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিভূমিতে 'প্রগাঢ় কৃষি অঞ্চল পরিকল্পনা' (Intensive Agricultural District Programme) সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের প্রতিপাদন কেন্দ্র হিসাবেই এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়।

উপরোক্ত কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষবর্ষে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যের অনুমিত উৎপাদন দাঁড়াইবে নিম্নরূপ :—

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৬০-৬১—১৯৬৫-৬৬) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যের অনুমিত উৎপাদন

কৃষিজ দ্রব্য	একক	ভিত্তি বৎসরের (১৯৬০-৬১) উৎপাদন (পরিবর্তন সাপেক্ষে)	অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ, ১৯৬১-৬৬	১৯৬৫-৬৬ সালের অনুমিত উৎপাদন	বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
খাদ্যশস্য	মিঃ টন	৭৬·০	২৮·০	১০০·০ (১)	৩১·৬
তৈল বীজ	,,	৭·১	২·৭	৯·৮	৩৮·০
ইক্ষু (গুড়)	,,	৮·০	২·০	১০·০	২৫·০
কার্পাস	মিঃ গাঁইট	৫·১	১·৯	৭·০	৩৭·২
পাট	,,	৪·০	২·২	৬·২	৫৫·০
নারিকেল	মিঃ	৪৫০০	৭৭৫	৫২৭৫	১৭·২
সুপারী	০০০ টন	৯৩	৭	১০০	৭·৫
কাজু বাদাম	,,	৭৩	৭৭	১৫০	১০৫·৫
মরিচ	,,	২০	১	২৭	৩·৯
এলাচ	,,	২·২৬	৪·৩৬	২·৬২	১৫·৯
লাক্ষা	,,	৫০	১২	৬২	২৪·০
তামাক	,,	৩০০	২৫	৩২৫	৮·৩
চা	মিঃ পাঃ	৭২৫	১৭৫	৯০০	২৪·১
কফি	০০০ টন	৪৮	৩২	৮০	৬৭·৭
রবার	,,	২৬·৪	১৮·৬	৪৫	৭০·৫

(১) ১৯৬৫-৬৬ সালে ধানের উৎপাদন ৪৫ মিঃ টন, গমের উৎপাদন ১৫ মিঃ টন, অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২৩ মিঃ টন এবং ডালের উৎপাদন ১৭ মিঃ টন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন উপরোক্ত হারে বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা (১৯৪৯-৫০=১০০) ১৯৬০-৬১ সালের ১৩৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৬-এ ; মাথাপ্রতি খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের ১৬ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭'৫ আউন্সে ; এবং মাথাপ্রতি বস্ত্রের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের বার্ষিক ১৫'৫ গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে বার্ষিক ১৭'২ গজে দাঁড়াইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে কৃষি উন্নয়নমূলক নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিও অনুসৃত হইবে। (১) ফল ও সব্জী উৎপাদনে নিযুক্ত মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৭০ লক্ষ একর এবং ফল ও সব্জীর মোট উৎপাদন দাঁড়াইবে ১ লক্ষ টন। আনুষঙ্গিক খাদ্যদ্রব্য যেরূপ গোল আলু, মিষ্ট আলু প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রুত পচনশীল খাদ্য দ্রব্যের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে। (২) অনিয়ন্ত্রিত ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে, ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হইবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইবে। (৩) বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টন পরিমিত কৃষিজ দ্রব্য মজুদ রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং উহার মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন কৃষিজ দ্রব্য মজুদ করা হইবে সরকারী মজুদঘরগুলিতে। (৪) এই পরিকল্পনাকালে কৃষি-কলেজগুলির সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫৭টি এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইবে। এই কলেজগুলিতে বার্ষিক ৫৬০০ হইতে ৬২০০টি ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনাকালে কৃষিবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ স্নাতকের প্রয়োজন হইবে প্রায় ২০,০০০। (৫) কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণার জন্য এই পরিকল্পনায় মোট ২৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে (কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ কোটি টাকা এবং রাজ্যসরকারগুলির ১৭ কোটি টাকা)। এই পরিকল্পনাকালে নানাবিধ কৃষিগবেষণা ব্যতীতও মৃত্তিকা সংরক্ষণ-সংক্রান্ত একটি, গবাদিপশুখাদ্য ও তৃণাঞ্চল সংক্রান্ত একটি এবং সংক্রামক রোগের বীজাণু সংক্রান্ত একটি—এই মোট তিনটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। (৬) এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অন্তর্গত কৃষিদপ্তরগুলির সুষ্ঠু শাসন ও পরিচালন ব্যবস্থারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (৭) এই পরিকল্পনার কার্যকালে দুইটি বৃহদায়তন খাসখামার স্থাপিত হইবে। ১৯৫৬ সালে রাজস্থানের সুরতগড অঞ্চলে ৩০,০০০ একর সমন্বিত একটি খাস খামার স্থাপিত হয়। (৮) এই পরিকল্পনায় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের যে ভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কৃষিজ দ্রব্যের উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। (৯) কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত সমবায় ও রাজ্যগত সরকারী সংস্থাগুলি কৃষিজ দ্রব্যের

উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছিবার এবং কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষার অন্যতম অবলম্বন বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেন।

প্রশ্নোত্তর

1. What geographical and other conditions are necessary for the production of (a) Wheat (C. U. '51, '52, '57), (b) Rice (C. U. '50, '53, '55, H.S.'61) and (c) Maize (C. U. '50, '52, H.S '63)? Give a brief account of their world distribution and international trade.

(কিরূপ ভৌগোলিক ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থায় (ক) গম, (খ) ধান এবং (গ) ভুট্টা উৎপাদিত হয়? উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।)

((ক) গম পৃঃ ১২৫-১২৯, (খ) ধান পৃঃ ১২৯-১৩১ ও (গ) ভুট্টা পৃঃ ১৩১-১৩২)

2. What physical and other conditions are necessary for the production of (a) Tea (C. U. '49, '52), and (b) Coffee (C. U. '49, H.S.'63)? State their areas of production and the nature of their world trade.

((ক) চা এবং (খ) কফি উৎপাদনের জন্য কিরূপ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য অবস্থার প্রয়োজন? উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ)। ((ক) চা পৃঃ ১৩২-১৩৪, ও (খ) কফি পৃঃ ১৩৪-১৩৬)

3. State the geographical factors necessary for the production of (a) Sugar cane (C. U. '49, '56) and (b) Sugar beet (C. U. 49, '56). Name the principal countries in which these are produced and state the world trade in each of these commodities.

((ক) ইক্ষু ও (খ) বীট উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ।) ((ক) ইক্ষু পৃঃ ১৩৬-১৩৭, (খ) বীট পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

4. Describe the conditions suitable for the cultivation of cotton. Name the principal producers of cotton and indicate the nature of world trade in cotton. (C. U. '50, '51. '55, '57, H. S. '61)

(কার্পাস উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। উহার প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম লিখ এবং কার্পাসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি নিদেশ কর।) (পৃঃ ১৩৮-১৪১)

5. Describe the conditions suitable for the production of Jute. Name the chief producers, exporters and importers of Jute. (C. U. '52)

(পাট চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পাটের প্রধান প্রধান উৎপাদক, আমদানী ও রপ্তানীকারক দেশগুলির নাম লিখ।) (পৃঃ ১৪১-১৪২)

6. Describe the conditions and areas of production of mulberry silk.

(রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার বর্ণনা কর এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

7. Indicate the conditions of growth and the areas of production of rubber. Indicate the nature of world trade in rubber. (C. U. '50, '55, '58)

(রবার চাষের অনুকূল অবস্থা এবং রবার উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ কর। রবারের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

8. Discuss the regional distribution and consumption of the principal food crops of India. (C.U. '56)

(ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৪৯-১৫২)

9. Estimate the importance of the following crops in India (a) Tea (C. U. '55, '58), (b) Coffee, and (c) Sugar cane (C. U. '54)

(ভারতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শস্যগুলির গুরুত্ব নির্দেশ কর : (ক) চা, (খ) কফি এবং (গ) ইক্ষু।) ((ক) চা পৃঃ ১৫৪-১৫৫ (খ) কফি পৃঃ ১৫৫-১৫৬, (গ) ইক্ষু পৃঃ ১৫৬-১৫৭)

10. Estimate the importance of the following agricultural products in India; (a) Cotton (C. U. '56) and (b) Jute (C. U. '54, '55)

(ভারতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শস্যগুলির গুরুত্ব নির্দেশ কর : (ক) কার্পাস এবং (খ) পাট)

((ক) কার্পাস পৃঃ ১৫৭, (খ) পাট পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

11. Name the principal oilseeds of India describing the areas where they are grown and the uses to which they are put.

(ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজসমূহের নাম লিখ এবং উহাদের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৫৯-১৬২)

12. Give an account of the cultivation of the principal plantation crops of India.

(ভারতের প্রধান প্রধান আবাদী ফসল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ।)

(ইক্ষু, পাট, চা, কফি ও রবার সম্পর্কে লিখ ; পৃঃ ১৫৬, পৃঃ ১৫৭, পৃঃ ১৫৪, পৃঃ ১৫৫ ও পৃঃ ১৬২)

13. Examine briefly the nature of progress achieved in the field of Indian agriculture under the Five Year Plans.

(পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় কৃষির যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৬২-১৬৫)

14. What are the principal bast fibres? Describe their uses and conditions of cultivation. (H.S. '63)

(প্রধান প্রধান বহিবাবরণ তন্তুগুলির নাম কর। উহাদের ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসমূহের উল্লেখ কর।) (পৃঃ ১৪১-১৪৩)

অষ্টম অধ্যায়

পশুচারণ

পশুচারণ (Pastoralism)—পশুচারণ মানুষের আর্থিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আদিম অবস্থায় মানুষ অরণ্য হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া এবং বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। পরবর্তী কালে মানুষ যখন জীবজন্তুকে পোষ মানাইয়া উহাদিগকে নিজ কার্যে নিযুক্ত করিতে শিখিল, তখন হইতেই মানব সভ্যতার এক নূতন যুগের সূচনা হইল। বহু প্রাণী মানুষের ভার বহনের কাযে নিযুক্ত হইল, আবার বহু প্রাণী হইতে মানুষ মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য এবং চর্ম, চর্বি, অস্থি, পশম প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য আহরণ করিতে শিখিল।

যাযাবর অবস্থায় মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যেই পশুপালন করিত। অবশ্য জীবিকার জন্য পশুপালন (primitive pastoralism) দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং তুন্দ্রা অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের

মধ্যে অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তবে বর্তমান কালে সভ্য মানুষ প্রধানতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই পশুপালন (commercial pastoralism) করিয়া থাকে। বাণিজ্য বা জীবিকা যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন পশুচারণের জন্য তৃণাচ্ছাদিত উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন। তাই পৃথিবীর সমতল ও জনবিরল তৃণক্ষেত্রসমূহেই পশুপালন ব্যবসায় লাভজনক।)

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু, মেষ, ছাগ ও শূকরই প্রধান।

বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রসমূহ (Principal commercial grazing grounds)—বর্তমান কালে (১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিস্তৃত তৃণভূমি এবং (২) ক্রান্তীয় স্যাভানা অঞ্চলে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য চারণক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত।

(১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিস্তৃত তৃণভূমির মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পশুচারণের কাজ সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। (ক) উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভূমিতে গবাদি পশু ও মেষ চারণ শিল্প পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উন্নত। (খ) দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আর্জেণ্টিনা, উরুগুয়ে এবং দক্ষিণ ব্রাজিলের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিসমূহে গবাদি পশু ও মেষ চারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র আর্জেণ্টিনার পম্পা প্রদেশে পশুচারণের কাজ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। (গ) অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মেষ ও গবাদি পশুর বাণিজ্যিক চারণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি অঞ্চলের সমষ্টিগত রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ⅔ অংশই চারণ-শিল্পজাত দ্রব্য। (ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড অঞ্চলে অসংখ্য মেষ, ছাগ ও গবাদি পশু পালিত হয় এবং এই অঞ্চল হইতে প্রচুর পশম ও হিমায়িত গোমাংস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (future potentialities)—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বাণিজ্যিক চারণশিল্পে এখনও বহু ত্রুটি রহিয়াছে, যথা—(ক) এই অঞ্চলে তৃণভূমিসমূহের আয়তন অনুপাতে পালিত পশুর পরিমাণ অধিক; (খ) অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত অপরিমিত ও অনিয়মিত বলিয়া এই শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়, এবং (গ) অধিকাংশ চারণক্ষেত্রেই উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(২) ক্রান্তীয় তৃণভূমি (স্যাভানা) অঞ্চলে পশুচারণ বাণিজ্যিক শিল্প হিসাবে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ এই অঞ্চলে—(১) অধিক বৃষ্টিপাত ও প্রখর উত্তাপের জন্য পুষ্টিকর তৃণের অপ্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়, (২) পশুরোগ অত্যন্ত ব্যাপক, (৩) যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত এবং (৪) পশুচারণ ও জান্তব দ্রব্য উৎপাদন প্রথা অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির। নিম্নলিখিত ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলসমূহে বর্তমানে পশুচারণ বাণিজ্যিক শিল্প হিসাবে পরিচালিত হইতেছে। (ক) আফ্রিকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা স্যাভানা অঞ্চলে গবাদি পশু ব্যাপকভাবে পালিত হয়। (খ) দক্ষিণ আমেরিকার চাকো, ক্যাম্পো, ল্যানো

ও বলিভিয়ার স্তাভানা অঞ্চলে কেবলমাত্র মাংসের জন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু পালিত হয়। (গ) অস্ট্রেলিয়ার স্তাভানা অঞ্চল চারণ-শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (future potentialities)—ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন গোমাংস নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গোমাংসের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রাখর্য হেতু এই সমস্ত অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পশমও উৎপন্ন হয় না। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর পশুখাদ্য উৎপাদন, পশুরোগ নিবারণ, উচ্চশ্রেণীর পশু সরবরাহ, যানবাহনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অবলম্বিত হইলে ভবিষ্যতে এই সমস্ত অঞ্চল চারণশিল্পে দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

গবাদি পশু (Cattle)

ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমিসমূহে গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। গো-পালনের জন্য সমৃদ্ধ তৃণক্ষেত্রের প্রয়োজন। পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে গবাদি পশু ও মেষ উভয়ই পালিত হয় তথাকার আর্দ্রতর অংশে সতেজ তৃণের প্রাচুর্য হেতু গবাদি পশু এবং শুষ্কতর অংশে তৃণের অপকর্ষ হেতু মেষ পালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর জনবিরল দেশসমূহের তৃণভূমি অঞ্চলগুলিই প্রধান প্রধান গোচারণ ক্ষেত্র। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এই তৃণভূমিসমূহ জলবায়ুর প্রতিকূলতা হেতু কৃষিজ ফসল উৎপাদনের উপযোগী নহে কিন্তু তৃণের প্রাচুর্য হেতু এই সমস্ত অঞ্চল গোচারণের পক্ষে উৎকৃষ্ট। উত্তর আমেরিকার 'প্রেয়রী' অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পা', ইউরেশিয়ার 'স্তেপ' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স' অঞ্চল গোপালনের জন্য বিখ্যাত। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে অধিক। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে।

মুখ্যতঃ মাংস ও দুগ্ধের জন্য ও গৌণতঃ ক্ষুর, চর্ম প্রভৃতি দ্রব্যাদির জন্য গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। তবে মাংস প্রদায়ী গবাদি পশু দুগ্ধ প্রদায়ী গবাদি পশু হইতে পৃথক।

মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন (Rearing of beef cattle)—উৎকৃষ্ট মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু আকারে বৃহৎ ও মেদবহুল। ইহাদের পালনের জন্য উন্মুক্ত ও বিস্তৃত তৃণভূমির প্রয়োজন। আনুমানিক দুই মণ মাংস পাইতে হইলে একটি গরুকে প্রতিদিন দুই হইতে পাঁচ সের পর্যন্ত পশুখাদ্য অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর কাল যাবত খাওয়াইতে হয়। এই কারণে নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প।

গোমাংস (Beef)—ইউরোপীয় দেশসমূহে (স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী,

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ ও রুশিয়ায়) অতি উচ্চ-শ্রেণীর মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হইলেও গোমাংস উৎপাদনে এই সমস্ত দেশ স্বাবলম্বী নহে। এই কারণে এই দেশগুলি আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর হিমায়িত গোমাংস আমদানী করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে রাজ্যে প্রচুর মাংস প্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। গোমাংস রপ্তানীতে আর্জেন্টিনা সর্বাগ্রগণ্য। উত্তর আমেরিকার প্রেয়রী তৃণভূমির পশ্চিমাংশে গবাদি পশু পালিত হয় এবং উহাদিগকে চিকাগোর বধ্যাগারে পাঠাইবার পুর্বে মেদবৃদ্ধির জন্য কিছুকাল যাবৎ ভুট্টাবলয়ে চরান হয়। ভুট্টাবলয়ের পশ্চিমে, চিকাগো সন্নিহিত অঞ্চল-সমূহেও মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোতেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাংস রপ্তানীর কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং কুইন্সল্যাণ্ডের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলসমূহেও মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতে গবাদি পশুব সংখ্যা সর্বাধিক হইলেও ধর্মীয় বাধানিষেধের দরুণ এদেশে গো-মাংসের ব্যবসায় তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। রুশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও গোমাংস উৎপন্ন হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমি অঞ্চলসমূহে সম্প্রতি গমচাষের প্রসার লাভ করায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে, গবাদি পশুপালন ব্যবস্থা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে এবং গোমাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য সম্প্রতি ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলসমূহে গবাদি পশুপালন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিতেছে।

গোমাংসের বাণিজ্য (Trade in beef)—গোমাংস রপ্তানীতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকাব করে। উরুগুয়ে, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশ। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ ইউরোপের দেশসমূহ প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন (Rearing of dairy cattle)—দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশু পালনের জন্য মৃদুশীত, মৃদুগ্রীষ্ম এবং আর্দ্র তৃণাঞ্চলই উপযুক্ত স্থান। দুগ্ধের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য কোমল সতেজ তৃণই সর্বোৎকৃষ্ট। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের আর্দ্র জলবায়ু সেবিত অঞ্চলসমূহে এই শ্রেণীর তৃণ ও অন্যান্য পশুখাদ্য প্রচুর জন্মে বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলেই দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুর পালন অধিক।

ডেয়ারী শিল্প (Dairy farming)—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারী শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই শিল্পের গঠন ও প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ বিশেষ অনুকূল :—(১)

দীর্ঘ ও পরিমিত বৃষ্টিযুক্ত গ্রীষ্মকাল। এইরূপ অবস্থায় চারণক্ষেত্রে পুষ্টিকর তৃণের প্রাচুর্য দেখা যায়। (২) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়া প্রয়োজন, কারণ এইরূপ আবহাওয়ায় গবাদি পশুর দুগ্ধ উৎপাদনের হার অধিক এবং দুগ্ধের সংরক্ষণও সহজসাধ্য হয়। (৩) মৃদু শীতকাল। ইহাতে গবাদি পশু সারা বৎসরই উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতে পারে। (৪) ভূপ্রকৃতি বন্ধুর হইলে সাধারণ কৃষিকার্য ব্যাহত হয় এবং এই কারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত পার্বত্য অঞ্চল ডেয়ারী শিল্প গঠনে অনুপ্রেরণা যোগায়। (৫) তৃণ ও অন্যান্য পশুখাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত গভীর ও আর্দ্র দো-আঁশ মাটিই বিশেষ অনুকূল। (৬) দুগ্ধ দ্রুত পচনশীল বলিয়া বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে দ্রুত প্রেরণের জন্য উন্নত ধরণের যানবাহন-ব্যবস্থা এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। (৭) এই শিল্পে প্রচুর সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত ঘন লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলেই এই ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। (৮) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্প-সংগঠনের অনুপ্রেরক।

উপরোক্ত অবস্থাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহ জনবহুল ও উত্তম যানবাহনব্যবস্থাযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

ডেয়ারী পশু (Dairy animals)—ডেয়ারী শিল্পে দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্ত যে সমস্ত পশু সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষই প্রধান। বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, মাখন ও পনীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহ (Principal dairy regions of the world)—পৃথিবীতে তিনটি উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী অঞ্চল রহিয়াছে—

(ক) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চল**—এই সকল অঞ্চল ডেয়ারী শিল্পে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উন্নত। সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের নৈকট্য, ঘন লোকবসতি, অধিক বালিযুক্ত দো-আঁশ মাটি, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং সাধারণ কৃষিকার্যের অপরিণত অবস্থা এই অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্প গঠনে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে। ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়া ডেনমার্ক, সুইডেন ও রুশিয়ার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, জার্মানী, রুশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল ঘনীভূত ও শুষ্ক দুগ্ধ উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

(খ) **দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা ও উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের

পটোম্যাক ও ওহিও নদীর উত্তরে এবং মিশৌরী নদীর পুর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহ এবং ক্যানাডার হ্রদ অঞ্চলের পুর্বদিকে অবস্থিত প্রদেশসমূহ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন মৃদু উত্তাপ (৬৭°-৭৩° ফাঃ), পরিমিত বৃষ্টিপাত (২২″-৫০″), বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, ঘন লোকবসতি, উন্নত যানবাহনের ব্যবস্থা ও সরকারের সহযোগিতা এই শিল্পের প্রসারের কারণ। এই অঞ্চল পনীর উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

(গ) **অস্ট্রেলিয়া**—পূর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড এই অঞ্চলের অন্তর্গত। আর্দ্র ও মৃদু জলবায়ু, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও সরকারের তত্ত্বাবধান হেতু এই দুইটি স্থানই ডেয়ারী শিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল মাখন উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। নিউজীল্যাণ্ড পনীর রপ্তানীতে পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন রপ্তানীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়া হইতে মাখন, পনীর ও ঘনীভূত দুগ্ধ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ ব্যতীতও আর্জেন্টিনা, চিলির অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলসমূহে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য অঞ্চলসমূহে, চীন, জাপান এবং ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে।

ডেয়ারী দ্রব্যের বাণিজ্য (Trade in dairy articles)—ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, রুশিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, এবং বাল্টিক রাজ্যসমূহ প্রধান **মাখন** রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স প্রধান আমদানীকারক দেশ। নিউজীল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রেলিয়া প্রধান **পনীর** রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম এবং আলজেরিয়া প্রধান আমদানীকারক দেশ। নেদারল্যাণ্ড,
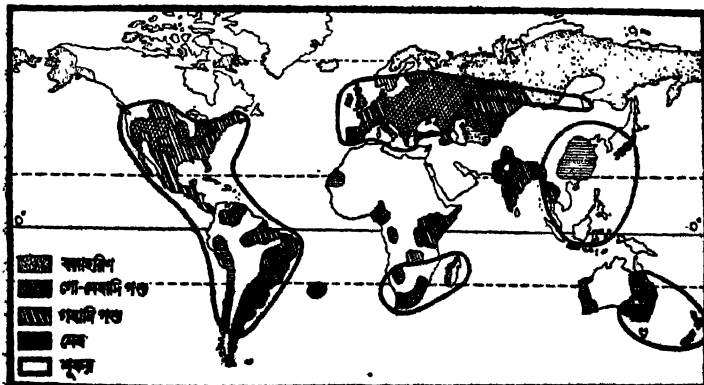
৪১নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত পশু

যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং নিউজীল্যাণ্ড প্রধান দুগ্ধ রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কিউবা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুইজারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাপান আমদানীকারক দেশ।

মেষ (Sheep)

মুখ্যতঃ মাংস ও পশমের জন্য এবং গৌণতঃ দুগ্ধের জন্য মেষ পালিত হয়। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে এবং নিউজীল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে অসংখ্য মেষ পালিত হয়। মেষ পালনের জন্য উষ্ণ আবহাওয়া, ১০"-৩০" পর্যন্ত বৃষ্টিপাত, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং অনুর্বর ভূখণ্ডই আদর্শস্থানীয়। পশমপ্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মাংসপ্রদায়ী মেষ হইতে পৃথক।

মাংসপ্রদায়ী মেষপালন (Rearing of mutton sheep)—মাংসের জন্য মেষ পালন করিতে হইলে তৃণসমৃদ্ধ চারণভূমির প্রয়োজন হয়। মাংসপ্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মেদবহুল হইয়া থাকে এবং ব্রিটেন ও নিউজীল্যাণ্ডের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই পালিত হয়।

মেষ-মাংস (Mutton)—অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে প্রচুর মেষ মাংস উৎপন্ন হয়। মেষ শাবক ও মেষ মাংসের রপ্তানীতে নিউজীল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলি একত্রে দ্বিতীয় স্থান এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন মেষ মাংস ও মেষ শাবকের প্রধান আমদানীকারক দেশ।

পশমপ্রদায়ী মেষপালন (Rearing of wool sheep)—পশম মেষলোম হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রুক্ষ ও শীতল জলবায়ুর মধ্যে প্রতিপালিত মেষ হইতেই উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়া পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের পক্ষে অনুকূল নহে। দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিসমূহ পশমপ্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ উপযোগী; কিন্তু উত্তর গোলার্ধের অনুরূপ তৃণভূমিতে শীতকালে শৈত্য অধিক হওয়ায় উহা পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের বিশেষ অনুকূল নহে। পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের জন্য সামান্য তৃণই যথেষ্ট। ৩০"-৭০" বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহে সুসমৃদ্ধ তৃণক্ষেত্র দৃষ্ট হয় সত্য তবে ঐ সমস্ত তৃণভূমি পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। কারণ বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা হেতু পশমের অপকর্ষ ঘটে। আবার যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০"-র অনধিক তথায় পশমের উৎকর্ষ ঘটিলেও তৃণের অপ্রাচুর্য হেতু মেষকুলের সংখ্যাহ্রাস ঘটায়

মেষ পালনের অনুপযোগী। অস্ট্রেলিয়ার বহু মেষচারণক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত অত্যল্প হওয়ায় প্রতি বৎসরই আর্দ্র জলবায়ুসেবিত টাসমানিয়া দ্বীপ হইতে বলশালী মেষ আমদানী করিয়া মেষকুলের সংখ্যা ঠিক রাখিতে হয়।

মেষ-পশমের শ্রেণীবিভাগ (Classification of wool)—সূক্ষ্মতা, মসৃণতা এবং ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে মেষ-পশম সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে: (১) মেরিনো মেষ হইতে পাওয়া পশম সর্বোৎকৃষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে মেরিনো পশমের উৎপাদন সর্বাধিক। (২) মিশ্রণজাত মেষ হইতে মাংস ও পশম উভয়ই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পশম দীর্ঘ-আঁশযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্থুল। ইংলণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এই শ্রেণীর পশম উৎপন্ন হয়। (৩) অত্যন্ত কর্কশ, স্থুল ও খর্বাকৃতি আঁশযুক্ত আর একপ্রকার পশম দক্ষিণ রুশিয়া, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ গালিচা প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্যিক পশমের উৎপাদন (Production of commercial wool)—বাণিজ্যে ব্যবহৃত পশমের উৎপাদনের জন্য প্রথমে পশমপ্রদায়ী মেষের গাত্র হইতে পশম কাটা (shearing) হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে অল্পবয়স্ক মেষশাবকের (প্রায় ৭ মাস বয়স্ক) গাত্র হইতে কাটা পশম অতি উচ্চশ্রেণীর হইয়া থাকে। মেষের গাত্র হইতে কাটা পশম চর্বিযুক্ত ও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন থাকে। কখনও কখনও এই অবস্থাতেই পশম রপ্তানী করা হয়, আবার কখনও কখনও এই পশমকে এ্যামোনিয়া-মিশ্রিত জলে ধুইয়া (scouring) চর্বিবর্জিত করা হয়। পশম শোধনের ফলে উহা হইতে যে চর্বি পাওয়া যায় তাহা দিয়া অন্যান্য উপকরণ-সংযোগে সাবান, কেশ-তৈল প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয়। পশমকে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইলে (combing) অপেক্ষাকৃত ছোট আঁশের পশম (noils) চিরুনীতে আটকাইয়া যায় এবং লম্বা আঁশের পশমগুলি (tops) থাকিয়া যায়। পরে এই আঁশের সাহায্যে পশমবস্ত্রের বয়ন (weaving) করা হয়।

মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চল (Principal wool producing regions)—মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) উত্তর গোলার্ধের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূখণ্ডসমূহ—

ইউরোপ—স্পেন, ব্রিটেন ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ প্রচুর পশম উৎপাদন করে। তবে উৎপাদিত পশমের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া এই সমস্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে পশম আমদানী করিয়া থাকে। অবশ্য ইউরোপের

কয়েকটি দেশ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পশম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে, রপ্তানীও করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকা—ক্যানাডার লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে ও সমুদ্রসেবিত অঞ্চলসমূহে পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয়। শীতাধিক্যবশতঃ প্রেয়রী তৃণভূমি অঞ্চলে এই শ্রেণীর মেষ পালিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্র পশমপ্রদায়ী মেষ পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমের শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলেই মেষ পালিত হইয়া থাকে। দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তবে বর্তমানে মিশ্রণজাত মেষ হইতে উৎকৃষ্ট পশমও উৎপাদিত হইতেছে। অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম এশিয়া, আর্জেন্টিনা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ পশম আমদানী করিয়া থাকে।

এশিয়া—এশিয়া মাইনর, ভারত ও চীনেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পশম উৎপাদনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) দক্ষিণ গোলার্ধের জনবিরল অঞ্চলসমূহ—

অস্ট্রেলিয়া—পশমপ্রদায়ী মেষ পালন অস্ট্রেলিয়ার একটি বহুবিস্তৃত ব্যবসা। গ্রেট ডিভাইডিং পর্বতমালার পশ্চিমাংশে অবস্থিত কুইন্সল্যাণ্ড-রাজ্যের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে মারে নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত শুষ্ক (বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০"-৩০" এবং গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ ৭৫° ফাঃ) অংশে এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে পশমের জন্য প্রধানতঃ মেরিনো মেষ এবং এই সমস্ত অংশের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল স্থানে মাংস ও পশমপ্রদায়ী মিশ্রণজাত মেষ পালিত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়াতেই মেষের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। পশম উৎপাদন ও রপ্তানীতে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সিডনী ও মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার পশম ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। অস্ট্রেলিয়ার পশমের প্রায় অর্ধেকাংশ যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও জাপান অস্ট্রেলীয় পশমের অন্যান্য প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পূর্বভাগের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ক্যানটারবেরী সমভূমি ও তৎসন্নিহিত তৃণভূমি অঞ্চলসমূহেই পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয় এবং এই দেশ হইতে প্রচুর পশম বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। মৃদু জলবায়ু, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, হিমায়ন-যন্ত্র ও চারণ শিল্পোদ্ভব উপজাত দ্রব্য-সমূহের ব্যাপক ব্যবহার হেতু নিউজীল্যাণ্ডে মেষ-পালন-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা—আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলিতে পশম পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। এই পশম সাধারণতঃ মহাদেশীয় ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রপ্তানী হইয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০"-৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত 'ভেল্ড' তৃণাঞ্চলেই মেষ পালিত হয়। পশম রপ্তানীকারক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার পরেই।

বাণিজ্য (Trade)—রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৮০% পশম আসে দঃ গোলার্ধ হইতে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, নিউজীল্যাণ্ড এবং উরুগুয়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মেষ-পশম **রপ্তানীকারক** দেশ। পৃথিবীর মোট পশম রপ্তানীর ৭৫% আমদানী করে উঃ পঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। গ্রেট ব্রিটেন মেষ-পশম আমদানীতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ইতালী এবং রুশিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মেষ-পশম **আমদানী** করে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বন্দর পৃথিবীর মেষ-পশম রপ্তানীর প্রধান বন্দর।

অন্যান্য পশম (Other wools & hairs)—মেষ ভিন্ন অন্যান্য লোমশ জন্তু হইতে পশম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার এঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও উজ্জ্বল মোহেয়ার পশম; কাশ্মীর, তিব্বত ও দক্ষিণ চীনের নানাস্থানে কাশ্মীরী ছাগলের লোম হইতে সূক্ষ্ম ও নরম কাশ্মীয়ার পশম; চীন ও তুর্কিস্তানে উটের লোম হইতে পশম; দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুনা নামক বন্যজীবের লোম হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম শ্রেণীর পশম; এবং আণ্ডিজ পর্বতাঞ্চলের আলপাকা, লামা, গুয়ানাকো প্রভৃতি জন্তুর লোম হইতে উৎপন্ন পশম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শূকর (Pigs)

শূকর নানাপ্রকার জলবায়ুতে প্রতিপালিত হয়। তবে ওক ও বীচ গাছের ফল খাইয়া শূকর জীবন ধারণ করে বলিয়া ওক ও বীচের নিবিড় অরণ্যযুক্ত অঞ্চলেই শূকর অধিক। প্রধানতঃ মাংস, চর্বি ও কুঁচি উৎপাদনের জন্য শূকর পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা-বলয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শূকর চারণ ক্ষেত্র অবস্থিত। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলেও প্রচুর শূকর পালিত হয়। তবে পালিত শূকরের সংখ্যার দিক হইতে চীন দেশই সর্বাগ্রগণ্য।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহে প্রচুর **শূকরমাংস** (pork, bacon, ham) উৎপন্ন হয়। শূকরমাংস রপ্তানীতে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম। ডেনমার্ক, ক্যানাডা, আয়র্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশ। আমদানীকারক দেশ-সমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও কিউবা প্রধান।

শূকরের চর্বি (lard) রপ্তানীতেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। শূকরের কুঁচি (bristles) নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের পশুচারণ শিল্প

পালিত পশু (Livestocks)—ভারতের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু, ছাগ ও মেষ উল্লেখযোগ্য। **গবাদি পশুর** সংখ্যার দিক হইতে ১৯৫৬ সালের আদমসুমারী অনুসারে (১৫৯ কোটি গরু—পৃথিবীর ১৯% এবং ৪.৫ কোটি মহিষ—পৃথিবীর ৫০%) ভারত পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করে। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলেই গবাদি পশুর সংখ্যা অধিক। চারণক্ষেত্রের তুলনায় গবাদি পশুর সংখ্যাধিক্য, প্রজননক্ষম উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ হেতু এদেশের গবাদি পশু অত্যন্ত রুগ্ন ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৩.৯ কোটি **মেষ** ছিল। ভারতীয় মেষের অধিকাংশই পাঞ্জাব, বিহার, পঃ বঙ্গ, উঃ প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, কাশ্মীর ও হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চলে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মেষ অপেক্ষা ভারতীয় মেষ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৫.৫ কোটি (পৃথিবীর ১৮%) **ছাগল** ছিল। গরু, মেষ ও ছাগল দুগ্ধ, চর্ম এবং মাংসের জন্য পালিত হয়।

ভারতের অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে **শূকর, গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র** ও **অশ্বতর** প্রধান। **হাঁসমুরগীর** (poultry) পালন ভারতের প্রতি গ্রামেই রহিয়াছে। পুণা, গুরুদাসপুর ও মার্তণ্ডম্ (কেরালা)-এ হাঁসমুরগী পালনের সরকারী কেন্দ্র আছে। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৯.৫ কোটি হাঁসমুরগী এবং ৮০ লক্ষ অন্যান্য গৃহপালিত পশু ছিল। সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি এবং আসামের পার্বত্যভূমি হইতে প্রচুর **মধু** সংগৃহীত হয়। কোয়েম্বাটোর, মহাবালেশ্বর, সোদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মধুমক্ষিকা পালনের কেন্দ্র রহিয়াছে।

জান্তব সম্পদ (Animal products)—ভারতের জান্তব সম্পদের মধ্যে পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, অস্থি প্রভৃতিই প্রধান। পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ (গাড়োয়াল, আলমোড়া ও নৈনিতাল), রাজস্থান (বিকানীর), কাশ্মীর ও দঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে **পশম** পাওয়া যায়। ভারতীয় পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতে গড়ে বার্ষিক প্রায় ৭.২ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়, তবে ইহার মাত্র ২.৪ কোটি পাঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১.৬ কোটি টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম আমদানী হইয়া আসে। **দুগ্ধ** উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ১.৭ ও ১.৯ কোটি টন দুগ্ধ উৎপাদিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান ২.২ কোটি টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে অনুমান ২.৫ কোটি টন। উৎপাদিত দুগ্ধের মধ্যে ৩৮% তরল দুগ্ধ হিসাবে, ৪২% ঘি প্রস্তুতিতে এবং ২০% ক্ষীর, মাখন, দধি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত দুগ্ধের অর্ধাধ গোজাত

এবং অধিকার্ধ মহিষজাত। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি ভারতবাসী দৈনিক গড়ে ৪'৭৬ আউন্স দুগ্ধ সেবন করে, তবে দৈহিক প্রয়োজনের দিক হইতে ইহার নিম্নতম পরিমাণ হওয়া উচিত ১০ আউন্স। ১৯৬০-৬১ সালে দৈনিক দুগ্ধ সেবনের পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে ৪'৯ আউন্স; ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে অনুমান ৫'১ আউন্স। নিকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু, গাভীপ্রতি দুগ্ধোৎপাদনের স্বল্পতা, বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব ও ক্রান্তীয় জলবায়ু হেতু এদেশে **দুগ্ধজাত দ্রব্যের** শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে **ঘি** (পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান) এবং **মাখন** (আগ্রা, আলিগড়, বোম্বাই ও কলিকাতা)-ই প্রধান। গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে ১'৪ কোটি মণ ঘি প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি বনস্পতি শিল্প প্রসার লাভ করায় এই শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, কলিকাতা, বরোদা, রাজকোট ও আলিগড়ে আধুনিক ডেয়ারী ফার্ম রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বধ্যাগার হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০,০০০ টন **চর্ম** সংগৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চর্ম রপ্তানী হয়। কানপুর, আগ্রা, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ চর্মশিল্পের কেন্দ্র।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পশুকৃষি (Animal husbandry under Five Year plans):—ভারতীয় পশুকৃষির নানাবিধ উন্নতিকল্পে **প্রথম পরিকল্পনার** কার্যকালে (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) মোট ৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। এই পরিকল্পনাকালে কৃত্রিম প্রজনন-কেন্দ্র-সমেত প্রত্যেকটি কেন্দ্রে চারিটি পৃথক পৃথক শাখা-সমন্বিত ১৪৬টি গ্রাম্য গোপালক কেন্দ্র[1] এবং ২৫টি গোসদন[2] স্থাপিত হয়। এই পরিকল্পনার কার্যকালে ৬৫০টি নূতন পশু চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৫৫-৫৫—১৯৬০-৬১) ভারতীয় পশুকৃষির নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যসূচী বাবদ মোট ব্যয় হয় ২১ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাকালে—(১) প্রত্যেকটিতে ৬টি করিয়া শাখা সমেত ১৯৬টি নূতন গ্রাম্য গোপালন-কেন্দ্র ও ৩৪টি নূতন গোসদন স্থাপিত হয়, প্রথম পরিকল্পনাকালে স্থাপিত গোপালন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে ১১৪টি কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হয় এবং ২৪৬টি গোশালায় উন্নতি সাধন করা হয়। (২) অন্ধ্রপ্রদেশ, প্রাক্তন বোম্বাই রাজ্য, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের অন্তর্গত যাযাবর গবাদি পশু-

১। অধিকতর দুগ্ধ উৎপাদন ও গবাদি পশুর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে এই কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়।

২। বৃদ্ধ, রুগ্ন ও প্রজনন-শক্তিহীন গবাদি পশুর দূরীকরণ ও পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে গোসদনগুলি স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীর গবাদিপশু যাহাতে প্রজননকার্যে ব্যবহৃত না হয় তদুদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা।

পালকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) ১৯০০টি নূতন পশু-চিকিৎসালয় এবং একটি পশুখাদ্য-সরবরাহক ব্যাংক স্থাপিত হয়। (৪) প্রায় ৯ কোটি গবাদি পশুকে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। (৫) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শূকর উৎপাদনের জন্য ১৩টি শূকর-প্রজনন-কেন্দ্র এবং ২৮টি শূকর-পালন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আলিগড় (উত্তর প্রদেশ) ও হরিণঘাটা (পশ্চিম বঙ্গ) এই দুইটি অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোট দুইটি শূকর-প্রজনন তথা শূকরমাংস উৎপাদন-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। (৬) উন্নত শ্রেণীর মেষ উৎপাদনের নিমিত্ত ৪টি মেষ-প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্থানীয় মেষ হইতে উন্নততর শাবক উৎপাদনের জন্য এই কেন্দ্রসমূহ হইতে মেষ (পুং) ৩০৫টি মেষ ও পশম সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বণ্টিত হয়। মেষ পশমের কর্তন, শ্রেণী-বিভাজন এবং বিক্রয়ের প্রতিপাদন কেন্দ্র হিসাবেও এই প্রজনন কেন্দ্রগুলি কার্য করিতে থাকে। (৭) উন্নততর গৃহপালিত পশুপক্ষী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ৫টি আঞ্চলিক 'পশুপক্ষী ও হাঁসমুরগী পালনকেন্দ্র' এবং ২৬৯টি 'পশুপক্ষী ও হাঁস-মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। (৮) পশুচিকিৎসা সম্বন্ধীয় ৩টি নূতন কলেজ স্থাপন করা হয় এবং ১৪টি পুরাতন কলেজের মধ্যে ৫টি কলেজের সম্প্রসারণ করা হয়। ইজতনগরের "ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট' কেন্দ্রে একটি স্নাতকোত্তর কলেজ স্থাপিত হয় এবং মথুরা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাটনায় একটি করিয়া চারিটি কলেজ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই পরিকল্পনা কালে পশুচিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ যে ৫০০০ জন স্নাতকের প্রয়োজন হয় তাহা এই কলেজগুলি সম্মিলিতভাবে সরবরাহ করিতে সক্ষম হয়।

স্থূল হিসাবে দেখা যায় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষবর্ষে গ্রাম্য গোপালন কেন্দ্রগুলির মোট ২০০০টি শাখা ছিল এবং ১৯৬০ সাল নাগাদ ৬৭০টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ৪০০০টি পশু চিকিৎসালয় ভারতে বর্তমান ছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৬০।৬১-১৯৬৫।৬৬) ভারতীয় পশু-কৃষির সামগ্রিক উন্নতিকল্পে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। এই পরিকল্পনা কালে—(১) গ্রাম্য গোপালন কেন্দ্র-সমূহের পুনর্গঠন করা হইবে এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ১০টি করিয়া পৃথক পৃথক শাখা ও কয়েকটি প্রজনন কেন্দ্রও স্থাপন করা হইবে। ১৬৮টি নূতন গোশালার পত্তন করা হইবে এবং এই গোশালাগুলিকে পরবর্তীকালে প্রজনন তথা দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হইবে। ২৩টি অতিরিক্ত গোসদন স্থাপন করা হইবে। গাভীপ্রতি দুগ্ধের উৎপাদন এবং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বৃষের সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সুষ্ঠু প্রজননের নানাবিধ ব্যবস্থাও গৃহীত হইবে এবং প্রজনন কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেই ১১টি বৃষপালন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। (২) গো-পালন কেন্দ্রে পশুখাদ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধিকল্পে প্রতিপাদন কেন্দ্রের স্থাপন, পশু-

খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী বীজের সরবরাহ, উদ্বৃত্ত পশুখাদ্যের সংরক্ষণ, সুষম পশুখাদ্যের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে; নূতন ২টি পশুখাদ্য সরবরাহক ব্যাংক এবং একটি পশুখাদ্য ও তৃণভূমি সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হইবে। (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ মোট ৮০০০টি পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেকটি গোপালন কেন্দ্রেই ন্যূনপক্ষে একটি করিয়া পশু-চিকিৎসালয় থাকিবে। (৪) গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ নিবারণের এবং অবাঞ্ছিত গবাদি পশুকে খোজা করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ভারতের সমস্ত গবাদি পশুকেই সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকা দিবার ব্যবস্থা ১৯৬৩-৬৪ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ হইবে। (৫) দুইটি আঞ্চলিক শূকর প্রজনন তথা শূকর মাংস উৎপাদন কেন্দ্র, ১২টি শূকর প্রজনন কেন্দ্র এবং ১৪০টি শূকর পালন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। (৬) একটি অশ্ব-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ঐ কেন্দ্রে ৪৮টি ঘোটকী, ২টি পাল ধরাইবার অশ্ব, ২০টি গর্দভ এবং ৫টি পাল ধরাইবার গর্দভ পালিত হইবে। এই কেন্দ্রটি হইতে বৎসরে ১২টি পাল ধরাইবার অশ্ব এবং ৬টি পাল ধরাইবার গর্দভ উৎপাদিত হইবে। স্থানীয় অশ্ব ও গর্দভ হইতে উন্নততর শাবক উৎপাদনের নিমিত্ত এই অশ্ব ও গর্দভ-গুলিকে ১০টি সুনির্বাচিত পাল ধরাইবার কেন্দ্রে রাখা হইবে। (৭) ১৫টি মেষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ১৭টি কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হইবে। এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে প্রায় ২৫০০টি উচ্চ শ্রেণীর মেষ (পুং) গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মেষপালন কেন্দ্রে প্রেরিত হইবে। (৮) ৬০টি রাজ্যগত ও ৩টি আঞ্চলিক হাঁসমুরগী পালন কেন্দ্রের এবং ৫০টি হাঁসমুরগী সম্প্রসারণ তথা উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রসারণ করা হইবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে মুরগী প্রতি বার্ষিক ডিম উৎপাদনের হার ৬০টি হইতে ৭০টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। দুইটি আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন কেন্দ্র, ১৭টি হাঁস সম্প্রসারণ কেন্দ্র, একটি গুঁড়া ডিম উৎপাদনের কারখানা এবং হাঁসমুরগীর জন্য ১৫টি খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপিত হইবে। (৯) পালিত পশু ও জান্তব সম্পদের সুষ্ঠু ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার প্রবর্তন; একটি বৃহদায়তন ও ১৪টি ক্ষুদ্রায়তন চামড়া ছাড়াইবার, চামড়া শুকাইবার ও মৃতদেহ ব্যবহারের এবং ২টি ভ্রাম্যমাণ হাড় গুঁড়া কারবার কেন্দ্রের স্থাপন এবং গবাদি পশুর বীমা ব্যবস্থার প্রসারণেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১০) গবাদি পশুর উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যাপৃত সংস্থাগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে গোসম্বর্ধনার কেন্দ্রীয় সংস্থাটি ১৯৬০ সালে পুনর্গঠিত হয়। গোশালা ও চর্মা-লয়ে নিযুক্ত শ্রমিকদের উন্নতি সাধন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। (১১) গুজরাট ও বিহারে পশু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দুইটি নূতন কলেজ স্থাপিত হইবে। এই পরিকল্পনাকালে যে ৬৮০০ জন স্নাতকের প্রয়োজন হইবে তাহা পুরাতন ও নূতন কলেজগুলি একযোগে মিটাইতে সক্ষম হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন। (১২) মেষ ও পশম সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌলিক গবেষণার

উদ্দেশ্যে রাজস্থানে একটি কেন্দ্রীয় মেষ প্রজনন গবেষণা সংস্থা এবং উহার তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে একটি এবং নীলগিরি অঞ্চলে একটি—এই দুইটি উপসংস্থাও স্থাপিত হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ডেয়ারী শিল্প ও দুগ্ধের সরবরাহ (Dairying and milk supply under Five Year plans)—**প্রথম পরিকল্পনায়** ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিসাধন ও দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি কল্পে ৭·৮১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। গ্রামাঞ্চল হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া স্বাস্থ্য-সম্মত পদ্ধতিতে বৃহৎ বৃহৎ শহরাঞ্চলে দুগ্ধের সরবরাহ করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** এই বাবদ ১২·০৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। এই পরিকল্পনাব কার্যকালে বৃহদায়তন ভোগকেন্দ্রসমূহে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ৩৬টি ডেয়ারী দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা, ১২টি গ্রাম্য মাখন তৈয়ারীর কারখানা, এবং দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে উদ্বৃত্ত দুগ্ধের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ৭টি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানার স্থাপন; ১২টি ডেয়ারী দ্রব্য উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণ এবং ডেয়ারী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

দিল্লী, পুণা, কুর্গ, কুর্নুল, গুণ্টুর, কোডাইকানাল এবং হরিণঘাটায় ডেয়ারী দ্রব্যের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ইতঃপূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্ব মোট ২৮টি দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণেব বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। অমৃতসর ও রাজকোটে দুইটি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা এবং বারাউনি, আলিগড, ও জুনাগডে তিনটি গ্রাম্য মাখন উৎপাদন কেন্দ্র বৈদেশিক সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে ২২৫৭টি সমবায় দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি এবং ৭৭টি দুগ্ধ সরবরাহ সম্মেলন ছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতীয় ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিকল্পে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। এই পরিকল্পনার কার্যকালে—(১) বার্ষিক ৯০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত দুইটি শিশুখাদ্য উৎপাদনের কারখানা, বার্ষিক মোট ৫৩০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত তিনটি ঘনীভূত দুগ্ধ উৎপাদনের কারখানা এবং বার্ষিক ৬৭০ টন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি দুগ্ধ সম্বলিত পানীয় দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে। (২) এক লক্ষ লোকের অধিক বসতিযুক্ত অঞ্চল সমূহে এবং বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল সমূহে ৫৫টি নূতন দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা গৃহীত হইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্য-কালে গৃহীত দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাগুলির সম্প্রসারণ করা হইবে। গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত প্রদায়ী দুগ্ধ কেন্দ্র সমূহে ৮টি গ্রাম্য মাখন উৎপাদন কেন্দ্র, ৪টি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র ও ২টি পনীর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। (৩) বৃহদায়তন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র সমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলেই ৪টি গবাদি পশুখাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে। (৪) ডেয়ারী শিল্পে

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য ৪টি কারখানা স্থাপিত হইবে। (৫) রেলপথে হিমায়িত কক্ষে দুগ্ধ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হইবে। (৬) সুষ্ঠু কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন ডেয়ারী কেন্দ্র ও মাখন উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইবে। (৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সুবিধার জন্য "ন্যাশন্যাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট"টি বাঙ্গালোর হইতে কর্নাল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকালে উক্ত সংস্থাটি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রবর্তন করিবে এবং বাঙ্গালোরের উপকেন্দ্রটি সম্প্রসারিত হইবে। বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ, আনন্দ ও আরে অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্প সম্পর্কে উপাধিস্তরের শিক্ষাদান এবং আনন্দ ও কর্নাল অঞ্চলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনা কালে ৬২৫ জন স্নাতক, ৯৭৫ জন উপাধিস্তরের শিক্ষা প্রাপ্ত এবং ১২৩০ জন অন্যান্য স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত—এই মোট ২৮৩০ জন ডেয়ারী শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the principal commercial grazing grounds of the world and indicate their future potentialities.

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা কর এবং উহাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৭১-১৭২)

2. Discuss the factors that account for the successful development of dairy farming. Name the important dairy products and describe the principal dairy regions of the world.

(ডেয়ারী শিল্পের গঠন ও প্রসারের অনুকূল অবস্থাগুলি আলোচনা কর। বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যসমূহের নাম লিখ এবং পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহের বর্ণনা কর।)

(পৃঃ ১৭৩-১৭৫)

3. What are the conditions of success for the commercial production of wool? Name the principal wool producing countries of the world and indicate the nature of world trade in wool.

(বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চল সমূহের নাম লিখ এবং পশম বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ১৭৬-১৭৯)

4. Discuss the development of animal farming in India. What are the important animal products? What steps have been taken in recent years to improve animal husbandry and dairying in India?

(ভারতের পশুচারণ শিল্পের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ভারতের জান্তব সম্পদগুলির নাম লিখ। বর্তমান কালে ভারতীয় পশুকৃষি ও ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৮০-১৮৫)

নবম অধ্যায়

মৎস্য চাষ

মৎস্য মানবের অন্যতম প্রধান খাদ্য। পূর্বে কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্যই মৎস্যের চাষ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের দ্রুত উন্নতি ও উন্নত ধরণের মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মৎস্য অন্যতম আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং মৎস্যের চাষ একটি প্রধান বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—আহরণ ক্ষেত্রের তারতম্য অনুসারে মৎস্যগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়' (১) নদী, হ্রদ, পুকুর, বিল প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয় তাহাদিগকে **পরিষ্কৃত বা স্বাদু-জলের মৎস্য** (fresh water fish) এবং (২) সমুদ্র হইতে যে সমস্ত মৎস্য আহরণ করা হয় তাহাদিগকে **সামুদ্রিক মৎস্য** (Sea fish) বলে। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রগুলিকে আবার অবস্থানভেদে **উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র** (Coastal fisheries) এবং গভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র (Deep Sea fisheries) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মৎস্য ও মৎস্য চাষ বলিতে আমরা সাধারণতঃ সামুদ্রিক মৎস্যই বুঝিয়া থাকি। গভীর সমুদ্রে তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকার এবং উপকূল হইতে কৃত্রিম মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রভৃতি সংগ্রহও এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্যক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য (Physical characteristics of the major world fisheries)—পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যপালন ক্ষেত্রগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্য চাষের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল—(১) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলি প্রধানতঃ **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে** (Temperate Latitudes) সীমাবদ্ধ। কারণ, (ক) ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে মৎস্য দ্রুত পচনশীল বলিয়া মৎস্য ব্যবসায় প্রচেষ্টা তেমন সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠে নাই। (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৎস্য প্রায়শঃই অখাদ্য এবং বিষাক্ত হয়। (গ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের একই স্থান হইতে একই প্রকারের মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে একই প্রকারের বহুসংখ্যক মৎস্য পাওয়া যায় এবং উহাদের অধিকাংশই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) মৎস্য শিল্পে প্রচুর সুলভ শিল্পশ্রমের প্রয়োজন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের

ধীবরেরা কর্মঠ ও শ্রমনিপুণ বলিয়া এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড় হইলেও প্রতিকূল জলবায়ু হেতু এতদঞ্চলের ধীবরেরা শ্রমনিপুণ ও কর্মঠ নহে। (ঙ) শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণস্থলগুলি মৎস্যপালনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণ অধিক হয় বলিয়া ঐ অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। (চ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৃদু জলবায়ু এই ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান কারণ।

(২) মহাদেশ-সন্নিহিত **অগভীর সমুদ্র এবং মগ্নভূমি** (Shallow Seas) মৎস্য চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট। কারণ—(ক) অগভীর সমুদ্রে মৎস্যখাদ্য উদ্ভিদ্ ও জলকীট (plankton) প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। (খ) দেশাভ্যন্তরস্থ বহু নদনদী ও সমুদ্রস্রোতবাহিত আবর্জনা এবং জীবজন্তুর মৃতদেহ ভাসিয়া উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হইলে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য উহা হইতেই তাহাদের প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। (গ) মৎস্য সাধারণতঃ অগভীর জলে তীরের নিকট ডিম্ব প্রসব করে এবং এই সমস্ত মগ্নভূমিতে দলে দলে জমা হয়। (ঘ) ভগ্ন তটরেখা মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের উপযোগী।

অতএব পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্য-আহরণ ক্ষেত্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহারা সাধারণতঃ সমুদ্রতীর হইতে কয়েক শত মাইলের মধ্যে অগভীর জলে অবস্থিত, এবং ইহারা প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তবে সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে উপরোক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি ব্যতীতও কতকগুলি অনুকূল **অর্থনৈতিক অবস্থার** প্রয়োজন।—যেমন, (১) সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চল-সমূহে কৃষি ও শ্রমশিল্পের অনুন্নত অবস্থা, (২) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, (৩) যানবাহনের সুব্যবস্থা, (৪) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা এবং (৫) উৎসাহী ও পরিশ্রমী ধীবরের পর্যাপ্ত সরবরাহ।

মৎস্য-আহরণ ক্ষেত্র (Major world fisheries)—পৃথিবীতে চারিটি প্রধান প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। যথা— (১) **উত্তর সাগর** ও ইউরোপের পশ্চিম তীরসংলগ্ন সমুদ্র। এই অঞ্চল (ক) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত, (খ) প্রায় সর্বত্রই অগভীর ও মৎস্যের বসোপযোগী মগ্নভূমিতে (ডগার্স ব্যাংক) পরিপূর্ণ, (গ) শীতল আর্কটিক স্রোত ও উষ্ণ আটলান্টিক সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণ-স্থল, (ঘ) গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি জনবহুল দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং (ঙ) ইউরোপীয় নদীসমূহ দ্বারা পরিবাহিত মৎস্যখাদ্য প্রচুর আবর্জনা-পুষ্ট। এই সমস্ত কারণে উত্তর সাগর পৃথিবীর একটি বৃহৎ মৎস্যপালন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। **গ্রেট ব্রিটেন** এই অঞ্চলের মৎস্য-ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার

করে এবং সমগ্র পৃথিবীতে মৎস্যপালনশিল্পে জাপানের পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। স্কটল্যাণ্ডের উইক, লারউইক, ফ্রেজারবার্গ, পিটারহেড, স্টোনওয়ে, লীথ ও এবারডীন এবং ইংলণ্ডের গ্রীমস্‌বী, ইয়ারমাউথ এবং লোয়েস্টফট্‌ প্রভৃতি মৎস্য আহরণের প্রধান বন্দর। ইংল্যাণ্ডের বিলিংসগেট শহর একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য-ব্যবসায় কেন্দ্র। কড, হেরিং, ম্যাকেরেল, হ্যাডক, স্যামন প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। নরওয়ের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ এই উত্তর সাগরের মৎস্য-চাষের উপর নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সন্নিহিত সমুদ্রে মৎস্যের ও উপকূল অঞ্চলে পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে এই অঞ্চলের মৎস্য-শিল্প এত উন্নতিশীল। লাফোটেন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র হইতে কড ও হেরিং মৎস্য অধিক ধৃত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন তিমি মৎস্যের তৈলের অর্ধেকেরও অধিক নরওয়ে সরবরাহ করিয়া থাকে। ফ্রান্সের সন্নিহিত সমুদ্রে সার্ডিন, এ্যানকোভ ও শুক্তি শিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
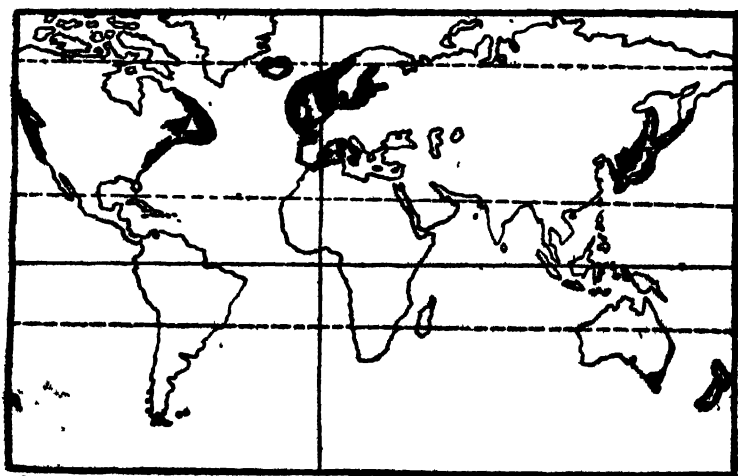
৪২নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যকেন্দ্রসমূহ

(খ) ল্যাব্রাডোর, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যানাডা ও নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূল-সংলগ্ন **উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর**—এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৎস্যপালন-ক্ষেত্র। উপকূলসন্নিহিত স্থানে মৎস্য আহরণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ধিসূত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে অবাধ মৎস্য শিকার চলে। এই সমস্ত স্থানের (ক) তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ও নদী-মোহনায় জল অগভীর এবং (খ) এখানে ল্যাব্রাডোরের শীতল জলস্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মিশ্রণ মৎস্যবাসের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এই বৃহৎ মৎস্যপালন-ক্ষেত্রকে 'গ্রেট ব্যাংক' বলে। কড, ম্যাকেরেল, হেক, হেরিং,

হ্যালিবুট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। সেণ্ট লরেন্স নদী হইতে চিংড়ি শিকার করা হয়। বোস্টন, হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্ট জন, মন্ট্রিল এবং পোর্টল্যাণ্ড এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্যকেন্দ্র।

(৩) **জাপানের** তীরসংলগ্ন সমুদ্র—জাপানের মৎস্যপালন ক্ষেত্র উত্তর মেরু সাগর হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। অগভীর সমুদ্র, বিস্তৃত মহীসোপানের অবস্থিতি এবং উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের মিশ্রণ হেতু এখানে এত বড় মৎস্যপালন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র মৎস্যের প্রায় ৮০ ভাগই হোক্কাইডো, কোরিয়া, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, হন্‌সু এবং শাখালিন-এর নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে ধৃত হয়; সার্ডিন, হেরিং, বনিটো, চিংড়ি প্রভৃতি জাপানের প্রধান মৎস্য। পরিমাণের দিক হইতে জাপানের মৎস্য আহরণ পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ধৃত মৎস্যের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। খাদ্যের অনুপযোগী অনেক মৎস্য হইতে জমির জন্য সার তৈয়ারী করা হইতেছে। এই দেশের উপকূলে কৃত্রিম মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য।

(৪) আলাস্কা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওয়াশিংটন ও অরিগনের নিকটবর্তী **উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর**—এই অঞ্চল স্যামন ও ট্রট মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। হেরিং, কড ও হ্যালিবুট মৎস্যও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া, সিট্‌কা, ভ্যান্‌কুভার, প্রিন্স রুপার্ট দ্বীপ এবং পোর্টল্যাণ্ড এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্যকেন্দ্র।

উপরোক্ত চারিটি বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্রও মৎস্যের চাষ হয়। পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ক্রান্তীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি অঞ্চল সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মৎস্য আহৃত হয়। পারস্য উপসাগরে, সিংহল ও ভেনেজুয়েলার সন্নিহিত সমুদ্রে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী সাগরে এবং ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে শুক্তি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নরওয়ে ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর অন্তর্বর্তী মেরু সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে তিমি ও সীল শিকার করা হয়।

বাণিজ্য (Trade)—মৎস্যের বহির্বাণিজ্য অল্প। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, এবং নরওয়ে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য বিদেশে রপ্তানী করে। বাল্টিক রাজ্য, জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল এবং ইতালী প্রধান প্রধান মৎস্য আমদানীকারক দেশ।

ভারতের মৎস্যশিল্প

ভারতের মৎস্যশিল্প—ভারতের অধিবাসীদের প্রায় ৪০% মৎস্যাশী। বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের অধিবাসীরাই অধিক পরিমাণে মৎস্য ভক্ষণ করে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে প্রায় ৭.৪ লক্ষ টন মৎস্য ধৃত হয়।

১৯৫৫-৫৬ সালে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহার প্রায় ৭০% সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্য এবং অবশিষ্ট ৩০% স্বচ্ছ জলের মৎস্য। প্রতি ভারতবাসী বৎসরে গড়ে ৩·৪ পাউণ্ড মৎস্য ভক্ষণ করে। অথচ দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রতি পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর পক্ষে দৈনিক ৩ আউন্স হিসাবে ৫১ পাঃ মৎস্যের প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণ মৎস্যই ধৃত হইতেছে। ভারতীয় মৎস্য শিল্পের এই অনুন্নতির প্রধানতম কারণ এই যে, এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা একদিকে যেরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও সন্দেহপ্রবণ, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্র। উপরন্তু সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও এদেশে নাই বলিলেই চলে।

ভারতীয় মৎস্যের শ্রেণীবিভাগ—ভারতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয় তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) **সমুদ্রের মৎস্য**—সধারণতঃ তীর হইতে সমুদ্রের ৫।৭ মাইল দূর পর্যন্ত এই সকল মৎস্য পাওয়া যায়। (২) **সমুদ্রোপকূলের মৎস্য**—প্রধানতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মহানদীর মোহানায়, শাখা ও উপনদীর সঙ্গমস্থলে এবং মহীসোপান অঞ্চলে ইলিশ, চিংড়ি, কাতলা, রোহিত, ভেটকী, চাঁদা, পারসে, ভাঙন প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলের মৎস্য ধৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলেই এই শ্রেণীর মৎস্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অভগ্ন তটরেখা, মহীসোপানের সংকীর্ণতা, পোতাশ্রয়ের অপ্রতুলতা এবং মৎস্য শিকারের আদিম পদ্ধতি হেতু সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্য শিল্প ভারতে তাদৃশ উন্নতি লাভ করে নাই। সম্প্রতি সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্যশিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার বিশেষ চেষ্টিত রহিয়াছেন। (৩) **দেশাভ্যন্তরের স্বচ্ছজলের মৎস্য**—আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধরা হয় তাহাদিগকে দেশাভ্যন্তরের স্বচ্ছজলের মৎস্য বলে। কাতলা, ইলিশ, রুই, মৃগেল, গলদাচিংড়ি, কই, মাগুর, পুঁটি প্রভৃতি এই শ্রেণীর মৎস্য। দেশাভ্যন্তরের মৎস্য স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ অনুমান করেন যে ১৫০ লক্ষ একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে বর্তমানে মৎস্য ধরা হইতেছে। তবে জলাশয়সমূহে কচুরীপানার প্রাদুর্ভাব, বৃহদাকার সেচব্যবস্থার প্রবর্তন হেতু পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতির অযত্ন, হাজামজা নদনদী ও খাল-বিলের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিবার ফলে মৎস্যের চলাচল ও ডিম্ব প্রসবের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের উল্লেখযোগ্য মৎস্যশিল্প কেন্দ্র—(ক) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গের **আভ্যন্তরীণ** জলভাগ হইতে প্রচুর রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য ধরা হয়। তবে এই শ্রেণীর মৎস্য আহরণের উন্নতির পথে

কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে। যথা—(১) স্থানীয় ধীবরেরা অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় এই শিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। (২) বহু ক্ষেত্রে যানবাহনের সুযোগসুবিধা না থাকায় মৎস্য চালান দেওয়া হয় না। (৩) ধীবরেরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার মৎস্য ধরিয়া অল্পকালের মধ্যেই জলভাগকে মৎস্যহীন করিয়া ফেলে। (৪) মৎস্য চাষের উন্নতি বা নূতন কোন প্রকার মৎস্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্যাপক প্রচেষ্টা এযাবৎ কাল পর্যন্ত হয় নাই। (৫) বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হেতু বহু মৎস্যের ডিম্ব ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং বর্ষা শেষে ঐ সমস্ত স্থানে জল শুষ্ক হইয়া গেলে ডিমগুলিও নষ্ট হইয়া যায়। (৬) পশ্চিম বঙ্গের মৎস্যশিল্প নিকারীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় মৎস্য ব্যবসায়ে উহারাই অধিক লাভবান হয় এবং ধীবরেরা অল্প মুনাফা পাওয়ায় মৎস্য ধরার তাদৃশ অনুপ্রেরণা পায় না। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে পঃ বঙ্গের ২৫০০ একর পরিমিত পরিত্যক্ত জলাশয়, ৩৭৮ একর পরিমিত পরিত্যক্ত বিল এবং ১৩৫০০ একর পরিমিত ছোট ছোট জলভাগে মৎস্য পালনের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের **সমুদ্রোপকূলের মৎস্যশিল্প** কেবলমাত্র সুন্দরবনাঞ্চলেই পরিদৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার মণ মৎস্য ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অতি সামান্য অংশই বর্তমানে আহৃত হইতেছে। (১) যানবাহনের অসুবিধা, (২) বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে দূরত্ব, (৩) মৎস্য-আহরণ-কেন্দ্রে বরফ, বাক্স প্রভৃতি সরঞ্জাম এবং দ্রুতগামী যানবাহনের অভাব, (৪) মৎস্য-আহরণ কেন্দ্রে খাদ্য, পানীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই অঞ্চলের মৎস্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু ধীবরদের নৌকাসমূহ প্রসারিত সমুদ্রে অধিকদূর যাতায়াতের উপযোগী না হওয়ায় তাহারা উপকূল-সন্নিহিত একটি নির্দিষ্ট এলাকা হইতে ক্রমাগত মৎস্য ধরে। ফলে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইলে সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্য-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে **গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিল্প** বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। তবে সম্প্রতি "ডিপার্টমেণ্ট অব্ ফিসারীজ"-এর সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প প্রসার লাভ করিতেছে।

(খ) **উড়িষ্যা**—উড়িষ্যায় সামুদ্রিক এবং আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্প সংগঠনের প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে; কিন্তু যানবাহনের সুবিধা না থাকায় অনেক স্থানেই মৎস্য ধরা হয় না। চিল্কা হ্রদ হইতে প্রচুর মৎস্য ধরা হয় এবং পরে দঃ পূঃ রেলপথে কলিকাতা, টাটানগর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। পুরীর সমুদ্রোপকূল হইতেও মৎস্য ধরা হয়। উড়িষ্যা হইতে রেলপথে প্রায় ৫৫ হাজার মণ মৎস্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। সম্প্রতি উড়িষ্যার বহু একর

পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগের পুনরুন্নয়ন করিয়া মৎস্য পালনের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

(গ) **অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও কেরালা—সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের** ব্যাপক উন্নতির পক্ষে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের ১৭৫০ মাইল দীর্ঘ উপকূলাঞ্চল সন্নিহিত ৪০,০০০ বর্গমাইল ব্যাপিয়া মহীসোপানের অবস্থিতি অত্যন্ত উপযোগী। অতি পুরাতন পদ্ধতিতে মৎস্য ধরা হয় বলিয়া এই বিস্তৃত মৎস্য-চারণভূমি একরূপ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাদ্রাজের এই সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ক্ষেত্রটি-উপকূল হইতে প্রায় ৩ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। **দেশাভ্যন্তরের মৎস্যশিল্প** মাদ্রাজে আদৌ বিস্তার লাভ করে নাই। তবে প্রথম পরিকল্পনার কাযকালে মেতুর জলাধারটির সংস্কার সাধনের ফলে বর্তমানে দৈনিক ৫ টন করিয়া মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা হইাছে। পূর্ব উপকূলে অন্ধ্রের গঞ্জাম, গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম্, কোকনদ, মসলিপত্তম, নেলোর, মাদ্রাজের মাদ্রাজ, পন্দিচেরী, নেগাপত্তম; কেরালার কোচিন, কালিকট ও মহীশূরের ম্যাঙ্গালোর মৎস্য ধরার বিখ্যাত কেন্দ্র। কেরালায় (আর্ণাকুলাম) সার্ডিন মৎস্যের তৈল ও "গুয়ানো" প্রস্তুত হয়। এই তৈল পাটের কলে এবং সাবান ও মোমবাতি তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। "গুয়ানো" হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। এই সার দাক্ষিণাত্যের চা-বাগানসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সিংহল, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। মাদ্রাজ হইতে বহু শুষ্ক ও লবণাক্ত মৎস্য বিদেশে রপ্তানী হয়। কেরালার কোচিন ও কালিকট মৎস্য, তৈল ও "গুয়ানো" রপ্তানীর প্রধান বন্দর। মাদ্রাজে হাঙরের যকৃৎ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সরকারী কারখানা রহিয়াছে।

(ঘ) **মহারাষ্ট্র ও গুজরাট**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়ের প্রাচুয, মৎস্য ধরার উপযোগী বিস্তৃত মহীসোপান, প্রায় সাতমাসব্যাপী অনুকূল আবহাওয়া, উন্নত শ্রেণীর ধীবরের প্রাচুয প্রভৃতি অনুকূল অবস্থাসমূহ এতদঞ্চলে **সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের** উন্নতির সহায়ক। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড উপকূলের নির্ভীক ধীবরেরা প্রচুর সামুদ্রিক মৎস্য ধরে। **আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্পের** উন্নতির জন্য মহারাষ্ট্র সরকার বিশেষ যত্নবান। মহারাষ্ট্রের ধীবর সমিতির উদ্যোগে ধীবরেরা মৎস্য ধরায়, মৎস্যের তৈল নিষ্কাশনে এবং মৎস্য টিনবন্দীকরণে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিতেছে। কচ্ছ উপসাগর হইতে মুক্তা উত্তোলিত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও মৎস্যশিল্প (Five Year plans and Indian fishing industry)—আভ্যন্তরীণ মৎস্য শিল্পের উন্নতিকল্পে **প্রথম পরিকল্পনার** (১৯৫০-৫১/১৯৫৫-৫৬) কার্যকালে উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা মৎস্য-ডিম্বের মৃত্যুহারের হ্রাস সাধন, বহু রাজ্যের অন্তর্গত পতিত ও অব্যবহৃত জলভাগকে আইনের সাহায্যে মৎস্যক্ষেত্রে পরিবর্তন, বিভিন্ন

রাজ্যের অন্তর্গত ২৫,০০০ একর পরিমিত মৎস্যচাষের উপযোগী আভ্যন্তরীণ জলভাগের অনুসন্ধান, বৃহদায়তন জলাধারগুলিতে মৎস্য-পালন ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে একটি "কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ মৎস্য গবেষণাকেন্দ্র" ও উহার তত্ত্বাবধানে এলাহাবাদ (নদীর মৎস্য), কটক (পুষ্করিণীর মৎস্য) ও কলিকাতায় (মোহানার মৎস্য) তিনটি উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়। **সামুদ্রিক মৎস্য** শিল্পের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুসৃত হয়ঃ—(১) ঋণদান, অধিকতর মৎস্য উৎপাদন এবং ইহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ৮০০টি প্রাথমিক ধীবর সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সরকারী সহায়তাপুষ্ট কেন্দ্রীয় সংঘ এই প্রাথমিক সমিতি-গুলিকে মৎস্য বিক্রয় এবং এঞ্জিন, বরফ ও হিমাগার সরবরাহ প্রভৃতি ব্যাপারে সহায়তা করিতেছে। (২) গত ৫ বৎসরে বোম্বাই (৬০০), ও সৌরাষ্ট্রে (৪০) বহু যন্ত্রচালিত নৌকার পত্তন ও অন্যান্য অঞ্চলের নৌকাগুলির গঠন-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়; (৩) বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের উপকূলাঞ্চলে ৪০ ফ্যাদম গভীরতা যুক্ত সমুদ্রতল হইতে মৎস্য আহরণের উপযোগী ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং পরীক্ষামূলক ভাবে সমুদ্রোপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকারের নৌকা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মৎস্য আহরণের প্রচেষ্টা করা হয়। (৪) মৎস্য পরিবহন ব্যবস্থার সমূহ উন্নতি সাধন করা হয়। (৫) বোম্বাই, কোজিকোড, ম্যাঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—এই চারিটি অঞ্চলে মোট ৪টি বৃহদায়তন বরফ ও হিমায়ন যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্য মৎস্য আহরণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমায়ন যন্ত্রের স্থাপন করা হয়। (৬) বোম্বাই, কারওয়াড, কালিকট, কোচিন ও মাদ্রাজ—এই পাঁচটি আঞ্চলিক মৎস্য কেন্দ্র সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কে নানারূপ গবেষণার প্রবর্তন করে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে মৎস্য আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টন। প্রথম পরিকল্পনায় মৎস্যশিল্প সংগঠনে মোট ব্যয় হয় ২.৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৬/১৯৬০-৬১) **আভ্যন্তরীণ মৎস্য** শিল্পের অধিকতর উন্নতি সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় **সামুদ্রিক মৎস্য শিল্প** সংগঠনের উপর। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়।—(১) মৎস্য আহরণ পদ্ধতির উন্নয়ন কল্পে প্রথম পরিকল্পনায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলির ব্যাপকতর অনুসরণ করা হয় এবং গত ৫ বৎসরে অতিরিক্ত প্রায় ১৫০০টি যন্ত্রচালিত নৌকার পত্তন করা হয়। (২) গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বোম্বাই-এর "কেন্দ্রীয় গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণ কেন্দ্র" কর্তৃক ৪০ ফ্যাদমের অধিক গভীরতাযুক্ত সমুদ্র-তল হইতে মৎস্য শিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের নানাস্থানে নূতন নূতন মৎস্যক্ষেত্রের আবিষ্কার এবং কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও টিউটি-

কোরিন অঞ্চলে তিনটি "মৎস্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানী কেন্দ্রের" স্থাপন করা হয়। (৩) মৎস্য আহরণের ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ কাযের উপযোগী করিয়া নূতন নূতন পোতাশ্রয়েব গঠন এবং পুরাতন পোতাশ্রয়গুলির উন্নয়ন করা হয়। (৪) মৎস্যের পরিবহন, সংবক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং মৎস্য ও উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হয়। ভাবতের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রেলপথে ছয়টি হিমায়িত কক্ষে মৎস্য পরিবহনেব ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত নানাবিধ শিক্ষা ও গবেষণার ভার মণ্ডপম্-এর "কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র" ও ব্যারাকপুরের "কেন্দ্রীয় আভ্যন্তবীণ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র" এই দুইটি সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়। মৎস্য শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে নানাবিধ গবেষণার জন্য কোচিনে "সেণ্ট্রাল ফিসারিজ টেকনোলজি স্টেশন" স্থাপিত হয় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মৎস্য আহরণ বিষয়ে ধীবরদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সর্বোপরি ধীবরদের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্য শিল্প গঠনের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনা কালে গৃহীত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে মোট ৯ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ব্যবস্থাগুলি অনুসৃত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টন মৎস্য ধৃত হইতে থাকে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০।৬১-১৯৬৫।৬৬) **আভ্যন্তরীণ মৎস্য শিল্পের** সমূহ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—(১) মৎস্য আহরণ পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কাযসূচীর ব্যাপকতর অনুসরণ, (২) বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ৫০,০০০ একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগকে, ১২০০ একব পরিমিত সামুদ্রিক উপ-কূলাঞ্চলকে এবং ২০০০ একর পরিমিত জলাভূমিকে মৎস্য উৎপাদনের প্রতিপাদন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহাব, (৩) পঞ্চায়েৎ সমিতি কর্তৃক আভ্যন্তরীণ জলভাগের উন্নয়ন এবং ধীবরদিগকে ঋণদান ও উৎপাদিত মৎস্যের ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সমবায় সমিতিগুলিব সহিত পঞ্চায়েৎ সমিতি সমূহেব সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, এবং (৪) ধীবর সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি সাধন ও সম্প্রসারণ ও ঐ সমিতিগুলির সহিত সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতিগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের উন্নয়নকল্পে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) মৎস্য আহরণের নৌকায় যন্ত্রসংযোগ এবং মৎস্য আহরণের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি সরববাহের যে কার্যসূচী দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে গৃহীত হয় তাহার সম্প্রসারণ করা হইবে এবং ৪০০০টি নূতন যন্ত্রচালিত নৌকার প্রবর্তন করা হইবে। (২) বোম্বাই, কোচিন, টিউটি-কোরিন ও বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে স্থাপিত "কেন্দ্রীয় গভীর সমুদ্রের মৎস্য

আহরণ কেন্দ্র"গুলির সম্প্রসারণ করা হইবে এবং ভেরাবল, ম্যাঙ্গালোর, পারাদিপ ও পোর্ট ব্লেয়ার অঞ্চলে নূতন ৪টি "গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণ কেন্দ্র" স্থাপিত হইবে। (৩) মৎস্য আহরণের উপযোগী নূতন ৩৫টি বৃহদায়তন জাহাজের প্রবর্তন এবং ১৬টি বন্দরকে মৎস্য ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া তোলা হইবে। (৪) বিভিন্ন রাজ্যে ৭২টি বৃহদায়তন বরফ ও হিমায়ন যন্ত্র স্থাপন করা হইবে। ভারতের পশ্চিম উপকূলাঞ্চলে, বিশেষতঃ কেরালা, মহীশূর ও গুজরাট অঞ্চলে, মৎস্য জমাইবার ও কৌটাবন্দী করিবার কারখানাও স্থাপিত হইবে। (৫) রেলপথে হিমায়িত কক্ষে মৎস্য পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারণ করা হইবে। (৬) চারিটি নূতন কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণার প্রবর্তন করা হইবে। (৭) কোচিনে অবস্থিত "সেণ্ট্রাল ফিসারিজ টেক্‌নোলজি স্টেশন"টি মৎস্যশিল্প সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইবে এবং রাজ্যগত মৎস্য দপ্তরগুলিও মৎস্য সংক্রান্ত স্থানীয় সমস্যার সমাধান কল্পে নিযুক্ত থাকিবে। (৮) মৎস্যশিল্প সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাপারে শিক্ষা দিবার জন্য কোচিনে একটি নূতন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং উহার তত্ত্বাবধানে আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা দিবার জন্য উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে কৌশল্যাগঙ্গায় একটি উপশিক্ষা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিতে প্রায় ২৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং এই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ হইলে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ বার্ষিক ১৮ লক্ষ টন মৎস্য ধৃত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। মৎস্য রপ্তানীর পরিমাণও ১৯৬০-৬১ সালের ৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ প্রায় ১২ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the physical conditions that are characteristic of the great fishing grounds and describe the major fishing grounds of the world. Indicate briefly the world trade in fish. (C. U. '41, '44, '45, '56)

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা কর। সংক্ষেপে মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৮৬-১৮৯)

2. Describe the development of fishing industry in India with special reference to that of West Bengal (C. U. '53)

(ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ১৮৯-১৯২)

3. Indicate the measures that have been adopted during the Five-Year plan periods for the development of Indian fisheries.

(ভারতীয় মৎস্যশিল্পের উন্নতিকল্পে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৯২-১৯৫)

দশম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ

খনিজ (Minerals)—স্বভাবতঃ একই উপাদানে গঠিত বা সামান্য পরিবর্তিত যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে খনিজ বলে। যেমন—কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি। খনিজ মাত্রই যে খনি হইতে খনন করিয়া বাহির করিতে হয় এমন নহে ; কখন কখন ইহা ভূমির উপরিভাগেও পাওয়া যায়—যেমন, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি।

খনিজ দ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য (Features of minerals and mining)—খনিজ শিল্পের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল, মানুষের আয়ত্তাধীন নহে। অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া খনিজ সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ৯০% নিকেল আসে ক্যানাডার অণ্টেরিও রাজ্য হইতে এবং পটাশের প্রায় সমস্ত অংশই আসে ফ্রান্স ও জার্মানী হইতে। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ সম্পদের পরিমাণ একান্ত সীমাবদ্ধ এবং ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রত্যেক দেশই আর্থিক দিক হইতে গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সম্পদের জন্য অধিকসংখ্যক খনির উপর অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদের নিঃশেষ এবং অঞ্চলবিশেষের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ হেতু খনিজ দ্রব্যের ন্যায় অপর কোন সম্পদই বিশ্বের রাজনীতিকে এত অধিক প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ এবং লোরেনের লৌহ আকরিক সম্পদের অধিকার লইয়া জাতিতে জাতিতে বিরোধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, খনি যতই নিঃশেষ হইতে থাকে উহা হইতে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-ব্যয়ও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমক্ষীয়মাণ উৎপাদনের বিধি (Law of Diminishing Returns) কৃষিকার্যের পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য খনিজ শিল্পের পক্ষেও তদ্রূপ প্রযোজ্য হইয়া থাকে। পঞ্চমতঃ, একবার ব্যবহারেই অধিকাংশ খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হইয়া যায়, যেরূপ কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি ; তবে কয়েকটি খনিজ সম্পদ, যেরূপ তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি, একবার ব্যবহারেই নিঃশেষিত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে একাধিকবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, খনিজ সম্পদের প্রলোভন এবং উহাদের আঞ্চলিক অবস্থিতি মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অঞ্চলেও

উপনিবেশ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। নাইট্রেট সম্পদের জন্য চিলির আটাকামা মরু অঞ্চলে এবং স্বর্ণের জন্য পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে লোকবসতি ইহারই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্থল ; এবং সপ্তমতঃ, প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ একবার নিঃশেষ হইয়া গেলে খনির শ্রমিকেরা অপর কোন খনির সন্ধানে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয় ; ফলে, খনিজ সম্পদের আহরণ বহুক্ষেত্রে মানুষকে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করে।

কৃষিজ ও খনিজ শিল্পের তুলনা (**Comparison between farming and mining**)—কৃষিজ ও খনিজ শিল্পের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বর্তমানের জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিকার্য মানুষের আয়ত্তাধীন, সেইজন্য শস্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হইলেও পুনরুৎপাদনের উপায় রহিয়াছে, কিন্তু খনিজ দ্রব্যের কণামাত্র সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। খনি হইতে খনিজ দ্রব্য ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে খনি নিঃশেষ হইয়া যায় বলিয়া খনিজ দ্রব্যের আহরণকে লুণ্ঠনবৃত্তি বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, কৃষিজ দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য বলিয়া ইহাদের চাহিদা সকল সময়েই প্রায় সমান থাকে ; কিন্তু খনিজ দ্রব্যের চাহিদা জাতিগত অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতির সহিত পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

খনিজ দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ (**Classification of minerals**)—শিল্প ও বাণিজ্যে যে সমস্ত খনিজ দ্রব্য প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—(১) **ধাতব খনিজ** (metallic minerals)—ইহাদের আবার চারিটি উপবিভাগ রহিয়াছে :—(ক) মূল্যবান ধাতব খনিজ (precious metals)—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্ল্যাটিনাম ; (খ) অন্ত্যজ লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (ferrous metals)—লৌহ ; (গ) অন্ত্যজ অলৌহবর্গীয় (nonferrous metals) ধাতব খনিজ—তাম্র, দস্তা, সীসক, রাং, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ; (ঘ) লৌহসংকর ধাতব খনিজ (ferro-alloys)—ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম, ভ্যানেডিয়াম প্রভৃতি। (২) **অধাতব খনিজ** (non-metallic minerals)—ইহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে :—(ক) স্থাপত্য-শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (structural minerals), যেমন অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, অ্যাস্‌ফাল্ট, জিপসাম প্রভৃতি; (খ) রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (chemical minerals), যেমন গন্ধক, লবণ, পটাশ প্রভৃতি ; এবং (গ) বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত খনিজ (miscellaneous minerals), যেমন অভ্র, গ্রাফাইট, রত্ন প্রভৃতি। (৩) **খনিজ জ্বালানী** (fuel minerals)—কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ধাতব খনিজ-অঞ্চলসমূহ (Important metalliferous regions of the world)—বিভিন্ন মহাদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ ধাতব খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ।

(ক) **উত্তর আমেরিকার** (১) 'লরেন্সীয় শীল্ড' অঞ্চলে লৌহ, নিকেল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কোবাল্ট, তাম্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ ও খনিজ তৈল, এবং (২) পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, দস্তা প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। (খ) **দক্ষিণ আমেরিকার** (১) আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে তাম্র, প্ল্যাটিনাম, রাং, টাংস্টেন, স্বর্ণ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ এবং (২) পূর্বদিকের মালভূমি অঞ্চলে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, স্বর্ণ, রত্ন প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। (গ) মধ্য ও দক্ষিণ **আফ্রিকার** কেলাসিত শিলাস্তরযুক্ত অঞ্চলে পাওয়া যায় স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, ক্রোমাইট প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। (ঘ) কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাস্তরযুক্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম **অস্ট্রেলিয়ার** স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, দস্তা প্রভৃতি পাওয়া যায়। (ঙ) **পূর্ব-এশিয়ার** দক্ষিণে কোরিয়া হইতে উত্তরে ওখটস্ক সাগর পর্যন্ত এবং সেখান হইতে পশ্চিমাভিমুখে ইয়াব্লোনয় পর্বত, বৈকাল হ্রদ, সায়ান ও আলটাই পর্বতমালা হইয়া দক্ষিণ সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচুর ধাতব পদার্থ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। **দক্ষিণ-পূর্ব** ও **দক্ষিণ এশিয়ার** মালভূমি অঞ্চলে রাং, তাম্র, টাংস্টেন এবং অন্যান্য ধাতব খনিজ পাওয়া যায়। (চ) **দক্ষিণ ইউরোপের** পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল, ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত উচ্চভূমি, এবং দক্ষিণ রুশিয়ার ককেশাস পর্বতাঞ্চলেও প্রচুর ধাতব খনিজ বিদ্যমান রহিয়াছে।

পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ

(১) লৌহবর্গীয় খনিজ

লৌহ আকরিক (Iron ore)

নানাবিধ আকরিক হইতে লৌহ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি আকরিকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—(১) ম্যাগনেটাইট্ (কৃষ্ণবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৭২% লৌহ থাকে। (২) হেমাটাইট্ (রক্তবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৭০% লৌহ থাকে। (৩) লিমোনাইট্ (পীতাভ বাদামীবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৬০% লৌহ থাকে। (৪) সিডেরাইট্ (বাদামী ও ধূসরবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৪৮% লৌহ থাকে। লৌহের সহিত যে সমস্ত বস্তুর মিশ্রণ থাকে উহাদের প্রভাবেও অনেক ক্ষেত্রে লৌহের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। ফসফরাসের সহযোগে যেমন লৌহ ভঙ্গুর হইয়া উঠে, তেমনই সামান্য ম্যাঙ্গানীজ বা ক্রোমিয়ামের সহযোগে লৌহের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ আকরিকের গুরুত্ব নির্ভর করে উহার অন্তর্গত লৌহভাগের পরিমাণের

আধিক্য, খননের সহজসাধ্যতা ও সুলভতা, পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা এবং সংকর ধাতু ও শক্তি সম্পদ সরবরাহের প্রাচুর্যের উপর।

প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল (Principal iron ore producing countries)—(ক) **উত্তর আমেরিকা**—যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ৩০%-এরও অধিক লৌহ উৎপাদন করিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ৮০%-এরও অধিক লৌহ আকরিক সুপিরিয়র হ্রদ-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ হইতেই পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের আকরিক লৌহ প্রধানতঃ (১) মিনেসোটার (৭০%) অন্তর্গত মেসাবি, ভারমিলিয়ন ও কুইনা খনিসমূহ এবং (২) মিচিগানের (৩০%) অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমিনি ও গোগোবিক অঞ্চল—এই দুইটি অঞ্চল হইতেই পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের আকরিক প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট বর্গীয়। হ্রদ অঞ্চলের আকরিক-লৌহ হ্রদ-পথে মিচিগান ও ইরি হ্রদ-সংলগ্ন লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহে এবং পিটস্-বার্গের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ আপালাচিয়ান কয়লাখনির অন্তর্গত আলাবামা রাজ্যেও লৌহ আকরিত হয়। আলাবামার লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর না হইলেও উহা হইতে সস্তায় ইস্পাত প্রস্তুত করা যায়। উইসকনসিন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া এবং রকি পর্বতাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ লৌহ আকরিত হয়। যথেষ্ট উৎপাদন সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে আকরিক আমদানী করিয়া থাকে। **ক্যানাডা** (অন্টেরিও, আলবার্টা, স্যাসকাচুয়ান, রকি পর্বতাঞ্চল, নোভাস্কোসিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড) ও **মেক্সিকো**তে সামান্য পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

(খ) **ইউরোপ**—ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে লৌহ আকরিক উৎপাদনে প্রথম এবং সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে **ফ্রান্স**। ফ্রান্সের লোরেন, নর্মাণ্ডি, ব্রিটানী এবং পীরেনীজ পর্বতাঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে লোরেনের লৌহখনিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় কেবলমাত্র এই খনিটি হইতে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি টন লৌহ আকরিত হয়। তবে লোরেনের লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিমোনাইট বর্গীয়। **জার্মানী**র সিজারল্যাণ্ড, ভোজেলস্বার্গ, পাইন ও স্যালজিটার খনিতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। জার্মানীর লৌহ আকরিক নিম্নশ্রেণীর এবং উৎপাদনের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই কারণে ফ্রান্স ও সুইডেন হইতে জার্মানী তাহার প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিকের অধিকাংশই আমদানী করিয়া থাকে। **যুক্তরাজ্যের** অধিকাংশ লৌহ প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল হইতেই আকরিত হয়—(১) নর্দাম্পটন-শায়ার, লিংকনশায়ার ও উত্তর ইয়র্কশায়ারের অন্তর্ভুক্ত ক্লীভল্যাণ্ড অঞ্চলের

খনিসমূহ হইতে—এতদঞ্চলের লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর; এবং (২) কাম্বারল্যাণ্ড ও উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ারের খনিসমূহ হইতে। এতদঞ্চলের আকরিক উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট বর্গীয়। দেশাভ্যন্তরে আকরিকের উৎপাদন মোট চাহিদার মাত্র ৫০% মিটাইতে সক্ষম বলিয়া যুক্তরাজ্যকে অন্যান্য দেশ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক আমদানী করিতে হয়। দক্ষিণ ওয়েলস সাধারণতঃ স্পেন, আলজেরিয়া ও সিয়েরালিওন হইতে এবং ইয়র্কশায়ারের শেফিল্ড অঞ্চল সাধারণতঃ সুইডেন হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আকরিক আমদানী করিয়া থাকে। **সুইডেনের** উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর (ম্যাগনেটাইট) লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলের কিরুনাভারা ও গেলিভারা লৌহখনি এবং মধ্যাঞ্চলের ডেনেমোরা লৌহখনি জগদ্বিখ্যাত। কয়লার অভাব হেতু সুইডেনের আকরিক লৌহের অধিকাংশই নার্ভিক বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। দঃ সুইডেনের কোপারবার্গ অঞ্চলেও লৌহ আকরিত হয়। **নরওয়ের** উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **স্পেনের** বিস্কে উপসাগর-সন্নিহিত স্যানট্যানডার এবং বিলবাও প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। দক্ষিণে আলমেরিয়ার চতুর্দিকেও লৌহ আকরিকের খনি রহিয়াছে। স্পেনের অধিকাংশ লৌহ আকরিক গ্রেটব্রিটেন, ইতালী ও জার্মানীতে রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের মাত্র ২ ভাগ **ইতালী** উৎপাদন করে। এলবা দ্বীপেই ইতালীর অধিকাংশ লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়। **বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ** প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক উৎপাদন ও রপ্তানী করে। চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং যুগোশ্লাভিয়া লৌহ আকরিকের অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চল।

(গ) **সোভিয়েট রাষ্ট্র**—বর্তমানে লৌহ আকরিক উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) ইউক্রেনের ক্রিভয়রগ, (২) ইউরালের ম্যাগনিটোগর্স্ক, (৩) কোলা উপদ্বীপ, (৪) মার্মানস্ক উপদ্বীপ, এবং (৫) দক্ষিণ ইউরালের ওর্স্ক অঞ্চলে আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়। এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) কুর্স্ক ও (২) কুজবাস্ অঞ্চলেও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়।

(ঘ) **এশিয়া**—সমগ্র এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর ৭% লৌহ উৎপাদন করে। **ভারতের** অন্তর্গত উড়িষ্যার বোনাই, কেওনঝড়, এবং ময়ূরভঞ্জের লৌহখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মহীশূরে লৌহখনি রহিয়াছে। ভারতের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট বর্গীয় এবং সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণের দিক হইতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তর ও দক্ষিণ **চীনের** বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহু লৌহখনি রহিয়াছে। ইয়াংসি উপত্যকা এবং সাংটাং উপদ্বীপই প্রধান লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র। হন্‌হুর পূর্ব

উপকূলের সেনিন খনি এবং হোক্কাইডোর মোরোরান খনি হইতে **জাপানের** অধিকংশ লৌহ আকরিক সংগৃহীত হয়। জাপানের লৌহ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। **কোরিয়া** ও **ফরমোসা**তেও সামান্য লৌহ পাওয়া যায়। **মাঞ্চুরিয়ার** লৌহক্ষেত্রসমূহ মুক্দেনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও লৌহ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে লৌহের খনি নাই বলিলেই চলে।

(ঙ) **আফ্রিকা**—উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজেরিয়া এবং টিউনিস অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনিজ লৌহ ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত সিয়েরালিওন-এ লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(চ) **অস্ট্রেলিয়া**—সিডনীর সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আইরন নব (Iron Knob) নামক অঞ্চলের লৌহ আকরিক অতিশয় উচ্চশ্রেণীর।

(ছ) **দক্ষিণ আমেরিকা**—ব্রাজিল ও চিলিতে অনেক লৌহখনি রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। চিলির টফো খনি হইতে মার্কিন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট খনিজ লৌহ উত্তোলিত হইতেছে।

বাণিজ্য—খনিজ লৌহের বহির্বাণিজ্য ব্যাপক। ফ্রান্স, সুইডেন, লুক্সেমবুর্গ, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মালয়, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং চিলি প্রচুর পরিমাণে খনিজ লৌহ **রপ্তানী** করে এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অধিক পরিমাণে আকরিক লৌহ **আমদানী** করে।

(২) অলৌহবর্গীয় খনিজ

তাম্র (Copper)

তাম্র আকরিক (Copper Ore)—আকরিক তাম্র সাধারণতঃ আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলাস্তরে নানাবিধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত জলের মধ্যে আকরিক তাম্রচূর্ণকে ঢালিয়া দিয়া আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি ভাসাইয়া পৃথক করা হয়। এইভাবে তাম্র আকরিকের মধ্যে ধাতব তাম্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহাকে 'রিভারবিরেটরী'-চুল্লীতে (Reverberatory furnace) উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া তাম্রে পরিণত করা হয়।

তাম্রের ব্যবহার (Uses of copper)—উত্তম বিদ্যুৎবাহী বলিয়া বর্তমানে বৈদ্যুতিক **শিল্পেই** তাম্র সর্বাধিক ব্যবহৃত হইতেছে। **অলঙ্করণে**, মুদ্রণ শিল্পে, ঢোলাই করিবার যন্ত্রপাতি নির্মাণে, রং ও পতঙ্গ-বিধ্বংসী ঔষধ

তৈয়ারীর জন্যও যথেষ্ট তাম্র ব্যবহৃত হয়। তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতল; নিকেল মিশাইয়া জার্মান সিলভার, রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ এবং পিতলের সহিত রাং মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—**উত্তর আমেরিকা**—তাম্র উৎপাদনে **যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় ⅓ অংশ তাম্র আকরিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পুরাতন তাম্রক্ষেত্রগুলি মিচিগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে খনিগুলি স্থানে স্থানে অতিশয় গভীর হওয়ায় উহা হইতে আকরিক উত্তোলনের ব্যয় অধিক। বর্তমানে রকি পর্বতাঞ্চলের—(১) আরিজোনা (বিসবি, জেরোম, এবং গ্লোব-মিয়ামি খনি) (২) উটাহ্ (বিংহাম খনি) (৩) মণ্টানা (বাট অঞ্চলের খনি) এবং (৪) নেভাডা (এলি খনি)—এই চারিটি স্থানেই প্রধানতঃ তাম্র আকরিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার আরিজোনার উৎপাদন সর্বাধিক। **ক্যানাডার** আকরিক তাম্রের উৎপাদনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অণ্টেরিও প্রদেশের সাডবেরী অঞ্চল, কুইবেক প্রদেশের নোরাণ্ডা অঞ্চল, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্কীনা, টেলক্রীক ও ভ্যানকুভার অঞ্চল এবং রকিপর্বতান্তর্গত আলবেনি অঞ্চলে তাম্র আকরিত হয়। ক্যানাডায় পৃথিবীর প্রায় ⅙ অংশ তাম্র উৎপন্ন হয়। **মেক্সিকোর** ক্যানানীয়া ও সোনাবা অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে তাম্র আকরিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—চিলি তাম্র উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (পৃথিবীর প্রায় ২০%) এবং তাম্র রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চিলির তাম্র মধ্যভাগের মরু অঞ্চলের অন্তর্গত চুকুইকামাটা ও পেট্রোরিলোস্ খনিসমূহ হইতেই আকরিত হয়। তবে এতদঞ্চলের তাম্র আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং মরু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় আকরিকের উত্তোলনও কষ্টসাধ্য। চিলির দক্ষিণাংশে অবস্থিত ব্র্যাডেন খনি হইতেও তাম্র আকরিত হয়।

আফ্রিকা—আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্য হইতে উঃ রোডেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অতিবৃহৎ তাম্র বলয়টিতে প্রচুর তাম্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন। কাটাঙ্গা অঞ্চলের তাম্র উৎকৃষ্ট এবং উঃ রোডেশিয়ার তাম্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কাটাঙ্গা অঞ্চলের পাণ্ডায় এবং উঃ রোডেশিয়ার বোয়ান এ্যাণ্টিলোপ ও ন্‌কানা অঞ্চলে তাম্র শোধনাগার রহিয়াছে। এতদঞ্চল হইতে অধিকাংশ তাম্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

রুশিয়া—রুশিয়ার ইউরাল পর্বতাঞ্চলে প্রচুর তাম্র আকরিত হয়। সম্প্রতি কাজাকস্তান, বলখাস হ্রদ অঞ্চল, উজবেকিস্তান, এবং আর্মেনিয়াতেও প্রচুর তাম্র আকরিত হইতেছে। [আরল সাগরের উত্তর উপকূলাঞ্চল ব্যাপিয়া পৃথিবীর একটি অতি সমৃদ্ধ তাম্রখনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এশিয়া—এশিয়ার অন্তর্গত **জাপান** তাম্র উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। জাপানের এসিও, বেসি, কোসাকো, হিতাচী, ও সাগানোসাকি অঞ্চলে প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। ওসাকা জাপানের শ্রেষ্ঠ তাম্র-শোধন কেন্দ্র। **ভারতের** ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মোসাবানিতে তাম্র আকরিত এবং মৌভাণ্ডারে পরিশোধিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া—কুইন্সল্যাণ্ডের ক্লনকারী ও মার্গান পর্বতাঞ্চলে তাম্র আকরিত হয়।

ইউরোপ—ইউরোপ তাম্রসম্পদে অতি দরিদ্র তবে বেলজিয়াম, জার্মানী ও ব্রিটেনে সামান্য পরিমাণে তাম্র আকরিত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রধান তাম্র আমদানীকারক দেশ। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশও তাম্র আমদানী করে। রপ্তানীকার্যে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাং (Tin)

রাং আকরিক (Tin ore)—পৃথিবীর অধিকাংশ রাং-ই ক্যাসিটেরাইট (Casseterite), স্ট্যানাইট (Stannite), সিলিনড্রাইট (Cylindrite) এবং ফ্র্যাঙ্কাইট (Franckeite) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। রাং মৌলিক শিলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই আকরিত হইয়া থাকে।

রাং-এর ব্যবহার (Uses of tin)—সহজে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া লৌহের পাতে রাং-এর প্রলেপ দিয়া গৃহের ছাদের 'টিন', পেট্রোল তৈলের টিন ও প্যাকিং বাক্স নির্মিত হয়। সীসকের পাতলা পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া সিগারেট ও চকোলেট মুড়িবার রূপালি কাগজ প্রস্তুত হয়। রাং-এর সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া ব্রোঞ্জ ও পিত্তল মিশ্রিত করিয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—পৃথিবীর অধিকাংশ

৪৩নং চিত্র—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের বণ্টন
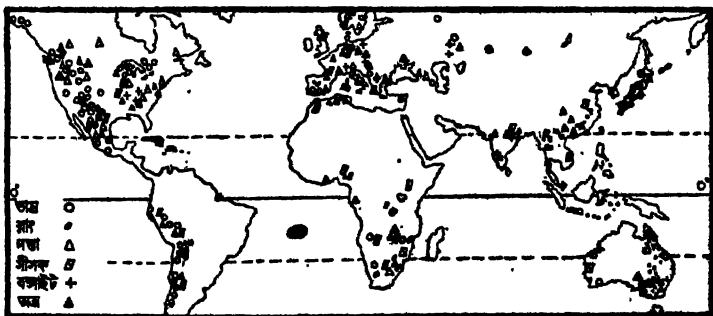
রাং (প্রায় ৭০ ভাগ) দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয় (পেরাক, সেলাঙ্গার, পাহাঙ্গ, নেগ্রিসেম্বিলন, জোহোর, কেডা, কেলাণ্টান, পেরলিস ও ত্রেঙ্গনু অঞ্চল), ব্রহ্মদেশ (মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুরি অঞ্চল), ইন্দোনেশিয়া (বাংকা, বিলিটন, সুমাত্রা ও সিংকেপ অঞ্চল), শ্যাম (পাকেট-দ্বীপ অঞ্চল) ও চীন (ইউনান মালভূমি ও কোয়ংসি অঞ্চল) দেশে পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপ হইতে পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক রাং সরবরাহ হয়। ইহা ছাড়া দঃ আমেরিকার বলিভিয়া ও পেরু ; আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও কঙ্গো ; অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য (কর্ণওয়াল), জার্মানী, পর্তুগাল, রুশিয়া (লেনিনোগর্স্ক ও ওলোভা-য়ানায়া অঞ্চল) প্রভৃতি দেশেও রাং উৎপন্ন হয়। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বলিভিয়ার রাং সম্পদকে ঠিকমত কার্যে নিযুক্ত করা যাইতেছে না, কারণ বলিভিয়ার রাং-এর খনিগুলি প্রায় ১৬০০০ ফিটের উর্ধ্বে পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত।

বাণিজ্য (Trade)—যুক্তরাষ্ট্র সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাং আমদানী করে। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী অন্যান্য রাং আমদানী-কারক দেশ। মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোনেশিয়া প্রধান প্রধান রপ্তানী-কারক দেশ।

দস্তা (Zinc)

দস্তার আকরিক (Zinc ore)—দস্তা প্রধানতঃ স্ফ্যালেরাইট (sphalerite), স্মিথসোনাইট (smithsonite), ও হেমিমরফাইট (hemi-morphite) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। এই সমস্ত আকরিকের মধ্যেই দস্তা ও সীসক মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

দস্তার ব্যবহার (Uses of zinc)—দস্তা প্রধানতঃ লৌহকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক তড়িৎকোষ নির্মাণে, ঔষধ, ব্রোঞ্জ ও পিতল তৈয়ারীর কাজে এবং তাম্র ও রৌপ্যের সহিত খাদ হিসাবেও প্রচুর দস্তা ব্যবহৃত হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—যুক্তরাষ্ট্র (ওজার্ক অধিত্যকার অন্তর্গত জেপলিন খনি, নিউজার্সির অন্তর্গত ফ্রাঙ্কলিন ফার্নেস এবং ইডাহো রাজ্যের অন্তর্গত ক্যুর-ড্য-এলেন খনি), অস্ট্রেলিয়া (ব্রোকেনহিল ও মাউণ্ট ইসা অঞ্চল), ক্যানাডা (বৃটিশ কলম্বিয়ার কুটেনে অঞ্চল এবং লরেন্সীয় ফলকের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল), জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, স্পেন, মেক্সিকো, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, রুশিয়া (ইউরাল পর্বত, ককেশাশের উত্তরাংশ, কাজাকস্থান, ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল), যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ব্রহ্মদেশ ও জাপান দস্তা উৎপাদন করে। আফ্রিকার উত্তর রোডেশিয়ায় প্রচুর দস্তা আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। দস্তা উৎপাদন ও ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বাণিজ্য (Trade)—যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও ভারত প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ এবং ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও আফ্রিকা প্রধান প্রধান রপ্তানীকারক দেশ।

সীসক (Lead)

সীসক আকরিক (Lead ore)--সীসকের প্রধান আকরিক হইল গ্যালেনা (Galena) বা লেড সালফাইড (Lead Sulphide)। ইহা সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সীসকের ব্যবহার (Uses of lead)—গ্যাস, জল ও নর্দমা প্রভৃতির নল নির্মাণ, মুদ্রণ শিল্প, মুদ্রলেখ যন্ত্র, মোটর শিল্প. বিমান শিল্প, তড়িৎকোষ নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে সীসক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রং তৈয়ারী, কাচ শিল্প, বন্দুকের গুলি তৈয়ারী, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ও মৃৎ-পাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য সীসকের ব্যবহার দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সীসক উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রে সীসক আকরিত হয় প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে—দক্ষিণ-পশ্চিম মিশৌরী, জোপলিন অঞ্চল এবং মণ্টানার সীমান্তে অবস্থিত ইডাহোতে। মেক্সিকো (চিহুয়াহুয়া ও শান লুই পোটোসি অঞ্চল), ক্যানাডা (ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কুটেনে অঞ্চল, অণ্টেরিও, কুইবেক, নোভাস্কোশিয়া ও ইয়ুকন রাজ্য), অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলস ও কুইনস্‌-ল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, পঃ জার্মানী, রুশিয়া, (ককেশাশ, কাজাকস্তান ও পূর্ব-সাইবেরিয়া), ইতালী. স্পেন, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, জাপান, ব্রহ্মদেশ (শান-রাজ্যের বডুইন খনিসমূহ) প্রভৃতি অঞ্চলেও সীসক পাওয়া যায়।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium).

অ্যালুমিনিয়াম আকরিক (Aluminium ore)—প্রধানতঃ বক্সাইট (Bauxite) ও ক্রায়োলাইট (Cryolite) আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। বক্সাইটকে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ ক্রায়ো-লাইট মিশ্রিত করিয়া পরে ঐ মিশ্রিত খনিজের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে অ্যালুমিনিয়াম পৃথক হইয়া তরল অবস্থায় ঋণাত্মক দণ্ডে সঞ্চিত হয়। পরিশেষে ঐ তরল অ্যালুমিনিয়াম হইতে পিণ্ড, পাত, তার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করিতে হইলে প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন। সেই কারণে যে সমস্ত দেশে পর্যাপ্ত ও সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত দেশেই আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

বক্সাইট উৎপাদনে ফ্রান্স (আল্প্‌স্‌ পর্বতান্তর্গত স্যাভয় অঞ্চলের খনিসমূহই প্রধান), হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, সুরিনাম, গিয়ানা, রুশিয়া (ইউরাল এবং

লেনিনগ্রাড সন্নিহিত বক্সিটোগর্স্ক অঞ্চল) এবং যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ক্রায়োলাইট উৎপাদনে গ্রীনল্যাণ্ডের স্থান সর্বোচ্চে।

অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার (Uses of Aluminium)—শক্ত অথচ হাল্কা হাওয়ায় বিমানপোত, মোটর গাড়ী, জাহাজ, রেলগাড়ীর কামরা প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্য অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গৃহের আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ক্যানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, রুশিয়া, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাণিজ্য (Trade)—অ্যালুমিনিয়াম (আকরিক বা নিষ্কাশিত) আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ও জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[**লৌহ-সংকর ধাতু (Ferro-alloys)**—লৌহের সহিত কোন একটি বা একাধিক ধাতব পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণকে লৌহ-সংকর বলা হয়। এরূপ লৌহ-সংকর প্রস্তুত করিতে সচরাচর যে সব ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাদের লৌহ-সংকর ধাতব পদার্থ বলে। ইহাদের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম ও ভ্যানেডিয়ামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)—ম্যাঙ্গানীজ প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে, ফেরোম্যাঙ্গানীজ নামক সংকর ধাতু ও ম্যাঙ্গানীজ ষ্টিল নামক ইস্পাত নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক এবং কাচ শিল্পে ও দিয়াশলাই-এর উপকরণ রূপে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রুশিয়া (জর্জিয়ার চিয়াতুরী এবং ইউক্রেনের নিকোপোল অঞ্চল) পৃথিবীতে প্রথম, ভারত (মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর) দ্বিতীয়, এবং আফ্রিকার ঘানা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, মিশর, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী, জাপান, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র অতি সামান্য পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন করিয়া থাকে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ২০% ম্যাঙ্গানীজ যুক্তরাষ্ট্র আমদানী করে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও ম্যাঙ্গানীজ আমদানীকারক দেশ।

টাংস্টেন (Tungsten)—উলফ্রাম আকরিক হইতে টাংস্টেন ধাতু নিষ্কাশিত হয়। ইস্পাতের দৃঢ়তা সম্পাদনে এবং উচ্চশ্রেণীর তীক্ষ্ণধারযুক্ত টাংস্টেন-স্টীল নামক ইস্পাতের যন্ত্রপাতি নির্মাণেই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক বাতির 'ফিলামেণ্ট' প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাংস্টেন হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ রং তৈয়ারী এবং অন্যান্য বহুবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—চীন ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে টাংস্টেন পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র, পর্তুগাল, কোরিয়া, মালয়, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোচীন, শ্যামদেশ ও ভারতে টাংস্টেন পাওয়া যায়। চীন, মালয়, এবং বলিভিয়া প্রধান টাংস্টেন রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানীকারক দেশ।

ক্রোমিয়াম (Chromium)—ক্রোমাইট আকরিক হইতে ক্রোমিয়াম উৎপন্ন হয়। স্থায়ী উজ্জ্বলতাসম্পন্ন এবং তাপ ও অম্লরোধক ক্রোম-স্টীল নামক ইস্পাত প্রস্তুত করিতে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। চামড়া পাকা করিতে, রং তৈয়ারীতে, কাচ কলাই করিতে এবং ঔষধ প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রোমাইট অত্যন্ত তাপ-সহ বলিয়া ক্রোমিয়াম মিশ্রিত মাটি দ্বারা তৈয়ারী ইট চুল্লী-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—তুরস্ক ক্রোমিয়াম উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সোভিয়েট রাষ্ট্র, দক্ষিণ, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, নিউ ক্যালিডোনিয়া, চীন, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়াতেও ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। তুরস্ক, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ ক্যালিডোনিয়া এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র ক্রোমিয়ামের প্রধান রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফ্রান্স প্রধান আমদানীকারক দেশ।

নিকেল (Nickel)—ইহা প্রধানতঃ ইস্পাত শিল্পে, মুদ্রা তৈয়ারীতে, মোটর শিল্পে এবং তৈজসপত্র, 'জার্মান সিলভার' ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। নিকেল ইস্পাতকে দৃঢ় করে ও কলঙ্ক রোধ করে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—পৃথিবীর মোট নিকেল উৎপাদনের প্রায় ৯০ ভাগই ক্যানাডাতে (অণ্টেরিও প্রদেশের সাড্‌বেরী খনি হইতে) উৎপন্ন হয়। নিউ ক্যালিডোনিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া, ব্রাজিল ও ভারতে সামান্য পরিমাণে নিকেল পাওয়া যায়। ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন এবং নিউ ক্যালিডোনিয়া নিকেলের প্রধান রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাষ্ট্র, বেলজিয়াম এবং জাপান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

এ্যান্টিমনি (Antimony)—ইহা প্রধানতঃ মুদ্রলেখ যন্ত্র, তড়িৎকোষ

নির্মাণ ও রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইস্পাতের দৃঢ়তা সম্পাদনে এ্যান্টিমনির ব্যবহার ব্যাপক। ইহার উৎপাদনে চীন (হুনান ও ইউনান প্রদেশ) পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মেক্সিকো, বলিভিয়া, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চল।

মলিবডেনাম ও ভ্যানেডিয়ামের সংমিশ্রণে ইস্পাত অত্যন্ত নমনীয় (dutcile) ও দৃঢ় হয়। কাজেই এইরূপ ইস্পাতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রস্তুত হয়। মলিবডেনাম উত্তোলিত হয় প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র (৮০-৮৫%), মেক্সিকো (৮%) এবং নরওয়েতে। ভ্যানেডিয়াম উত্তোলিত হয় প্রধানতঃ দঃ পঃ আফ্রিকা (৫০%), উঃ রোডেশিয়া (২৫%), যুক্তরাষ্ট্র (১২%) এবং দঃ আমেরিকার পেরু (১২%) রাজ্যে।]*

(৪) অধাতব খনিজ

অভ্র (Mica)—ইহা স্থিতিস্থাপক, তড়িতের অপরিবাহী, তাপসহ এবং তাপের বিকিরণরোধক। বৈদ্যুতিক শিল্পে, বিমানপোত ও মোটর শিল্পে অভ্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রতিমার সাজ এবং নানা প্রকার অলঙ্করণে, চুল্লীর জানালা নির্মাণে, ম্যাগনেশিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়লারের উপরের তাপরক্ষক প্রলেপ নির্মাণে, রং তৈয়ারীতে, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্যে অভ্র ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ভারত (বিহার, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরালা ও রাজস্থান) অভ্র উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান (পৃথিবীর প্রায় ৭৫%) অধিকার করে। ভারতের অভ্র অতি উচ্চশ্রেণীর। যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, স্পেন, পর্তুগাল, রুশিয়া, জাপান, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল অতি সামান্য পরিমাণে অভ্র উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (Trade)—অভ্র রপ্তানীতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

লবণ (Salt)—সমুদ্র বা হ্রদের লবণাক্ত জল শুষ্ক করিয়া গুঁড়া লবণ এবং লবণের খনি হইতে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে, নানাপ্রকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, চর্মশিল্পে, পচন-নিবারক দ্রব্য হিসাবে, সার তৈয়ারী প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—যুক্তরাষ্ট্র (পশ্চিম মিচিগান এবং মেক্সিকো উপসাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ), রুশিয়া, জার্মানী, নিউইয়র্ক, উত্তর পূর্ব ওহিও, দঃ পুঃ অষ্ট্রিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান, এডেন, ইতালী, স্পেন, জাপান, পোল্যাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া, ব্রাজিল, ক্যানাডা, রুমেনিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান লবণ-উৎপাদক দেশ।

---

* এই অংশটি পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত।

স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর (Building materials)—পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহ-নির্মাণের নানা প্রকার প্রস্তর অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে বেলেপাথর, চুনাপাথর, গ্রানাইট, মর্মর ও শ্লেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলে-পাথর ও চুনাপাথর ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের ভঙ্গিল পর্বতা-ঞ্চলেই আকরিত হয়। ব্রিটেনের **চুনাপাথর** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডার **গ্রানাইট** প্রসিদ্ধ। ইতালীর ক্যারারা **মর্মর** সর্বোৎকৃষ্ট। ভারত, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মর্মর পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, পাকিস্তান ও যুক্ত-রাষ্ট্রের **শ্লেট** বিখ্যাত।

শক্তিসম্পদ (Sources of Power)

পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তিসম্পদসমূহকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে : (১) জ্বালানী শক্তি (fuels) এবং (২) জলবৈদ্যুতিক শক্তি (hydroelectric power)। জ্বালানী শক্তিকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—(ক) খনিজ জ্বালানী (mineral fuels)—কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, (খ) কাষ্ঠ জ্বালানী (wood fuels)—কাষ্ঠ, (গ) সংযোগাত্মক জ্বালানী (synthetic fuels)—সুরাসারিক শক্তি। অবশ্য বহু দেশে মনুষ্য, জন্তু ও বায়ু শক্তি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত শক্তিসম্পদগুলির মধ্যে বর্তমান কালে শিল্পকার্যে কয়লা, খনিজতৈল ও জল-বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারই সর্বাধিক। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সুরাসারিক শক্তি, নদীপ্রবাহের শক্তি, সূর্য-শক্তি, আণবিক শক্তি প্রভৃতির ব্যবহার ব্যাপক-ভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্পকার্যে শক্তিসম্পদ হিসাবে কয়লা ও খনিজতৈল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ কয়লা ও খনিজতৈলকে প্রথমে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করিয়া তবে উহাদের ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কয়লা (Coal)

কয়লার উৎপত্তি (Formation of Coal)—জলাভূমিতে যে গহন অরণ্য জন্মে উহা কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় এবং উহার উপর স্তরে স্তরে কর্দম ও বালি সঞ্চিত হইতে থাকে। এই ভাবে উদ্ভিদ্ অবশেষ সুদীর্ঘকাল ভূত্বকের নীচে থাকিয়া ভূগর্ভের তাপ, ভূত্বকের চাপ এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

পৃথিবীর সকল অংশেই কয়লা পাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ ভূগঠনের যে যুগে উদ্ভিদ্ ও অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই যুগের শিলাদ্বারা গঠিত স্তরেই

কয়লা রহিয়াছে। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে প্যালিওজয়িক মহাযুগের (Palæzoic age) কার্বনিফেরাস পর্যায়ে[১] (Carboniferous period) পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপ মহাদেশের এবং উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের অধিকাংশ কয়লাক্ষেত্রই এই পর্যায়ের সৃষ্টি। ভারত, দঃ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমূহ আংশিক ভাবে কার্বনিফেরাস্ পর্যায়ে এবং আংশিক ভাবে পার্মীয় পর্যায়ে[২] (Permian period) গঠিত হয় বলিয়া এই ক্ষেত্রগুলিকে পার্মো-কার্বনিফেরাস (Permo-carboniferous) পযায়ের কয়লাক্ষেত্র বলা হয়। এই দুইটি পর্যায়েই পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লার সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশের এবং মধ্য এশিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমূহ পরবর্তী মেসোজয়িক মহাযুগের[৩] (Mesozoic age) ত্রিয়াসিক[৪] (Triassic) জুরাসিক[৫] (Jurrasic) এবং ক্রেটেসাস[৬] (Cretaceous) পর্যায়ে গঠিত হয়। কাইনোজয়িক মহাযুগের[৭] টার্শিয়ারী[৮] (Tertiary) পর্যায়েও স্থানে স্থানে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে সত্য, তবে এই কয়লা সাধারণতঃ নিকৃষ্ট লিগ্‌নাইট শ্রেণীর। জাপান, উঃ পূঃ সাইবেরিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, মধ্য ও দঃ ইউরোপ, উঃ আমেরিকার মধ্যভাগের সমভূমি ও রকি পর্বতাঞ্চল, এবং দঃ আমেরিকার পশ্চিম ও উত্তর অংশের অধিকাংশ কয়লাই এই শ্রেণীর।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পৃথিবীর কয়লাক্ষেত্রসমূহ কেবলমাত্র পাললিক শিলাস্তরেই পাওয়া যায়, আগ্নেয় অথবা রূপান্তরিত শিলাস্তরে কয়লা কখনই পাওয়া যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় কয়লার স্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে থাকিলেও পরবর্তী কালে ভূত্বকের আলোড়নের ফলে বহুক্ষেত্রে এই স্তরগুলির স্থানে স্থানে চ্যুতি (fault) ও ভাঁজ (fold) দেখা গিয়াছে।

১ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ২৬.৫ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ৫.৫ কোটি বৎসর।

২ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ২১ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ২.৫ কোটি বৎসর।

৩ এই মহাযুগের স্থায়িত্বকাল ১২.৫ কোটি বৎসর।

৪ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ১৮.৫ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ৩ কোটি বৎসর।

৫ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ১৫.৫ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ২.৫ কোটি বৎসর।

৬ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ১৩ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ৭ কোটি বৎসর।

৭ এই মহাযুগের স্থায়িত্বকাল ৭ কোটি বৎসর।

৮ পর্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ৫ কোটি বৎসর। পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ৫.৯ কোটি বৎসর।

আবার কোন কোন স্থানে স্তরগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে কয়লার স্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠের এত নীচে রহিয়াছে যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উহাদের উত্তোলন সম্ভবপর নহে।

পৃথিবীর কয়লা সম্পদ (Coal resources of the world)—পৃথিবীর কয়লা সম্পদ সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নহে। অস্ট্রেলিয়া ও দঃ আফ্রিকার খনিসমূহ বাদ দিলে বলা যায় যে দক্ষিণ গোলার্ধ কয়লা সম্পদে অতিশয় দরিদ্র। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ সুপ্রচুর। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও পোল্যাণ্ড কয়লা সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ; তবে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড ততটা সমৃদ্ধ নহে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে কয়লা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ক্রমাগত অনুসন্ধান কায চালাইবার ফলে রুশিয়ায় পর্যাপ্ত সঞ্চিত কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভারত কয়লা সম্পদে একরূপ সমৃদ্ধই বলা যাইতে পারে, তবে জাপানের কয়লা সম্পদ অতি সামান্য। চীন দেশও কয়লা সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ (Classification of coal)—অঙ্গার ও গ্যাসের পরিমাণ এবং কাঠিন্যের তারতম্য অনুসারে কয়লাকে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা,—(১) **এ্যানথ্রাসাইট** (Anthracite) কয়লা—ইহা অত্যন্ত কঠিন, উজ্জ্বল এবং ভারী। ইহাতে ৯০-৯৫% অঙ্গার থাকে। ইহা সহজদাহ্য নহে, কিন্তু জ্বলিলে অল্প ধূম্র ও প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। তবে ইহা হইতে কোক উৎপন্ন হয় না এবং ইহার খনন কায অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। পৃথিবীতে উৎপন্ন এ্যানথ্রাসাইট কয়লা সমগ্র উৎপাদনের ৫%-এর অধিক হইবে না এবং ইহার প্রায় সমগ্র অংশই যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ওয়েলস্ কয়লা-খনি অঞ্চল হইতে আসে। (২) **বিটুমিনাস** (Bituminous) কয়লা—ইহাতে প্রায় ৮০-৮৫% অঙ্গার থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজদাহ্য এবং জ্বলিলে ধূম্র উদ্গত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট কয়লার প্রায় ৮০%-ই বিটুমিনাস শ্রেণীর। বিটুমিনাস কয়লা পোড়াইয়া কোক কয়লা উৎপন্ন হয়। কোক কয়লার দাহিকা শক্তি অত্যধিক। আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশনে কোক কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (৩) **লিগ্‌নাইট** বা **বাদামী** (Lignite বা Brown) কয়লা—ইহা নিকৃষ্টশ্রেণীর। পৃথিবীতে উৎপন্ন কয়লার প্রায় ১০%ই লিগ্‌নাইট। ইহাতে প্রায় ৪৫% অঙ্গার থাকে এবং উদ্বায়ী দ্রব্যেরই আধিক্য বর্তমান। (৪) **গ্যাস** (Gas) কয়লা—ইহাতে ৪০% অঙ্গার বিদ্যমান। ইহা সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। (৫) **পীট** (Peat)—উদ্ভিদ্ হইতে কয়লা জন্মিবার ইহাই প্রথম স্তর। ইহা অল্প অঙ্গারযুক্ত দাহ্য পদার্থ। আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহা রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ (Coal reserves of the world)—এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৭৩৯,৭৫৫'৩ কোটি টন। ইহার মধ্যে ৪৯,৬৮৪'৬ কোটি টন এ্যানথ্রাসাইট, ৩৯০, ২৯৪'৪ কোটি টন বিটুমিনাস এবং ২৯৯,৭৭৬'৩ কোটি টন লিগ্‌নাইট কয়লা।

উত্তর আমেরিকার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫০৭,৩৪৩'১ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ২১৮৪'২ কোটি টন, বিটুমিনাস ২২৩৯৬৮'৩ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ২৮১'৯০'৬ কোটি টন)। উহার মধ্যে ক্যানাডার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১২৩,৪২৬'৯ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ২১৫'৮ কোটি টন, বিটুমিনাস ২৮৩৬৬'১ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৯৪৮৪৫'০ কোটি টন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৩৮৩৮৬৫'৭ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ১৯৬৮'৪ কোটি টন, বিটুমিনাস ১৯৫,৫৫২'১ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ১৮৬৩৪৫'২ কোটি টন)।

ইউরোপের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৭৮৪১৯'০ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৫৪৩৪'৬ কোটি টন, বিটুমিনাস ৬৯৩১৬'২ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৩৬৬৮'২ কোটি টন)।

এশিয়া মহাদেশের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১২৮১০৩'৮ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৪০৭৬৩'৭ কোটি টন, বিটুমিনাস ৭৬০৪১'৮ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ১১২৯৮'৩ কোটি টন)। উহার মধ্যে চীনের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৯৯৫৫৮'৭ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৩৮৭৪৬'৪ কোটি টন, বিটুমিনাস ৬০৭৫২'৩ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৬০'০ কোটি টন), জাপানের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৭৯৭'০ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৬'২ কোটি টন, বিটুমিনাস ৭১৩'০ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৭৭'৮ কোটি টন), এবং ভারতের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৭৯০০'১ কোটি টন (বিটুমিনাস ৭৬৩৯'৯ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ২৬০'২ কোটি টন)।

অস্ট্রেলেশিয়ার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১৬৮৫৯'৮ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৬৫'৯ কোটি টন, বিটুমিনাস ১৩৩১৬'১ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৩৫১৩'৮ কোটি টন)। উহার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১৬৫৫৭'২ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ৬৫'৯ কোটি টন, বিটুমিনাস ১৩২২৫'০ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ৩২৬৬'৩ কোটি টন) এবং অবশিষ্টাংশ নিউজীল্যাণ্ডের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ।

আফ্রিকা মহাদেশে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫৭৮৩'৯ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ১১৬৬'২ কোটি টন, বিটুমিনাস ৪৫১২'৩ কোটি টন এবং লিগ্‌নাইট ১০৫'৪ কোটি টন)। ইহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫৬২০'০ কোটি টন (এ্যানথ্রাসাইট ১১৬৬'০ কোটি টন এবং বিটুমিনাস ৪৪৫৪'০ কোটি টন) এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য স্থানে রহিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৩২০৯'৭ কোটি টন (এ্যানথ্রা-সাইট ৭০'০ কোটি টন এবং বিটুমিনাস ৩১৩৯'৭ কোটি টন)।

পৃথিবীর কয়লা উৎপাদন (World production of coal)—প্রতি বৎসর গড়ে পৃথিবীতে ১৫০ কোটি টন পরিমিত কয়লা উত্তোলিত হয়। সঞ্চিত কয়লার পরিমাণের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় যে বর্তমান হারে উত্তোলিত হইলে ইহা এখনও প্রায় ২০০০ বৎসর চলিতে পারে। তবে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণের সহিত বার্ষিক কয়লা উত্তোলনের পরিমাণের কোন সামঞ্জস্য নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় দেশগুলি দ্রুতগতিতে কয়লা উত্তোলন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত কয়লা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। ব্রিটেনে যে পরিমাণ কয়লা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা বর্তমান হারে উত্তোলিত হইলে ৬০০ হইতে ১০০০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে।

মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের ১/৩ অংশ; ব্রিটেন, জার্মানী ও রুশিয়া প্রত্যেকে $\frac{১}{৮}$ বা $\frac{১}{৯}$ অংশ করিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি অবশিষ্টাংশ উত্তোলন করিয়া থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের মাত্র ২% উত্তোলন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লা ক্ষেত্রসমূহ (Principal coal fields of the world)—

(ক) **উত্তর আমেরিকা**—উত্তর আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্রেই** পৃথিবীর মোট কয়লার ৩০%-৪০% উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ অন্যান্য দেশের মোট সঞ্চিত কয়লার প্রায় সমান হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লার খনিগুলি হইল—(১) পেনসিল্‌ভ্যানিয়ার এ্যানথ্রাসাইট কয়লাখনি। ইহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এ্যানথ্রাসাইট কয়লাক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটির বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০-৭০ মিঃ টনের মধ্যে। (২) পিটস্‌বার্গ হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত আপালাচিয়ান অঞ্চলের বিটুমিনাস কয়লাখনি। এই খনি অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের ৬০-৭০% কয়লা উত্তোলিত হয়। আপালাচিয়ান কয়লাখনিটি আবার তিনটি অংশে বিভক্ত :—(ক) উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—পিটস্‌বার্গ সন্নিহিত পেনসিলভানিয়ার বিটুমিনাস কয়লাখনি, এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার উত্তরাংশের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (খ) মধ্য আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—কেণ্টাকী ও ভার্জিনিয়া রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (গ) দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—আলাবামা ও টিনিস রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (৩) ইলিনয় হইতে ইণ্ডিয়ানা হইয়া কেণ্টাকী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-মধ্য

কয়লাখনি। (৪) আয়োয়া হইতে পূর্ব কানসাস, পশ্চিম মিশৌরী এবং ওকলাহামা হইয়া আরকানসাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম-মধ্য কয়লাখনি। (৫) রকি পর্বত অঞ্চলের কয়লাখনি। এই অঞ্চল হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে, তবে কলরাডো রাজ্যে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লাও
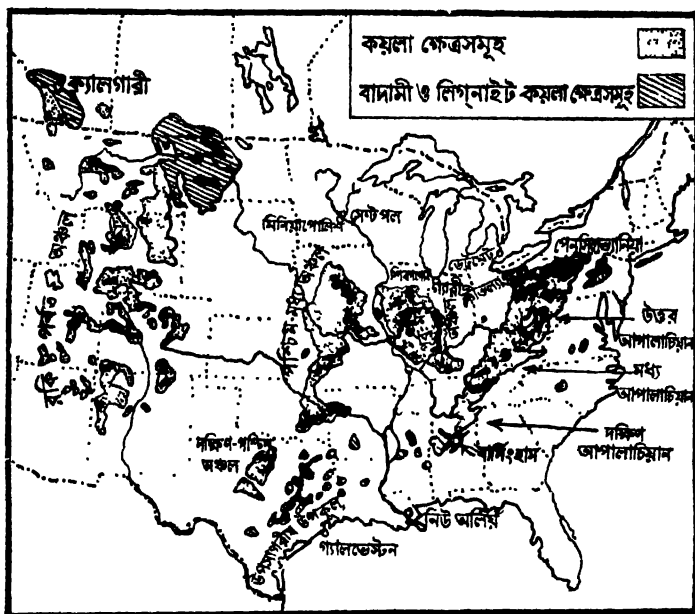
৪৪নং চিত্র—যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহ

রহিয়াছে। (৬) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কয়লাখনিসমূহ। এতদঞ্চলের কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। (৭) উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত কয়লাখনিসমূহ। বর্তমানে আলাস্কাতে অতি বৃহৎ কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু যানবাহন ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ এই অঞ্চল হইতে আশানুরূপ পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে না। মিচিগান রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-মধ্য কয়লার খনি এবং টেকসাস, ওকলাহামা, ও আরকানসাস রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম কয়লার খনি এখনও তাদৃশ উন্নতি লাভ করে নাই।

ক্যানাডায় তিনটি উল্লেখযোগ্য কয়লার খনি রহিয়াছে—(১) ক্যানাডার অন্তর্গত আপালাচিয়ান কয়লাখনি। এই কয়লাখনিসমূহ নোভাস্কোশিয়া ও নিউব্রান্সউইক রাজ্যের অন্তর্গত। (২) রকি পর্বত ও তাহার পূর্ব প্রান্তের কয়লাখনি। প্রেয়রী অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্টার কয়লাখনি এবং রকি পর্বতের পূর্ব-ঢালের অন্তর্গত ক্রোস্ নেস্ট কয়লাখনি ইহার অন্তর্ভুক্ত। (৩) পশ্চিম উপকূলের কয়লাখনি। ভ্যানকুভার দ্বীপ ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার খনি-

সমূহ ইহার অন্তর্গত। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের এবং শিল্পাঞ্চলে কয়লা চালান দেওয়ার খরচ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এবং সস্তায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় বলিয়া ক্যানাডার কয়লার অতি সামান্য অংশই শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্যানাডার কয়লা প্রধানতঃ লিগনাইট শ্রেণীর। উত্তর আমেরিকার লিগনাইট কয়লার প্রায় ⅚ অংশ একমাত্র ক্যানাডাই উত্তোলন করিয়া থাকে। তবে বিটুমিনাস কয়লারও অপ্রতুলতা নাই। কয়লাখনিসমূহ শিল্পাঞ্চলসমূহ হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানী করিয়া থাকে।

(খ) **ইউরোপ**—কয়লা উৎপাদনে **যুক্তরাজ্য** পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্যের (ক) পিনাইন পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত—(১) নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম, (২) ইয়র্ক-ডার্বি-নটিংহামশায়ার, (৩) কাম্বারল্যাণ্ড, (৪) দক্ষিণ ল্যাংকাশায়ার, (৫) উত্তর স্টাফর্ডশায়ার ; (খ) ওয়েলস্ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত—(৬) উত্তর ওয়েলস্, (৭) দক্ষিণ ওয়েলস্, ও (৮) ডীনের অরণ্য ; (গ) মধ্যদেশের সমভূমিতে অবস্থিত—(৯) পূর্ব শ্রফশায়ার, (১০) দক্ষিণ স্টাফর্ডশায়ার, (১১) ওয়ারউইকশায়ার ও (১২) লিস্টারশায়ার ; এবং (ঘ) স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত—(১৩) আয়ারশায়াব, (১৪) গ্লাসগো বা ক্লাইড, (১৫) ফাইফশায়ার ও (১৬) মিডলোথিয়ান খনি হইতে অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে
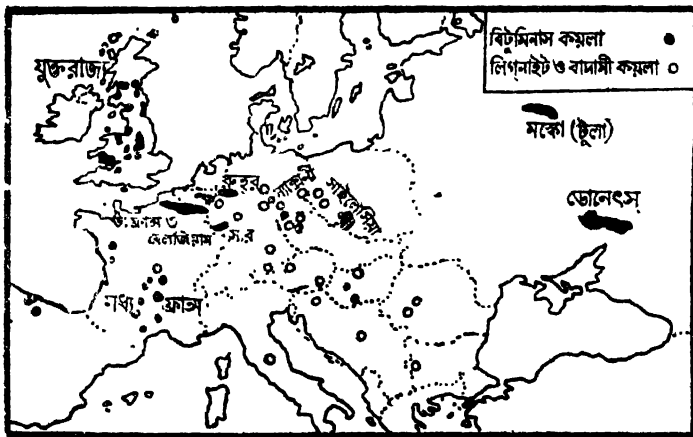
৪৫নং চিত্র—ইউরোপের কয়লাক্ষেত্রসমূহ

“কোল ইণ্ডাস্ট্রিজ ন্যাশনালাইজেশন এ্যাক্ট” (Coal Industries Nationalisation Act) নামক একটি আইন প্রণয়নের দ্বারা গ্রেটব্রিটেনের কয়লা সম্পদকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এতদনুসারে ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে স্থাপিত “ন্যাশনাল কোল বোর্ড” (National Coal Board)

নামক সংঘের উপর দেশের কয়লা সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কয়লা উৎপাদনের সুব্যবস্থা করান এবং ক্রমক্ষীয়মাণ উৎপাদনের নিরাকরণের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সংঘ আশা করে যে ১৯৭০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দাঁড়াইবে বার্ষিক ২৫ কোটি টন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে **জার্মানী**র প্রধান প্রধান কয়লাখনি ছিল ওয়েস্টফ্যালিয়া, স্যাক্সনী, আর সাইলেসিয়া এই তিনটি অঞ্চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড সাইলেসিয়ান কয়লাক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। স্যাক্সনীর কয়লাক্ষেত্রটি বর্তমানে পড়িয়াছে জার্মানীর রুশীয় পরিমণ্ডলে আর ওয়েস্টফ্যালিয়ার কয়লাক্ষেত্রটি রহিয়াছে পশ্চিম-জার্মান সাধারণতন্ত্রের এলাকার মধ্যে। এইটিই জার্মানীর সুবিখ্যাত রুহ্‌র অঞ্চল। সার-অববাহিকার কয়লাক্ষেত্রটিও পশ্চিম জার্মানীতে; তবে ইহার গুরুত্ব অনেক কম। যুদ্ধের পর জার্মানীতে কয়লা উত্তোলনের কাজে মন্দা পড়িয়াছে। জার্মানীর অধিকাংশ কয়লাই লিগনাইট শ্রেণীর।

ফ্রান্সের কয়লা সম্পদ অতি সামান্য। (১) উঃ ফ্রান্সের ডোভার প্রণালী হইতে জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খনি ও (২) মধ্যভাগের মালভূমির নিকটবর্তী খনি অঞ্চল হইতেই ফ্রান্সের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ফ্রান্সের কয়লা মধ্যম শ্রেণীর এবং খনি হইতে কয়লা উত্তোলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। যুক্তরাজ্য, ওয়েস্টফ্যালিয়া এবং সার অঞ্চল হইতে ফ্রান্স কয়লা আমদানী করে।

সেম্বার-মিউজ অঞ্চলে **বেলজিয়ামের** প্রধান ও উচ্চশ্রেণীর কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত। মধ্য ও উত্তর বেলজিয়ামেও সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। ওয়েস্টফ্যালিয়া, সার ও যুক্তরাজ্য হইতে বেলজিয়াম প্রচুর কয়লা আমদানী করে। বেলজিয়াম হইতে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা বিভিন্ন দেশে রপ্তানীও হয়।

পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ইতালী, ও সুইডেনেও সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

(গ) **সোভিয়েট রাষ্ট্র**—কয়লা উৎপাদনে রুশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্র-সমূহ হইল **ইউরোপীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত—(১) আজভ সাগরের উত্তরে ডনেৎস্‌ ক্ষেত্র (মোট উৎপাদনের ৬০%)—ইহাই রুশিয়ার সর্বপ্রধান কয়লাক্ষেত্র, (২) মস্কোর দক্ষিণে টুলা ক্ষেত্র, (৩) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাংশের কয়লাক্ষেত্র, (৪) পেচোরা অববাহিকার কয়লাক্ষেত্র, ও (৫) ট্রান্স-ককেশিয়া অঞ্চলের বাটুম শহরের নিকটবর্তী কয়লাক্ষেত্র। **এশীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত কয়লাক্ষেত্রগুলি হইল—(ক) পশ্চিম সাইবেরিয়ার (৬) কুজনেৎস্ক পর্বতের কয়লা ক্ষেত্র; মধ্য সাইবেরিয়ার (৭) টুঙ্গুজ, (৮) লেনস্ক, (৯) মিনুসিনস্ক, (১০) ইর্খুটস্ক, (১১) কানস্ক, ও (১২) লেনা পর্বতের কয়লাক্ষেত্র; (খ) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার

(১৩) ফার্গানা ও (১৪) কারাগাণ্ডা অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্র এবং (গ) সুদূর প্রাচ্যের (১৫) বেরীনস্ক অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। রুশিয়ার কয়লা অধিকাংশই বিটুমিনাস শ্রেণীর। রুশিয়ায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৯৩ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়।

(ঘ) **এশিয়া**—পৃথিবীর কয়লা উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে **চীন** অন্যতম। চীনদেশে উৎপন্ন কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস চীনদেশ প্রচ্ছন্ন কয়লা সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রায় সমগ্র শানসি (এ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমিনাস কয়লা) ও শেনসি প্রদেশের একাংশ জুড়িয়া যে সুবৃহৎ কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত তাহা শুধু নাকি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়ার বিরাট কয়লাক্ষেত্রের সহিত তুলনীয়। এই ক্ষেত্রটিতেই সম্ভবতঃ চীনের ৮০% কয়লা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সাংটাং, জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশেও প্রচুর কয়লার খনি আছে। তিয়েনসিনের ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি কয়লার খনি হইতে বহুকাল যাবৎ আধুনিক প্রথায় কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে। পিপিং শহরের কাছাকাছিও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। বস্তুতঃ চীনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই কিছু কিছু কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চীনের কয়লা আহরণের কাজ এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে,—বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টনের মত। **জাপানের** কয়লা-
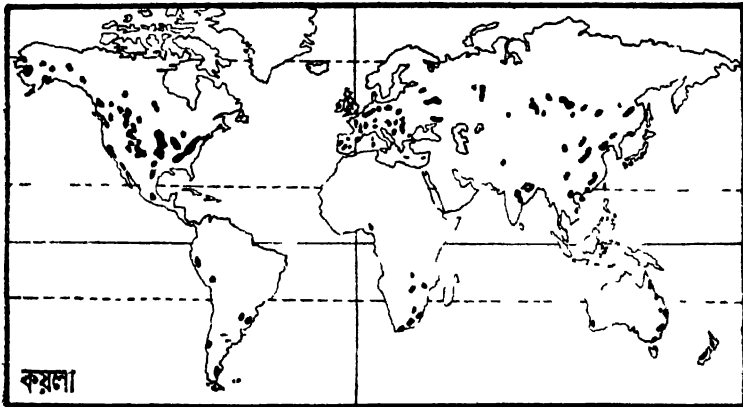
৪৬নং চিত্র—পৃথিবীর কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

খনিসমূহ সমস্ত দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শাখালিন হইতে ফরমোজা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই কয়লা পাওয়া যায়। তবে মোট উৎপাদনের প্রায় ২/৩ ভাগ উত্তর কিউসিউ এবং অবশিষ্টাংশ হোক্কাইডোর কয়লা খনি হইতে আসে। উৎপাদিত কয়লা দেশের প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। জাপানের কয়লা নিম্নশ্রেণীর বিটুমিনাস জাতীয়। কয়লা উৎপাদনে **ভারত** পৃথিবীতে

অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৫% কয়লাই রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনিসমূহ হইতে সরবরাহ হয়। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, এবং রাজস্থানেও কয়লা পাওয়া যায়। ভারতীয় কয়লা ইউরোপীয় ও মার্কিনী কয়লার ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। মাঞ্চুরিয়া, ব্রহ্মদেশ, পঃ পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতেও সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

(ঙ) **দক্ষিণ আমেরিকা**—দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল ও চিলিতে সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

(চ) **আফ্রিকা**—দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনের অন্তর্গত ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং নাটালে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়। নাটালের নিউক্যাসল এবং ট্রান্সভ্যালের মিডলবার্গ প্রধান প্রধান কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র। নাটালের কয়লা ডারবান বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় এবং ট্রান্সভালের কয়লা জোহানেসবার্গ ও 'র্যাণ্ড' অঞ্চলের শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হয়।

আফ্রিকার রোডেশিয়া রাজ্যেও কতকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে। এতদঞ্চলের খনিসমূহের মধ্যে ওয়াংকি কয়লা খনি হইতে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য এবং কঙ্গো রাজ্যের কাটাঙ্গা প্রদেশের শিল্পকেন্দ্রসমূহে কয়লার সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি কয়েকটি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ছ) **অস্ট্রেলিয়া**—কয়লাই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। নিউ সাউথ ওয়েলস হইতে অস্ট্রেলিয়ার ৭০% কয়লা সংগৃহীত হয়। এতদঞ্চলের সিডনী কয়লাক্ষেত্রটি সর্ববৃহৎ। অবশ্য উত্তরে নিউক্যাসল, পশ্চিমে লিথগো এবং দক্ষিণে ইল্লাওয়ারা কয়লাক্ষেত্র হইতেও কয়লা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের ডসন অববাহিকা ও ইপস্উইচ অঞ্চল হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও টাসমানিয়া অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের মাত্র ১% উত্তোলিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার কয়লা বিটুমিনাস ও লিগনাইট জাতীয়।

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন ওয়েস্টপোর্ট ও গ্রেমাউথ ক্ষেত্র হইতেই ঐ রাজ্যের অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়।

কয়লার বাণিজ্য (Coal trade)—অতি সামান্য পরিমাণ কয়লাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়লা **রপ্তানী**তে যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে প্রথম। যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্মেলন এবং অস্ট্রেলিয়াও কয়লা রপ্তানী করিয়া থাকে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালী, সুইডেন, বাল্টিক রাজ্যসমূহ, ক্যানাডা এবং জাপান প্রচুর কয়লা **আমদানী** করিয়া থাকে।

কয়লার ব্যবহার (Uses of Coal)—কয়লা প্রধানতঃ শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়লা হইতে প্রস্তুত কোক বিভিন্ন ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে, সিমেণ্ট শিল্পে, বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য-প্রস্তুতিতে, রেল এঞ্জিন চালনায়, গৃহস্থালীর কাযে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণের* ফলে কয়লা হইতে কোক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় **উপজাত দ্রব্যাদি** (by-products) পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে (১) আলকাতরা ও তজ্জাত দ্রব্যাদি; (২) এ্যামোনিয়া ও উহার যৌগিক পদার্থ, (৩) গ্যাস (coal gas), (৪) তৈল ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, যথা—(ক) অপরিস্কৃত তৈল, (খ) বেনজিন বা বেনজল—ইহা দ্বারা রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত হয়; (গ) ন্যাপথলিন—গৃহস্থালীতে ও সংযোগাত্মক নীল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়; (ঘ) টলুয়েন—ট্রাই-নাইট্রো-টলুয়েন (টি-এন-টি) বিস্ফোরক ও মিষ্ট দ্রব্য স্যাকারিন (চিনি হইতে ৫১১ গুণ অধিক মিষ্টি) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়; (ঙ) ফেনল বা কার্বলিক এ্যাসিড, (চ) বিবিধ দ্রব্যাদি—যথা, গন্ধক প্রভৃতি প্রধান। বর্তমানে ১৬০০০এরও অধিক সংখ্যক উপজাত দ্রব্যাদি কয়লা হইতে প্রস্তুত ও নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

খনিজ তৈল (Mineral Oil বা Petroleum)

ভূগর্ভে শিলায় সঞ্চিত সুপ্রাচীন জীবাশ্ম হইতে এই তৈল উদ্ভূত। খনিজ তৈল শিলাস্তরের মধ্য হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে শিলা তৈলও (rock oil) বলা হয়।

খনিজ তৈলের উৎপত্তি ও উত্তোলন (Formation and extraction of mineral oil)—খনিজ তৈলের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভূবিজ্ঞানীরা একমত না হইলেও অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানী মনে করেন যে জলজ উদ্ভিদ ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পরে ভূগর্ভস্থ জল এবং জীবাণুর কার্যপ্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন হেতু খনিজ তৈলে পরিণত হয়। উদ্ভিদের খনিজ তৈলে রূপান্তরিত হইবার আদর্শ স্থান হইল প্রাচীন জলাভূমি ও নদীর বদ্বীপাঞ্চল। দুইটি অপবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত নবীন পাললিক প্রবেশ্য স্তরের ঊর্ধ্বভঙ্গেই (anticline) খনিজ তৈল সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলাস্তরে খনিজ তৈল পাওয়া যায় না। খনিজ তৈলের সঙ্গে

* উচ্চ তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণ (high temperature carbonisation) পদ্ধতিতে প্রাথমিক পদার্থ-হিসাবে কোক ও গ্যাস এবং অন্যান্য উপজাত দ্রব্য হিসাবে আলকাতরা ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, এ্যামোনিয়া ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গন্ধক, বেঞ্জল, ন্যাপথা প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। নিম্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণ (low temperature carbonisation) পদ্ধতিতে প্রধানতঃ ধূমহীন কোক, আলকাতরা ও হালকা তৈল প্রস্তুত হয়। উদ্‌যানীভবন পদ্ধতিতে (hydrogenation) প্রধানতঃ কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত হয়।

প্রায় সর্বদাই প্রাকৃতিক গ্যাস (natural gas) ও জল সঞ্চিত থাকে। তৈল অপেক্ষা গ্যাস হাল্কা আর জল ভারী বলিয়া শিলাস্তরের উপরিভাগে গ্যাস, মধ্যভাগে খনিজ তৈল এবং সর্বনিম্নে জল থাকে। তৈলযুক্ত অঞ্চলে কূপ খনন করিয়া তৈল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তোলিত তৈলকে অপরিস্রুত তৈল (crude oil) বলে। তৈলকূপসমূহের আর্থিক গুরুত্ব নির্ভর করে ইহাদের গভীরতার উপর। সাধারণভাবে বলা যায় যে ২০০০'-এর অনধিক গভীরতাযুক্ত কূপগুলিকে অগভীর এবং ৩০০০'-৬০০০' পর্যন্ত গভীরতাযুক্ত কূপগুলিকে গভীর কূপ বলা হয়। অবশ্য ১০,০০০'-এর অধিক গভীরতাযুক্ত কূপের অস্তিত্বও রহিয়াছে। তৈলখনি অঞ্চলসমূহ হইতে নলপথে (pipe line) অপরিস্রুত তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে (refining centre) অথবা রপ্তানীর জন্য বন্দরসমূহে প্রেরণ করা হয়।
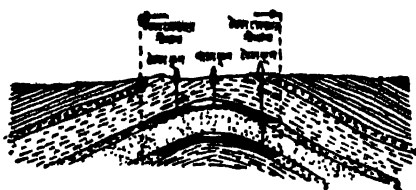
৪৭নং চিত্র—তৈলক্ষেত্র হইতে তৈল উত্তোলন

জ্বালানী হিসাবে খনিজ তৈল ও কয়লার তুলনা (Comparison between oil and coal as fuels)—নলের সাহায্যে তৈল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুবিধা থাকায় খনিজ তৈলের আমদানী-রপ্তানী ব্যয় কয়লার আমদানী-রপ্তানী ব্যয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়লা অপেক্ষা তৈলের সঞ্চয় সহজতর। তৈলকে পূর্ণ মাত্রায় দহন করিয়া উহার সমস্ত শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কয়লার ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব হয় না। কারণ বহু ক্ষেত্রে কয়লাকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া দিতে হয়। আবার কয়লা অপেক্ষা খনিজ তৈলের দাহিকাশক্তি অধিক ও আয়তন অল্প। ইহা কয়লা অপেক্ষা পরিচ্ছন্নও বটে। তবে আজও পর্যন্ত খনিজ তৈল পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। আবার ইহা সহজদাহ্য বলিয়া ইহার সুষ্ঠু সংরক্ষণও কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য এবং লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি ভারী শিল্পে ইহার ব্যবহার অতি সামান্য। বহুক্ষেত্রে তৈলখনি কয়লাখনি অপেক্ষা দ্রুত (কখনও কখনও ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই) নিঃশেষিত হইয়া যায় বলিয়া তৈলকূপ-সন্নিহিত অঞ্চলে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছে।

খনিজ তৈলের ব্যবহার (Uses of mineral oil)—খনিজ তৈল একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক উপাদানসমূহ সর্বত্র একপ্রকার নহে কিংবা সর্বত্র সমপরিমাণেও থাকে না। তৈল কূপ হইতে উত্তোলিত অপরিস্রুত খনিজ তৈলকে পরিস্রুত করিয়া যে বিভিন্ন উপজাত

দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ ব্যারেল (প্রায় ৪২ গ্যালন) অপরিস্কৃত খনিজ তৈলকে পাতনযন্ত্রে চুয়াইয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া নিম্নলিখিত অতি প্রয়োজনীয় **উপজাত দ্রব্যগুলি** (by-products) পাওয়া যায় :—গ্যাসোলিন অথবা পেট্রোল (৪২%), গ্যাস তৈল ও জ্বালানী তৈল (৪০%), কেরোসিন (৫'৩%), পিচ্ছিলকারক পদার্থ (৩'৭%), পীচ বা কৃত্রিম অ্যাসফাল্ট (২%), কোক (১%), অন্যান্য পদার্থ (ভেসেলিন, প্যারাফিন ইত্যাদি—৬%)। যে খনিজ তৈলের পরিশোধনে প্যারাফিন বা মোম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে হাল্কা গ্যাসোলিন (ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট) পাওয়া যায়।

গৃহাদি আলোকিত করিতে ও রেলগাড়ী চালাইতে কেরোসিন তৈল, জাহাজের জ্বালানী হিসাবে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল এবং মোটর গাড়ী বিমান পোত প্রভৃতি চালাইবার উপযোগী নানাপ্রকার দাহ্য পদার্থ খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়। শিল্পকার্যে শক্তি উৎপাদন করিতেও খনিজ তৈলের নানাবিধ উপজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খনিজ তৈলের উৎপাদন (World oil production)—পৃথিবীতে উৎপাদিত সমগ্র খনিজ তৈলের প্রায় ৯০% যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ভেনেজুয়েলা, পারস্য, ইন্দোনেশিয়া ও রুমেনিয়া—এই ছয়টি দেশেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি দেশই একযোগে ৮০% উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে খনিজ তৈলের একান্ত অভাব রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকায় এইগুলির উপর অধিকার বিস্তারের জন্য পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহ সর্বদাই সচেষ্ট। বর্তমানে কেবলমাত্র রুশিয়া ও জাপানের তৈলক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ তৈলক্ষেত্রের উপর মার্কিন, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রভুত্ব বিদ্যমান।

তৈল বলয় (Oil Belts)—পৃথিবীতে তিনটি প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদক বলয় রহিয়াছে ; যথা, (১) **মার্কিন বলয়** (American Belt)—এই বলয় উত্তর আমেরিকার পুর্বদিকে অবস্থিত আপালাচিয়ান পর্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং মেক্সিকোর মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া হইয়া পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ের একটি শাখা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়া ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্কিন বলয়েই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই বলয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৭০০ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। (২) **মধ্য-প্রাচ্য বলয়** (Middle East Belt)—এই বলয় পারস্য দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাকের মধ্য দিয়া রুশিয়া এবং রুমেনিয়ার অন্তর্গত

কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেহেরিন দ্বীপপুঞ্জ এবং সৌদী আরবের তৈলাঞ্চলগুলিও এই বলয়ের অন্তর্গত। এই বলয়ের তৈল উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বলয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৩২০ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। (৩) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলয়** (South-East Asiatic Belt)—এই বলয় উত্তরে আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলখনিসমূহ (Principal oil fields of the world)—(ক) **উত্তর আমেরিকার** অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়—

৪৮নং চিত্র—যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার খনিজ তৈল অঞ্চলসমূহ

(১) **যুক্তরাষ্ট্র**—বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৬০% খনিজ তৈল যুক্তরাষ্ট্রে উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য তৈলখনি অঞ্চলগুলির মধ্যে (১) উত্তর-পূর্ব নিউইয়র্ক হইতে টিনিসি রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আপালাচিয়ান খনি অঞ্চল, (২) ইলিনয় ও দক্ষিণ-পূর্ব ইণ্ডিয়ানা খনি অঞ্চল,

(৩) হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ইণ্ডিয়ানা ও ওহিও রাজ্যের অন্তর্গত লিমা-ইণ্ডিয়ানা খনি অঞ্চল, (৪) উত্তর টেক্সাস, ওকলাহামা ও কান্‌সাস্‌ রাজ্যের অন্তর্গত মধ্য-মহাদেশীয় খনি অঞ্চল, (৫) মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী টেক্সাস্‌ ও লুইসিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত উপসাগরীয় খনি অঞ্চল, (৬) মিচিগান রাজ্যের খনি অঞ্চল, (৭) প্রধানতঃ ওয়াইওমিং রাজ্যের অন্তর্গত রকি পর্বতের খনি অঞ্চল ও (৮) ক্যালিফোর্নিয়ার খনি অঞ্চলই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বর্তমানে টেক্সাস্‌, ওকলাহামা ও ক্যালিফোর্নিয়ার তৈলখনিগুলি হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তৈলের প্রায় ৮০% আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

(২) **মেক্সিকোর** উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায় এবং এই অঞ্চলে অবস্থিত ট্যাম্পিকো ও টুক্সপান বন্দর দিয়া প্রচুর খনিজ তৈল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে মেক্সিকো পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২% খনিজ তৈল উৎপাদন করে।
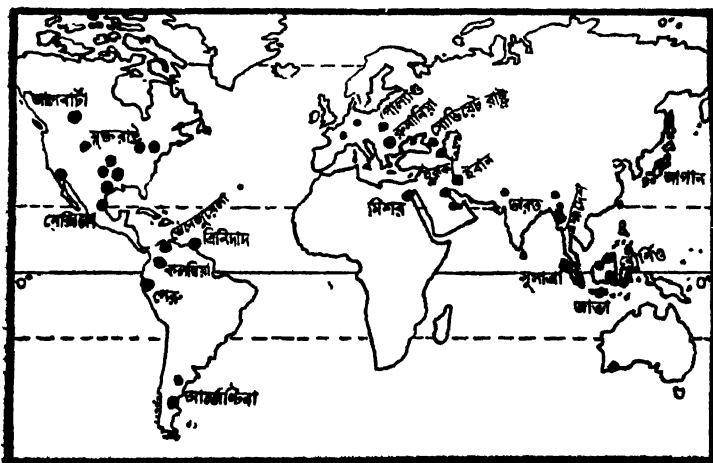
৪৯নং চিত্র—পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

(৩) **ক্যানাডার** অন্তর্গত আলবার্টা এবং অণ্টেরিও প্রদেশ হইতে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতেছে। আলবার্টা রাজ্যের এডমণ্টন শহর হইতে পশ্চিমের রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়া ভ্যানকুভার বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত তৈল পরিবহনের একটি নলপথ ১৯৫৩ সালে এবং ঐ শহর হইতে পূর্বদিকে স্যাসকাচুয়ান রাজ্যের রেজিনা শহর পর্যন্ত প্রসারিত ৪৩৯ মাইল দীর্ঘ আর একটি নলপথ ১৯৫০ সালে নির্মিত হওয়ায় আলবার্টা রাজ্যের তৈল ক্যানাডার শিল্প সংগঠনে বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার

করিয়াছে। দ্বিতীয়োক্ত নলপথটি প্রসারিত হইবে সুপিরিয়র হ্রদের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। এইটি সম্পূর্ণ হইলে ইহার মোট দৈর্ঘ্য হইবে ১১০০ মাইল।

(খ) **দক্ষিণ আমেরিকার** উল্লেখযোগ্য তৈলখনিগুলি আণ্ডিজ পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত। এই খনিগুলির মধ্যে (১) ভেনেজুয়েলার ম্যারাকাইবো অঞ্চল; (২) কলম্বিয়ার ম্যাগডালিনা-স্যানট্যানডার অঞ্চল এবং (৩) পেরুর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খনিজ তৈলের উৎপাদন অধিক। আর্জেন্টিনার খনিজ তৈলের সমগ্র চাহিদার প্রায় ৪০% (১) উত্তর প্যাটাগোনিয়া ও (২) উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা —এই দুইটি খনি অঞ্চল হইতে মিটান হয়। উত্তরে ত্রিনিদাদ অঞ্চলে, চিলির উত্তরাংশে এবং বলিভিয়া রাজ্যেও সামান্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের প্রায় ১২% সরবরাহ করে।

(গ) **ইউরোপীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত (১) কাস্পিয়ান উপকূলে অবস্থিত বাকু (রুশিয়ার ৭৫%), ককেসাস পর্বতের উত্তরস্থ গ্রজনী ও মাইকপ এবং (২) উরাল পর্বতাঞ্চল (উখ্‌টা হইতে স্টারলিটামাক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল) তৈল-খনির জন্য বিখ্যাত। ইউরাল অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উফা বর্তমানে তৈল উৎপাদনে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে ইহাকে 'দ্বিতীয় বাকু' বলা হয়। নলের সাহায্যে (১) বাকু হইতে বাটুম, (২) মাখাচ্‌কালা হইতে গ্রজনী ও আরমাভির হইয়া কৃষ্ণসাগর তীরাস্থিত তুয়াপসে এবং (৩) আরমা-মাভির হইতে রস্টভ-অন-ডন হইয়া ক্রেদোভায়া পর্যন্ত তৈল প্রেরিত হয়। **এশীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত (১) সুদূর প্রাচ্যের শাখালিন ও কামসাটকা এবং (২) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় তৈল খনি রহিয়াছে। সম্প্রতি কারাগাণ্ডা ও বুখারায় এবং তুর্কমেন ও কিরঘিজ রাষ্ট্রে তৈলখান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ঘ) **মধ্যপ্রাচ্য**—(১) **পারস্যের** মসজিদ-ই-সুলেমান, আঘা-জারি, লালি, গাচ-সরণ, নাফ্‌ট্-ই-সাফিদ্‌ ও হাফ্‌ট্-কেল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য তৈলখনিসমূহ অবস্থিত। এই অঞ্চলসমূহ হইতে পরিস্রাবণের জন্য খনিজ তৈল নলযোগে আবাদান বন্দরে আনীত হয়। ১৯৫১ সালে পারস্যের তৈল-উত্তোলন শিল্পের জাতীয়করণ হয় এবং পরবর্তী কালে পারস্যের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

(২) **ইরাকের** কারকুক ও খান্কে অঞ্চলে তৈলখনিগুলি অবস্থিত। কার-কুকের তৈলখান পৃথিবীবিখ্যাত। এই অঞ্চল হইতে খনিজ তৈল নলযোগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে নীত হয়। পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের প্রায় ১৫% ইরাকে পাওয়া যায়।

(৩) **সৌদী আরবের** হাসা প্রদেশ, **বেহরিন দ্বীপপুঞ্জ** এবং **কাটের** উপদ্বীপেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তৈলখনিগুলি মার্কিন শক্তির তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। মিশর প্যালেস্টাইন এবং আফগানিস্তানেও অল্পবিস্তর তৈল পাওয়া যায়।

(ঙ) **ইউরোপ**—রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন অতি সামান্য। রুমেনিয়া ও পোল্যাণ্ড (বর্তমানে ইহা রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত) ইউরোপের প্রধান তৈল-উৎপাদক দেশ। রুমেনিয়ার তৈলখনিগুলি কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। **প্লোস্টি** এই স্থানের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। জার্মানীর হ্যানোভার অঞ্চল, ফ্রান্সের পেচেলব্রন অঞ্চল এবং ব্রিটেনের নটিংহামশায়ারে কয়েকটি ছোট ছোট তৈলখনি রহিয়াছে।

(চ) **এশিয়া**—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত দেশগুলিতে তৈল পাওয়া যায়।

(১) **ভারতে** (সর্বপ্রধান খনি ডিগবয়) খনিজ তৈলের উৎপাদন অতি সামান্য (বার্ষিক গড় ৬০-৭০ মিঃ গ্যালন)। (২) **পাকিস্তান** (পঃ পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান) প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ মিঃ গ্যালন তৈল উৎপাদন করে। (৩) **ব্রহ্মদেশের** ইরাবতী নদীর উপত্যকায় এবং রামরীতে বহু তৈলখনি রহিয়াছে। (৪) জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ব্রুন্‌সি, সারাবাক্, বালিকপাপান ও তারাকান **ইন্দোনেশিয়ার** প্রধান প্রধান খনিজ তৈলাঞ্চল। (৫) **জাপানে** অতি সামান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। উত্তর হন্‌সুর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আকিটা ও নিগাটা খনি হইতে জাপানের সমগ্র উৎপাদনের ৯৫% তৈল উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ব্যতীত চীন, নিউজীল্যাণ্ড, ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

খনিজ তৈলের বাণিজ্য (Trade in mineral oil)—যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা, ইরান, রুশিয়া, রুমেনিয়া, ইরাক, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মেক্সিকো, পেরু, ত্রিনিদাদ, বেহ্‌রিন দ্বীপ প্রভৃতি দেশ খনিজ তৈল **রপ্তানী** করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, ইতালী, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল **আমদানী** করে।

খনিজ তৈলের পরিবর্ত সামগ্রী (Petroleum substitutes)—খনিজ তৈলের পরিবত সামগ্রী হিসাবে 'তৈল শেল' (oil shale), সংযোগাত্মক তৈল (synthetic oil), বেনজল (benzol) ও সুরাসারের (alcohol) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'তৈল শেল'—ইহা সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটেই পাওয়া যায়। এই 'শেলকে' চূর্ণ ও উত্তপ্ত করিয়া তৈলের নিষ্কাশন করা হয়। তবে 'শেল' হইতে তৈল নিষ্কাশন খনি হইতে তৈল উত্তোলন অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বতাঞ্চল, কেণ্টাকী ও ইণ্ডিয়ানা রাজ্য; ব্রিটেনের স্কটল্যাণ্ড এবং রুশিয়ার এস্টোনিয়া রাজ্যে 'তৈল শেল' পাওয়া যায়।

সংযোগাত্মক তৈল—পৃথিবীতে তৈলের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈলহীন দেশগুলি কয়লা হইতে সংযোগাত্মক পদ্ধতিতে তৈল উৎপাদনের

চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। কয়লা হইতে তৈল বাহির করিবার নানারূপ পদ্ধতি রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে বার্জিয়াস পদ্ধতি এবং ফ্রাঞ্জফিসার পদ্ধতিই প্রধান। **বার্জিয়াস পদ্ধতি** অনুসারে বিটুমিনাস কয়লার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণকে উচ্চ চাপযুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত অতি উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে কয়লা তরলীভূত হইয়া অপরিস্রুত তৈল উৎপাদন করে। পরে এই অপরিস্রুত তৈলকে পাতনযন্ত্রে চোলাই করিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত করিয়া পেট্রোল পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে এই পদ্ধতিতে কয়লা হইতে সংযোগাত্মক তৈল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিকে 'হাইড্রোজেনেশন' বা উদ্বায়ীভবনও বলা হয়। **ফ্রাঞ্জফিসার পদ্ধতি** অনুসারে কয়লার সূক্ষ্ম চূর্ণকে অল্প তাপে ও চাপে চোলাই করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে জার্মানীতে কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিকে কয়লার অল্পতাপযুক্ত অঙ্গারীকরণও বলে।

বেনজল—কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত করিবার সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে বেনজল প্রস্তুত হয় তাহাও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরাসার—জৈব শ্বেতসার (organic starch) হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত হয় তাহাও খনিজ তৈলের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সুরাসার প্রস্তুতিতে সাধারণতঃ খাদ্যশস্য, আলু, গুড় প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

সাধারণতঃ তৈলকূপ হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে এবং কখনও কখনও গ্যাসকূপ হইতে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তাহাও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, রুমেনিয়া ও মেক্সিকো রাজ্যে ইহার ব্যবহার সমধিক। সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সুই (Sui) অঞ্চলে এক অতি বৃহৎ গ্যাসকূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদঞ্চল হইতে নলের সাহায্যে গ্যাস করাচীর বিভিন্ন শিল্পাগারে প্রেরিত হইতেছে।

জলবিদ্যুৎ (Water Power বা Hydroelectric Power বা White Coal)

খনিজ জ্বালানী ও জলবিদ্যুতের তুলনা (Comparison between mineral fuels and water power)—জলপ্রপাত বা নিম্নগামী বেগবতী নদীর জলস্রোত দ্বারা ডায়নামো চালাইয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয় তাহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। খনিজ তৈল বা কয়লা অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ

সস্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার যোগান অফুরন্ত। পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রহিয়াছে; ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে উহা ভবিষ্যতে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীতে যতদিন সূর্যতাপে জল বাষ্পীভূত হইবে, জলবিদ্যুতের সরবরাহ ততদিন অফুরন্ত রহিবে। আবার আকরিক হইতে এ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন, কাষ্ঠমণ্ড শিল্প, কৃত্রিম সার তৈয়ারী, কয়েকপ্রকার রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি শিল্পকার্যে এত অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় যে জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি কয়লা ও খনিজ-তৈল-হীন অঞ্চলেও শিল্পের প্রসারলাভ ঘটিতেছে। আবার জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সহজে ও অল্পব্যয়ে বহুদূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে প্রেরণ করা যায় বলিয়া বর্তমান কালে এই বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের ফলে যন্ত্রশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইয়াছে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Factors favourable for generation)—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নলিখিত ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(ক) **ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical বা Physical factors)**—(১) বন্ধুর ভূপ্রকৃতির উপর দিয়া প্রবাহিত জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল হয় বলিয়া পার্বত্য নদনদী ও জলপ্রপাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। স্বাভাবিক জলপ্রপাতের অভাবে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া কৃত্রিম প্রপাত তৈয়ারী করিতে হয়। বাঁধ নির্মাণের পক্ষে পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানই প্রশস্ত। কারণ ইহাতে প্রথমতঃ, বাঁধ বাঁধিতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, উচ্চস্থান হইতে জল-ধারার পতনের ফলে যে বেগ সঞ্চারিত হয় তাহাতে সহজেই জলবিদ্যুৎ আহরণ করা যায়। (২) সারাবৎসর ধরিয়া নিয়মিত, প্রচুর ও সমবেগসম্পন্ন পলিবিহীন জলপ্রবাহের প্রয়োজন। সারাবৎসর ধরিয়া জলপ্রবাহের সমতা রক্ষার জন্য তুষারাবৃত পর্বত, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপুষ্ট নদনদী ও পর্বতের উপর জলপূর্ণ স্বাভাবিক বা কৃত্রিম হ্রদ থাকা প্রয়োজন। (৩) নাতিতীব্র শীতকাল। কারণ শীতকালীন উত্তাপ যদি হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে তাহা হইলে জলরাশি জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় না।

(খ) **অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic factors)**—অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির বিদ্যমানতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। (১) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা। উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রসমূহ ৩০০-৪০০ মাইলের অধিক দূরবর্তী হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়। জলবিদ্যুতের ব্যবহারকেন্দ্রসমূহ জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ হওয়া

প্রয়োজন। (২) যানবাহনের সুব্যবস্থা। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের সহিত উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৩) অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলসমূহে কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রতুলতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপ্রেরণা দেয়।

দঃ আমেরিকার আমাজন ও আফ্রিকার কঙ্গো নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশের দরুণ এই সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় তথায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জলবিদ্যুৎশক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ (gift of nature) নহে, ইহা মনুষ্যকৃত শ্রমসাধ্য সম্পদ।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পৃথিবীর জলবিদ্যুৎ শক্তির আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ (potential power) এবং উহার প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ (developed power) এই দুইটির মধ্যে চরম অসংগতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আফ্রিকা মহাদেশের সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ ৬২০০ লক্ষ কিলোওয়াট (কিঃ ওঃ) কিন্তু উৎপাদনের উপযোগী হইল মাত্র ৩ লক্ষ কিঃ ওঃ। অনুরূপভাবে এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দঃ আমেরিকা, ইউরোপ এবং ওশিয়ানিয়ার সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ যথাক্রমে ৩১০০, ১৯০০, ১৪৮০, ১৫৬০ ও ৬১০ লক্ষ কিঃ ওঃ এবং ঐ দেশগুলিতে উৎপাদনের উপযোগী বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হইল যথাক্রমে ১০২, ৩৫০, ২০, ৩২০, ও ১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ। বর্তমানে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।

(১) **উত্তর আমেরিকা**—এই মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নায়াগ্রা জলপ্রপাত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় একটি চুক্তিদ্বারা প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত ৩৬,০০০ ঘন ফুট জল ক্যানাডাতে এবং ২০,০০০ ঘন ফুট জল যুক্তরাষ্ট্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত বিতরিত হইতেছে। এই প্রপাত হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুতের প্রায় ৭৫% যানবাহন চলাচল এবং রাসায়নিক, এ্যালুমিনিয়াম, বনজ ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্যানাডার অন্তর্গত দক্ষিণ অন্টেরিও ও কুইবেক প্রদেশের শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাফেলো, রচেস্টার ও নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই নায়াগ্রা প্রপাত হইতে উদ্ভূত জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে **যুক্তরাষ্ট্রের** (ক) উত্তরে নিউইয়র্ক এবং নিউইংলণ্ড রাজ্যে, (খ) দক্ষিণাঞ্চলের আটলান্টিক

উপকূলসন্নিহিত রাজ্যসমূহে, এবং (গ) পশ্চিমের রকি পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুতের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার হইতেছে। **ক্যানাডার** মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত প্রেয়রী প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। তবে পূবাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক।

(২) **ইউরোপ**—বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত অনেক দেশেই প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। **ইতালী**তে কয়লা সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল, কিন্তু বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা কয়লার এই অভাব বহুলাংশে মোচন করা হইয়াছে। ইতালীর অধিকাংশ জলবিদ্যুৎই আল্পস্ পর্বতাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে উৎপাদিত এবং পো অববাহিকার অন্তর্গত শিল্পকেন্দ্রসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইতালীর দক্ষিণাংশের আপেনাইন পর্বতাঞ্চল হইতে নির্গত নদীসমূহ হইতেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। **সুইজারল্যাণ্ডে** কয়লা ও খনিজ তৈলের অত্যন্ত অভাব। তাই সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ শিল্প ও রেলপথ ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। আল্পস্ পর্বতাঞ্চল হইতে নির্গত নদীসমূহ হইতে সুইজারল্যাণ্ডের জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। **নরওয়ে** দেশে কয়লা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সেই কারণে নরওয়ের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবিদ্যুৎশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। সমবেগসম্পন্ন নদীপ্রবাহ, ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, অসংখ্য জলপ্রপাতের বিদ্যমানতা এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করিয়া থাকে। নরওয়ের দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, খনিজ শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্পই নরওয়ের জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রধান গ্রাহক। নরওয়ের অনুরূপ ভৌগোলিক পরিবেশ **সুইডেনে** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। ভেনার হ্রদ হইতে উৎপন্ন গোটা নদীর উপর ট্রলহাট্টা সুইডেনের বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা **ফ্রান্স** কয়লার অপ্রতুলতা ও খনিজ তৈলের অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে আল্পস্, পীরেনীজ ও সেভেন পর্বতাঞ্চল হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ও যন্ত্রশিল্পসমূহ জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার করিয়া থাকে। **জার্মানী**র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য হইলেও উৎপাদিত জলবিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক।

(৩) **এশিয়া**—এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহারে জাপান ও ভারতবর্ষ-ই প্রধান। ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, খরস্রোতা নদীর প্রাচুর্য, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং অনধিক শৈত্য **জাপানে** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। মধ্য জাপান পর্বতাঞ্চলের পূর্ব ও দক্ষিণ ঢালে

জাপানের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ কারখানা অবস্থিত। শিল্প, যানবাহন এবং গৃহাদি আলোকিত করিবার জন্য জাপানে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **ভারতের** জলবিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। ঋতুভেদে ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে বলিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। **ব্রহ্মদেশে** উত্তরের পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু জলবিদ্যুৎ ভোগকেন্দ্র-সমূহ দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশে জলবিদ্যুতের উৎপাদন প্রসার লাভ করে নাই।

(৪) **রুশিয়া**—সম্প্রতি রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। ইউরোপীয় রুশিয়ার (১) নীপার নদীর উপর (নীপ্রোগেস কেন্দ্র), (২) লেনিনগ্রাদের নিকট স্বীর ও ভলকভ নদীর উপর, (৩) শ্বেত সাগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিভা নদীর উপর, (৪) ককেশাস পর্বতাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর উপর এবং (৫) ভল্গা অববাহিকা অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এশীয় রুশিয়াতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে সামান্য পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট জল বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পূবাঞ্চল এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারতের খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদে ভারতের অবস্থা (Position of India as a supplier of minerals)—ভারত নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। শিল্পোন্নতির জন্য যে সমস্ত খনিজ পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতে রহিয়াছে। আভ্যন্তরীণ যোগান, চাহিদা ও বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের খনিজ সম্পদগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—(ক) যে সকল খনিজ সম্পদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প এবং যোগান প্রচুর থাকায় রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্তও প্রচুর। যেরূপ, আকরিক লৌহ, অভ্র, টাইটানিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, জিপসাম, মোনাজাইট, বেরেলিয়াম, করাণ্ডাম, ষ্টিয়াটাইট, ম্যাগনেসাইট, সিলিকা ইত্যাদি। (খ) যে সমস্ত খনিজ সম্পদে ভারত প্রায় আত্মনির্ভরশীল। যেরূপ, কয়লা, বক্সাইট, স্বর্ণ, তাম্র, ক্রোমাইট, স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর, মর্মর, শ্লেট, সোডিয়াম, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, সোহাগা, পিরাইট, নাইট্রেট, ফস্ফেট, আরসেনিক, রত্ন, ব্যারাইট, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি। (গ) যে সমস্ত খনিজ সম্পদের জন্য ভারতকে বৈদেশিক আমদানীর উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। যেরূপ,

রৌপ্য, নিকেল, খনিজ তৈল, গন্ধক, সীসক, দস্তা, রাং, পারদ, টাংস্টেন, মলিব-ডেনাম্, গ্র্যাফাইট, প্ল্যাটিনাম, অ্যাসফাল্ট, পটাশ, ফ্লুরাইড প্রভৃতি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পাকিস্তান অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের সমুদয় পরিমাণ গন্ধক, ৮১% ক্রোমাইট, ২০% খনিজ তৈল, এবং ৪% কয়লা পাইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও খনিজ (Indian minerals under Five Year plans)—জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। খনিজ সম্পদের গুণাগুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদির সংগ্রহ এবং ইহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন আগ্রহ দেখাইয়াছেন। এই কমিশনের নির্দেশ অনুসারে **প্রথম পরিকল্পনার** কার্যকালে কয়লা, খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানীজ, সীসক, দস্তা, সালফাইড, পিরাইট, ক্রোমাইট, অভ্র, জিপসাম, এ্যাসবেস্‌টস্, হীরক, গন্ধক, মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ খনিজ, কিয়ানাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, "ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ্ মাইনস্", "সেণ্ট্রাল গ্লাস এ্যাণ্ড সেরা-মিক রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট" এবং "ন্যাশনাল মেটালাবজিক্যাল ল্যাবোরেটরী" কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় খনিজ শিল্পের উন্নয়নকল্পে ১ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছিল, তবে পরবর্তীকালে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে কয়লা, খনিজ তৈল, তাম্র, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, জিপসাম, সীসক, দস্তা, রাং, চুনাপাথর, ডলোমাইট, মর্মর, বালি, গ্র্যাফাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের সঞ্চিত তহবিল সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান ও নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের ভার ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ও "ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ্ মাইনস্"-এর উপর ন্যস্ত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প সংগঠন ও প্রসারণের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে বলিয়াই পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরি-কল্পনার কাযকালে কয়লা, লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট, চুনাপাথর, তাম্র, দস্তা, সীসক ও ম্যাগনেসাইট-এর সঞ্চিত তহবিল ও নূতন নূতন খনির অধিকতর অনুসন্ধান ও নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের ভার ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ও "ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ্ মাইনস্"-এর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শেষোক্ত সংস্থা দুইটির প্রসারণ কল্পে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে যথাক্রমে ১০ কোটি ও ৫ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। উপরোক্ত সংস্থা দুইটি ব্যবহারিক ভূতত্ত্ববিদ্যা ও খনিজবিদ্যা সম্পর্কেও শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী থাকিবে। রাজ্যগত বিভিন্ন "ভূতত্ত্ব ও খনিজ দপ্তর"গুলিকেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যমধ্যে খনিজ দ্রব্যের অধিকতর অনুসন্ধানের ও উত্তোলনের সহায়তা করিবার নির্দেশ

দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে খনিজ শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যে সরকারী খাতে ৪৭৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ

ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

লৌহ আকরিক (Iron ore)—আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতের লৌহ আকরিক অতি উচ্চশ্রেণীর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আবার ভারতের অধিকাংশ লৌহখনিরই বিশেষ সুবিধা এই যে, এই খনিগুলির নিকটেই কয়লা এবং লৌহ গলাইবার উপযোগী ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়। অধিকন্তু খনি হইতে কারখানা এবং সেখান হইতে বড় বড় শহরকে যুক্ত করিবার উপযোগী যানবাহনের সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতে সঞ্চিত আকরিক লৌহের পরিমাণ ২১০০ কোটি টনেরও উপর। উত্তম শ্রেণীর লৌহ আকরিক ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গেলেও নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে উহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হয়।

ছোটনাগপুরের **সিংভুম** জেলার কল্হান মহকুমার অন্তর্গত পানশিরাবুরু, বুদাবুরু, গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডি খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। এই খনিগুলি দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা টাটানগরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার সহিত সংযুক্ত। **উড়িষ্যা**—(ক) **কেওনঝাড়** অঞ্চলের দুইটি খনি প্রধান—(১) বাগিয়াবুরু এবং (২) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি খনির এই জেলার অন্তর্গত অংশ। এই খনিগুলির নিকটেই ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। (খ) **বোনাই** অঞ্চল। (গ) **ময়ূরভঞ্জ** জেলার গুরুমহিষাণী, ওকাম্পাদ (গুলাইপাদ) ও বাদামপাহাড় খনি অঞ্চল হইতে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর আকরিক উত্তোলিত হয়। এই সমুদয় খনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা টাটানগর ও আসানসোলের সহিত সংযুক্ত। এই খনিগুলির নিকটে প্রচুর কয়লা ও ডলোমাইট
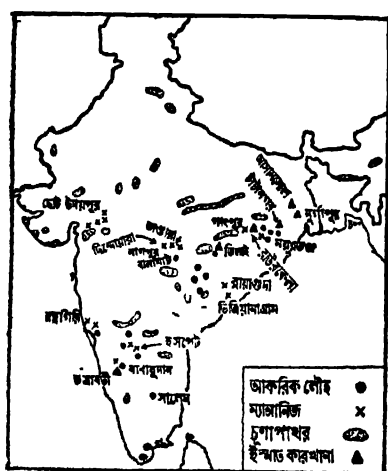
৫০ নং চিত্র—ভারতের খনিজ সম্পদ

পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ময়ূরভঞ্জ জেলার এই তিনটি খনি হইতেই ভারতে উত্তোলিত মোট লৌহ আকরিকের ⅓ অংশ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা, বোনাই ও কেওনঝাড় হইতে সিংভূম জেলার কলহান মহকুমা পর্যন্ত এই অতিবিস্তৃত লৌহ-প্রস্তরের বিরাট পর্বত পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে ও গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি উড়িষ্যার কিরিবুরু অঞ্চলে একটি লৌহ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খনিটি জাপানী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। **মহীশূর** রাজ্যের বাবাবুদান পর্বতে অবস্থিত কেমাঙগুণ্ডি খনি হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের তিপ্পুর ও চিতলদ্রুগ অঞ্চলেও লৌহ পাওয়া যায়। এই রাজ্যে কয়লার অভাব থাকায় কাঠের কয়লায় লৌহ গলান হয়। **মধ্যপ্রদেশের** চান্দা জেলার লোহারা ও পিপলগাঁও এবং দ্রুগ জেলার ঢালি ও রাজহারা পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর আকরিক পাওয়া যায়। এই প্রদেশের বস্তার অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। মধ্যপ্রদেশের লৌহ আকর ভিলাই-এর ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবে। **অন্ধ্রের** নেলোর, কুডাপ্পা ও কুর্নুল এবং **মাদ্রাজের** ত্রিচিনপল্লী ও সালেম জেলায় লৌহখনি রহিয়াছে। এই খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর ম্যাগনেটাইট আকরিক পাওয়া যায়। লৌহ-খনির নিকট কয়লা না থাকায় আকরিক হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে না। **মহারাষ্ট্রের** রত্নগিরি অঞ্চলে এবং গোয়ায় লৌহখনি আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ (আলমোড়া), পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লা-খনি-অঞ্চলসমূহেও সামান্য পরিমাণে আকরিক লৌহ ("আয়রন স্টোন শেল") পাওয়া যায়। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ২৯·৭, ৪৬·৭ ও ১০৫·২ (অনুমিত) লক্ষ টন লৌহ আকরিত হয়।

ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা (বর্তমানে ৮০ লক্ষ টন) মিটাইবার পরেও প্রতি বৎসর যে রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহা জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সিংহলে রপ্তানী হয়। ১৯৫০ সালের পর হইতেই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১·৪ মিঃ টন লৌহ আকর ভারত হইতে রপ্তানী হয়। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এই রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান প্রায় ২ মিঃ টন। ভারতের **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** আকরিক লৌহ রপ্তানী অপেক্ষা ঢালাই লৌহ রপ্তানীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যেরূপ প্রসার নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আকরিক লৌহের উত্তোলন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ কেবলমাত্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই ইহার ব্যবহার দাঁড়াইবে অনুমান বার্ষিক ২ কোটি টন। আবার ভারত-জাপান চুক্তির সর্ত অনুসারে ভারত উড়িষ্যার কিরিবুরু অঞ্চল হইতে ২০ লক্ষ টন এবং মধ্যপ্রদেশের বৈলাদিলা অঞ্চল হইতে ৪০ লক্ষ টন—এই মোট ৬০ লক্ষ টন

লৌহ আকর জাপানে রপ্তানী করিবে। অন্যান্য দেশে রপ্তানীর পরিমাণ ২০ লক্ষ টন ও চলতি রপ্তানীর পরিমাণ ২০ লক্ষ টন ধরিলে মোট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি টন। অতএব দেশাভ্যন্তরে বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা এবং রপ্তানীর পরিমাণ অনুমান করিয়া পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৫ ৬৬ সাল নাগাদ লৌহ আকর উত্তোলনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন বার্ষিক ৩'২ কোটি টন।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে মধ্য প্রদেশের বৈলাদিলা, মাদ্রাজের সালেম, এবং মহীশূরের তুমকুর, চিতলদ্রুগ এবং বেলারী-হসপেট অঞ্চলে লৌহ আকরিকের অনুসন্ধান কার্য ব্যাপকভাবে চালাইয়া যাওয়া হইবে।

ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)—[ব্যবহার—পৃঃ ২০৬ দেখ] একমাত্র রুশিয়া ব্যতীত ভারতই ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের প্রায় ৬০% **মধ্যপ্রদেশে**র বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা, জব্বলপুর এবং ঝাবুয়া অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ হইতে পাওয়া যায়। বিশাখাপত্তনমে বন্দর নির্মাণের পর হইতে মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ শিল্পের উন্নতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে দঃ পূঃ রেলপথের বিশাখাপত্তনম-রায়পুর শাখাপথে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ বিশাখাপত্তনম বন্দরে নীত হয় এবং সেখান হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের ১৫% **অন্ধ্র** রাজ্যে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যের বিশাখাপত্তনম, কুর্নুল ও বেলারী জেলার এবং সান্দুর অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানীজই বিশাখাপত্তনম বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। **মহারাষ্ট্রে**র পাঁচমহল জেলায়, রত্নগিরি ভাণ্ডারা, নাগপুর এবং ছোট উদয়পুরে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের ৬% ম্যাঙ্গানীজ এ অঞ্চল হইতে আসে। **মহীশূরে**র কাদুর, সিমোগা, তুমকুর ও চিতলদ্রুগ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। মহীশূরের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন অতি সামান্য—মোট উৎপাদনের প্রায় ৪%। **বিহারে**র মানভূম, হাজারীবাগ ও **উড়িষ্যা**র ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি, কেওনঝাড় এবং গাংপুর অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। এই অঞ্চল ভারতের মোট উৎপাদনের ৪% ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলন করে। **রাজস্থানে**র বান্‌সওয়ারা অঞ্চলেও ম্যাঙ্গানীজ আকরিত হয়।

ভারতে প্রায় ১৮ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রায় ১০ কোটি টনই রহিয়াছে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ৮'৮, ১৫'৮ ও ১১'৬ (অনুমিত) লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলিত হয়। উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজের মাত্র ১০% ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গ্রহণ করে এবং অতি সামান্য অংশ কাঁচশিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং বিদ্যুৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৮৮% গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম,

জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া যায়। তবে **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যেরূপ সম্প্রসারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এই শিল্পে ম্যাঙ্গানীজের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতের ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারত সরকার ম্যাঙ্গানীজের রপ্তানী বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই খনিজের উন্নয়ন সম্পর্কিত বহুবিধ ব্যবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অবলম্বিত এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে পাঁচমহল অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ আকরিক বলয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন আকরিকের অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাওয়া হইবে এবং উড়িষ্যা ও রাজস্থানের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে।

ক্রোমাইট (Chromite)—[ব্যবহার—২০৭ পৃঃ দেখ] মহীশূরের (৬৫%) সিমোগা ও হাসান খনি হইতে, উড়িষ্যা, সিংভূম (৩৩%), বিহারের রাঁচী ও ভাগলপুরের খনি অঞ্চল হইতে এবং কাশ্মীর রাজ্যে অতি সামান্য পরিমাণ ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ভারতে উৎপাদিত ক্রোমাইটের প্রায় সমগ্র অংশই যুক্তরাজ্য, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীতে মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই ক্রোমাইটের ব্যবহার অধিক। এই খনিজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৪৮ সাল হইতেই এই ধাতুর রপ্তানী-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর ক্রোমাইটের রপ্তানী একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর ক্রোমাইট রপ্তানীর পরিমাণও ১৯৫১ সাল হইতে ১০ হাজার টন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭,০০০, ৮৯,০০০ ও ৯৯,০০০ (অনুমিত) টন ক্রোমাইট আকরিত হয়। প্রথম **পরিকল্পনার** কার্যকালে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, ব্যুরো অফ্ মাইন্স্ ও ন্যাশনাল মেটালারজিক্যাল্ ল্যাবরেটারী কর্তৃক ক্রোমাইটের অধিকতর উৎপাদন, নূতন খনির অন্বেষণ ও উন্নততর নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্পর্কিত নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দঃ মহীশূরের ও উড়িষ্যার (নৌশাহী) ক্রোমাইট-খনির উন্নয়ন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিহারের জোজুহাট, মহীশূরের হাসান ও মহীশূর জেলা এবং উড়িষ্যার কটক, কেওনঝাড় ও ঢেনকানল জেলার খনি সমূহে সঞ্চিত ক্রোমাইটের পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে। ভারতে প্রায় ২৩ লক্ষ টন ক্রোমাইট সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ০'২ লক্ষ টন ক্রোমাইট বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

পঃ বঙ্গ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে **ফায়ার ক্লে** (Fire clay) ও **কেওলিনের** (Kaolin) খনি আছে। ফায়ার ক্লে হইতে ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত তাপসহ ইষ্টক এবং কেওলিন হইতে চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ভারতের নানাস্থানে **চুনাপাথর** (Limestone), **এ্যান্টিমনি** (Antimony) প্রভৃতিরও খনি রহিয়াছে। সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে **ভ্যানেডিয়াম** (Vanadium); জামসেদপুরের নিকটবর্তী খারসোয়ান অঞ্চলে **কিয়ানাইট** (Kyanite); কেরালায় **জিরকোনিয়াম** (Zirconium); আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও কেরালা রাজ্যে প্রচুর **সিলিমেনাইট** (Silimanite); মাদ্রাজ, মহীশূর, রেওয়া, সিংভূম, খাসিপাহাড় (আসাম) ও কাশ্মীরে **করাণ্ডাম** (Corrundum) পাওয়া যায়।

মোনাজাইট (Monazite)—মোনাজাইট আকরিক হইতে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। গ্যাসের আলোর ম্যাণ্ট্ল্ প্রস্তুতিতে ও আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোনাজাইটের প্রায় ৮০ ভাগই ভারতের কেরালা রাজ্য, উড়িষ্যা (চিল্কা), অন্ধ্র (গোদাবরীর বদ্বীপাঞ্চল) এবং মাদ্রাজে (তিনেভেলি) পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভারত হইতে মোনাজাইটের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইলমেনাইট (Ilmenite)—ইলমেনাইট আকরিক হইতে নিষ্কাশিত টাইটানিয়াম ধাতু দ্বারা অতি শুভ্র রং প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর সমগ্র চাহিদার প্রায় ৭৫ ভাগ ইলমেনাইট যোগায় ভারতের কেরালা রাজ্য। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ২'১৩, ২'৫১ ও ২'৪৬ (অনুমিত) লক্ষ টন ইলমেনাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৩৫ কোটি টন ইলমেনাইট সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসর ভারতে প্রায় ০'১ লক্ষ টন ইলমেনাইট বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

টাংস্টেন (Tungsten)—রাজস্থানের যোধপুর, বিহারের কালিমাটি ও মধ্যপ্রদেশে **উলফ্রাম** পাওয়া যায়। ইহা হইতে টাংস্টেন ধাতু নিষ্কাশিত হয়।

তাম্র (Copper)—[ব্যবহার—পৃঃ ২০১ দেখ] ভারতে অতি সামান্য পরিমাণে তাম্র উৎপাদিত হয়। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩'৬০, ৩'৫৩ ও ৪'৪১ (অনুমিত) লক্ষ টন তাম্র আকরিত হয়। **বিহারের** সিংভূম, হাজারীবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় তাম্র পাওয়া যায়। সিংভূম জেলায় ৮০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া একটি বিশাল তাম্রবলয় রহিয়াছে। এই বলয়ের অন্তর্গত মোসাবানী, ঘাটশীলা ও ধোবানী অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে তাম্র উত্তোলিত হয়। **অন্ধ্রের** নেলোর জেলা, **মহীশূর, উত্তর প্রদেশের** গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন অঞ্চল, **রাজস্থানের** আজমীঢ়, আলোয়ার ও উদয়পুর, **পাঞ্জাবের** কুলু অঞ্চল, **সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর** অঞ্চলেও সামান্য

পরিমাণে তাম্র আকরিক পাওয়া যায়। বহির্হিমালয় ব্যাপিয়া কুলু উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া কাংড়া, নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়া সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিরাট তাম্রবলয় রহিয়াছে। দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এবং যানবাহনের অসুবিধা থাকায় ঐ অঞ্চল হইতে উত্তোলনকার্য চলে না। সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় অবস্থিত "ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন" ভারতে উৎপাদিত প্রায় সমগ্র তাম্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারত প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে তাম্র আমদানী করে। তাম্রের সহিত দস্তা মিশ্রিত করিয়া এদেশে পিত্তল প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় **পরিকল্পনা**র কার্যকালে ক্ষেত্রী, দারিবো (রাজস্থান) ও রংপো (সিকিম) অঞ্চলে তাম্র খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাম্র আকরিকের অনুসন্ধান কার্য চালান হইবে।
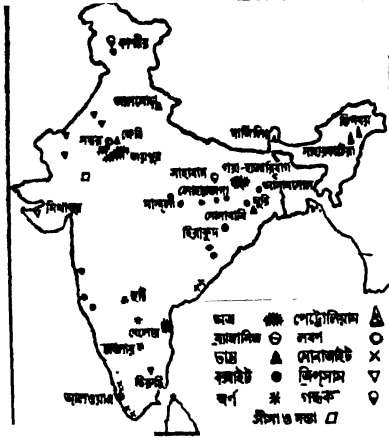
৫১নং চিত্র—ভারতেব খনিজ সম্পদ

ভারতে প্রায় ৩·২৯ কোটি টন তাম্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসর ভারতে বিভিন্ন শিল্প কার্যে প্রায় ০·৭ লক্ষ টন তাম্র (ধাতু) ব্যবহৃত হইতেছে।

ম্যাগনেসাইট (Magnesite)—এই আকরিক হইতে নিষ্কাশিত ম্যাগনেশিয়াম ধাতু কাঁচ, সিমেণ্ট, কাগজ, রং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বিহার, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মাদ্রাজের সালেম জেলায় প্রচুর ম্যাগনেসাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। এদেশে উত্তোলিত প্রায় সমগ্র ম্যাগনেসাইট ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ০·৫৩, ০·৫৮ ও ১·৫৪ (অনুমিত) লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ১০ কোটি টন ম্যাগনেসাইট আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি-বৎসর প্রায় ১·৪ লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিক নানাবিধ শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া এবং মাদ্রাজের সালেম জেলায় ম্যাগনেসাইট আকরিকের ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালান হইবে।

বক্সাইট (Bauxite)—[ব্যবহার—পৃঃ ২০৫ দেখ] ভারতে প্রচুর বক্সাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে সমস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৬ কোটি টন। ইহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের পরিমাণ ২৮ মিঃ টন;

ইহার প্রায় ⅚ অংশ বিহারেই রহিয়াছে। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ০'৬৪, ০'৯০ ও ৩'৭৭ (অনুমিত) লক্ষ টন বক্সাইট আকরিক হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, কাশ্মীর ও জম্মু এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। তবে এদেশে এ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন অতি সামান্য। "ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম কোং" মাদ্রাজে এবং "এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া" আসানসোলে নিষ্কাশনের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। বিহারের মুরীতেও এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুতির একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন বক্সাইট আকরিক বিভিন্ন শিল্পকাযে ব্যবহৃত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে গুজরাটেব কায়বা ও জামনগর জেলায়, মহারাষ্ট্রের কোলাপুর অঞ্চলে, মহীশূরের বেলগাঁও অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক অঞ্চলে, এবং বিহাবেব রাঁচী ও পালামৌ জেলায় সঞ্চিত বক্সাইট আকরিকের বিস্তৃততর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে।

রাং (Tin)—[ব্যবহার—পৃঃ ২০৩ দেখ] বিহারের হাজাবীবাগ জেলায় বাং-এর খনি রহিয়াছে। ভাবতে অতি সামান্য পবিমাণ রাং উৎপাদিত হয়। মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর বাং এদেশে আমদানী করা হয়। বতমানে ভারতে বৎসবে প্রায় ৪৫৫০ টন রাং (ধাতু) নানাবিধ শিল্প কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

স্বর্ণ (Gold)—আগ্নেয় শিলাস্তরের মধ্যে মৌলিক অবস্থায় স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই শিলাস্তরকে চূর্ণ করিয়া স্বর্ণ বাহির করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে নদীবাহিত বালুকার সহিত স্বর্ণকণা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত হয়। তবে এই প্রকাবে সংগৃহীত স্বর্ণের পরিমাণ অতি সামান্য। অলংকার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্যই স্বর্ণ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ শিল্পে এবং ঔষধ প্রস্তুত করিতেও স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট স্বর্ণের প্রায় ২% ভারতে পাওয়া যায়। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি হইতে প্রায় ৯৯% স্বর্ণ পাওয়া যায়। কোলারেব চ্যাম্পিয়ান ও উরিগাম খনি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ফুট গভীর। মহীশূরের বেল্লারা ও ধারওয়ারে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায়, কাশ্মীরে, প্রাক্তন হায়দরাবাদের হুট্টি অঞ্চলে, অন্ধ্রের অনন্তপুর ও মাদ্রাজের সালেম জেলাতেও স্বর্ণের আকর পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং কাশ্মীরের স্বর্ণরেণুবাহী নদীর বালুকা ধৌত করিয়াও সামান্য পরিমাণ পাললিক স্বর্ণ উৎপাদিত হয়। স্বর্ণোৎপাদন ভারতে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২'৩৬ ও ২'১১ লক্ষ আউন্স। ভারত সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশ হইতে আমদানী করে।

রৌপ্য (Silver)—রৌপ্য প্রধানতঃ সীসক, স্বর্ণ ও তাম্র আকরিকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তবে অনেক সময় খনিতে মৌলিক অবস্থাতেও সামান্য পরিমাণ রৌপ্য পাওয়া যায়। ইহা অলঙ্কার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্য, তৈজসপত্র নির্মাণে, ঔষধ প্রস্তুত করিতে ও গিল্টি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতে অতি সামান্য পরিমাণ রৌপ্য, স্বর্ণ ও তাম্রের খনি হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে উৎপাদিত হয়। ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর রৌপ্য বিদেশ হইতে আমদানী করে।

দস্তা ও সীসক ভারতে (রাজস্থান) খুব সামান্যই পাওয়া যায়। ভারতে প্রায় ১·০৭ কোটি টন দস্তা-সীসক আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৬০ সালে ৩৬৭০ টন সীসক (ধাতু) ও ০·১ লক্ষ টন দস্তা (ধাতু) উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ০·৩ লক্ষ টন সীসক (ধাতু) ও ০·৬ লক্ষ টন দস্তা (ধাতু) বিভিন্ন শিল্প কাযে ব্যবহৃত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অন্ধ্র প্রদেশের কুডাপ্পা-কুর্নুল ও নেলোর জেলায়, বিহারের হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা ও মুঙ্গের জেলায়, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর ও বস্তার জেলায়, সিকিমের পাঞ্চেকানী অঞ্চলে, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া ও গাড়োয়াল জেলায়, রাজস্থানের উদয়পুর অঞ্চলে, জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি অঞ্চলে এবং মণিপুরে তাম্র, সীসক ও দস্তা আকরিকের ব্যাপকতর অনুসন্ধান কায চালাইয়া যাওয়া হইবে।

অভ্র (Mica)—[ব্যবহার—পৃঃ ১৮৬ দেখ] ভারত অভ্র উৎপাদনে বহুকাল যাবৎ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫% অভ্র ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫ ও ৪·১৯ লক্ষ হন্দর অভ্র উত্তোলিত হয়। উৎকৃষ্ট অভ্র ভারতে যত আছে তত আর কোথাও নাই। ভারতীয় অভ্র সাধারণতঃ নিম্নোক্ত স্থানসমূহে পাওয়া যায়। **বিহারের** অভ্রবলয় হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়া ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১৪ মাইল প্রশস্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া আছে। কোডার্মা বনাঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে এই বলয়ের উল্লেখযোগ্য খনিসমূহ অবস্থিত। বিহারের অভ্রবলয় সমগ্র ভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৮০% সরবরাহ করে। ভারতের অভ্রশিল্পে ২ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ১½ লক্ষ শ্রমিকই বিহারের অভ্রশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। বিহারের অভ্রের উৎকর্ষ এবং তৎস্থানের শিল্পে নিযুক্ত জনগণের দক্ষতা ভারতীয় অভ্রশিল্পকে জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। বিহারের অভ্র স্বচ্ছ; ইহা "চুণী অভ্র" নামে পরিচিত। ইহার মূল্যও অধিক। **অন্ধ্র** রাজ্যের নেলোর জেলায় ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রশস্ত একটি বিস্তৃত অভ্রবলয় রহিয়াছে। আট-

মাকুর, রায়পুর, গুড়ুর ও কাভালী অঞ্চলে খনিসমূহ অবস্থিত। নেলোরের অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নীলগিরি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ অভ্র পাওয়া যায়। বিহার ও অন্ধ্রের খনিসমূহ হইতে প্রায় ৭০% অভ্রের চাদর পাওয়া যায়। **মহীশূরের** হাসান জেলা, **কেরালার** ইরানিয়াল তালুক এবং **রাজস্থানের** আজমীঢ় ও জয়পুর অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

ভারতের বৈদ্যুতিক শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই বলিয়া অভ্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত অল্প। এই কারণে ভারতীয় অভ্রের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। যুক্তরাষ্ট্র (৪৫%), যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ফ্রান্স ভারতীয় অভ্রের প্রধান ক্রেতা। বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা (৮৫%), মাদ্রাজ (১৪%) ও বোম্বাই (১%) অভ্র রপ্তানী করে। ব্রাজিল হইতে সামান্য পরিমাণ অভ্রের চাপড়া পাত খোলাইবার জন্য এদেশে আসে। আন্তর্জাতিক অভ্রের বাজারে ব্রাজিল ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। "মাইকা এ্যাডভাইসারী কমিটি" (১৯৫০) এবং "মাইকা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল" (১৯৫৬) ভারতীয় অভ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ বিশেষ কাযধারার অনুমোদন করেন।

লবণ (Salt)—ভারতে উৎপাদিত লবণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) সামুদ্রিক লবণ, (২) ভৌম লবণ ও (৩) আকরিক লবণ। ভারতে মোট উৎপাদিত লবণের প্রায় ৬৬% বোম্বাই, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, পশ্চিম বঙ্গ, কচ্ছ উপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল এবং মালাবার উপকূল অঞ্চলের সমুদ্রজল বাষ্পীভূত করিয়া সংগৃহীত হয়। ভারতে উৎপাদিত লবণের প্রায় ২০% রাজস্থানের সম্বর হ্রদ, যোধপুর রাজ্যের ডিডোয়ানা ও ফলোদি হ্রদ এবং বিকানীর রাজ্যের লুনকরণসার হ্রদ হইতে পাওয়া যায়। ভারতে মোট লবণ উৎপাদনের প্রায় ১২% পাঞ্জাবের মণ্ডী রাজ্যের লবণ-খনি হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে ভারতে যথাক্রমে—৩ ও ২·৫২ কোটি টন লবণ প্রস্তুত হয়। খাদ্য হিসাবে এদেশে লবণের চাহিদা বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ টন।

য়্যাস্‌বেস্‌টস্ (Asbestos)—ইহা একপ্রকার তন্তুময় খনিজ পদার্থ। ইহার দ্বারা তাপ ও বিদ্যুৎ প্রতিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। অগ্নিরোধক বস্ত্র, পর্দা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে, বহুবিধ যন্ত্রে তাপের বিকিরণ রোধ করিবার জন্য আবরক হিসাবে এবং অন্যান্য বহুবিধ কাযে য়্যাসবেসটস্ ব্যবহৃত হয়।

মহীশূর (ব্যাঙ্গালোর), রাজস্থান (আজমীর-মারওয়ারা) ও অন্ধ্র (কুডাপ্পা) প্রদেশে সামান্য পরিমাণে য়্যাস্‌বেস্‌টস্ পাওয়া যায়। ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে ভারতে ১৩৯৭ ও ১৬৮৩ (অনুমিত) টন য়্যাস্‌বেস্‌টস্ আকরিত হয়। ভারত প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে প্রচুর য়্যাস্‌বেস্‌টস্ আমদানী করে। ভারতে সঞ্চিত য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌এর পরিমাণ ৫·৬ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ হাজার টন অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ বিভিন্ন শিল্প-কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

জিপ্‌সাম (Gypsum)—কাগজ শিল্পে, সিমেণ্ট ও সার নির্মাণে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রাজস্থান (বিকানীর, যোধপুর, জৈসলমীর), কাশ্মীর, মাদ্রাজ ও গুজরাট (কাঠিয়াবাড) প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ২·০৬, ৬·৯ ও ৯·৮২ (অনুমিত) লক্ষ টন জিপ্‌সাম আকরিত হয়। দ্বিতীয় **পরিকল্পনাকালীন** অনুসন্ধান কার্যের ফলে যোধপুর ও বিকানীরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে সঞ্চিত জিপসাম আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১১১·৭ কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভাবতে উৎপাদিত জিপ্‌সামের সমগ্র অংশই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া যায়।

সোরা (Saltpetre)—কাঁচ তৈয়ারী, খাদ্য সংরক্ষণ, বারুদ নির্মাণ ও জমিতে সার দিবার জন্য সোরা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। উত্তর প্রদেশে ও বিহারে প্রচুর সোরা পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের অতি সামান্য অংশই আসামের চা-বাগানে সার দিবার কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, মরিসাস ও চীনে রপ্তানী করা হয়।

হীরক (Diamond)—অন্ধ্র (অনন্তপুব, বেলারী, কৃষ্ণা, গুণ্টুর এবং গোদাবরী জেলা), উড়িষ্যা (সম্বলপুব জেলা), মধ্যপ্রদেশ (চান্দা জেলা, পান্না, চারখারী ও বুন্দেলখণ্ড) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের পান্না খনির ১২ মাইল দূরে মাজগাওয়ান অঞ্চলে একটি নূতন হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত সরকার এই খনিটি রুশ বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় চালাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছে। ১৯৫৫ সালে ভারতে ১৭৮৭ ক্যারাট হীরক উত্তোলিত হয়।

শক্তিসম্পদ
(Sources of Power)

ভারতে প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ হইতে শিল্পকার্যে ব্যবহৃত শক্তি উৎপাদন করা হয়। গৃহস্থালীর কার্যে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, গোময় এবং কাষ্ঠও জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা (Coal)—বর্তমান জগতে কয়লাই শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পদ। কয়লা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার পরিমাণ পৃথিবীর মাত্র ২%। ১৯৫১ সালে ভারতে ৩৪৪·৩ লক্ষ টন

কয়লা উত্তোলিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ভারতের খনিজ সম্পদগুলির মধ্যে কয়লাই শ্রেষ্ঠ।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ভারতের কয়লা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। (ক) ভারতের উপদ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র রাজ্যের খনিসমূহ হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহা **গণ্ডোয়ানা (Gondwana)** কয়লা এবং (খ) অন্যান্য স্থান হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহা **টার্শিয়ারী (Tertiary)** কয়লা। গণ্ডোয়ানা কয়লা টার্শিয়ারী কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।
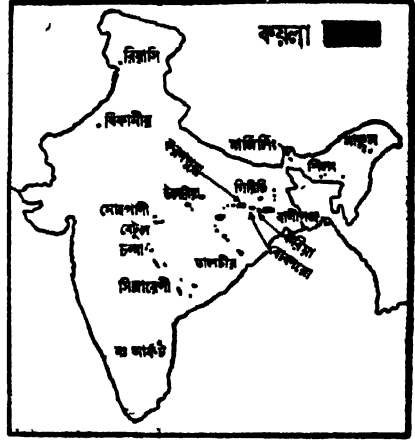
৫২ নং চিত্র—ভারতের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনিসমূহ

(ক) গণ্ডোয়ানা কয়লা খনিগুলির নিম্নোক্ত স্থানসমূহ হইতেই অধিকতর কয়লা উত্তোলন কার্য চলে।

পশ্চিমবঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ও আসানসোলের কয়লার খনিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। **রাণীগঞ্জের** কয়লার খনি প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চল হইতে ভারতের সমগ্র কয়লার প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ পাওয়া যায়। এই খনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথে কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। এই কয়লার খনিকে ভিত্তি করিয়াই কলিকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **বিহার**—কলিকাতা হইতে ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ১৭৫ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত **ঝরিয়া**র কয়লাখনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার প্রায় ৫০% এই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ঝরিয়ার কয়লার খনির পশ্চিমে অবস্থিত **বোকারো** খনি ২২০ বর্গ মাইল বিস্তৃত; **উত্তর করণপুরা** খনির আয়তন ৪৫০ বর্গমাইল। ইহা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পূর্ণ। **দক্ষিণ করণপুরা** খনি হইতেও কয়লা পাওয়া যায়। উত্তরের **গিরিডি** খনি হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায় এবং উহা লৌহ গালাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত পঃ বঙ্গ ও বিহারের উপরোক্ত কয়লার খনিসমূহ ঐ সমগ্র অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের সহায়তা করে। বিহারের শোণ-পালামৌ অববাহিকার অন্তর্গত ডালটনগঞ্জ, পালামৌ, হুটার, ঔরাঙ্গা, প্রভৃতি খনি হইতেও কয়লার উত্তোলন কার্য চলে।

(৩) **উড়িষ্যার** মহানদী অববাহিকার অন্তর্গত **তালচের, রামপুর** ও **হিমগির** খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ঐ অববাহিকা অঞ্চলের শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) **মধ্যপ্রদেশে** ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাতপুরা অঞ্চলে অবস্থিত **কানহান্** এবং **পেঞ্চ উপত্যকা** ও **মোহপানী**; এবং রেওয়া-ছত্রিশগড অববাহিকার অন্তর্গত **উমেরিয়া, সোহাগপুর, জোহিলা, সিংগ্রলী, ভাতপাণি, ঝিলিমিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষ্মণপুর, কররা,** ও **রায়গড়** খনিসমূহই প্রধান। রেলপথ দ্বারা অন্যান্য স্থানের সহিত উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত না হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের খনিসমূহ হইতে ভাল উত্তোলন কায চলে না। তবে অন্যান্য শক্তি সম্পদ না থাকায় সাতপুরা ও রেওয়া-ছত্রিশগড অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত শিল্পই এতদঞ্চলের কয়লা খনি-সমূহকে ভিত্তি কবিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) নবগঠিত **মহারাষ্ট্র** রাজ্যেব ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত **বল্লারপুর, ওয়ারোরা, উন, ভাণ্ডার, ঘুঘঘুষ, চান্দা, ওয়ামনপল্লী, সাহ্পুর** ও **ইয়োটমল** অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। ওয়ার্ধা অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এই সমস্ত কয়লার খনিকে ভিত্তি কবিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৬) **অন্ধ্রের সিঙ্গারেনী** ও **বেদ্দাদানল** খনিতে কয়লা পাওয়া যায়। এই খনিগুলির কয়লা সাধাবণতঃ নিম্নশ্রেণীর। দক্ষিণ ভাবতের রেলপথসমূহে এবং কলকারখানায় এই স্থানের কয়লা ব্যবহৃত হয়। এই রাজ্যের **তান্দুর** খনি হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়।

(খ) টার্শিয়ারী কয়লা **আসামের** নাজিরা ও মাকুম, **রাজস্থানের** বিকানীর, **জম্মু** ও **কাশ্মীর** এবং **পশ্চিমবঙ্গের** দার্জিলিং অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। ভারতে মোট উৎপাদিত কয়লার মাত্র ২% টার্শিয়ারী কয়লা; ইহার মধ্যে আবার অর্ধেকাংশই আসামের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। আসামের কয়লা আসাম রেলপথে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া যাতায়াতকারী স্টীমার-সমূহে অধিক ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন যে আসামের গারো পর্বতাঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর কয়লা প্রচুর সঞ্চিত রহিয়াছে। আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও নূতন নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইতেছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট অঞ্চলেও একটি অতি বিস্তৃত লিগনাইট কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** কার্যকালে দক্ষিণ আর্কটের লিগনাইট কয়লার সাহায্যে মাদ্রাজের নিভেলিতে একটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানাটির কায সম্পূর্ণ হইলে ঐ খনি হইতে উত্তোলিত বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন কয়লার সাহায্যে নিভেলি কারখানায় ২৫০ কিঃ ওঃ তাপ বিদ্যুৎ, বার্ষিক ৩·৮ লক্ষ টন গুঁড়া কয়লার ইট (briquettes), ৭০,০০০ টন ইউরিয়া ও সালফেট নাইট্রেট (সারের জন্য) উৎপাদিত হইবে।

১৯৬১ সালের শেষদিক হইতেই কারখানাটি উৎপাদন কার্য আরম্ভ করে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যসূচী সম্পূর্ণ করা হইবে, অতিরিক্ত ১৫০ কিঃ ওঃ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী করিয়া কারখানাটির সম্প্রসারণ করা হইবে, এবং লিগনাইট কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ৪৮ লক্ষ টনে দাঁড় করান হইবে।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, consumption and trade)—ভারতীয় কয়লাব খনিসমূহ সমগ্র ভারতে সমভাবে **বন্টিত** নহে। মোট উৎপাদনের প্রায় ৮২% পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালে উত্তোলিত ৩৬৭'৭ লক্ষ টন কয়লার মধ্যে আসামের খনিসমূহ হইতে ৫ লক্ষ টন, পঃ বঙ্গের খনিসমূহ হইতে [দার্জিলিং (০'৩ লক্ষ টন), রাণীগঞ্জ (১২২'২ লক্ষ টন)] ১২২'৫ লক্ষ টন, বিহারের খনিসমূহ হইতে [ঝরিয়া (১৩১'৯ লক্ষ টন), করণপুরা (১৪'৪ লক্ষ টন), বোকারো (২৩'৮ লক্ষ টন), গিরিডি (২'৬ লক্ষ টন) এবং অন্যান্য ছোট ছোট খনি (১'৪ লক্ষ টন)] ১৭৪'১ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশেব খনিসমূহ হইতে [ছিন্দোয়ারা ও চান্দা (২২ ৫ লক্ষ টন), বস্তি (০'৭ লক্ষ টন) এবং অন্যান্য খনিসমূহ (২৩'১ লক্ষ টন)] ৪৬'৩ লক্ষ টন, উডিষ্যাব খনিসমূহ হইতে ৫'২ লক্ষ টন, অন্ধ্রের খনি (সিঙ্গারেনী) হইতে ১৪'৩ লক্ষ টন ও রাজস্থানের বিকানীর খনি হইতে ০'৩ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে উত্তর ভারতে কয়লার সরববাহ অতি সামান্য এবং উহাও অতি নিকৃষ্টস্তরের। উত্তরপ্রদেশে কয়লা একেবারেই নাই। ভাবতের কয়লার খনিসমূহ সমুদ্রোপকূলে কিংবা জলপথেব সন্নিকটে অবস্থিত না থাকায় সুলভ পরিবহনেব সুযোগ নাই।

ভারতে **সঞ্চিত (Reserve)** কয়লার পরিমাণ সম্পর্কিত কোনরূপ সুষ্ঠু সমীক্ষা এতাবৎকাল পর্যন্ত হয় নাই। বৈদেশিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮৭০০ কোটি টন। আবার ভাবতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮০০০ কোটি টন। উহার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের ২০০০' নিম্ন পর্যন্ত ১' বেধযুক্ত স্তরে অবস্থিত গণ্ডোয়ানা কয়লার পরিমাণ ৬০০০ কোটি টন। ঐ একই নিম্নতায় ৪'এর অধিক বেধযুক্ত স্তরে অবস্থিত এবং ২৫% অপেক্ষা অল্প ছাই সমন্বিত কয়লার পরিমাণ ২০০০ কোটি টন বলিয়া ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কর্তৃক অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে ৫০০ কোটি টন অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং উহার মধ্যে আবার ২০০ কোটি টন কোক নির্মাণের উপযোগী কয়লা। বর্তমান হারে উত্তোলিত হইলে এই কয়লার দ্বারা ভারতের মাত্র দুইশত বৎসরকাল চলিতে পারে। ভারতে নিম্নশ্রেণীর কয়লার মধ্যে ৩০০ কোটি টন টার্শিয়ারী কয়লা ও ২০০ কোটি টন লিগনাইট ভূগর্ভে সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় কয়লাকে পাঁচ **শ্রেণীতে** **(Classification)** বিভক্ত করা যায় :—(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহারোপযোগী কয়লা—ইহা ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো ও গিরিডির খনি হইতে পাওয়া যায়। (২) উচ্চ শ্রেণীর স্টীম কয়লা—ইহা রাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা, তালচের ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন খনি হইতে পাওয়া যায়। (৩) টার্শিয়ারী কয়লা—ইহা আসাম, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। (৪) নিম্নশ্রেণীর স্টীম কয়লা ও (৫) লিগ্‌নাইট।

কয়লা অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় ইহার অপচয় জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সেইজন্য এদেশে কয়লার সদ্ব্যবহার ও **সংরক্ষণের (Conservation)** নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আশু কর্তব্য। (১) উন্নত প্রণালীতে কয়লার উত্তোলন, (২) কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (৩) কয়লা হইতে উপজাত দ্রব্যের উৎপাদন, (৪) গুঁড়া কয়লার দ্বারা ইট প্রস্তুতকরণ এবং জ্বালানি হিসাবে ইহাদের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, (৫) কয়লার ধৌতকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার বিমিশ্রণ, (৬) কয়লার পরিবর্তে অন্য শক্তিসম্পদের (বিশেষতঃ জলবিদ্যুতের) উৎপাদন ও ব্যবহার, এবং (৭) খনি হইতে কয়লা কাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ।

খনি হইতে কয়লা উত্তোলন কার্যে প্রায় ৩.৫ লক্ষ **শ্রমিক (labour)** নিযুক্ত রহিয়াছে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী। ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী বলিয়া ইহারা সারা বৎসর সমভাবে খনির কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, এই সমস্ত শ্রমিক খনি হইতে উত্তোলনকার্যেও দক্ষ নহে। এদেশের খনির কার্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণ কয়লাই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। আবার ভারতের ৮২৮টি কয়লার খনির মধ্যে ৬৫১টি এত ক্ষুদ্রায়তনের যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করাও অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় কয়লার মূল্য অধিক হইয়া পড়ে।

ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার ৩৩% রেলপথসমূহে, ১০% লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহে, ১০% বয়ন শিল্পাগারসমূহে, ৭% বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে, ৭% স্টীমারসমূহে রপ্তানীর কার্যে এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য নানাবিধ শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্যে **ব্যয়িত (uses)** হয়। ভারতীয় কয়লা হংকং, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, পাকিস্তান, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে **রপ্তানী** হয়। ১৯৫১ সালে ২৭.৩ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী করা হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কয়লা (Indian coal under Five

Year Plans)—ভারতীয় কয়লা শিল্পের গঠনমূলক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে **প্রথম পরিকল্পনার** কার্যকালে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়—(১) ১৯৫২ সালে "কয়লা-খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন" প্রণয়নের দ্বারা একটি "কোল বোর্ড" স্থাপন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত কয়লার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়; (২) সম্যক্ অনুসন্ধানের ফলে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো ও করণপুরা খনিগুলির সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ নির্দিষ্টরূপে জানা যায় এবং ঝিলিমিলি কয়লার খনি হইতে প্রচুর কোক কয়লা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়; (৩) বঙ্গ-বিহার অঞ্চলের খনিসমূহের অভ্যন্তরস্থ শূন্যস্থান পুরণ সম্পর্কে নানাবিধ বিষয় বিচার-বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়; (৪) "ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌ষ্টিটুশন" কর্তৃক ভারতীয় কয়লার সুষ্ঠু শ্রেণী বিভাগ সাধিত হয়; (৫) কয়লার অঙ্গারীকরণ, কোক উৎপাদন, মিশ্রণ, নির্গন্ধককরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণার কার্য ধানবাদের "ফুয়েল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিট্যুট্" কর্তৃক পরিচালিত হয়; (৬) নরম বা হাল্কা কোক কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলে; (৭) কয়লা ধৌত করণ কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক একটি "কোল ওয়াশারিজ কমিটি" নিযুক্ত হয়। এই কমিটি অনতিবিলম্বে একটি কয়লা ধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন এবং (৮) যে সমস্ত শিল্পে কোক কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য নহে সে সমস্ত শিল্পে কোক কয়লার পরিবর্তে অন্য শ্রেণীর কয়লা ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ১৯৫৫ সালে কয়লার উত্তোলন ও রপ্তানী দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮২·২ ও ৩১·৫৭৪ লক্ষ টন।

পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন যে **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** (১৯৫৫-৫৬/১৯৬০-৬১) শেষ বর্ষে, ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ কয়লার চাহিদা দাঁড়াইবে বার্ষিক ৬০০ লক্ষ টন—১৯৫৫ সালের উৎপাদন অপেক্ষা প্রায় ২২০ লক্ষ টন অধিক। এই অতিরিক্ত ২২০ লক্ষ টন উৎপাদনের মধ্যে ১২০ লক্ষ টন আসিবে সরকারী খনিসমূহ [বর্তমান সরকারী খনিসমূহ হইতে (প্রধানতঃ বোকারো ৫ লক্ষ টন ও সিঙ্গারেনী ১৫ লক্ষ টন) ২০ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশের নূতন কয়লার খনি করবা হইতে ৪০ লক্ষ টন এবং অন্যান্য খনি হইতে ৬০ লক্ষ টন] হইতে এবং ১০০ টন বেসরকারী খনিসমূহ হইতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল হইতেই সরকারী খনিসমূহ "ন্যাশনাল কোল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন" নামক একটি নবগঠিত কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। এইরূপ অনুমিত হয় যে ১৯৫৪ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ রাণীগঞ্জ খনির উত্তোলন বৃদ্ধি পাইবে ৫৯·৪ লক্ষ টন, করণপুরার ৪৫·৬ লক্ষ টন, বোকারোর ৫ লক্ষ টন, করবার ৪০ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য খনিসমূহের ৩০ লক্ষ টন

ও সিঙ্গারেনীর ১৫'০ লক্ষ টন—এই মোট ২৩০ লক্ষ টন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে ১৯৬০-৬১ সালের প্রকৃত উৎপাদন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তাগ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ১৯৬০-৬১ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের তাগ ও প্রকৃত উৎপাদন বুঝা যাইবে।

খনি প্রতি উৎপাদন ১৯৬০-৬১

(লক্ষ টন)

খনি		দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত তাগ	প্রকৃত উৎপাদন
আসাম	...	৫ ০	৬'৮
দার্জিলিং	...	০'৩	০'৪
রাণীগঞ্জ	...	১৮১'৬	১৮০'৮
ঝরিয়া	...	১৬৬'৯	১৬০'৯
করণপুরা	...	৬০'০	৪৪'৮
বোকারো	...	২৮'৮	৩৭'৫
গিরিডি	...	২'৬	৪'৬
বিহারের অন্যান্য ছোট ছোট খনি		১'৪	১'৫
ছিন্দোয়ারা ও চান্দা	...	২২'৫	৩০'৬
করবা	...	৪০'০	৫'৭
মধ্যভারতের খনিসমূহ	...	৫৩'১	৩৬'৭
সন্তি	...	০'৭	১'৪
উড়িষ্যা	...	৫'২	৮'৮
সিঙ্গারেনী	...	২৯'৩	২৫'২
বিকানীব	...	০'৩	০'৫
মোট	...	৫৯৭'৭	৫৪৬'২

(২) শ্রমিকদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কাযে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য এই পরিকল্পনার কার্য-কালে ৪টি (কারগলি, গিরিডি, তালচের ও কুরাশিয়া) ও পরে আরও কয়েকটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। (৩) উন্নত ধরণের পরিবহন ও বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে কয়লা বণ্টনের সুব্যবস্থা করা হয়।

(৪) কোক কয়লার সংরক্ষণ কল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুসৃত হয়:—(ক) কয়লা সংরক্ষণ মূলক কার্যসূচীকে "কয়লা খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)" আইনের অঙ্গীভূত করা হয়; (খ) কোক কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়; (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার ধৌতকরণ প্রথার সাহায্যে ধাতুশিল্পে ইহাদের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬৪ লক্ষ টন কয়লা ধৌত-

করণ ক্ষমতাযুক্ত চারিটি কেন্দ্রীয় ধৌতকরণ কারখানা এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সংলগ্ন আরও একটি ধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে দুর্গাপুরের কারখানা (বার্ষিক উৎপাদনের ক্ষমতা ৮ লক্ষ টন) এবং কারগলির ধৌতকরণ কারখানা (বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ টন) দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালের স্থাপিত হইয়াছে। অপর তিনটি কারখানা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমার্ধেই স্থাপিত হইবে, (ঘ) উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর কয়লার মিশ্রণের দ্বারা ইহাদিগকে ধাতুশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। (ঙ) ধাতুশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পকার্যে কোক কয়লার পরিবর্তে অন্যান্য শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে; এবং (চ) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত কয়লার খনিকে সরকারী অর্থানুকূল্য দেওয়া হয়। (৫) অধিকতর উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৭টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা-খনির সংযোজন সাধন করা হয়। (৬) ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ও ব্যুরো অব মাইন্‌স্ কর্তৃক এই পরিকল্পনা কালে করবা, উঃ ও দঃ করণপুরা, রাণীগঞ্জ চিরিমিরি, রামগড়, ঝিলিমিলি, কোটা, সিংগ্রলী, উমেরিয়া, সোহাগপুর, কান্‌হান্, পেঞ্চ উপত্যকা, সিঙ্গারেনী, তালচের, গোদাবরী অববাহিকা ও আসামের কয়লাখনি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লাশিল্পের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—(১) পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬০।৬১-১৯৬৫।৬৬) শেষ বর্ষে, ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ কয়লার চাহিদা দাঁড়াইবে বার্ষিক ৯৭০ লক্ষ টন—১৯৬০।৬১ সালের নির্ধারিত তাগ ৬০০ লক্ষ টন অপেক্ষা ৩৭০ লক্ষ টন অধিক। এই অতিরিক্ত ৩৭০ লক্ষ টন উৎপাদনের মধ্যে ২০০ লক্ষ টন আসিবে সরকারী খনিসমূহ হইতে [সিঙ্গারেনী ৩০ লক্ষ টন, দক্ষিণ বালাণ্ডা ১০ লক্ষ টন, বিশ্রামপুর ২৫ লক্ষ টন, উত্তর বালাণ্ডা ১০ লক্ষ টন, জারাংদি ২ লক্ষ টন, কাঠারা (অতিরিক্ত) ৫ লক্ষ টন, কার্গলি-বোকারো (অতিরিক্ত) ৫ লক্ষ টন, সাবাং ৩ লক্ষ টন, সিংগ্রলী ২৫ লক্ষ টন, কাম্পটি ১৫ লক্ষ টন, পেঞ্চ-কান্‌হান্ ১০ লক্ষ টন, চার্চা-ঝিলিমিলি ১০ লক্ষ টন, পশ্চিম বোকারো ৫ লক্ষ টন, রামগড় ১৫ লক্ষ টন, করবা ১৫ লক্ষ টন, রাণীগঞ্জ ১০ লক্ষ টন, দিশেরগড় ৫ লক্ষ টন এবং ঝরিয়া ১৫ লক্ষ টন]* এবং অবশিষ্ট ১৭০ লক্ষ টন আসিবে বেসরকারী খনিসমূহ হইতে [প্রধানতঃ ঝরিয়া ক্ষেত্র হইতে কোক তৈয়ারীর কয়লা ৪৮·৭ লক্ষ টন, রাণীগঞ্জ ক্ষেত্র হইতে মিশ্রণোপযোগী কয়লা ১১·২ লক্ষ টন এবং রাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা ও মধ্যপ্রদেশের

* সিঙ্গারেনী খনি ব্যতীত অন্যান্য খনিগুলি "ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন" কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। সিঙ্গারেনী খনি এবং "ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন" কর্তৃক পরিচালিত এই খনিসমূহ হইতে মোট উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ ২১৫ লক্ষ টন আশা করা গেলেও উৎপাদনের তাগ ২০০ লক্ষ টনে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে কোক ব্যতীত অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর কয়লা ১০৮'৪ লক্ষ টন]। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী অংশের বিভিন্ন খনি হইতে উত্তোলিত অতিরিক্ত কয়লার পরিমাণ বুঝা যাইবে।

১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী অংশের বিভিন্ন খনি হইতে উত্তোলিত অতিরিক্ত কয়লার অনুমিত উৎপাদন (লক্ষ টন)

খনিসমূহ	কোক তৈয়ারীর কয়লা	মিশ্রণোপযোগী কয়লা	কোক তৈয়ারী ব্যতীত অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত কয়লা	মোট
বঙ্গদেশ-বিহার				
রাণীগঞ্জ	৩'৫	১৬'২	৮৬'৬	১০৬'৩
ঝরিয়া	৫৮'৪			৫৮'৪
বোকারো	১৬'৮		৩'৩	২০'১
পশ্চিম বোকারো	৫'০			৫'০
রামগড়	১৫'০			১৫'০
করণপুরা			৪'২	৪'২
মধ্যপ্রদেশ				
পেঞ্চ-কানহান			৩৪'৩	৩৪'৩
বিশ্রামপুর			২৫'০	২৫'০
চার্চা-ঝিলিমিলি		৫'০	৫'০	১০'০
সিংগ্রলী			২৫'০	২৫'০
করবা			১৫'০	১৫'০
মহারাষ্ট্র : কাম্পটি			১৫'০	১৫'০
উড়িষ্যা : তালচের			২০'০	২০'০
অন্ধ্রপ্রদেশ : সিঙ্গারেনী			৩০'০	৩০'০
মোট	৯৮'৭	২১'২	২৬৩'৪	৩৮৩'০

(২) খনি হইতে কয়লা কাটা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বালিদ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। দামোদর ও অজয় নদের অববাহিকা অঞ্চল হইতে বালি সংগ্রহ করিয়া খনি অঞ্চল সমূহে রজ্জুপথে দ্রুত সরবরাহের নিমিত্ত "কোল বোর্ড" ঝরিয়া খনি অঞ্চলে ৪টি এবং রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলে ৩টি—এই মোট ৭টি রজ্জুপথ স্থাপন করিবে। (৩) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কার্যে খনির শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। (৪) উন্নত ধরণের পরিবহন ও বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে কয়লা বণ্টনের সুব্যবস্থা করা হইবে। (৫) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাত শিল্পের যে সম্প্রসারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে

তাহাতে বার্ষিক ১২৭ লক্ষ টন কয়লার ধৌতকরণ প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কয়লা ধৌতকরণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত ধৌতকরণ কারখানা সমূহের সম্প্রসারণ, প্রস্তাবিত কারখানা সমূহের দ্রুত রূপায়ণ এবং নূতন কয়েকটি ধৌতকরণ কারখানা স্থাপনেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দুগ্‌দা ও ভোজুদি অঞ্চলে স্থাপিত কারখানা দুইটির মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২ লক্ষ টন হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কাঠারা অঞ্চলে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টন কয়লা ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত দুইটি কারখানা (ইহারা কাঠারা, জারাংদি, সাবাং ও কারগলি খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে), করণপুরা অঞ্চলে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত দুইটি কারখানা (ইহারা আরগাডা ও সিরকা খনি অঞ্চল হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে) এবং মধ্য ঝরিয়া অঞ্চলে ৩০ লক্ষ টন ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত একটি কারখানা (ঝরিয়া খনি অঞ্চলে উন্মুক্ত নূতন কয়েকটি খনি হইতে ইহারা কয়লা সংগ্রহ করিবে) স্থাপিত হইবে। ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত কোক কয়লার ধৌতকরণ ব্যতীতও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য শ্রেণীর কয়লার ধৌতকরণের গুরুত্ব এবং এতদুদ্দেশ্যে ধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।

খনিজ তৈল (Petroleum)—খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারতের স্থান আশানুরূপ নহে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত এক প্রকার ভঙ্গিল শিলাস্তর হইতে এই খনিজ তৈল পাওয়া যায়। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তের তৈলক্ষেত্র আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে লখিমপুর জেলার ডিগবয়ে ২½ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বর্তমান। ইহাই ভারতের সর্বপ্রধান তৈলখনি। এই তৈল ডিগবয়ের পরিশোধনাগারে পরিশোধিত হয়। আসামের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কাছাড় জেলার বদরপুরে নিঃশেষিতপ্রায় একটি তৈলখনি রহিয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসামের তৈল-খনিসমূহ রেলপথ দ্বারা কলিকাতার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পঃ বঙ্গের উপকূলাঞ্চলে, কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, পাঞ্জাব ও কাংড়া উপত্যকায় (জ্বালামুখী) তৈল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান হইতে খনিজ তৈল পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, consumption and trade)—১৯৫০ সালে ভারতে খনিজ তৈলের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন দাঁড়ায় মাত্র ৬৬০ লক্ষ গ্যালন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল এদেশে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, বোর্নিও, ব্রহ্মদেশ এবং রুশিয়া

হইতে আমদানী হইয়া আসে। সম্প্রতি বোম্বাই-এর অনতিদূরে ট্রম্বে অঞ্চলে 'বার্মা-শেল' কর্তৃক একটি এবং 'স্ট্যানভ্যাক' কর্তৃক একটি তৈল পরিশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। 'ক্যালটেক্স কোং' কর্তৃক বিশাখাপত্তনমে একটি তৈল শোধনাগারের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। **প্রথম পরিকল্পনার** কার্যকালে ভারত সরকার কর্তৃক স্ট্যানভ্যাক কোম্পানীর সহায়তায় পঃ বঙ্গ, ক্যাম্বের উপকূলাঞ্চল এবং রাজস্থানের জৈসলমীরে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্য চালান হয় এবং "ন্যাচারাল রিসোর্স এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ" দপ্তরের অধীন "অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস ডিভিশন" নামক একটি বিভাগ খোলা হয় এবং পরবর্তীকালে এই বিভাগটি "অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন" নামক একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** কার্যকালে জৈসলমীর, ক্যাম্বে ও জ্বালামুখী অঞ্চলে খনিজ তৈলের অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়। 'স্ট্যানভ্যাক' কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিম বঙ্গে এবং 'আসাম অয়েল কোম্পানী'র সহায়তায় আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে তৈল অনুসন্ধান কার্য চালান হয়। পশ্চিমবঙ্গে তৈল বা গ্যাস কিছুই না থাকাতে পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধান কার্য পরিত্যক্ত হয়। অনুসন্ধান কার্যের ফলে আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায় এবং এইরূপ অনুমিত হয় যে এই অঞ্চল হইতে বার্ষিক ২৭·৫ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যাইবে। এতদঞ্চলের তৈলখনি হইতে তৈল উত্তোলনের জন্য সম্প্রতি "অয়েল ইণ্ডিয়া" নামক একটি নূতন সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে (এই সংস্থাটিতে ভারত-সরকারের অংশ অর্ধেক এবং বার্মা অয়েল কোম্পানীর অংশ অর্ধেক)। এতদঞ্চল হইতে উত্তোলিত তৈল সরকারী অংশে স্থাপিত গৌহাটির নুনমাটি (বার্ষিক পরিস্রাবণ ক্ষমতা ৭·৫ লক্ষ টন) এবং বিহারের বারাউনি (বার্ষিক পরিস্রাবণ ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন) এই দুইটি নূতন তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে নলপথে প্রেরিত হইবে। নাহারকাটিয়া অঞ্চলে তৈল ব্যতীতও যে স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাইবে তাহা বিদ্যুৎ ও কৃত্রিম সার উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইবে। ক্যাম্বে উপসাগর সন্নিহিত অঞ্চলে ও অ্যাংক্লেশ্বরে অনুসন্ধানের ফলে সঞ্চিত তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত দুইটি তৈলকূপেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই কূপ দুইটি "অয়েল ইণ্ডিয়া" সংস্থাটি ইজারা লইয়াছেন। পাঞ্জাবে অনুসন্ধান কার্য চালান সত্ত্বেও এতাবৎকাল পর্যন্ত তৈল পাওয়া যায় নাই, তথাপি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে খনিজ তৈল শিল্পের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) "অয়েল ইণ্ডিয়া" সংস্থাটি কর্তৃক আসামের ইজারা বলে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ হইতে খনিজ তৈলের অধিকতর

উত্তোলন কার্য চালান হইবে। (২) "অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন" কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে তৈলের অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাওয়া হইবে এবং গুজরাটের ক্যাম্বে-অ্যাংক্লেশ্বর ও আসামের শিবসাগর অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈল উত্তোলনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। "অয়েল ইণ্ডিয়া" প্রতিষ্ঠানটি নাহারকাটিয়া, মোরান ও হুগরিজান অঞ্চলে এবং উহার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রায় ১৮৮৬ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে খনিজ তৈল সংক্রান্ত নানাবিধ অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্য চালাইয়া যাইবে। (৩) এই পরিকল্পনাকালে বারাউনি ও গৌহাটির তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্র দুইটির নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইবে এবং ২০ লক্ষ টন পরিস্রুত তৈল উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত একটি নূতন পরিস্রাবণ কেন্দ্র গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। (৪) তৈলজাত দ্রব্যাদির পরিবহনের উদ্দেশ্যে বারাউনি পরিস্রাবণ কেন্দ্র হইতে উহার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ভোগ কেন্দ্রে এবং কলিকাতায় তৈল প্রেরণের উদ্দেশ্যে নলপথের স্থাপন করা হইবে। (৫) ১৯৫৯ সালে স্থাপিত "দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী" নামক সরকারী সংস্থাটি ইতঃপূর্বেই "ইউ. এস. এস. আর এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন" নামক সংস্থাটির সহিত ১৯ লক্ষ টন পরিমিত কেরোসিন তৈল, ডিজেল তৈল, প্রভৃতি সামগ্রী আমদানীর জন্য একটি চারি বৎসরের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। রুমেনিয়ার সহিত অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনের পরিকল্পনাও রহিয়াছে। এই পরিকল্পনাকালে "দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী" বারাউনি, গৌহাটি ও ক্যাম্বে অঞ্চলের সরকারী পরিস্রাবণ কেন্দ্রগুলি হইতে উৎপাদিত খনিজ তৈলজাত সামগ্রীসমূহ বণ্টনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতে প্রচুর বিটুমিনাস ও লিগনাইট জাতীয় কয়লা রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর ন্যায় ভারতেও এই কয়লা হইতে বিশ্লেষিত তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আবার ভারতের চিনির কলগুলি প্রতিবৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ মণ গুড় ফেলিয়া দেয়। এই গুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিলে পেট্রোলের সহিত অবাধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯৫০ সালে শক্তি সুরাসারের উৎপাদন ছিল ৪৫ লক্ষ গ্যালন, ১৯৫৫ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৪ লক্ষ গ্যালন। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ শক্তিসুরাসার উৎপাদক কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইলে ভারতে পেট্রোল আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জলবিদ্যুৎ (Water Power)—ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ, শ্রম-শিল্পের অধিকতর প্রসার, গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পে প্রাণ সঞ্চার এবং শ্রম-শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ

প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, নদীর খরপ্রবাহ, নিয়মিত ও অবিরাম জলস্রোত—এই সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং কয়লা ও খনিজতৈলের অপ্রতুলতা, জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, যানবাহনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের **সহায়ক** (পৃঃ ২২৭ দেখ)। ইহাদের প্রথমোক্ত দুইটি প্রাকৃতিক অবস্থাই ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল, কিন্তু ঋতু-ভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনিশ্চয়তা হেতু ভারতীয় নদীসমূহের জলপ্রবাহ অবিরাম ও সুনিয়ন্ত্রিত নহে। সুতরাং অনাবৃষ্টিকালে ও গ্রীষ্মকালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করিয়া জল সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জলবিদ্যুতের উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা **দক্ষিণ ভারতেই** অধিক। দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত রহিয়াছে। পঃ ঘাট পর্বত অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাতও দাক্ষিণাত্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। আবার ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কয়লার খনিসমূহ অনেক দূরে অবস্থিত অথচ সমগ্র দক্ষিন ভারতে শিল্প সংগঠন দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদাও রহিয়াছে ব্যাপক। এই সমস্ত কারণে দাক্ষিণাত্যের অনেক শিল্পই সম্পূর্ণরূপে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। মাদ্রাজে জলবিদ্যুৎ ও কয়লাজাত বিদ্যুৎ একই কেন্দ্র হইতে সরবরাহ হয়। মাদ্রাজের দক্ষিণের পর্বতাঞ্চল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

উত্তর ভারতের নদীসমূহ হিমালয়ের হিমবাহ হইতে উদ্ভূত। প্রত্যেকটি নদী নিত্যবহ, প্রত্যেকটির ঢাল সুস্পষ্ট, কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ অতি সামান্য। কারণ উত্তর ভারতের প্রকাণ্ড সমভূমিতে কৃত্রিম জলাশয় ও জলপ্রপাত সৃষ্টি করা দুষ্কর ও ব্যয়সাধ্য। স্বাভাবিক জলপ্রপাতযুক্ত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তাঘাট অতিশয় দুর্গম, নদনদীর স্রোতবেগও ভীষণ, এবং সেখানকার জলশক্তিকে বাঁধিয়া ফেলা নানাবিধ সমস্যাযুক্ত। আবার উত্তর ভারতের যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের বড় বড় কেন্দ্রগুলি উত্তর ভারতের কয়লা ও তৈল ক্ষেত্র হইতেই প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদের সরবরাহ পাইয়া থাকে। তবে কয়লাসম্পদ রহিত উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে জলবিদ্যুতের উৎপাদন একটু বেশী। হিমাচল প্রদেশ হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিমালয় অঞ্চলটিই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—দক্ষিণ ভারতের **মহারাষ্ট্র** রাজ্যের পশ্চিম ঘাট পর্বতাঞ্চলে তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে: (ক) "দি টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং" (১৯১৫) **লোনাভলার** নিকট তিনটি হ্রদে (লোনাভলা, ওয়াল-ওয়ান, এবং

সিরাওয়াটা) মৌসুমী বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখিয়া খোপোলির বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানায় প্রেরণ করে। (খ) "দি **অন্ধ্র ভ্যালী** পাওয়ার সাপ্লাই কোং" (১৯২২) অন্ধ্রনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া একটি কৃত্রিম জলাশয়ে জল সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই জল বিভপুরীর বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে চালান দেওয়া হয়। (গ) "দি টাটা পাওয়ার কোং" (১৯২৭) **নিলামুলা** নদীর জলস্রোত দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভীরা নামক স্থানে প্রকাণ্ড জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনটি কোম্পানী একত্রীভূত হইয়া-"টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক এজেন্সী" নামে অভিহিত হয়। এই তিনটি কেন্দ্রে মোট ২,৪৪,০০০ কি: ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ট্রাম কোং, সুবার্বান রেলপথের শাখাসমূহ এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে **চোলা** (কল্যাণ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি (৫৪,০০০ কি: ওঃ) সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে।

মহীশূরের "শিবসমুদ্রম্ ওয়ার্কস্" (১৯০২) ভারতের উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রম্ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করিয়া ৯২ মাইল দূরবর্তী কোলার স্বর্ণখনি পর্যন্ত লওয়া হয় এবং ৬০ মাইল দূরবর্তী ব্যাঙ্গালোর শহরেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। শিবসমুদ্রম্ বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে ৪২,০০০ কি: ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বর্তমানে মহীশূরের অন্যান্য শহরে এবং এই রাজ্যের দক্ষিণ-পুর্বার্ধের আরও প্রায় ২০০টি শহর এবং গ্রামাঞ্চলে শিবসমুদ্রম্ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে অধিকতর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য **সীমসা** (১৭,২০০ কি: ওঃ) ও **যোগপ্রপাত** অঞ্চলে (৪৮,০০০ কি: ওঃ) আরও দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে এই তিনটি কেন্দ্র পরস্পর সংযুক্ত। রেশম শিল্পে, স্বর্ণখনিতে ও রাজ্যের অপরাপর শিল্পে এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে যোগ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনাটির উৎপাদনক্ষমতা ৭২,০০০ কি: ওঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনাটির নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে "দি মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো-ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্"। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ বর্তমানে মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যেও সরবরাহ করা হইতেছে।

মাদ্রাজে তিনটি প্রধান জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে।—(ক) এই প্রদেশের নীলগিরি জেলার অন্তর্গত পাইকারা নদীর গতিপথের অন্তর্বর্তী একটি জলপ্রপাত হইতে "দি **পাইকারা** (৩৮,৭৫০ কি: ওঃ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" নামক একটি পরিকল্পনা ১৯৩২ সালে সমাপ্ত হয়। এই স্থান হইতে বিদ্যুৎশক্তি কোয়েম্বাটোর, ইরোদ, ত্রিচিনাপল্লী, নেগাপত্তম ও বিরুধ নগরে

নীত হয়। সাধারণতঃ বয়নশিল্প কারখানায় এবং গৃহ আলোকিত করিবার জন্য এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। (খ) "দি **মেত্তুর** (৪০,০০০ কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" (১৯৩৭) নামক পরিকল্পনাটি মেত্তুর বাঁধের জল হইতেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া সালেম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, আর্কট, চিতুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ করে। (গ) তাম্রপর্ণী নদীর গতিপথের অন্তর্বর্তী একটি জলপ্রপাত হইতে "দি **পাপনাশম্** (২৩,০০০ কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" পরিকল্পনাটি তিনেভেলী, কয়লাপটি, মাতুরা, তেনকাশী ও রাজপালম প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই তিনটি পরিকল্পনার উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে কোয়েম্বাটোর, মেত্তুর এবং অগস্ত্য মন্দিরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে পাইকারা নদীর জলের সাহায্যে পরিচালিত **ময়ার** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি (৩৬,০০০ কিঃ ওঃ) এবং মাদ্রাজ শহরের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির সম্প্রসারণ (৩০,০০০ কিঃ ওঃ) সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে। মাদ্রাজ রাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিই বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত।

৫৩ নং চিত্র—ভারতের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

কেরালা রাজ্যের **'পল্লীভাসাল** হাইড্রো-ইলেকট্রিক সিস্টেম' মুদিরাপুঝা নদীর জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন (৩৬,০০০ কিঃ ওঃ) করে, উহা দ্বারা এই রাজ্যের "এ্যালুমিনিয়াম প্রোডাকশন কোম্পানী'র এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়া থাকে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে **সেঙ্গুলাম** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি (৪৮,০০০ কিঃ ওঃ) সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে। কেরালার সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত। মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও আবার বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া "চক্র প্রথায়" (grid system) বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

উত্তর ভারতের কাশ্মীরে শ্রীনগর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত **বরামুলার "ঝেলাম** পাওয়ার ইনস্টলেশান" শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কাশ্মীরে আরও দুইটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা

রহিয়াছে—"দি **মুজাফফরাবাদ** হাইড্রো-ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশান" (কিষেণগঙ্গার একটি শাখা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে) এবং '**জম্মু** হাইড্রো-ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশান"। জম্মু এবং কাশ্মীরের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সরবরাহ কেন্দ্রের পরিকল্পনা চলিতেছে।

পাঞ্জাব রাজ্যের সিমলা পর্বতাঞ্চলের অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগরের নিকটবর্তী উল নদীর স্রোত হইতে "দি **উল রিভার** হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" (১৯৩৩) অথবা **মণ্ডি** পরিকল্পনা (৬৮,০০০ কি: ও:) হিমালয়ের পাদদেশস্থ পাঞ্জাবের বহু শহরে আলোক এবং অন্যান্য নানাবিধ গৃহস্থালী কার্যের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, ধারিওয়াল প্রভৃতি স্থানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং রেলপথে এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে **নাঙ্গাল** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি (৪৮,০০০ কি: ও:) অংশতঃ সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশের "দি **গ্যাঞ্জেস্‌ ক্যানাল** হাইড্রো-ইলেকট্রিক গ্রীড্' (১৯২৬) হইতে এই রাজ্যের প্রায় ১৪টি জেলায় এবং দিল্লীর সাহাদারা অঞ্চলে বহুবিধ গৃহস্থালীর কার্যে, শিল্পে এবং কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ (১৯,০০০ কি: ও:) সরবরাহ করা হয়। গঙ্গার খালের ১১টি জলপ্রপাতের মধ্যে ৪টি জল-প্রপাত হইতে এই শক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। বাহাদুরাবাদ, মহম্মদপুর, চিতোরা, শালাওয়া, ভোলা, পালরা এবং সুমেরায় এই শক্তিকেন্দ্রসমূহ অবস্থিত। কিন্তু প্রধান শক্তিকেন্দ্র কেবলমাত্র বাহাদুরাবাদে। প্রথম পরি-কল্পনার কার্যকালে হরিদ্বারের নিকট **পাথরী** (২০,৪০০ কি: ও:) **সার্দা** (৪১,৪০০ কি: ও:) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে অন্ধ্র ও উড়িষ্যার **মাচকুন্দ** (৩৪,০০০ কি: ও:) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে।

নেপাল, আসাম এবং দার্জিলিং-এ স্থানীয় প্রয়োজনমত জলবিদ্যুৎ উৎ-পাদিত হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের নানাস্থানে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও বহু কারখানা রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে ভারত মোট ৪ কোটি কি: ও: জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সমর্থ।* ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ০·৫৬, ০·৯৪ ও ১·৯৩ (অনুমিত) মি: কি: ও: এবং ২৫১·৯৩, ৩৭৪·২২ ও ৭৫৮ (অনুমিত) কোটি কি: ও: ঘণ্টা।

* দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম প্রবাহিণী নদীসমূহ হইতে [illegible] লক্ষ কি: ও:, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব প্রবাহিণী নদীসমূহ হইতে ৮০ লক্ষ কি: ও:, মধ্যভারতের নদীসমূহ হইতে ৪১ লক্ষ কি: ও:, গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল হইতে ৪৬ লক্ষ কি: ও:, ব্রহ্মপুত্র, মণিপুর ও ভিয়াও অঞ্চল হইতে ১২৫ লক্ষ কি: ও: ও সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চল হইতে ৬৬ লক্ষ কি: ও:—এই মোট ৪ কোটি কি: ও:।

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা (Multipurpose river projects)—ভারতের জলপ্রবাহের ৬% সেচকার্যে এবং মাত্র ১.৫% বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কেবলমাত্র সেচকার্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই নহে, পরন্তু বন্যা নিবারণ, নৌ-চলাচল, মৎস্য-চাষ, জলসেচ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, জমির ক্ষয় নিবারণ, বন উৎপাদন, পরিস্রুত জলের সরবরাহ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে জলপ্রবাহের ব্যবহার করা হউক। যে সমস্ত পরিকল্পনার দ্বারা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জলপ্রবাহকে এই প্রকার নানাবিধ কার্যে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে জলপ্রবাহ ব্যবহারের **বহুমুখী পরিকল্পনা** বলে। ভারতীয় সরকার টি. ভি. এ. (টেনেসি ভ্যালী অথরিটি) পরিকল্পনাটির অনুকরণে ভারতের কয়েকটি নদী-প্রবাহ বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতকে শতদ্রু, মধ্যগঙ্গা, পুর্বগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হুগলী, সুবর্ণরেখা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তী, নর্মদা ও চম্বল এই কয়টি নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলে এক বা একাধিক "বহুমুখী পরিকল্পনা"র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদনুসারে ভারতে ১৫৩টি নদী পরিকল্পনার কার্য গৃহীত হয়; উহাদের মধ্যে ৬টি বহুমুখী, ১০৪টি সেচ ও ৪৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বিবৃত হইল।

(১) **দামোদর পরিকল্পনা (Damodar Project)**—৩৩৬ মাইল দীর্ঘ দামোদর নদ ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া বিহারের মধ্যে ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দামোদর অববাহিকার উত্তরাংশে বিহারের হাজারীবাগ, পালামৌ, রাঁচি, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণা অবস্থিত। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত প্রায় ৪৭"। অধিকাংশ বৃষ্টি গ্রীষ্মকালে পতিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতগাত্র বাহিয়া প্রচণ্ড জলস্রোত নিম্নভূমিতে পতিত হয় এবং অববাহিকার দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে।

দামোদর ও ইহার বিভিন্ন উপনদের উচ্চ উপত্যকায় ৮টি বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ কার্যাদির ব্যবস্থা "দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন" (১৯৪৮) নামক প্রতিষ্ঠানটির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই বাঁধগুলি বিহার প্রদেশে নির্মিত হইবে এবং ইহাদের মধ্যে বরাকর নদের উপর তিলাইয়া, বলপাহাড়ী ও মাইথনে; দামোদর নদের উপর বারমো, আয়ার ও পাঞ্চেৎ পাহাড় অঞ্চলে, এবং কোনার ও বোকারোতে একটি করিয়া বাঁধ দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে পাঞ্চেৎ, কোনার, তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ ও তৎসংলগ্ন (কেবলমাত্র কোনার ব্যতীত)

বিদ্যুৎকেন্দ্র (মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১'০৪ লক্ষ কিঃ ওঃ), বোকারোয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) ও দুর্গাপুরের জলাধার এবং তৎসংলগ্ন সেচ ও নাব্য খালের কার্য সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম পর্যায়ের কার্য ফলপ্রসূ হইলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য গ্রহণ করা হইবে। এই পর্যায়ে আয়ার, বলপাহাড়ী, বোকারো ও বার্মো অঞ্চলে বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। বোকারো তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২'২৫ লক্ষ কিঃ ওঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে এবং দুর্গাপুরে ১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত আর একটি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। বিহার রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইবার জন্য চন্দ্রপুরে ২'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি নূতন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ১২০০' দীর্ঘ ও ৯৯' উচ্চ তিলাইয়া বাঁধ এবং বোকারোর তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন (১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) কেন্দ্রটির কার্য ১৯৫৩ সালে সম্পূর্ণ হয়। তিলাইয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে উৎপাদিত (৪০০০ কিঃ ওঃ) বিদ্যুৎ হাজারীবাগ জেলার কোডারমা অভ্রখনি অঞ্চলসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। কোনার বাঁধটির কার্য ১৯৫৫ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং মাইথন বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৬০,০০০ কিঃ ওঃ) কার্য এবং পাঞ্চেৎ বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৪০,০০০ কিঃ ওঃ) কার্যও শেষ হইয়াছে। ২২৭১' দীর্ঘ ও ৩৮' উচ্চ দুর্গাপুরের বাঁধটির কার্য ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে। বহু খালের সাহায্যে (মোট দৈর্ঘ্য ১৫৫০ মাইল) এই বাঁধের জল লইয়া পঃ বঙ্গের ৯'৭৩ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি জমিতে জলসেচ করা হইবে এবং ৮৫ মাইল দীর্ঘ সুনাব্য খালপথেও সৃষ্টি করা হইবে। এই খালপথের
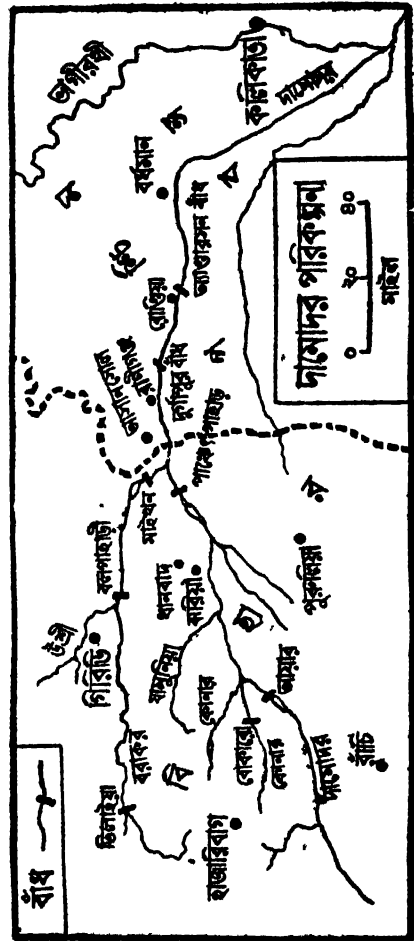
৫৪ নং চিত্র—দামোদর পরিকল্পনা

সাহায্যে কলিকাতা ও পঃ বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলসমূহের মধ্যে নৌ-চলাচলের সুবন্দোবস্ত হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ইহা দ্বারা বন্যা ও মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, কৃত্রিম হ্রদসমূহে মৎস্য চাষের সুবন্দোবস্ত এবং অববাহিকা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দামোদর অববাহিকার উত্তরাঞ্চলে কাষ্ঠ, লাক্ষা এবং তসর প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলই কয়লা, বক্সাইট, চীনামাটি, অভ্র, চুনাপাথর, এ্যান্টিমনি প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

(২) **মহানদী পরিকল্পনা (Mahanadi Project)**—উড়িষ্যার হিরাকুদ, টিকারপারা এবং নাবাজ অঞ্চলে মহানদীর উপব তিনটি বাঁধ বাঁধিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই তিনটি বাঁধ নির্মিত হইলে মহানদী অববাহিকা অঞ্চলের বহু লক্ষ একর জমিতে জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচলের সুবিধা, উড়িষ্যার বদ্বীপাঞ্চলেব বন্যা নিবারণ এবং অবণ্য ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সম্বলপুর হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে **হিরাকুদে** ১৫,৭৩৮′ দীর্ঘ প্রধান বাঁধের কার্য ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাতে ২৮৮ বর্গমাইল পরিমিত জলাধাবে ৬৬ লক্ষ একর-ফুট জলরাশি বাঁধা পড়িবে। ইহাতে মহানদীর বদ্বীপাঞ্চলের বন্যানিরোধ, ১.২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুতের উৎপাদন এবং সম্বলপুর, বলাংগির, কটক ও পুরী জেলার ৫.৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইবে। এ স্থান হইতে রাউর-কেলার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে, রাজগাঙপুরের সিমেণ্ট শিল্পকেন্দ্রে, জোডার ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজ শিল্পকেন্দ্রে, চৌদ্বার অঞ্চলের বয়ন ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রসমূহে ও হিরাকুদে যে এ্যালুমিনিয়াম কেন্দ্র

৫৫নং চিত্র—ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী পরিকল্পনার কেন্দ্রসমূহ

স্থাপিত হইবে তাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটির কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা মিটাইবার জন্য সম্প্রতি এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যের অনুমোদন করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে, হিরাকুদ বাঁধ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত চিপলিমা অঞ্চলে ৭২,০০০ কিঃ ওঃ এবং হিরাকুদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিরিক্ত ৭৫,০০০ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। চিপলিমার বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে এবং হিরাকুদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্য ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই পরিকল্পনাটি উড়িষ্যার শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৩) **কুশীবাঁধ পরিকল্পনা (Kosi river Project)**—এই পরিকল্পনায় বিহার রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। ভারত নেপাল সীমান্তে হনুমান নগরের নিকট কুশী নদীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া বিহারের (পুর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলায়) ১৪·০৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কুশী নদীর বন্যা নিবারিত হইবে, কলিকাতা হইতে প্রায় কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মৎস্য চাষও বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পযায়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে হনুমান নগরের নিকট কুশী নদীতে বাঁধ নির্মাণ করা হইবে (১৯৬২ সাল নাগাদ এই কার্য সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়); দ্বিতীয় পযায়ে কুশী নদীর উভয় তীরে ১৫২ মাইল দীর্ঘ অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া হইবে (এই কায সম্পূর্ণ হইয়াছে); এবং তৃতীয় পর্যায়ে হনুমান নগরের বাঁধ হইতে পূর্বকুশী খাল খনন করা হইবে (এই কার্য চলিতেছে)। এই খাল হইতে মুরলীগঞ্জ, জানকীনগর, বনমনখী এবং আরারিয়া এই চারিটি শাখা খালও প্রসারিত হইবে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে নেপালের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই পরিকল্পনার কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

(৪) **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা (Tungabhadra Project)**—কৃষ্ণা নদীর একটি উল্লেখযোগ্য শাখানদী তুঙ্গভদ্রার উপর মল্লপুরম্ অঞ্চলে ৭৯৪২′ দীর্ঘ ও ১৬২′ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া অন্ধ্র ও মহীশূর রাজ্যের ৮·৩ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ এবং প্রায় ৭২,০০০ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। এই পরিকল্পনাটি দ্রুত সমাপ্তির পথে চলিয়াছে।

(৫) **রিহাণ্ড পরিকল্পনা (Rihand Valley Project)**—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার পিপরি গ্রামের নিকট শোনের উপনদী রিহাণ্ড নদীতে ৩০৬৫′ দীর্ঘ এবং ২৯৪·৫′ উচ্চ একটি বাঁধ বাঁধিয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা, মৎস্যচাষ, শিল্পোন্নতি,

৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিবারণ, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (১৯৫৪)। এই পরিকল্পনাটির কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(৬) **কাক্রাপারা (তাপ্তী) পরিকল্পনা (Kakrapara Project)**—১৯৪৯ সালে গৃহীত এই পরিকল্পনাটি দুইটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে সুরাট হইতে ৫০ মাইল দূরে কাক্রাপারার নিকট তাপ্তী নদীবক্ষে ২০৩৮′ দীর্ঘ ও ৪৫′ উচ্চ সিমেণ্টের বাঁধ ও নদীতীরে মাটির বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১ লক্ষ একর-ফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সঞ্চিত জলরাশি হইতে ৬·৫৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ২৪ হাজার কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। দ্বিতীয় স্তরে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া ৩৫·৫ লক্ষ একর ফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ২ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। প্রথম স্তরের বাঁধ নির্মাণের কার্য ১৯৫৩ সালে সমাপ্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য কার্য দ্রুতসমাপ্তির পথে চলিয়াছে।

(৭) **কয়না পরিকল্পনা (Koyna River Project)**—এই পরিকল্পনায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাতারা জেলার কয়না নদীর উপর ২০৮′ দীর্ঘ একটি বাঁধ বাঁধিয়া ১৫৬,০০০ মিঃ ঘনফুট জল সঞ্চয় করা হইবে এবং উহার ⅙ অংশ মহীশূরের বিজাপুর জেলায় সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে। চিপলান হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত খাদাওয়াডী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে ২·৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে এবং বোম্বাই, সোলাপুর, সাতারা ও মহীশূরের বেলগাঁও অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবে। ১৯৫৪ সালে এই পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় এবং শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

(৮) **চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Valley Project)**—রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে গৃহীত এই পরিকল্পনাটি উভয় রাজ্যকেই উপকৃত করিবে। এই পরিকল্পনায় যমুনার উপনদী চম্বলের উপর ইন্দোরের চৌরাশীগড়ে (৭২,০০০ কিঃ ওঃ), উদয়পুরের রাওয়াত ভট্টে (৬৪,০০০ কিঃ ওঃ) এবং কোটা অঞ্চলে (৪২,০০০ কিঃ ওঃ) তিনটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ১১ লক্ষ একর পরিমিত জমি জলসিঞ্চিত হইবে। প্রথম বাঁধের কার্য ১৯৫৪ সালে আরম্ভ হয় এবং এই সমগ্র পরিকল্পনাটি ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে ইতোমধ্যেই কোটা বাঁধ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জল সরবরাহের কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

(৯) **কৃষ্ণা বাঁধ বা নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (Nagarjunsagar Project)**—এই পরিকল্পনা অনুসারে অন্ধ্ররাজ্যের নাগার্জুনকোণ্ডা অঞ্চলে, কৃষ্ণা নদীতে ২৯০′ উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া অন্ধ্র রাজ্যের ২০·৬ লক্ষ একর পরিমিত

কৃষিজমিতে জলসেচ ও ৭৫,০০০ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ১৯৫৫ সালে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনাটি ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১০) **মাচকুন্দ পরিকল্পনা** (Machkund Project)—উড়িষ্যা ও অন্ধ্ররাজ্যের সীমা নির্দেশকারী মাচকুন্দ নদীর দক্ষিণ তটে ডুডুমা জলপ্রপাতের নিকট ১৩৪৫′ দীর্ঘ ও ১৭৬′ উচ্চ জলাধার নির্মাণ করিয়া ৬'২৫ লক্ষ একর-ফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জলরাশির সাহায্যে ১'১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। ইহা অন্ধ্ররাজ্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১১) **ভদ্রা বাঁধ পরিকল্পনা** (Bhadra Reservoir Project)—মহীশূর রাজ্যের ভদ্রা নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া ঐ রাজ্যের সিমোগা, চিকমাংগালুর, চিতলদ্রুগ ও বেলারী জেলার ২'৪৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৩৩,২০০ কিঃ ওঃ পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেব যে পরিকল্পনাটি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১২) **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা** (Mor Project)—দেওঘরে ত্রিকূট পর্বতে উৎপন্ন হইয়া ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে। এই পরিকল্পনায় সাঁওতাল পরগণার মেসানজোরে ২১৭০′ দীর্ঘ ও ১৫৫′ উচ্চ একটি বাঁধ (ক্যানাডা বাঁধ) এবং তিলপাডা, কোপাই, ব্রাহ্মণী ও দ্বারকাতে জলাধার নির্মাণ করিয়া ৭'২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের এবং ৪ হাজার কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে কুটিরশিল্প ও সেচকার্য পরিচালিত হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যতীত এই সমগ্র পরিকল্পনাটি ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্য ১৯৫৭ সালে শেষ হয়। এই পরিকল্পনায় পঃ বঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু অংশ উপকৃত হইবে।
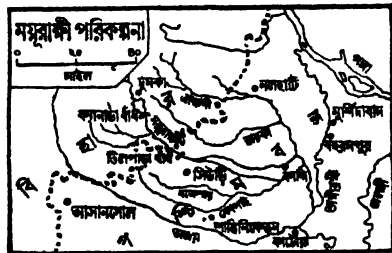
৫৬নং চিত্র—ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

(১৩) **গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা** (Ganga Barrage Project)—নদীগর্ভে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে ভাগীরথী অগভীর ও লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা-ভাগীরথীপথে উত্তর ভারতের সহিত সংযোগ সাধন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরের সংরক্ষণ-ব্যয়ও ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাগীরথীর সংস্কার সাধন কল্পে—(১) মুর্শিদাবাদ জেলার

ফরাক্কায় গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে ; (২) ভাগীরথীর উপর জঙ্গীপুরের নিকট অপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে ; এবং (৩) ফরাক্কা বাঁধ হইতে জঙ্গীপুর বাঁধ পর্যন্ত ২৬½ মাইল দীর্ঘ একটি খালও খনন করা হইবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে ভাগীরথী ও তাহার পূর্ব তীরবর্তী শাখা-নদীগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু অংশে সম্বৎসরব্যাপী জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধিত হইবে এবং কলিকাতা হইতে পাটনা পর্যন্ত সম্বৎসরব্যাপী নৌচলাচলের সুব্যবস্থা হইবে।

(১৪) **রামাপদসাগর পরিকল্পনা (Ramapada Sagar Project)**—অন্ধ্রের গোদাবরী নদীর উপর রামাপদসাগরের সন্নিকটে একটি বাঁধ বাঁধিয়া ২৩ লক্ষ একর পরিমিত জমি জলসিক্ত ও ৭৫ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

(১৫) **ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (Vakra-Nangal Project)**—পাঞ্জাবের ভাক্রা গিরিখাতের নিকট রূপার হইতে ৫০ মাইল দূরে শতদ্রু নদীতে ১৭০০′ দীর্ঘ এবং ৭৪০′ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাঁধ বাঁধিয়া ৭৪ লক্ষ ঘনফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সঞ্চিত জল হইতে পাঞ্জাব (হিসার, রোটক, কর্নাল ও গুরগাঁও জেলা, এবং পেপসু) ও রাজস্থানের (বিকানীর) বর্ষণ-বঞ্চিত প্রায় ৬৭.৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪.৫ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। ভাক্রা গিরিখাত হইতে ৮ মাইল দূরে নাঙ্গাল নদীর উপর ১০২৯′ দীর্ঘ, ৯০′ উচ্চ এবং ৪০০′ প্রশস্ত একটি বাঁধ বাঁধিয়া আরও ১.৫৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ভাক্রা বাঁধের জলের সমতা রক্ষার জন্যই এই নাঙ্গাল পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিকল্পনা দুইটি দ্বারা পাঞ্জাবের খাদ্যশস্য ও কার্পাস উৎপাদন এবং শিল্পসংগঠন বৃদ্ধি পাইবে এবং নৌ-চলাচলের সুবিধাও হইবে। নাঙ্গাল বাঁধটির কার্য শেষ হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সাল হইতে এই পরিকল্পনার গাংগুয়াল শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র (৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) হইতে এবং ১৯৬০ সাল হইতে কোটলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ হইবে। উৎপাদিত শক্তির সাহায্যে এ অঞ্চলে আণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত "ভারী জল" (heavy water) ও সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং কুটির-শিল্প প্রসার লাভ করিবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন* (Electricity development under Five Year plans):—বিদ্যুৎ উৎপাদন

* ভারতে সাধারণতঃ কয়লা, প্রবহমাণ জলস্রোত, খনিজতৈল, স্বাভাবিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম হইতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

সম্পর্কে **প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** নির্ধারিত অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ ও ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান হইতে প্রতীয়মান হইবে।

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫০/৫১-৫৫/৫৬)			দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৫/৫৬-১৯৬০/৬১		তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬০/৬১-১৯৬৫/৬৬)	
	ভিত্তি বৎসর ১৯৫০-৫১	অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ ১৯৫৫-৫৬	১৯৫৫-৫৬ প্রকৃত উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ ১৯৬০ ৬১	১৯৬০-৬১ প্রকৃত উৎপাদন (পরিবর্তন সাপেক্ষে)	অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ ১৯৬৫-৬৬	১৯৬৫-৬৬ অনুমিত উৎপাদন
সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার বিদ্যুৎ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা (মিঃ কিঃ ওঃ)	২ ৩০	১.৪	৩ ৪২	৩.৪৮	৫ ৭০	৬.৯৯	১২.৬৯
ঐ ঐ উৎপাদন (মিঃ কিঃ ওঃ ঘণ্টা)	৬৫৭৫		১০,৭৭৭		১৯,৮৫০		৪৫,০০০
তড়িৎবাহী-তারের দৈর্ঘ্য (মাইল) (১১ কিঃ ভোঃ ও তদূর্ধ্ব)	১৯০০০		৩৬,৫০০		৮৪,০০০		১৫০,০০০
বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাম ও শহরের সংখ্যা	৩৬৭৮		৭,৪০০		২৩,০০০		৪৩,০০০
বহুমুখী পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ আনুপাতিক ব্যয় সমেত সরকারী খাতে মোট ব্যয় (টাকা)	২৬০ কোটি			৪৬০ কোটি		১০৩৯ কোটি	

প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে সরকারী অংশে গৃহীত ১৪২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে যে কয়টি প্রধান প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা (জল ও তাপ) সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে উহাদের মধ্যে নাঙ্গাল, বোকারো, চোলা, খাপারখেদা, ময়ার, মাদ্রাজ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, মাচকুন্দ, পাথরী, সারদা, সেঙ্গুলাম, যোগ প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী অঞ্চলগুলির স্বাভাবিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটান, বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রের সম্যক প্রসার এবং শিল্প প্রসারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অতিরিক্ত ৩'৪৮ মিলিয়ন কিঃ ওঃ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার জন্য, **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** নির্দেশ দেওয়া হয় ; কিন্তু ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ প্রকৃত উৎপাদনেব পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২'২৮ মিঃ কিঃ ওঃ। এতদুদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে নূতন ৪৪টি (২৫টি জল-বিদ্যুৎ ও ১৯টি তাপ-বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই ৪৪টি পরিকল্পনার এবং প্রথম পবিকল্পনার শেষার্ধে গৃহীত ১৫টি পরিকল্পনার অধিকাংশই ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া পবিকল্পনা কমিশন আশা করেন কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রাচুর্যহেতু এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাযকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া "চক্রপ্রথা"র (grid system) অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে একটি সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত হয় কারণ নদী-উপত্যকাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন একটি বিশিষ্ট বাজ্যেব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তাহা কোন একটি রাজ্যের পক্ষে কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যতীত নির্বাহ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প সংগঠন, সেচকার্যে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার এবং রেলপথের বৈদ্যুতীকবণের উপর যে গুরুত্ব আরোপ কবা হইয়াছে তাহাতে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতে মোট ১২'৬৯ মিলিয়ন কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তৃতীয় পবিকল্পনা কালে ৪৯টি নূতন (২৮টি জল বিদ্যুৎ, ২০টি তাপ বিদ্যুৎ এবং একটি আণবিক বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই ৪৯টি পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ ৩১টি পরিকল্পনা (২০টি জলবিদ্যুৎ এবং ১১টি তাপ বিদ্যুৎ) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অংশতঃ কাযকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হইবে এবং ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ৪৩ হাজার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যাহাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এতদুদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া "চক্র প্রথায়" বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভ

জনক করিয়া তুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র-সমূহের পরিচালনা সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা প্রভৃতি বিষয়েও নানাবিধ কার্যসূচী গৃহীত হইবে।

বিদ্যুতের ব্যবহার, ১৯৫১-১৯৬৫

	১৯৫১		১৯৫৫		১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	ব্যবহার মিঃ কিঃ ওঃ ঘণ্টা	মোট ব্যবহারের শতাংশ	ব্যবহার মিঃ কিঃ ওঃ ঘণ্টা	মোট ব্যবহারের শতাংশ	ব্যবহার মিঃ কিঃ ওঃ ঘণ্টা	মোট ব্যবহারের শতাংশ	ব্যবহার মিঃ কিঃ ওঃ ঘণ্টা	মোট ব্যবহারের শতাংশ
গৃহস্থালীর কার্যে	৫৯৫ ০০৫	৭ ৯	৮৫০ ৪২৬	৭ ৯	১৪৯০ ০	৭ ৫	১৪০০০ ০	৭ ৬
ব্যবসাবাণিজ্যে	৩৩১ ৫৩৩	৪ ৪	৫১৪ ৪০৩	৪ ৮	৮৭১ ০	৪ ৪	১৯০০০ ০	৪ ২
শিল্পে	৪৬০৯ ৭৫৪	৬১ ৪	৬৭৫৭ ০৬৩	৬২ ৬	১২৩১৩ ৫	৬২ ০	২৮৪০০ ০	৬৩ ১
পরিবহনে	৩২৯ ৫৯৪	৪ ৪	৪০৩ ৩০২	৩ ৭	৪৬৯ ০	২ ৩	১৮০০ ০	৪ ০
সাধারণ আলোক ব্যবস্থায়	৬৭ ৯১৭	০ ৯	১০৫ ৬৩১	১ ০	১৯০ ০	১ ০	৪০০ ০	০ ৯
সেচ কার্যে	২০৩ ০৪৮	২ ৭	২৫৮ ৮০৩	২ ৪	৮৩৬ ০	৪ ২	১৯০০ ০	৪ ২
জল সরবরাহে	২১১ ৫৮৩	২ ৮	২৮৪ ৬৩৭	২ ৬	৭৫৫ ০	২ ৩	৯০০ ০	২ ০
অন্যান্য কার্যে	১১৬৫ ৫৩৭	১৫ ৫	১৬০৬ ৯৮১	১৫ ০	৩২৪২ ৫	১৬ ৩	৬৩০০ ০	১৪ ০
মোট	৭৫১৩৯৭১	১০০ ০	১০৭৭৭ ২৬৬	১০০ ০	১৯৮৫০ ০	১০০ ০	৫০০০০ ০	১০০ ০

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the important features of mineral and mining industry.
(খনিজদ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৯৬-১৯৭)

2. Name the different grades of iron ore and examine the world distribution of iron ore. (C. U.' 50, '53)
(লৌহ আকরিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম কর এবং প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল সমূহের নাম লিখ।) (পৃঃ ১৯৮-২০১)

3. State the commercial and industrial uses of the following minerals indicating the countries where each may be found : (a) Copper (C.U. '53), (b) Tin, (c) Zinc, (d) Lead, (e) Aluminium.
(নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদগুলির ব্যবহার এবং উহারা কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায় তাহা নির্দেশ কর।—(ক) তাম্র, (খ) রাং, (গ) দস্তা, (ঘ) সীসক, (ঙ) এ্যালুমিনিয়াম)
((ক) পৃঃ ২০১-২০৩ (খ) পৃঃ ২০৩-২০৪ (গ) পৃঃ ২০৪-২০৫ (ঘ) পৃঃ ২০৫ (ঙ) পৃঃ ২০৫-২০৬)

4. State the commercial and industrial uses of mica and name the countries where it is found.
(অভ্রের ব্যবহার নির্দেশ কর এবং যে যে দেশে অভ্র পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ)।
(পৃঃ ২০৮)

5. Enumerate the principal coal fields of the world.
(পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহের নাম লিখ।) (পৃঃ ২১৩-২১৮)

6. Examine the distribution of coal fields in Europe.
(ইউরোপ মহাদেশে কয়লাখনি সমূহের বণ্টন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২১৫-২১৬)

7. What is mineral oil ? What are its by-products ? Describe the principal petroleum belts of the world.
(খনিজ তৈল কাহাকে বলে ? ইহার উপজাত দ্রব্যাদি কি কি ? পৃথিবীর তৈল বলয় সমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২১৯, ২২০-২২১)

8. Give an account of the world distribution of mineral oil.
(C.U. '55, '58)
(পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈল খনি অঞ্চল সমূহের বিবরণ লিখ।) (পৃঃ ২২২-২২৫)

9. What do you mean by hydroelectric power ? What geographical and economic factors favour the development of water power ? (C.U. '56)
(জলবিদ্যুৎ বলিতে কি বুঝ ? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমূহের নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২২৬-২২৮)

10. Examine the production of white coal in different parts of the world.
(পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা কর।)
(পৃঃ ২২৮-২৩০)

11. Examine the distribution, production and consumption of the more important mineral resources of India excepting fuel minerals.
(খনিজ জ্বালানী ব্যতীত ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক বণ্টন, উৎপাদন আভ্যন্তরীণ ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।) (পৃঃ ২৩২-

12. Examine the nature of distribution, consumption and reserves of coal in India. (C. U. '51, '56)

(ভারতীয় কয়লার আঞ্চলিক বণ্টন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং সঞ্চিত পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৪১-২৪৫)

13. Examine the nature of development of Indian coal mining industry under the Five Year Plans.

(পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় কয়লা শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৪৫-২৫০)

14. Give an account of petroleum resources and petroleum industry of India. (C. U. '51, '60, H.S. '63)

(ভারতের খনিজ তৈল সম্পদ ও খনিজ তৈল শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃঃ ২৫০-২৫২)

15. Examine the distribution of hydel power plants in India and explain why most of the plants have been developed in South India rather than in North India. (C.U. '51, '57)

(ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা সমূহের আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা কর এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ কারখানার প্রসার এত ব্যাপক কেন তাহার কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৫২-২৫৬)

16. What are the multipurpose river projects ? Describe some such projects of India. (C. U. '53, '58)

(বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ ? ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহুমুখী নদী পরিকল্পনার বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২৫৭-২৬৩)

17. Describe the Damodar Valley Project. (C. U. '54, '56)

(দামোদর পরিকল্পনাটির বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২৫৭-২৫৯)

18. What are the chief advantages of *hydroelectric power* ? Mention the geographical conditions that are necessary for the production of hydroelectricity. Briefly describe any one of the multipurpose schemes of India, indicating the power potential of the scheme. (H. S. '61)

(জলবিদ্যুতের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি কি কি ? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা সমূহের উল্লেখ কর। ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনার যে কোন একটির বর্ণনা কর এবং পরিকল্পনার সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ কর।)

(পৃঃ ২২৬-২২৮, ২৫৭-২৫৯)

একাদশ অধ্যায়

বনজ সম্পদ

অরণ্যের সুবিধা (Utility of forests) :—অরণ্য হইতে সাধারণতঃ দুইশ্রেণীর সুবিধা পাওয়া যায়। যথা—(ক) **প্রত্যক্ষ সুবিধা**—(১) অরণ্য হইতে কাষ্ঠ ও জ্বালানী পাওয়া যায়, (২) আসবাবপত্র নির্মাণ, যানবাহন, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল অরণ্য হইতে আহৃত হয়; (৩) লাক্ষা, হরীতকী, চর্মরঞ্জক দ্রব্যাদি, তাপিন তৈল, ধুনা, নানা প্রকার তৈল, রবার প্রভৃতি নানাবিধ উপজাত দ্রব্য অরণ্য হইতে আহৃত হয়; (৪) তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়; এবং (৫) বনজ শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। (খ) **পরোক্ষ সুবিধা**—(১) অরণ্যাঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত অধিক হয় এবং ভূমি সিক্ত থাকে; (২) অরণ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এবং স্থলভাগে জলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; (৩) অরণ্যাঞ্চলসমূহ ঝড়ের গতিবেগ রোধ করে; (৪) বহুক্ষেত্রে অরণ্য নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে; (৫) অরণ্য ভূমিক্ষয় নিবারণ করে ও মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে; এবং (৬) অরণ্য বন্যার গতিরোধ করে।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও আঞ্চলিক বণ্টন (Classification and regional distribution of forests)—জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে* পৃথিবীর অরণ্যসমূহকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

(ক) উষ্ণমণ্ডলের **কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** (tropical hardwood evergreen forest)—উষ্ণমণ্ডলের যে সমস্ত অঞ্চলে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত প্রচুর ও উত্তাপ অধিক সেই সমস্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ কঠিন কাষ্ঠযুক্ত এই প্রকার বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বহির্ভূত ৮০"-র অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌসুমী অঞ্চলের স্থানবিশেষেও এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অরণ্যের বৃক্ষসমূহের মধ্যে সেগুন, মেহগিনি, আবলুস, গোলাপগন্ধ, সিডার, রবার ও তালজাতীয় বৃক্ষই মনুষ্যের

*উত্তাপ (অন্যূন মাসিক গড় ৪৩° ফাঃ), বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যের কিরণ ও আলো, মৃত্তিকা ও উহার রাসায়নিক ধর্ম, ভূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতা প্রভৃতির উপর প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান নির্ভর করে।

নানাবিধ প্রয়োজনে, বিশেষতঃ আসবাব তৈয়ারীর কার্যে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উষ্ণমণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প (Lumbering in tropical forests)—উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যসমূহে মূল্যবান বৃক্ষের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ—(১) এই অঞ্চলের ভূমিভাগ বৎসরের কোন সময়েই বরফাবৃত না থাকায় অল্পব্যয়ে শিল্পাগারে কাষ্ঠ প্রেরণ সম্ভব হয় না। (২) স্থলপথে যানবাহনের ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। (৩) এই অঞ্চলের কাষ্ঠের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হওয়ায় কাষ্ঠসমূহ নদীবক্ষে ভাসমান থাকে না এবং নদীবক্ষে কাষ্ঠ চালান দেওয়াও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। (৪) এই অঞ্চলের অরণ্যে এক শ্রেণীর বৃক্ষ একই স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় না এবং অরণ্যাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে একই-শ্রেণীর কাষ্ঠ সংগ্রহ করা কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ। (৫) এই অঞ্চলে শক্তিসম্পদ ও শ্রমিকের অপ্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ ব্যবসায়কেন্দ্রের অভাব রহিয়াছে। এতদঞ্চলের কাষ্ঠ ছেদন করা কষ্টসাধ্য।

উষ্ণমণ্ডলের বনজ উঞ্ছবৃত্তি (Gathering and collecting in tropical forests)—উঞ্ছবৃত্তি উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা আহৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে (১) দঃ মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং চিউইংগাম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত 'জাপোটে' বৃক্ষের রস হইতে **চিকল**, (২) বিভিন্ন অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত **বন্য রবার**, (৩) দঃ আমেরিকার অরণ্য হইতে সংগৃহীত ও 'কেব্‌ল্‌' নির্মাণে ব্যবহৃত **ব্যালাটা**, (৪) ব্রাজিলের অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাদ্যরূপে ব্যবহৃত **ব্রাজিল নাট**, (৫) পানামা হইতে দঃ ইকুয়েডর পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাদ্যরূপে ও বোতাম তৈয়ারীতে ব্যবহৃত **আইভরী নাট**, (৬) পশ্চিম আফ্রিকার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং তৈল উৎপাদনে ব্যবহৃত **পাম নাট**, (৭) ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং পানামার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং সুদৃশ্য 'পানামা হ্যাট' নামক একশ্রেণীর টুপী প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত **টোকুইলা পাম** নামক বৃক্ষের তন্তু, (৮) জাপান, তাইওয়ান ও দঃ চীনের অরণ্য হইতে সংগৃহীত **কর্পূর কাষ্ঠ**, (৯) কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার অরণ্য হইতে আহৃত **সিঙ্কোনা***, (১০) ভারত ও পাকিস্তানের অরণ্য হইতে সংগৃহীত **লাক্ষা, মোম**, এবং (১১) বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত নানাবিধ **কষায়িন**, বহু প্রকারের **গঁদ** প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট এবং কঠিন কাষ্ঠযুক্ত **পর্ণমোচী**

*বর্তমানে অবশ্য পৃথিবীর ৯০% সিঙ্কোনা জাভার আবাদ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সিংহল ও ভারতেও বর্তমানে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

বৃক্ষের অরণ্য (temperate hardwood deciduous forests)—নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের আল্পস্, পিরেনীজ, মরু-রুশিয়া, মধ্য-সাইবেরিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রের আপালাচিয়ান অঞ্চল, প্যাটাগোনিয়া এবং দক্ষিণ চিলিতে ওক, বার্চ, মেপল্, অ্যাশ, আখরোট, এল্‌ম, চেস্টনাট প্রভৃতি দীর্ঘ পত্র ও কঠিন কাষ্ঠ বিশিষ্ট পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক ও লরেন্সীয় জলবায়ু সেবিত অঞ্চল সমূহে এই শ্রেণীর অরণ্যভূমি সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তবে উষ্ণ মণ্ডলের স্থানে স্থানেও এইরূপ অরণ্যভূমি দৃষ্ট হয়। এই সকল কাষ্ঠ ঈষৎ শক্ত এবং আসবাব তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বনভূমি অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূখণ্ডে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে পরিষ্কৃত করিয়া কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট এবং কোমল কাষ্ঠযুক্ত **সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য** (temperate softwood coniferous forests)—তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর অরণ্যে পাইন, ফার, স্প্রুস, লার্চ প্রভৃতি নরম কাষ্ঠের বৃক্ষ জন্মে। এই সমস্ত কাষ্ঠ লঘু, স্থায়ী অথচ দৃঢ়। জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, এবং দিয়াশলাই-এর কাঠি, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাষ্ঠ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে, (২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণাংশে, (৩) ইউরোপীয় দেশসমূহের উত্তরাংশে ও হিমালয় পর্বতের উচ্চতর অংশে, এবং (৪) নিউজীল্যাণ্ডের অংশ বিশেষে এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে।

কোমল কাষ্ঠযুক্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চলসমূহ প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত

৫৭নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান অরণ্য অঞ্চল
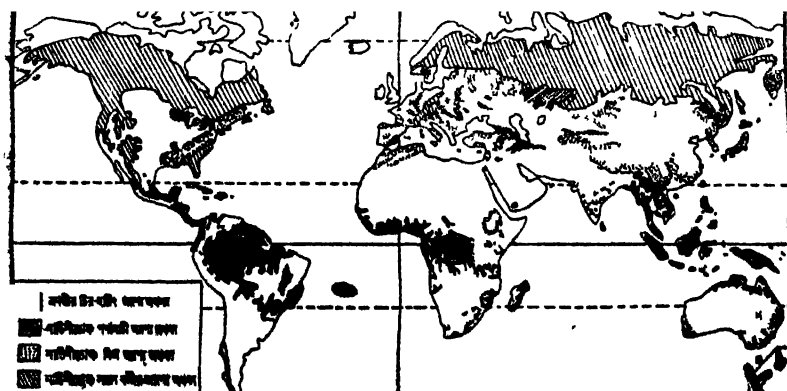
কোস্ট-রেঞ্জ, সিয়েরা নেভাডা, কাস্কেড ও রকি পর্বতাঞ্চলের আর্দ্র ও শীতল অংশে সিডার, ডগলাস ফার, হোয়াইট পাইন, রেড উড প্রভৃতি সরলবর্গীয়-বৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং বালুকাময় ভূমিভাগেও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দৃষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বালুকাময় ভূমিভাগে পাইনবৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে। ইউরোপের অন্তর্গত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও বাল্টিক রাজ্যসমূহের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে প্রচুর কোমলকাষ্ঠ প্রতিবৎসর ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, দঃ জার্মানী ও মধ্য ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল, বল্কান ও আপেনাইন পর্বতের উচ্চতর অংশেও এইরূপ বনভূমি রহিয়াছে। রুশিয়ার উত্তরস্থিত 'তৈগা' বনমণ্ডলটির বিস্তার সাইবেরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। বর্তমানে ইহাই হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ও নিবিড়তম সরলবর্গীয় বনপ্রদেশ। ইহার আয়তন প্রায় ১৩০ কোটি একর। তবে এই বনভূমি অতি দুর্গম বলিয়া এ অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণ অতি সামান্য। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে এই বনভূমির মাত্র ৭½ কোটি একর পরিমিত স্থানের কাষ্ঠসম্পদ ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে।

দঃ গোলার্ধের অন্তর্গত দঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড দেশের ৩০° দঃ সমাক্ষরেখার দক্ষিণস্থিত অঞ্চলসমূহে সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি পরিলক্ষিত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠশিল্প (Lumbering in temperate forests)—পৃথিবীতে প্রতিবৎসর যত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ৭০% নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করিবার কারণ—(১) এই অঞ্চলের অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের ন্যায় নিবিড় না হওয়ায় কাষ্ঠ আহরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। (২) এই অঞ্চলের কাষ্ঠসমূহ নদীবক্ষে ভাসমান থাকে বলিয়া বসন্তকালে তুষার গলিয়া গেলে ভূমির উপর দিয়া নদীপথে কাষ্ঠ চালান দেওয়া সহজসাধ্য। (৩) এই অঞ্চলের অরণ্যে একই স্থানে একই প্রকারের বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৪) এই অঞ্চলে জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য কাষ্ঠশিল্পে শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। (৫) এতদঞ্চলের কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নরম হওয়ায় ইহাদের ছেদন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। (৬) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশে নির্মাণ ও শিল্পকার্যে কাষ্ঠের চাহিদাও ব্যাপক। (৭) সমৃদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়কেন্দ্রসমূহের নৈকট্য, শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্য, এই জাতীয় কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদা এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্পের উন্নতির সহায়ক।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বনজ উঞ্ছবৃত্তি (Gathering and collecting in temperate forests)—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্যাঞ্চলের উঞ্ছবৃত্তি তাদৃশ ব্যাপক নহে। এই অঞ্চলে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা আহৃত বাণিজ্যিক সামগ্রীর মধ্যে আর্জেন্টিনার অরণ্য হইতে সংগৃহীত কুয়েব্রাকো কষায়িন; স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো ও আলজেরিয়ার ওক বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত কর্ক, পাইন বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত পীচ, আলকাতরা, রজন, তার্পিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য এবং চামড়া ট্যান করিবার নানাবিধ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্পাঞ্চলসমূহ (Lumbering regions of the Temperate Belt)—উত্তর আমেরিকায় ২৭% ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এই মহাদেশের অন্তর্গত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেই কাষ্ঠ শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

ক্যানাডা বনজ সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ। ভূমিভাগের মোট ৩৫% বনাকীর্ণ। ক্যানাডার অধেক কাষ্ঠ ব্রিটিশ কলম্বিয়া হইতে আসে। এই অঞ্চলের স্প্রুস্, ফার, হেমলক, সিডার প্রভৃতি কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যানাডার উত্তরাঞ্চলে ও আলাস্কায় কোমল কাষ্ঠযুক্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে, কিন্তু অত্যধিক শৈত্য ও প্রতিকূল জলবায়ু হেতু এই সমস্ত অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। পুবের লরেন্সীয় উচ্চভূমি ও সমুদ্র-সেবিত প্রদেশসমূহ কাষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত; নদী ও হ্রদপথে এই সমস্ত স্থানের কাষ্ঠ স্থানান্তরিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাও রহিয়াছে। ক্যানাডার বন সংরক্ষণ প্রথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে দেওয়া হয় না এবং ছোট ছোট বৃক্ষসমূহকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। সংবাদপত্রের কাগজ, কাষ্ঠ, ও কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি রপ্তানীতে ক্যানাডার স্থান অদ্বিতীয়। ক্যানাডা হইতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, দঃ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পুবের উচ্চভূমি, পশ্চিমের পার্বত্যভূমি ও দক্ষিণ অঞ্চলে নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে। পুবের উচ্চভূমি অঞ্চলে স্প্রুস্, ফার, পাইন, বীচ, বার্চ, মেপ্‌ল, হেমলক, ওক, পপলার, হিকোরী, সাইপ্রেস্ প্রভৃতি মূল্যবান কঠিন কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যের বনভূমি হইতে কঠিন ও কোমল এই উভয়বিধ কাষ্ঠই আহৃত হয়। তবে বর্তমানে পুবের অরণ্যাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ আহরণের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। পশ্চিমের অরণ্যভূমি হইতে স্প্রুস্, ফার, ডগলাস, রেডউড, পাইন, বার্চ, জুনিপার প্রভৃতি কাষ্ঠ আহৃত হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র এই অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪০% কাষ্ঠ সংগৃহীত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠ চেরাই-এর ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুর্ব ও পশ্চিম দিকের রাষ্ট্রসমূহ হইতে প্রচুর কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। উত্তর-পূর্ব রাষ্ট্রসমূহে,

বিশেষতঃ নিউইয়র্ক অঞ্চলে, নরম কাষ্ঠ, জলবিদ্যুৎ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ এবং ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ-পুর্ব অঞ্চলের পাইন বনভূমি হইতে তার্পিন, রজন, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি আহৃত হয় এবং এতদঞ্চলে উৎপাদিত কাষ্ঠমণ্ডের সাহায্যে কাগজ, কৃত্রিম রেশম (রেয়ঁ) ও প্লাষ্টিক প্রস্তুত হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বন্দর ও ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের অরণ্য সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ভূমিভাগের ২৯% বনাকীর্ণ।

ইউরোপ—ইউরোপ মহাদেশের ভূমিভাগের ৩১% বনসন্নিবিষ্ট। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে বনাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। সেই কারণে ইউরোপ হইতে কাষ্ঠের রপ্তানী অপেক্ষা বিভিন্ন দেশ হইতে ইউরোপে কাষ্ঠের আমদানীর পরিমাণ অধিক। সম্প্রতি এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বনসংরক্ষণ প্রথা বিশেষরূপে প্রসার লাভ করিয়াছে।

ইউরোপ মহাদেশে কঠিন কাষ্ঠ অপেক্ষা কোমল কাষ্ঠের সরবরাহই অধিক। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে প্রচুর কোমল কাষ্ঠ, রজন, পশুলোম, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ, প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া থাকে। সরলবর্গীয় বনভূমির নিবিড় অবস্থান, নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা এবং জলবিদ্যুতের প্রাচুয হেতু এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের আথিক উন্নতি প্রধানতঃ বনজ দ্রব্যের রপ্তানীর উপরই নির্ভরশীল। এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে বীচ, অ্যাস্পেন প্রভৃতি কঠিন কাষ্ঠযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিও দৃষ্ট হয়। ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত দেশসমূহের অরণ্যাঞ্চল হইতে ওক, চেস্টনাট প্রভৃতি মূল্যবান কঠিন কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষ এবং কর্ক সংগৃহীত হয়। স্পেন ও পোর্তুগাল কর্ক রপ্তানীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। মহাদেশের মধ্যভাগের ও পশ্চিমাঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চল হইতে মূল্যবান কঠিন কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সমগ্র **রুশিয়ার** উত্তরে ফিনল্যাণ্ড হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে পৃথিবীর ই অংশ বনভূমি রহিয়াছে। এই বনভূমি সরলবর্গীয় বৃক্ষে পরিপুর্ণ এবং ইহা হইতে কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুতের কাঁচামাল সংগৃহীত হয়। করাত ঘর, কাগজের কল ও মণ্ড প্রস্তুতের কারখানা লইয়া গঠিত অধিকাংশ বৃহদায়তন কাষ্ঠ সমবায় (timber combine) ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত কারেলিয়ার কোণ্ডোপোঝ, উত্তর ইউরালের কামা এবং এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত পুর্ব সাইবেরিয়ার ক্রাসনোইয়ার্স্ক ও ইনিসি অববাহিকার ইগার্কা অঞ্চলে অবস্থিত রহিয়াছে। ইউরোপীয়

রুশিয়ার অন্তর্গত লেনিনগ্রাদ ও আর্কেঞ্জেল কাষ্ঠ রপ্তানীর বন্দর। বনজ সম্পদে রুশিয়া বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এশিয়া—এই মহাদেশের ২৮% ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এশিয়া মহাদেশের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প প্রধানতঃ চীন ও জাপানেই পরিলক্ষিত হয়। তবে জাপানের কাষ্ঠ শিল্প যেরূপ সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে চীনের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই। কারণ, কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য চীনের অধিকাংশ বনভূমিকে পরিষ্কৃত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

জাপানের সমগ্র ভূমিভাগের ৫৫% বন সমাচ্ছন্ন। জাপানের এই বনভূমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—(১) দক্ষিণ জাপানের উপক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (২) পূর্ব ও পশ্চিম জাপানের হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্রবনভূমি। ইহাই জাপানের সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বনভূমি, এবং (৩) হোক্কাইডো ও হনসুর উচ্চ পার্বত্যভূমিতে হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলীয়, প্রধানতঃ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। এই সকল বনভূমি হইতে কাষ্ঠ, জ্বালানী, কাষ্ঠমণ্ড, বাঁশ, কর্পূর, ফলমূল, তুঁত প্রভৃতি বহু মূল্যবান বনজ সম্পদ আহৃত হইয়া থাকে। **চীনের** উত্তরাংশের উচ্চভূমিতে সরলবর্গীয় এবং দক্ষিণে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। **ভারত ও ব্রহ্মদেশের** স্থানে স্থানে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় বনভূমি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অস্ট্রেলেশিয়া—অস্ট্রেলিয়ার ১৫% ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও দঃ পঃ অংশে এই শ্রেণীর অরণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ বনমণ্ডল অস্ট্রেলিয়ার বনমণ্ডল অপেক্ষা সমৃদ্ধ।

দঃ আমেরিকা—দঃ আমেরিকার ৪৪% ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এই মহাদেশের প্রধানতঃ দুইটি অংশ হইতেই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ আহৃত হইয়া থাকে—(১) পারানা অববাহিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, পূঃ প্যারাগুয়ে এবং উঃ আর্জেন্টিনা, এবং (২) দঃ পঃ চিলি। তবে পরিবহন ব্যবস্থার দৈন্য হেতু এই দুইটি অঞ্চলের কাষ্ঠ সম্পদ সম্যকরূপে আহৃত হয় নাই।

কাষ্ঠের বাণিজ্য (World trade in timber)—কাষ্ঠ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য। সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাষ্ঠই এই ব্যবসায়ের শতকরা ৮০ ভাগ অধিকার করে। ক্যানাডা, রুশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান কাষ্ঠ রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়াম প্রধান কাষ্ঠ আমদানীকারক দেশ। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দেশসমূহে কঠিন কাষ্ঠ রপ্তানী করিয়া থাকে।

বন সংরক্ষণ (Forest conservation)—বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই যে প্রতি বৎসর গড়ে যে হারে নূতন কাষ্ঠ জন্মে তাহা অপেক্ষা ৬০% অধিক

কাষ্ঠ প্রতি বৎসর নানা কাজে ব্যয়িত হয়। এইভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীময় কাষ্ঠের ঘাটতি দেখা দিবে। অরণ্যের নানাবিধ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া বর্তমানে সকল মহাদেশই (১) নিঃশেষিত অরণ্যাঞ্চলে নূতন অরণ্য রচনায় এবং (২) অরণ্য সংরক্ষণে মনোনিয়োগ করিয়াছে। অরণ্য সংরক্ষণ বলিতে সাধারণতঃ (১) দাবানল হইতে অরণ্য রক্ষা, (২) কেবলমাত্র পরিপুষ্ট বৃক্ষেরই ছেদন, (৩) নির্দিষ্ট বৃক্ষ ছেদন কালে যাহাতে অন্য বৃক্ষ নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং (৪) বনভূমির চারাযুক্ত অঞ্চলে পশুচারণের নিষেধ বুঝাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিরক্ষীয় বনমণ্ডলের প্রতিও নিবদ্ধ হইয়াছে। নিরক্ষীয় বনমণ্ডলই বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম কাষ্ঠভাণ্ডার।

কাষ্ঠমণ্ড সংক্রান্ত শিল্প—(Wood cellulose industries)—বর্তমানে কাষ্ঠমণ্ড সংক্রান্ত শিল্পসমূহের মধ্যে কাগজ শিল্প, কৃত্রিম রেশম শিল্প এবং প্লাস্টিক শিল্পই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাগজ শিল্প (Paper industry)—যে কোন প্রকার তন্তুময় উদ্ভিজ্জ পদার্থকে মণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা যায়। তবে ঐ মণ্ডের সহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, যথা—চায়না ক্লে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ফিটকিরি ও ট্যাল্‌ক মিশ্রিত করা হয়। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ এস্‌পার্টো ও সাবাই ঘাস, খড়, বাঁশ, তুঁতগাছ, বাওবাব, পরিত্যক্ত পাট, ছিন্ন বস্ত্র, নরম কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত কাগজ তৈয়ারী হয় তাহার ৯০%-এরই মূল উপকরণ কাষ্ঠমণ্ড। কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্য কেবল মাত্র কোমল কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্প্রুস্, ফার, ও পাইন এই তিন প্রকারের কাষ্ঠের ব্যবহারই অধিক। কঠিন কাষ্ঠ হইতেও কাগজের উপযোগী মণ্ড প্রস্তুত হয় তবে উহাতে সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। (কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক অবস্থার একত্র সমাবেশ সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়:—(১) প্রচুর কোমল কাষ্ঠ সমৃদ্ধ বনভূমির নিকটবর্তিতা। (২) পরিষ্কার ও নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ। (৩) কল-কারখানা চালাইবার জন্য প্রচুর যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ; কারণ, দৈনিক ১ টন কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্য গড়ে প্রায় ১০০ অশ্বশক্তি পরিমিত যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। (৪) কাগজশিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ। (৫) শিল্পকেন্দ্রে কাষ্ঠ ও বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের সরবরাহ এবং শিল্পকেন্দ্র হইতে কাষ্ঠমণ্ড বা কাগজ বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ করিবার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এবং (৬) বনাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ছেদন, কারখানায় কাষ্ঠ প্রেরণ প্রভৃতি কার্যের জন্য সুদক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ।)

বৃহৎ আকারে এই সমস্ত ব্যাপারের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়

বলিয়া কাগজ উৎপাদনে পৃথিবীর দুইটি অঞ্চল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে —(১) উঃ আমেরিকার সেন্ট-লরেন্স নদীর অববাহিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পূর্বাঞ্চল এবং (২) উঃ পঃ ইউরোপের অন্তর্গত নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পঃ জার্মানী, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। ইহা ব্যতীত জাপান এবং রুশিয়াও কাগজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতেও কাগজ প্রস্তুত হয় তবে ভারতের কাগজশিল্প বিশেষ উন্নত নহে। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কাগজের প্রায় ⅓ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় ⅙ অংশ ক্যানাডায় এবং প্রায় ⅓ অংশ উঃ পঃ ইউরোপের দেশসমূহে উৎপাদিত হয়।

কৃত্রিম রেশম বা রেয়ঁ শিল্প—(Artificial silk বা Rayon industry)—বর্তমানে কীটজ রেশম অপেক্ষা কৃত্রিম রেশম অনেক অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ, করাতের গুঁড়া, নরম কাষ্ঠ (প্রধানতঃ স্প্রুস্ ও পাইন) বা পরিত্যক্ত কার্পাস রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত (প্রধানতঃ কার্বন বাইসালফাইড, এ্যাসেটিক এ্যাসিড ও ইথার) মিশ্রিত করিয়া মণ্ডে পরিণত করা হয়। পরে ঐ মণ্ড অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে চালিত করিলে উহা সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিণত হয়। পরে এইরূপ কয়েকটি সূক্ষ্ম সূত্র পাকাইয়া উহাদ্বারা বস্ত্র বয়নের উপযোগী সূত্র প্রস্তুত করা হয়। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, নরম জল, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ ও বিক্রয়-কেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্পের গঠন ও একদেশীভবনের সহায়তা করে। রেয়ঁ সাধারণতঃ গেঞ্জি, মোজা, প্রভৃতি প্রস্তুতিতে, কার্পাস ও কীটজ রেশমের সহিত মিশ্রিত করিতে এবং প্যারাসুট সিল্ক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং এই সমস্ত কার্যে রেয়ঁ-র ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের ন্যায় কোমল, মসৃণ, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ নহে তবুও সুলভতার জন্য কৃত্রিম রেশমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড প্রধান কৃত্রিম রেশম উৎপাদক দেশ। ক্যানাডা, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের কৃত্রিম রেশম শিল্প কেরালা, বোম্বাই ও অন্ধ্র অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে। ভারতের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। রেয়ঁ বস্ত্রের রপ্তানীকারক হিসাবে জাপান প্রধান। অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে পঃ জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য।

প্লাস্টিক শিল্প (Plastic industry)—কাষ্ঠ বা কার্পাস মণ্ডের সহিত নাইট্রিক এ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া "নাইট্রোসেলুলোজ" বা "পাইরোক্সাইলিন" প্রস্তুত করা হয়। ইহাই প্লাস্টিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত-

হইয়া থাকে। কাষ্ঠমণ্ড বা করাতের গুঁড়া হইতে যে "লিগনিন" পাওয়া যায় তাহার দ্বারাও প্লাষ্টিক প্রস্তুত হয়। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বহুবিধ গুণসম্পন্ন—যেরূপ ইস্পাত অপেক্ষাও কঠিন, এ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষাও হাল্কা, অগ্নি ও অম্লরোধক, বহুবিধ বর্ণ ও স্বচ্ছতা বিশিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাষ্টিক প্রস্তুত হইতেছে। প্লাষ্টিক বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্যে, বৈদ্যুতিক শিল্পে, জলরোধক বস্ত্র, গাণিতিক যন্ত্রপাতি, থলি, বোতাম, কোমরবন্ধ, জুতা, কৃত্রিম দাঁত, চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যাইতেছে।

ভারতের বনজ সম্পদ

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ অঞ্চল (Natural vegetation regions)—মানুষের প্রভাবমুক্ত অবস্থায় দেশে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যে, মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, গুল্ম ও তৃণভূমি এবং মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ্; প্রধানতঃ মৃত্তিকার গঠনের উপর নির্ভরশীল জলাভূমির অরণ্য এবং প্রধানতঃ ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার উপর নির্ভরশীল হিমালয়ের অরণ্য—এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান বিবৃত হইল—

(১) **চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** (Evergreen forests)—পূর্ব অবহিমালয় অঞ্চল, আসাম, পশ্চিম উপকূলের পর্বতাঞ্চল, আন্দামান প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০"-র অধিক, গড় উত্তাপ প্রায় ৭৫° ফাঃ এবং বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ৭০%-এর অধিক সে সমস্ত স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অসুবিধা, নিবিড় জঙ্গল এবং একই স্থানে এক জাতীয় বৃক্ষের স্বল্পতা হেতু এই সমস্ত অঞ্চলের অরণ্যসম্পদ মনুষ্যের প্রয়োজনে তাদৃশ ব্যয়িত হয় নাই। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে চাপলাশ, চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, তেলসুর, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) **মৌসুমী ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য** (Monsoon deciduous forests)—মালভূমির উত্তর-পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরের সমভূমি ও অবহিমালয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ৪০"-৮০"-র মধ্যে, সেখানে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাই ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। তবে প্রয়োজনের তাগিদে সমভূমির অন্তর্গত এই শ্রেণীর অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া কৃষিকার্যের ব্যবস্থা

করা হইয়াছে। এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ অতি মূল্যবান। এই বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, বহেড়া, গামারি, তুঁত, আবলুস, খয়ের, শিরিষ, শিমূল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুসুম, অঞ্জন, পাডুয়াক, কিন্দল, লরেল প্রভৃতি অতি মূল্যবান কাষ্ঠ ও বাঁশ পাওয়া যায়।

(৩) গুল্ম ও তৃণভূমি (Shrubland)—যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ ২০-৪০″ পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে অসহ্য গরম ও শীতে অসহ্য শীত অনুভূত হয় সে সমস্ত স্থানে কাঁটাযুক্ত বাবলা জাতীয় গাছ বা গুল্মভূমি দেখা যায়। পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে এই জাতীয় গুল্মলতা দৃষ্ট হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমির একাংশে, পার্বত্য অরণ্যভূমির মধ্যে মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে "স্যাভানা" তৃণভূমির অনুরূপ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সাবাই ঘাস এই সমস্ত তৃণভূমিতে প্রচুর জন্মে। ইহা হইতে কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত হয়।

(৪) মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ্ (Desert and semi-desert vegetation)—পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মালভূমির মধ্যাঞ্চলে যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত ২০″-র অনধিক সেই সমস্ত স্থানে কাঁটা ও শাঁসালো ডাঁটাযুক্ত এবং দীর্ঘমূলবিশিষ্ট ছোট ছোট বৃক্ষ দেখা যায়। ইহাদিগকে মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ (xerophytes) বলে। বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা প্রভৃতি এই অঞ্চলের বিখ্যাত বৃক্ষ। জ্বালানি হিসাবে এই সকল কাষ্ঠের ব্যবহার অত্যধিক। এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয় এবং ইহাদের ছাল রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
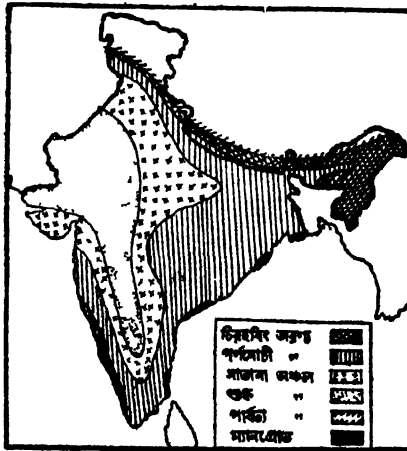
৫৮নং চিত্র—ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ অঞ্চল

(৫) জলাভূমির অরণ্য (Mangrove swamps)—সমুদ্রোপকূলে ও বৃহৎ নদীর বদ্বীপে যেখানে সর্বত্রই লোনা জল প্রবাহিত হয় সেখানে জলাভূমির অরণ্য দৃষ্ট হয়। তালজাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এই শ্রেণীর অরণ্যে প্রচুর জন্মে। সুন্দরবনের অরণ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরঞ্জনদ্রব্য ও মধু এই অঞ্চলের অরণ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের সুন্দরী ও পুশুর কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) **হিমালয় পর্বতাঞ্চলের অরণ্য** (Himalayan forest)—এই অরণ্যাঞ্চলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য—পাদদেশ হইতে ৩০০০′ পর্যন্ত গুল্মভূমি; ৩০০০′-৬০০০′ পর্যন্ত চীর পাইন; ৬০০০′-১০,০০০′ পর্যন্ত স্প্রুস, ফার, সিডার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য; এবং ১০,০০০′-১৫,০০০′ পর্যন্ত আল্পীয় উদ্ভিদ্ অঞ্চলে রডোডেনড্রন জন্মে। ১৫,০০০ ফুটের ঊর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ জন্মে না। (খ) পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য—পাদদেশ হইতে ৪০০০′ পর্যন্ত শাল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য; ৪০০০′-৮০০০′ পর্যন্ত ওক, লরেল, মেপল, বার্চ, অল্ডার প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য; ৮০০০′-১২০০০′ পর্যন্ত শ্বেতফার, স্প্রুস এবং দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য; এবং ১২০০০′-১৬০০০′ পযন্ত রডোডেনড্রন, জুনিপার প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। ১৬০০০ ফুটের ঊর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ বিস্তার নাই। এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের মধ্যে বার্চ, সাইপ্রাস, পাইন, স্প্রুস, ফার, দেবদারু প্রভৃতি প্রধান।

ভারতের সমগ্র আয়তনের মাত্র ২১·৮% অর্থাৎ ১২·৭৪ কোটি একর (১৯৫৭-৫৮) বনভূমি। তবে এই বনভূমির বণ্টন সর্বত্র সমান নহে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ১১% ও মধ্যাঞ্চলের ৪৪% ভূমি বনময়। আবার নিবিড় বসতিপূর্ণ ও কৃষিসমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। ১৯৫২ সালে বন সংক্রান্ত যে সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয় যে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩৫%-এ দাঁড় করাইতে হইবে। ইহার মধ্যে ৬০% বনভূমি পার্বত্য অঞ্চলে ও ২০% বনভূমি সমভূমি অঞ্চল থাকিবে। ভারতে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সাল হইতেই বিভিন্ন স্থানে বনমহোৎসব সুরু হয়, তদবধি ইহা একটি বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

বনজ সম্পদ (Forest products)—ভারতের অরণ্যাঞ্চলসমূহ হইতে আহৃত সম্পদকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—প্রধান বা মুখ্য বনজ সম্পদ এবং অপ্রধান বা গৌণ বনজ সম্পদ। **প্রধান বনজ সম্পদ** (**Major products**) বলিতে নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত নানাবিধ কাষ্ঠ ও জ্বালানিকে বুঝায়। নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠের বার্ষিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৮ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানী দ্বারা লব্ধ এই শ্রেণীর কাষ্ঠের মোট সরবরাহ প্রতি বৎসর ২১ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টন নরম ও ১৪ লক্ষ টন কঠিন কাষ্ঠ। এই ২১ লক্ষ টন কাষ্ঠের প্রায় ৩০% (৫·৮ লক্ষ টন) বিভিন্ন সরকারী কার্যে, যেরূপ রেলপথের পাটাতন নির্মাণ এবং নানাবিধ সামরিক ও বেসামরিক কার্যে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৭০% বিভিন্ন বেসরকারী কার্যে, যেরূপ দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, প্লাইউড, চায়ের বাক্স প্রভৃতি শিল্পে (৩·৩৫ লক্ষ টন) এবং গৃহাদি নির্মাণে (১১·৯৫ লক্ষ টন) ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র

নির্মাণে গোলাপ গন্ধ, চিকরাশি, চাপলাশ, তুন, শাল, সেগুন, গামারি, আবলুস, শিবিষ, বার্চ, প্রভৃতি , গৃহাদি নির্মাণে চিকরাশি, গর্জন, পুন, শাল, জারুল, সাইপ্রাস প্রভৃতি , প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে চাপলাশ, বহেড়া, শিমুল, পাইন, স্প্রুস, ফার, দেবদারু, পুণ্ডর প্রভৃতি ; রেলপথের পাটাতন, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি নির্মাণে সুন্দরী, চাপলাশ, গোলাপ গন্ধ গর্জন, তেলসুব, নাহার, শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, গামারি, পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি , হকি, ক্রিকেট ও টেনিস খেলার ব্যাট নির্মাণে তুঁত , ছড়ি ও ছড়ির বাট নির্মাণে আবলুস , ও কাগজের মণ্ড নির্মাণে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

ভারতে জ্বালানী কাষ্ঠের বার্ষিক উৎপাদনের হার প্রায় ৫৭ লক্ষ টন অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় ০·০২ টন। অথচ প্রতি বৎসর পৃথিবীতে গড়ে মাথাপ্রতি ০.৩৪ টন জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী হিসাবে এদেশে বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা, সুন্দরী প্রভৃতি কাষ্ঠের ব্যবহার অধিক।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ও জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদন বুঝা যাইবে :—

কাষ্ঠ ও জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদন

বৎসর	পরিমাণ (হাজার ঘন ফুট)						মোট মূল্য (হাজার টাকা)
	নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ	অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ	মণ্ড ও দিয়াশলাই প্রস্তুতির	জ্বালানী কাষ্ঠ	কাঠ কয়লা উৎপাদনের উপযোগী কাষ্ঠ	মোট উৎপাদন	
১৯৫০-৫১	১০,৫৬,৭৬	২,৯৫ ৭৯	৪,৭৫	৩৯,৪৩ ১৯	২,৭৫ ৬৯	৫৫ ৭৫,৫৮	১৯,০৮,০৭
১৯৫৫-৫৬	১১,৯৮,৬৭	২,৫৪ ৩৭	১৪,৮১	৩২,৬০,৫৭	৫,৫৬,৬১	৫২,৮৫,০৩	২৭,৬৮,৮২
১৯৫৭-৫৮	১৩,৩২,৩২	২,৯৬,৫৬	১৯,৭৮	৩৬,০১,৯১	২,৭৩,৮৮	৫৫,২৪,৫৬	২৮,২১,৩০

উপরোক্ত প্রধান বনজ সম্পদ ব্যতীত ভারতীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর **অপ্রধান বনজ সম্পদ** (Minor products)-ও আহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য হইতে **লাক্ষা** পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে ভারতের প্রাধান্য খুব বেশী। বার্নিশ, ছাপাখানার কাজ, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার প্রচুর। দেশাভ্যন্তরে ইহার চাহিদা অল্প থাকায় প্রায় সমুদয় লাক্ষাই কলিকাতা বন্দর হইতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপানে রপ্তানী হইয়া যায়।

হিমালয় ও আসামের পর্বতাঞ্চলে চীরপাইন বৃক্ষ হইতে **ধুনা** উৎপাদিত হয়। ইহা হইতে **তার্পিন** তৈলও পাওয়া যায়। কাচের সহিত মিশাইবার জন্য এবং কাগজ, ঔষধ, বার্নিশ ও সাবান প্রভৃতিতে ধুনা ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে **হরীতকী** জন্মে। ঔষধ ও রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতিতে এবং চামড়া পাকা করিতে হরীতকী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, চীন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর হরীতকী ভারত হইতে রপ্তানী হয়। দার্জিলিং ও নীলগিরি পর্বতাঞ্চলের বৃষ্টিবহুল অংশে **সিঙ্কোনা** বৃক্ষের চাষ হয়। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর **সুপারি** জন্মিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে প্রচুর **তালবৃক্ষ** জন্মে। তালের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। মরু অঞ্চলে **খেজুর** বৃক্ষ জন্মে। ইহা হইতে খেজুর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে যে খেজুর গাছ জন্মে তাহার রস হইতে গুড়, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর **বাঁশ** জন্মে। বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। চন্দন (মহীশূর), নানাবিধ তৈল এবং মূল্যবান ভেষজ দ্রব্য, বেত, খস, সোলা, হোগলা, মাদুর কাঠি, সাবাই ঘাস প্রভৃতিও অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে উৎপাদিত অপ্রধান বনজ সম্পদের মূল্যগত পরিমাণ বুঝা যাইবে :—

অপ্রধান বনজ সম্পদের মূল্যগত পরিমাণ

(হাজার টাকা)

সাল	বাঁশ ও বেত	তন্তু ও রেশম সদৃশ বস্তু	গঁদ ও ধুনা	অন্যান্য অপ্রধান বনজ সম্পদ	মোট মূল্য
১৯৫০-৫১	১,৫২,০০	৫২	৪১ ৯৩	৪ ৯৮,০৩	৬,৯২,৪৮
১৯৫৫-৫৬	১,৩৬,৭৮	৪৩	১,০১,৪২	৫,৬৩,১১	৮,০১,৭৪
১৯৫৭-৫৮	১,৩৪,৫৯	৮২	১,২৫,৬১	৫,৯৩,১৮	৮,৫৪,২০

বনজ শিল্পের অনুন্নতির কারণ (**Causes of backwardness of Indian forestry**)—বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণবশতঃ ভারতের বনজশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। (১) ভারতের বনাঞ্চলসমূহ সাধারণতঃ দুর্গম ; (২) বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবার উপযোগী যানবাহনের অভাব ; (৩) কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদার অভাব ; (৪) একজাতীয়

বহুসংখ্যক বৃক্ষের একত্র সমাবেশের অভাব ; এবং (৫) কাগজ প্রস্তুত করিতে মণ্ড তৈয়ারীর জন্য নরম কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের অসুবিধা। ভারতে বনজ সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার, শিল্পে ইহাদের প্রয়োগ বৃদ্ধি এবং ইহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য দেরাদুনে ভারতীয় **বনবিজ্ঞান গবেষণাগার** (Forest Research Institute) গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বনোন্নয়ন (Indian forests under five year plans): **প্রথম পরিকল্পনায়** (১৯৫০-৫১।১৯৫৫-৫৬) কার্যকালে—(১) ৭৫,০০০ একর পরিমিত জমিতে নূতন অরণ্য রচনা, বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলে নূতন ৩০০০ মাইল রাস্তা নির্মাণ, পতিত জমিযুক্ত অঞ্চলে পশুখাদ্য খড ও জ্বালানীর উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পে গ্রাম্য ও ছোট ছোট আবাদের পত্তন, বেসরকারী হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আগত ২০০ লক্ষ একর পরিমিত বনভূমিসমূহে সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কয়েকটি নূতন বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কার্যের প্রবর্তন করা হয়। (২) দিয়াশলাই শিল্পের উপযোগী কাষ্ঠের আবাদ বার্ষিক ৩০০০ একর করিয়া বৃদ্ধি পায়। (৩) বন সংক্রান্ত নানারূপ গবেষণা, যেরূপ ভারতে মালয়ী বেতের চাষ, সামুদ্রিক কীটের উপদ্রব হইতে কাষ্ঠ রক্ষা, বাঁশ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। (৪) বন সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে দেরাদুন বনবিজ্ঞান গবেষণাগারের সম্প্রসারণ সাধিত হয়। (৫) বন্যজীব সংরক্ষণ সম্পর্কে ১৯৫২ সালে "ইণ্ডিয়ান বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ" নামক সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এই পরিকল্পনাকালে বনোন্নয়ন কার্যে মোট ৯·৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৬।১৯৬০-৬১) বনসংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বনোন্নয়নমূলক কার্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়। (১) সরকারী হইতে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আগত প্রায় ৩·৮ লক্ষ একর পরিমিত বনভূমির উন্নয়ন ; (২) নিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের নদী ও খাল তীরবর্তী স্থানে, রাস্তার উভয় পার্শ্বে এবং পরিত্যক্ত ভূমিভাগে বনের প্রসারণ ; (৩) ৫০,০০০ একর পরিমিত জমিতে নূতন করিয়া মূল্যবান কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষ, যেরূপ শাল প্রভৃতির, ৫০,০০০ একর অতিরিক্ত জমিতে দিয়াশলাই কাষ্ঠের, ১৩,০০০ একর পরিমিত জমিতে চর্মরঞ্জন, কাগজ ও কৃত্রিম রেশমশিল্পে ব্যবহৃত ওয়াটল্ ও ব্লু গাম বৃক্ষের এবং কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত বেব্ (baib) ঘাস চাষের বৃদ্ধি ; (৪) বনভূমির অন্তর্গত স্থানে ৭৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ ; (৫) উন্নত প্রণালীর কাষ্ঠ আহরণ ; (৬) নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাষ্ঠের ব্যবহার বৃদ্ধি কল্পে ১৩।১৪টি কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও সহনশীল-করণের কারখানা স্থাপন ; (৭) ২০০০ একর পরিমিত জমিতে ভেষজ উদ্ভিদের রোপণ ; (৮) কয়েকটি "বনজ সম্পদ সমীক্ষা" ও একটি "কাষ্ঠ প্রজাতি সমীক্ষার" স্থাপন ; এবং (৯) ৫ লক্ষ

একর পরিমিত তৃণভূমি অঞ্চলে চারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা কালে (১০) দেরাদুন (কাষ্ঠ আহরণ, নূতন বৃক্ষের প্রবর্তন, বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি ও কাষ্ঠের ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণা), কোয়েম্বাটোর (প্রজনন ও বৃক্ষচাষ সংক্রান্ত গবেষণা) ও ব্যাঙ্গালোর-এর (বনজ সম্পদ সংক্রান্ত গবেষণা) গবেষণা কেন্দ্রে বনোন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপক গবেষণা চালান হয়। (১১) বনাঞ্চলসমূহের পশ্চাৎপদ অধিবাসীদের উন্নতি বিধান, সমবায় পদ্ধতিতে বনজ উঞ্ছবৃত্তির সংগঠন ও বনাঞ্চলসমূহে অস্থায়ী কৃষিকার্যের পরিবর্তে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। (১২) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ১৮টি জাতীয় উদ্যান ও পশু-রক্ষণাগার এবং দিল্লীতে একটি আধুনিক পশুশালা স্থাপিত হয়। (১৩) বিভিন্ন রাজ্যগত অরণ্যনীতি, বনোন্নয়ন ও পরিচালনা সম্পর্কে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন: বন পরিসংখ্যান ও বনজ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির উন্নতি সাধন, বনজ দ্রব্যের সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ সাধন প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া একটি "কেন্দ্রীয় ফরেষ্ট্রি কমিশন" গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বনোন্নয়ন কার্যে মোট ব্যয় হয় ১৯·৩ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬১।১৯৬৫-৬৬) বনোন্নয়নমূলক কার্যের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত কার্যসূচীর ব্যাপকতর অনুসরণ, (২) ২১০,০০০ একর পরিমিত জমিতে সেগুন কাষ্ঠের, ৪০,০০০ একর পরিমিত জমিতে বাঁশ, ৬০,০০০ একর পরিমিত জমিতে দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত কাষ্ঠের, ২২,০০০ একর পরিমিত জমিতে ওয়াটল বৃক্ষের, ৪৬,০০০ একর পরিমিত জমিতে জ্বালানী কাষ্ঠের, ৩২৫,০০০ একর পরিমিত জমিতে অন্যান্য কাষ্ঠের এবং ৩০০,০০০ একর পরিমিত জমিতে শিল্পে ব্যবহৃত ও দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ চাষের প্রবর্তন; (৩) গ্রামাঞ্চলে বনভূমির ও জ্বালানী কাষ্ঠ-চাষের প্রবর্তন এবং নদী ও খাল তীরবর্তী অঞ্চলে, জাতীয় ও রাজ্যগত সড়কগুলির ও রেলপথের উভয় পার্শ্বে বনের প্রসারণ; (৪) অধিকতর উৎপাদনের জন্য বনজ শিল্পে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারণ; (৫) অপ্রধান বনজ সম্পদের আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৬) নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাষ্ঠের ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে ২৭টি কাষ্ঠ সহনশীল করণের ও ৩টি কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও সহনশীল-করণ কারখানার স্থাপন; (৭) ৪৩,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি অঞ্চলের সমীক্ষণ এবং উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলের পুর্ব সমীক্ষিত ৬০,০০০ একর পরিমিত বনভূমি অঞ্চলের পুনর্বাসন; (৮) বনজ সম্পদ ও বনজ শিল্প সম্পর্কে সুষ্ঠু সমীক্ষার প্রবর্তন; (৯) ১৫০,০০০ একর পরিমিত তৃণভূমি অঞ্চলে চারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (১০) বনজ সম্পদ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা কার্য চালাইবার জন্য অতিরিক্ত তিনটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের স্থাপন; (১১) বনবিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসারণ; (১২) ৫টি পশুশালা, ৫টি জাতীয় উদ্যান এবং ১০টি বন্যপ্রাণীর আশ্রয়

স্কুল স্থাপন এবং দিল্লীর পশুশালাটির সম্প্রসারণ, (১৩) বনাঞ্চল সমূহের পশ্চাৎপদ অধিবাসীদের উন্নতি বিধান ও বনজ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠন ; এবং (১৪) বনজশিল্পের উন্নতি কল্পে জনসাধারণের সহযোগিতারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বনোন্নয়ন কল্পে ৫১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. State the utility of forests. Describe the different forest regions of the world and discuss the nature of their economic exploitations. (C. U. '5)

(অরণ্য হইতে আমরা যে সমস্ত উপকার পাই তাহা লিখ। পৃথিবীর অরণ্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ সাধন ও উহাদের প্রত্যেকটি বিভাগের বর্ণনা কর এবং উহাদের ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৬৯-২৭২)

2. Indicate the regions of soft wood forest in the world and examine the nature of exploitation of these forests. (C. U. '55)

(পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কোমল কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে তাহাদের নাম লিখ এবং এই অরণ্যাঞ্চল সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৭১-২৭৫)

3. Indicate the recent development of wood cellulose industries of the world.

(বর্তমান পৃথিবীতে কাষ্ঠমণ্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন শিল্পের যে সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৭৬-২৭৮)

4. Enumerate the geographical factors determining the location of paper industry and name the regions which are noted for paper manufactures.

(কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে যে সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থা অনুকূল তাহা নির্দেশ কর এবং পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কাগজ শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম লিখ।) (পৃঃ ২৭৬-২৭৭)

5. What are the chief forest areas in India ? Give an account of the foresr products of India. (C. U. '53, '57)

(ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলসমূহ কি কি ? ভারতের বনজ সম্পদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৭৬-২৮২)

6. Discuss the measures that have been adopted in recent years for the development of Indian forests.

(ভারতের বনভূমির উন্নয়ন কল্পে সম্প্রতি যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহার আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৮৩-২৮৫)

7. Name the countries where timber industry has developed, giving reasons for such development. Also indicate the present state of this industry in India. (H. S. '61)

(পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কাষ্ঠ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম লিখ এবং ঐ সমস্ত দেশে এই শিল্পের প্রসারের কারণসমূহ উল্লেখ কর। এই শিল্প সম্পর্কে ভারতের বর্তমান অবস্থাও নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৭৩-২৭৫)

তৃতীয় খণ্ড

পরিবহন ব্যবস্থা

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—স্থলপথ

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদনের পরেই পরিবহনের স্থান। কারণ উৎপাদন ও ভোগকেন্দ্র সমূহের মধ্যে স্থানগত ব্যবধান হেতু প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রায়শঃই উৎপাদনকেন্দ্রে ভোগ করা সম্ভব হয় না। আবার বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত দ্রব্য শিল্পকেন্দ্র সমূহে শিল্পীত পণ্য হিসাবে রূপান্তরিত হইয়াই ভোগকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই কারণে উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রে বা শিল্পকেন্দ্রে এবং তথা হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমস্ত দ্রব্যাদির পরিবহন করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা, পরিবাহিত পণ্যের প্রকারভেদ, পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন-প্রকারের যানবাহন, বিভিন্ন প্রকৃতির যানবাহন কর্তৃক ব্যবহৃত বাণিজ্য-পথ সমূহের বিভিন্নতা, বাণিজ্য-পথ সমূহের অবস্থিতি প্রভৃতির অনুশীলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (Importance of transport system)—যে কোন স্থানের বৈষয়িক উন্নতি তথাকার পরিবহন-ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে পৃথিবীর কোন অঞ্চলই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অথচ বর্তমান কালে মানুষের চাহিদা ব্যাপক। সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভোগ্য পণ্য অল্পাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। এইজন্য বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর এই পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার। দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন যেরূপ একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অন্যদিকে তেমনি ইহা উৎপাদনে গতিবেগও সঞ্চার করিয়া থাকে। কারণ কোন দেশ হইতে যদি এক বা একাধিক পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে

সম্ভবপর ক্ষেত্রে ঐ দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়াসও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থনীতির দৃষ্টিতে পরিবহন উৎপাদনেরই একটি অঙ্গ, কারণ যেখানে দ্রব্যসম্ভার মানুষের ভোগে লাগিতে পারে কেবলমাত্র সেখানে নীত হইলেই উহা উৎপন্ন দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত হয়। চতুর্থতঃ, পরিবহন ব্যবস্থা যতই প্রসার লাভ করে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্যও ততই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আবার এই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে বিভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের মধ্যে বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের সহযোগ ও সহশৃঙ্খল স্থাপন এবং ইহাই হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলভিত্তি। পঞ্চমতঃ, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ধারাবাহিক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বাণিজ্য ও পরিবহন-ব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিবহন-ব্যবস্থায় প্রসারলাভ ঘটিয়াছে অন্যদিকে তেমনই পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসারলাভ ঘটায় বাণিজ্যের পারমাণও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইউরোপের সহিত এশিয়া মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক পণ্যের দ্রুত পরিবহনের সুবিধার জন্য সুয়েজখালের খনন করা হয় কিন্তু সুয়েজখাল খননের পর হইতেই ঐ দুইটি মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুরূপভাবে পানামাখাল খননের পর হইতেই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলাঞ্চলের বাণিজ্যের পবিমাণ ও আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার পরিলক্ষিত হয় এবং ইহারই ফলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রসারলাভ করে ও বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ, সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপার্জিত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কারণ পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে দুরধিগম্য স্থানের সম্পদও মানুষের অধিগত হইয়া প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়। চিলির নাইট্রেট, পঃ অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, কিম্বার্লির হীরক এই নিয়মেরই উদাহরণস্থল।

পরিবহনের প্রকারভেদ (Modes of transport)—পণ্য-পরিবহন ও গমনাগমন বর্তমান কালে মানুষ, পশু, মোটর গাড়ী ও রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে **স্থলপথে**; নৌকা, স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক **জলপথে** এবং বিমানপোতের সাহায্যে **আকাশপথে** সাধিত হইয়া থাকে।

স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থা (Land transport system)—স্থলপথে **মানুষ** আদিম অবস্থায় নিজেই পণ্য বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইত। আজও পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং প্রতিকূল

পরিবেশযুক্ত অংশের লোকেরা পণ্য-পরিবহন এবং গমনাগমনের জন্য প্রধানতঃ মানুষের বহনক্ষমতার উপরেই নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি হেতু পার্বত্য অঞ্চলে, প্রতিকূল জলবায়ু হেতু নিরক্ষীয় অরণ্যাঞ্চলে এবং আর্থিক অসংগতি হেতু ভারত, জাপান ও চীনের সমভূমি অঞ্চলসমূহেও পরিবহন কার্যে মনুষ্যশক্তির বহুল প্রয়োগ আজও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পশু—পরিবহন-কার্যে ভারবাহী পশু যন্ত্রসভ্যতায় উন্নত ইউরোপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য স্থানেব কথা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে অশ্ব প্রধান ভারবাহী জন্তু। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে বৃষ, দক্ষিণ ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে গর্দভ, এবং পার্বত্য অঞ্চলে অশ্বতর, হিমমরু অঞ্চলে বল্গা হরিণ ও কুকুর; মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চমরী গরু, ছাগল ও ভেড়া; দক্ষিণ-আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের দিকে লামা; এশিয়ায় হস্তী ও উষ্ণ মরু অঞ্চলে উট মানুষের প্রধান সহায়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি সতর্কতার সহিত অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পরিবহন কার্যে পশুশক্তির ব্যবহারও আঞ্চলিক ভৌগোলিক ও আর্থিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হহয়া থাকে।

রাস্তা—মানুষ এবং পশু যে যুগে পণ্য পরিবহন কার্যে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত থাকিত সে যুগে রাস্তাঘাটের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কিন্তু শকটের প্রচলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে রাস্তা ও যানবাহনের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম পর্বে যখন মানুষ ও পশু নিজেই পণ্য-পরিবহন করিত তখন পায়ে চলা সংকীর্ণ রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তার প্রচলন ছিল না। দ্বিতীয় পর্বে শকটের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শকট চালনার উপযোগী প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা নির্মিত হয়। তৃতীয় পর্বে যখন শকটের চাকা লোহার পাত দিয়া মোড়া হয় তখন পাকা রাস্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। চতুর্থ পর্বে মোটর গাড়ীর প্রচলনহেতু এ্যাসফাল্টের সাহায্যে পাকা রাস্তাকে সুদৃঢ় ও ঘর্ষণসহ করা হয় এবং রেলগাড়ীর প্রচলন হেতু রেলপথের প্রবর্তন করা হয়।

সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে ১ কোটি মাইল পরিমিত রাস্তা রহিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ শহরেই বর্তমানে মোটর গাড়ী চলাচলের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অস্ট্রেলিয়া, আরব, সাহারা প্রভৃতি মরু অঞ্চলেও মোটর পথে চলাচল ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী রহিয়াছে। এই দেশে গড়ে প্রতি ৪ জন লোকের ১ খানা করিয়া, ব্রিটেনে প্রতি ১৮ জন লোকের ১ খানা করিয়া এবং ভারতে প্রতি ১৯০০ জন লোকের ১ খানা

করিয়া মোটর গাড়ী রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে মোটরগাড়ী ও ট্রামগাড়ীর দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তম রাস্তার গুরুত্বও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যবস্থা সাধারণতঃ ভৌগোলিক ও আর্থিক পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কারণ, প্রথমতঃ পার্বত্য অঞ্চল, জলাভূমি, মরুভূমি, কোমল শিলাস্তরে গঠিত বৃষ্টিবহুল অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ভাল রাস্তা নির্মাণ ও উহার সংরক্ষণ অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য এবং দ্বিতীয়তঃ, ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু (প্রতি ৬০ একক ক্ষিতিজ দূরত্বে ১ হইতে ৩ একক পর্যন্ত ভূমির উন্নতি) হইলে উত্তম মোটর পথ ও রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয় কিন্তু ভূমির ঢাল তীব্র হইলে, ভাল রাস্তা নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলসমূহে যদি বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা, নিবিড় লোকবসতি, অধিবাসীদের উন্নত জীবনমান, রাস্তা নির্মাণের উপযোগী উপকরণসমূহের সুলভতা, এবং যান্ত্রিক শকট চালনার উপযোগী শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ত ও সুলভ সরবরাহ থাকে তবে ঐ সমস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার পূর্বার্ধে ক্যানাডার দক্ষিণাংশ হইতে মেক্সিকো উপসাগরীয় উপকূলাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেই রাস্তাঘাটের প্রসারণ ব্যাপক। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ অংশ রাস্তা বিদ্যমান।

শিল্পপ্রধান **পশ্চিম ইউরোপের** বিভিন্ন দেশে রাস্তাঘাট বিশেষ উন্নত ধরণের। তবে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। **সোভিয়েট রাষ্ট্রে** মোটর পথ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ইউরোপীয় রুশিয়ার মস্কো-লেনিনগ্রাদ, মস্কো-মিন্‌স্ক্‌, লেনিনগ্রাদ-টিফ্‌লিস্ এবং ট্রান্স-ককেশিয়ার 'জর্জিয়ান মিলিটারী'ও ওস্‌সেটিয়ান পথ এবং এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার স্টালিনাবাদ-খোরাগ এবং স্টালিনাবাদ-অস্-ফুঙ্গ-তেরমেজ পথ; সাইবেরিয়ার ভ্লাডিভস্টক-খাবারোভস্ক-কমসোমল্‌স্ক, আমুর-ইয়াকুৎস্ক, ইর্খুটস্ক-কিরেনস্ক, ম্যাগাদান-কলিমস্ক এবং ওখোটা-ইয়াকুৎস্ক পথসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি রাস্তা আলমা আতা হইতে সিনকিয়াংএর রাজধানী উরুমচী পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। **এশিয়া** মহাদেশের চীন ও ভারতেই রাস্তার পরিমাণ সমধিক। চীন দেশে সড়কের পরিমাণ ৮৬০০০ মাইল। ইহাদের মধ্যে কুনমিং-লাসিও (বার্মা রোড), জিচুয়ান-হুনান, হানচুং-পাইহো, জিচুয়ান-ইউনান, লাসান-সিচাং এবং সিচাং-সিয়াংগুণ রাজপথসমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের রাস্তা ও সীমান্ত পথসমূহ

ভারতের রাস্তা (**Indian road transport system**)—১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৯৭,৫৪৬ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১৫০,৯৬৩ মাইল কাঁচা রাস্তা

ছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষবর্ষ (৩১-৩-৫৬) পর্যন্ত অতিরিক্ত ২৪,০৭১ মাইল পাকা রাস্তা ও ৪৯,০৮৮ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্মিত হয়।* আয়তন এবং প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রাস্তার পরিমাণ অতি অল্প এবং গ্রামাঞ্চলে ভাল রাস্তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে ভাল রাস্তার অধিকতর প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। যে সমস্ত স্থানে রেলপথ নাই বা রেলপথ নির্মাণের অসুবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত স্থানে রাস্তা নির্মাণ করিয়া পণ্য চলাচলের সুব্যবস্থা করা আশু কর্তব্য। এক্ষেত্রে রাস্তাসমূহ রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া উহার পরিপূরক হইলেই দেশের মঙ্গল।

ভারতের রাস্তাসমূহ **ত্রুটি (defects)** বহুল—কারণ (১) পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে ; (২) অধিকাংশ রাস্তাই অতি সঙ্কীর্ণ, (৩) বহু রাস্তার অন্তর্বর্তী নদীর উপর এখনও সেতু প্রস্তুত হয় নাই, আর যেগুলি রহিয়াছে সেগুলিও অতি সঙ্কীর্ণ ; আবার (৪) বহুক্ষেত্রে রাস্তাগুলি সংস্কারের অভাবে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

পথের বিস্তার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। **নাগপুর পরিকল্পনা** (১৯৪৩) অনুসারে ভারতে মোট ৩৩১,০০০ মাইল পথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার মধ্যে ১২৩,০০০ মাইল পাকা এবং ২০৮,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা। এই **পরিকল্পনা** অনুসারে ভারতের রাস্তা-সমূহকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) জাতীয় রাজপথ (১৬,৬০০ মাইল) ও জাতীয় রাজপথ সংযোগকারী পথ (৪,১৫০ মাইল)—এই পথসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। ৬টি জাতীয় রাজপথ দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিবে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১১.৯ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথ ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২.৫ হাজার মাইল। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ জাতীয় রাস্তার পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান ১৫ হাজার মাইল। ইহাদের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড উত্তরাংশ (দিল্লী-অমৃতসর-পঃ পাক সীমান্ত), গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পূর্বাংশ (দিল্লী-আগ্রা-কানপুর-কলিকাতা), আগ্রা-বোম্বাই, কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই, পাঠানকোট-জম্মু-শ্রীনগর-উরি, বোম্বাই-ব্যাঙ্গালোর-মাদ্রাজ, কলিকাতা-মাদ্রাজ, কাশী-নাগপুর-হায়দরাবাদ-কুরনুল-ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারিকা, দিল্লী-আমেদাবাদ-বোম্বাই, আমেদাবাদ-কাণ্ডলা-পোরবন্দর, আম্বালা-সিমলা-তিব্বত (হিন্দুস্থান-তিব্বত পথ), দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-গোরক্ষপুর, মজঃফরপুর-নেপাল, আসাম প্রবেশ পথ, আসাম ট্রাঙ্ক রোড, আসাম ট্রাঙ্ক রোড হইতে প্রসারিত শাখাসমূহের সাহায্যে মণিপুর হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত প্রসারিত পথসমূহই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (২) প্রাদেশিক রাজপথ (৫৩,৯৫০ মাইল)

*সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্রসমূহের অন্তর্গত রাস্তাসমূহ (৪৪,২৫৯ মাইল) লইয়া।

—এই পথসমূহ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। ইহারা প্রাদেশিক শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহকে সংযুক্ত করিবে এবং রাজ্যান্তর্গত জাতীয় রাজপথের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে প্রাদেশিক রাস্তার পরিমাণ ছিল ১৭·৬ হাজার মাইল; ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ হাজার মাইল। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এই শ্রেণীর রাস্তার পরিমাণ ৩৫ হাজার মাইল দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। (৩) জেলান্তর্গত ও গ্রাম্য পথ (২৫৬,৩০০ মাইল)—জেলাবোর্ড কর্তৃক এই পথসমূহ নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। রাজ্য সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রাস্তা উন্নয়ন (Indian road under Five Year Plans)—প্রথম পরিকল্পনার কাযকালে বহু নূতন রাস্তার নির্মাণ, পুরাতন রাস্তার সংস্কার এবং ৩৩টি বৃহদায়তন ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতুর নির্মাণকায সমাধা হয়। এই পরিকল্পনা কালে জম্মু-বানিহালসুড়ঙ্গ-কাশ্মীর, পাসি-বদরপুর, পশ্চিম উপকূলের রাস্তা, পাঠানকোট-উধমপুর সংযোগকারী একটি পরিবত রাস্তা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তা এবং কয়েকটি আন্তঃ-প্রাদেশিক রাস্তার নির্মাণ কায চলিতে থাকে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে (৩১-৩ ৫৬) ভারতে মোট রাস্তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২২,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ১,৯৮,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা। রাস্তা উন্নয়নমূলক কাযে প্রথম পরিকল্পনা কালে মোট ব্যয় হয় ১৪৬·৮ কোটি টাকা। **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** কাযকালে প্রথম পরিকল্পনায় গৃহীত কিন্তু অসম্পূর্ণ কার্যাদি চালাইয়া যাওয়া হয় এবং এই পরিকল্পনা কালে বহু "সংযোগকারী" রাস্তা, বৃহদায়তন সেতুর নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার, সংকীর্ণ রাস্তার বিস্তার, প্রাদেশিক রাস্তার নির্মাণ এবং বহু নূতন গ্রাম্য পথের নির্মাণ ও পুরাতন গ্রাম্য পথের সংস্কার সাধন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (৩১-৩-৬১) ভারতে মোট রাস্তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪৪,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ২,৫০,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাযকালে রাস্তা উন্নয়ন কার্যে ২৪১·৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই পরিকল্পনার শেষ বর্ষে ভারত নাগপুর পরিকল্পনা কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা নির্মাণের ভাগ অতিক্রম করিয়া যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নমূলক কাযসূচী একটি নূতন দীর্ঘমেয়াদী (১৯৬১-৮১) পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটির প্রধান উদ্দেশ্য হইল—(ক) উন্নত ও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামের ৪ মাইলের অনতিদূরে পাকা রাস্তা এবং ১·৫ মাইলের অনতিদূরে অন্যান্য রাস্তা থাকিবে; (খ) অর্ধোন্নত অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামের ৮ মাইলের অনতিদূরে পাকা রাস্তা এবং ৩ মাইলের অনতিদূরে অন্যান্য রাস্তা থাকিবে; এবং (গ) অনুন্নত অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামের ১২

মাইলের অনতিদূরে পাকা রাস্তা এবং ৫ মাইলের অনতিদূরে অন্যান্য রাস্তা থাকিবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮১ সাল নাগাদ ভারতে ২,৫২,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ৪,০৫,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা প্রসারিত থাকিবে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে ভারতের প্রতি ১০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে গড়ে ৫২ মাইল রাস্তা থাকিবে (বর্তমানে প্রতি ১০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে রাস্তার পরিমাণ প্রায় ৩১ মাইল)।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নমূলক কার্যে ২৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকালে বহু প্রাদেশিক পাকা রাস্তার নির্মাণ, জাতীয় রাজপথসমূহের উন্নয়ন, ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি নূতন জাতীয় রাজপথের (সালামারা হইতে ব্রহ্মপুত্র-সেতু পযন্ত প্রসারিত) নির্মাণ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত আন্তঃপ্রাদেশিক রাস্তাসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যস্থচীর রূপায়ণ ও কয়েকটি নূতন পরিকল্পনার গ্রহণ, অনুন্নত ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে রাস্তার প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন রাস্তার প্রবর্তন এবং রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণামূলক কার্যস্থচী গ্রহণ করা হইবে।

ভারতের সীমান্ত-পথ (India's land frontier routes)—ভারতের স্থল-সীমান্ত ৯,৩০৯ মাইল দীর্ঘ হইলেও সীমান্ত পথের বাণিজ্য অতি সামান্য। উচ্চ ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা, গভীর অরণ্য, বিস্তীর্ণ মরুভূমি এবং রেলপথের অভাব হেতু সীমান্ত-পথের বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি
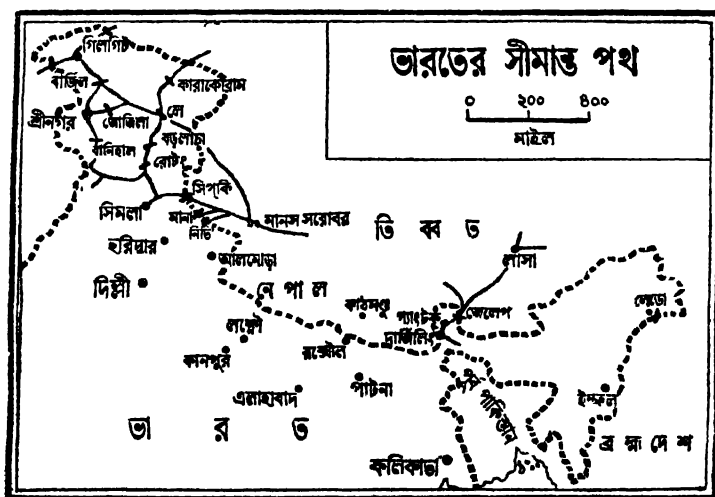
৫৯ নং চিত্র—ভারতের সীমান্তপথ

লাভ করে নাই। চমরী গাই, অশ্বতর, উট এবং টাট্টু ঘোড়ার সাহায্যে মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও নেপালের সহিত সীমান্ত-পথের বাণিজ্য

নিষ্পন্ন হয়। ভারতের সীমান্তপথসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) শ্রীনগর হইতে বন্দীপুর হইয়া এবং বরজিল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া গিলগিট পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। এই পথ গিলগিট হইতে পামির পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। (২) শ্রীনগর ও সোনামার্গ হইতে জোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে বিস্তৃত পথ। (৩) লেহ্ হইতে কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সিনকিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (৪) কুলু উপত্যকার যোগীন্দ্রনগর হইতে রোটাঙ্গ ও বড়লাচালা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া লেহ্ পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (৫) সিমলা হইতে সিপ্‌কি গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া মানসসরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (৬) সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হইতে জেলেপ্‌লা ও নাথুলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া লেহ্ পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (৭) আকিয়াব হইতে প্রসারিত একটি পথ টোনগুপ গিরিবর্ত্ম এবং আরাকান-ইয়োমা অতিক্রম করিয়া প্রোম অঞ্চলে ব্রহ্ম রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। (৮) ডিমাপুর হইতে কোহিমা, মণিপুর ও ব্রহ্ম সীমান্তের তামু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথ রহিয়াছে। তামু হইতে আর একটি পথ ইয়ে-উ ও মান্দালয় অঞ্চলে ব্রহ্মদেশের রেলপথ-সমূহের সহিত সংযোগ সাধন করিতেছে। (৯) লুসাই পর্বতাঞ্চলের আইজাল হইতে ফালাম ও পাকোকু পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (১০) আসাম-চুংকিং পথ—এই পথ উত্তর-পূর্ব অসামের লেডো অঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশের মিতকিইনা হইয়া ভামো এবং সেখান হইতে পাওসান হইয়া কুনমিং পর্যন্ত গিয়াছে। কুনমিং হইতে এই পথ আবার চীনদেশের চুংকিং পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমগ্র পথটিকে স্টীলওয়েল বা বার্মা রোড বলা হয়। লেডো হইতে কুনমিং পর্যন্ত এই পথের দৈর্ঘ্য ১০৪৪ মাইল এবং কুনমিং হইতে চুংকিং প্রায় ১০০০ মাইল। সীমান্তপথে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেলপথ (Railways)

বাষ্প-চালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পর হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র রেলপথের বিস্তার ঘটিতে থাকে। বর্তমানে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ ভূখণ্ডগুলি ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই রেল-পথের প্রসার সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুভার পণ্যসম্ভারের দ্রুত ও দীর্ঘপথ পরিবহনের জন্য রেলপথই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। পৃথিবীতে বর্তমানে ৭'৮ লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে।

রেলপথ বনাম **মোটর পথ (Rail transport *versus* Motor transport)**—বৃহদায়তন ও গুরুভার পণ্যসম্ভার দীর্ঘপথ পরিবহনে রেলপথ মোটরপথ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথের কয়েকটি বিষয়ে সুবিধা রহিয়াছে। যেমন—(১) পণ্যসম্ভারের দূরত্ব ও

দ্রুত পরিবহনে রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ বিশেষ উপযোগী এবং অল্পব্যয়-সাপেক্ষ; (২) রেলপথসমূহকে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র বিস্তার করা সম্ভব নহে, কিন্তু মোটরে অধিকাংশ স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর; (৩) মোটর-পথে মোটরগাড়ী যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু রেলপথে রেলগাড়ী নির্দিষ্ট পথ ও সময় ব্যতীত যাতায়াত করিতে পারে না। (৪) মোটরপথে পণ্য-সম্ভারের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে সরাসরিভাবে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু রেলপথে ইহা সম্ভব নহে; (৫) রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় অল্প। বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় রেলপথ এবং মোটরপথ কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতিযোগীই নহে, পরিপূরকও বটে। কারণ মোটর গাড়ী সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে পণ্যসংগ্রহ করিয়া রেলগাড়ীর পণ্য সরবরাহ করে এবং রেলপথে পরিবাহিত পণ্যসম্ভারও মোটর গাড়ীর সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে বণ্টন করা হইয়া থাকে। এই ভাবে মোটরপথ ও রেলপথ পরস্পরের পরিপুরক হইয়া কার্য করে।

রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (Influence of environment on the laying down of railway lines)—কয়েকটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রেলপথের নির্মাণ ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভৌগোলিক পরিবেশ—(১) বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেই রেলপথের ব্যাপক প্রসার সম্ভব। কারণ বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে রেলপথস্থাপন অত্যন্ত কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। (২) অত্যন্ত আর্দ্র নিম্নভূমি বা জলাভূমিতে, এবং তুষারাবৃত ও মরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য। এই কারণে মন্দোষ্ণ জলবায়ু ও মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহই রেলপথ স্থাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। (৩) নদী-খাল-হ্রদবহুল অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। এই কারণে পুর্ববঙ্গের সর্বত্র রেলপথ স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

অর্থনৈতিক পরিবেশ—যুক্তরাষ্ট্র ও পঃ ইউরোপের দেশগুলির ন্যায় যে সমস্ত অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যোন্নত সেই সমস্ত অঞ্চল রেলপথ নির্মাণে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রণী। অপর পক্ষে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যানাডা, সাইবেরিয়া, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরল লোকবসতি ও পরিবহনযোগ্য পণ্যের অপ্রতুলতা রেলপথের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রেলপথের প্রসারের উপরেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

বিভিন্ন 'গেজে'র (মাপের) রেলপথ (Different railway gauges)—রেলপথের দুইটি লৌহবর্ত্মের মধ্যবর্তী দূরত্বকে রেলের 'গেজ' বলা হয়। রেলপথের প্রকৃতি, রেলগাড়ীর গতি এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা রেলের 'গেজের' উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পৃথিবীর রেলপথসমূহকে 'গেজ' হিসাবে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রশস্ত বা 'ব্রড গেজ'

(broad gauge) (৫'৬", ৫'৩" ও ৫'০") প্রমাণ বা 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' (standard gauge) (৪'৮½") এবং সংকীর্ণ বা 'ন্যারো গেজ' (narrow gauge) (৩'৬", ৩'৩⅜" বা ১ মিটার, ৩' ইত্যাদি)। স্থানীয় ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে রেলের 'গেজ' নির্ধারিত হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে পার্বত্য ও নদীবহুল অঞ্চলে 'ন্যারো গেজের' রেলপথ নির্মিত হয়। এই শ্রেণীর রেলপথ নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প তবে এই মাপের রেলপথসমূহের উপর দিয়া যে সমস্ত গাড়ী চলাচল করে তাহাদের গতি খুব মন্থর হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ রেলপথই এই মাপের। অপর পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন কঠিন ও বিস্তৃত সমভূমির উপর দিয়া 'ব্রড' ও 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' রেলপথ নির্মিত হইয়া থাকে। সমগ্র উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপের অধিকাংশ (স্পেন, পর্তুগাল ও রুশিয়া ব্যতীত) রেলপথের মাপই ৪'৮½"। পৃথিবীতে ব্রডগেজ অপেক্ষা স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ রেলপথেরই প্রসার সমধিক। এই পথে গাড়ী সমূহের গতিও বিশেষ দ্রুত হইয়া থাকে।

মহাদেশীয় রেলপথ (Trans-continental railways)—বিভিন্ন মহাদেশের এক মহাসাগরীয় উপকূল হইতে অপর মহাসাগরীয় উপকূলে দ্রুত পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত যে সমস্ত রেলপথ নির্মিত ও ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে মহাদেশীয় রেলপথ বলে। উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলি আয়তনে বৃহৎ বলিয়া এই জাতীয় রেলপথের প্রয়োজনীয়তা উত্তর গোলার্ধে অধিক কিন্তু
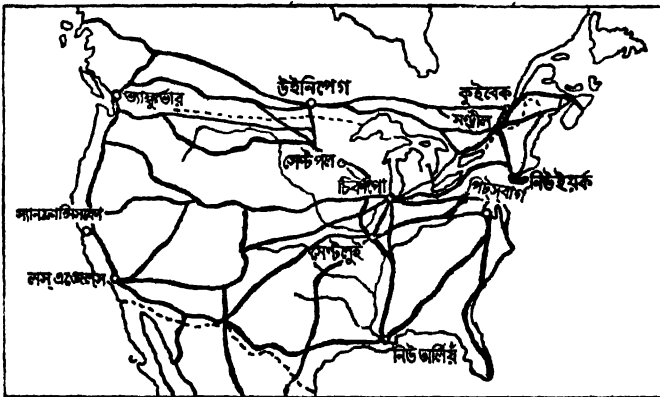
৬০নং চিত্র—উত্তর আমেরিকার মহাদেশীয় রেলপথসমূহ

দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশসমূহ সংকীর্ণ এবং লোকবসতি অত্যন্ত বিরল থাকায় তথায় মহাদেশীয় রেলপথের সংখ্যা অতি অল্প।

উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথসমূহ (Important transcon-

tinental railway lines)—**উত্তর আমেরিকা**—পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তনে উত্তর আমেরিকার পূর্বার্ধ বিশেষ উন্নতিশীল। এই মহাদেশের ১০০° দেশান্তর রেখার পূর্বে অবস্থিত খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে রেলপথসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে এতদঞ্চলের যে কোন স্থান হইতে নিকটতম রেলপথের দূরত্ব ১০ মাইলেরও অনধিক। এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্রেই রেলপথের প্রসারণ সর্বাপেক্ষা অধিক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ বর্গ মাইল ভূখণ্ডে গড়ে ৯ মাইলেরও অধিক রেলপথ রহিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের ঘনসন্নিবিষ্ট রেলপথসমূহ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া আটটি মহাদেশীয় রেলপথ ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই **ক্যানাডার** ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রকৃত পক্ষে ক্যানাডার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে তুইটি **মহাদেশীয় রেলপথ**।

(১) **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ** (৩৫০০ মাইল)—ইহা ক্যানাডার পূর্ব উপকূলের সেণ্টজন ও হ্যালিফ্যাক্স হইতে মণ্ট্রীল, অটাওয়া, সাডবেরি, পোর্টআর্থার, ফোর্টউইলিয়াম, উইনিপেগ, রেজিনা ও মেডিসিন হ্যাট হইয়া ক্যালগারী পযন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে ইহার একটি শাখা দক্ষিণে ক্রোসনেস্ট গিরিবর্ত্ম হইয়া এবং অপব শাখা উত্তরে কিকিং হর্স গিরিবর্ত্ম এবং কলম্বিয়া ও ফ্রেজার নদীর উপত্যকা বাহিয়া পশ্চিম উপকূলের ভ্যানকুভার বন্দরে গিয়া পৌছিয়াছে। লিভারপুল হইতে চীন ও জাপানেব সম্পূর্ণ সমুদ্রপথের দূরত্ব আংশিকভাবে এই রেলপথে এবং আংশিকভাবে সমুদ্রপথে প্রায় ১২০০ মাইল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ক্যানাডার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে এই রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা ক্যানাডার গম বলয়ের মধ্য দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তবে ইহা হ্রদ অঞ্চলের খনিজ ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানগুলির সহিত বন্দরসমূহেরও সংযোগ স্থাপন করে। এই বেলপথ নির্মিত হইবার পর হইতে পুর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকবসতিও বৃদ্ধি পাইতেছে।

(২) **ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ** (কিঞ্চিদধিক ২০০০ মাইল)—ইহা প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি রেলপথের সমষ্টি, এবং অংশতঃ ক্যানাডা ও অংশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের গমবলয়ের মধ্য দিয়া ইহার গতি। ইহা সাণ্ডে উপসাগরের তীরস্থিত মঙ্কটন শহর হইতে কুইবেক, উইনিপেগ, সাসকাটুন ও এডমণ্টন হইয়া ইওলোহেড গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তথা হইতে ইহার এক শাখা পশ্চিম উপকূলের প্রিন্স রুপার্ট বন্দর পর্যন্ত এবং অপর শাখা ভ্যান-

কুভার বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। **সাসকাটুন হইতে প্রসারিত** হাডসন বে রেলপথ (৬০০ মাইল)-এর সাহায্যে **ইহা হাডসন উপসাগর তীরস্থিত** চার্চিল বন্দরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। **যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো,** বাফেলো প্রভৃতি বিবিধ শ্রমশিল্প-প্রধান শহরও এই পথে **পরস্পর সংযুক্ত।** এই রেলপথে বাসন্তিক গম, পশুজাত সামগ্রী, কাষ্ঠ ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের স্কাগোয়ে বন্দর হইতে ইউকন নদীর তীরে অবস্থিত হোয়াইট হর্স পর্যন্ত বিস্তৃত ইউকন রেলপথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ক্যানাডায় বর্তমানে ৫৮,৭৬০ মাইল রেলপথ রহিয়াছে।

১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২২৭,২৪৪ মাইল (পৃথিবীর প্রায় ৪৫%) রেলপথ ছিল। সমতল ভূপ্রকৃতি, অনুকূল জলবায়ু, নিবিড় লোকবসতি, পর্যাপ্ত কৃষিজ ও শিল্প সম্পদ প্রভৃতি অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহ পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলেই অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। **যুক্তরাষ্ট্রে** ছয়টি উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে। (১) **নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ** (১৯১১ মাইল)—ইহা শিকাগো হইতে সেণ্টপল, উইনিপেগ, মণ্ট্রীল এবং পাগেটসাউণ্ড হইয়া পশ্চিম উপকূলের সীট্‌ল ও পোর্টল্যাণ্ড বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি রেলপথ স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। শাখাপথে নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া শহর দুইটিও ইহার সহিত সংযুক্ত। (২) **ইউনিয়ান অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল প্যাসি-ফিক রেলপথ** (২২০৫ মাইল)—ইহার মারফৎ পূর্বদিকের শিকাগো ও নিউইয়র্ক শহর দুইটির সঙ্গে পশ্চিমে স্যানফ্রান্সিসকো শহরের যোগ সাধিত হইয়াছে। (৩) **সাদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ**—ইহা বাল্‌টিমোর ও ওয়াশিংটন হইয়া প্রথমে নিউ অরলিয়ঁ এবং পরে উপসাগরীয় সমভূমি ও মেক্সিকোর প্রান্ত সীমা অতিক্রম করিয়া লস্ এঞ্জেলস্ পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি রেলপথ স্যানফ্রান্সিসকো শহর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। (৪) **ওয়েস্টার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ**—পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তদ্বয়ের সংযোগকারী এই রেলপথটি প্রধানতঃ পণ্য পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৫) **গ্রেট নর্দার্ণ রেলপথ**—এই রেলপথটি পূর্বদিকের সেণ্ট পল শহর হইতে পশ্চিমের সীট্‌ল্ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি শাখা পথে সেণ্টপল নিউইয়র্কের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। (৬) **আচিসন, তোপেকা ও সান্তাফে রেলপথ**—ইহা সেণ্ট লুই শহরের মাধ্যমে নিউইয়র্ক ও স্যানফ্রান্সিসকোকে সংযুক্ত করিতেছে। এই ছয়টি মহাদেশীয় রেলপথের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থিত রাষ্ট্রসমূহের ও মধ্যাঞ্চলের সমভূমিতে উৎপন্ন পণ্য আটলান্টিক বন্দরসমূহে এবং উত্তর-পূর্বের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে নীত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—দক্ষিণ আমেরিকার রেলপথসমূহ কৃষিপ্রধান আর্জেন্টিনা ও দঃ পূঃ ব্রাজিলেই সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। পশ্চিম উপ-

কূলেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূলের এই রেলপথগুলি উপকূলীয় বন্দরসমূহের সহিত উহাদের পশ্চাৎ-ভূমির সংযোগ সাধন করিতেছে। আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এই রেলপথসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মহাদেশে চিলি-আর্জেণ্টাইন রেলপথ নামে একটি মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে।

চিলি-আর্জেণ্টাইন রেলপথ (৮৯৪ মাইল)—এই পথ আর্জেণ্টিনার রাজধানী ও বন্দর বুয়েনশ আয়ার্স শহর হইতে প্রসারিত হইয়া 'পম্পা' অঞ্চলের মধ্য দিয়া ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চল ভেদ করিয়া চিলির ভ্যাল্‌পারাইজো বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা পারানা-পারাগুয়ে পগঙ্কের গম ও বীট বলয়ের

৬১নং চিত্র—আফ্রিকার রেলপথ ও নদীপথ সমূহ

সহিত চিলি ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কৃষি ও খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের সংযোগ সাধন করে।

উপরোক্ত মহাদেশীয় রেলপথটি ব্যতীতও এতদঞ্চলে দুইটি উল্লেখযোগ্য রেলপথ রহিয়াছে। উহাদের প্রথমটি বুয়েনস আয়ার্স হইতে বলিভিয়ার খনি অঞ্চলগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয়টি বুয়েনস আয়ার্স হইতে ব্রাজিলের সাওপোলো ও রায়ো-ডি-জেনেরো এই দুইটি কফি-বন্দরের সহিত সংযুক্ত।

আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত রেলপথই ৩'৬" মাপের। এই রেলপথগুলি দক্ষিণে কেপটাউন হইতে উত্তরে কঙ্গোপ্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। উহার উত্তরাংশে রেলপথ না থাকায় জলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কঙ্গোপ্রদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশেও সম্প্রতি রেলপথসমূহ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-সেবিত উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিশ অঞ্চলে রেলপথের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকা মহাদেশের তথাকথিত **কেপ-টু-কায়রো** নামক মহাদেশীয় রেলপথটি রেলপথ, জলপথ ও হাঁটাপথের সমষ্টি মাত্র। বর্তমানে রেলপথ আছে কেপটাউন হইতে কঙ্গো প্রদেশের
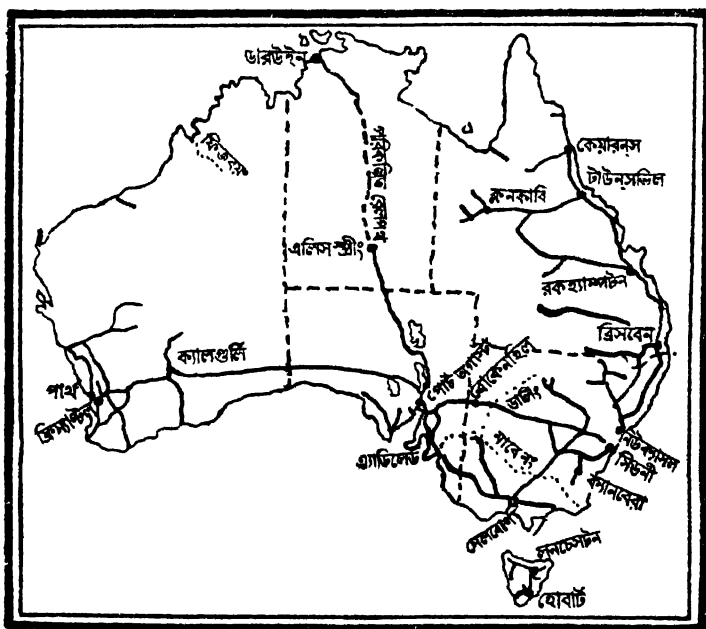
৬২নং চিত্র—অষ্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ

বুকামা পর্যন্ত। বুকামা হইতে নদী ও স্থল-পথে খার্টুম, এবং খার্টুম হইতে রেলপথে ওয়াদি হায়ফা পর্যন্ত যাওয়া যায়। হায়ফা হইতে পুনরায় নদীপথে

সেলাল পৌঁছিতে হয়। সেলাল হইতে আবার রেলপথ কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত। কেপ-টাউন হইতে কায়রোর দূরত্ব প্রায় ৯,০০০ মাইল।

আফ্রিকাতে সম্প্রতি আর একটি মহাদেশীয় রেলপথ (২০০০ মাইল) নির্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে। এই রেলপথটি নাইজার নদীর তীরে গাও শহর এবং আইভরী উপকূল হইতে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাঞ্জিয়ার্স অথবা কলম্ব বেচার পযন্ত বিস্তৃত হইবে।

অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ (৩৬,০৪৫ মাইল) প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সামুদ্রিক বন্দরগুলির সহিত খনিজ, প্রাণীজ ও কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থের রেলপথ নির্মিত হওয়ায় (কুইন্সল্যাণ্ড ও পঃ অস্ট্রেলিয়ায় সংকীর্ণ মাপের, নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে প্রমাণ মাপের এবং ভিক্টোরিয়ায় প্রশস্ত মাপের) এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে রেলপথে সরাসরি চলাচল সম্ভব নহে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে রেলপথের প্রসার অধিক। উষ্ণ মরুদেশীয় জলবায়ু হেতু অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে এযাবৎ কাল পর্যন্ত কোন রেলপথ নির্মিত হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ায় একটি মহাদেশীয় রেলপথ বহিয়াছে। এই মহাদেশীয় রেলপথটি দঃ-পূঃ অস্ট্রেলিয়াকে পঃ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ এর সহিত সংযুক্ত কবিয়াছে। অস্ট্রেলিয়াতে আর একটি মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে। এই পথ উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দর হইতে দক্ষিণ-অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড বন্দর পযন্ত বিস্তৃত হইবে।

ইউরোপ—শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের রেলপথসমূহ উত্তর আমেরিকার পূর্বার্ধের রেলপথসমূহের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট। প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে বেলজিয়ামে ৩১ মাইল, ব্রিটেনে ২৪ মাইল, জার্মানীতে ২২ মাইল, হল্যাণ্ডে ১৯ মাইল ও ফ্রান্সে ১৪ মাইল রেলপথ বহিয়াছে। তবে সামগ্রিক বিচারে ইউরোপ মহাদেশে প্রতি ১০০ মাইল ভূখণ্ডে প্রায় ৬ মাইল রেলপথ রহিয়াছে।

উত্তরে স্কটল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পার্বত্যভূমি হইতে দক্ষিণে আল্পস্ পর্বতাঞ্চল পযন্ত এবং পূর্বে জার্মানীর পূর্বে সীমান্ত হইতে পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর পযন্ত আবদ্ধ ভূখণ্ডের কোন স্থানই নিকটতম রেলপথ হইতে ১০ মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। বিরল লোকবসতি হেতু পূর্ব ইউরোপের রেলপথসমূহ মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। অবশ্য ইউরোপীয় রুশিয়ায় রেলপথসমূহ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

ইউরোপীয় রেলপথসমূহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে: প্রথমতঃ, কেবলমাত্র স্পেন, পর্তুগাল ও রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অধিকাংশ রেলপথই প্রমাণ মাপের (স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ) দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলসমূহ রেলপথ স্থাপনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। পীরেনীজ ও আপেনাইন পর্বত ভেদ করিয়া অদ্যাপি কোন রেলপথ প্রসারিত হয় নাই।

অবশ্য সম্প্রতি সিম্‌প্লন, মণ্ট সেনিস, সেণ্ট গোথার্ড প্রভৃতি সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে আল্পস্ পর্বত ভেদ করিয়া রেলপথসমূহ উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছে। তৃতীয়তঃ, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের রেলপথ-সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের রাজধানীসমূহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন, মস্কো প্রভৃতিই হইল ইউরোপীয় রেলপথ-সমূহের নাভিকেন্দ্র।

ইউরোপের প্রধান প্রধান রেলপথসমূহ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে (১) পূর্বদিকে বার্লিন হইয়া লেনিনগ্রাদ ও তথা হইতে মস্কো পর্যন্ত; (২) দক্ষিণ-পূর্বে সুড়ঙ্গ পথে আল্পস্ পর্বতাঞ্চল অতিক্রম করিয়া ইতালী ও ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন পর্যন্ত এবং (৪) ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস পথে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস রেলপথটিকে একটি মহাদেশীয় রেলপথ বলা যাইতে পারে, তবে ইহা ঠিক একটিমাত্র রেলপথ নহে, কয়েকটি পৃথক পৃথক রেলপথের সমষ্টি মাত্র। এই পথটি প্যারী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, ব্রাতিশ্লাভা, বুদাপেস্ত, বেলগ্রেড প্রভৃতি শহরের মধ্য দিয়া তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তথা হইতে ইহা একটি শাখাপথের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস পর্যন্ত এবং তথা হইতে আর একটি শাখাপথের সাহায্যে মিশরের এল কান্তারার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

রুশিয়া—রুশিয়ার মোট পরিবাহিত পণ্যের ৮০% রেলপথে পরিবাহিত হয়। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ৭০,০০০ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। মস্কো এই রেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল। মহাদেশীয় রেলপথসমূহের মধ্যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান এবং ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ** (৫৮০০ মাইল)—ইহা উত্তর পশ্চিমে লেনিনগ্রাদ হইতে মস্কো, রিয়াজান, কুইবিশেভ (সামারা), উফা, চেলিয়াবিন্স্ক, ওমস্ক, নোভোসাইবিরিস্ক, ক্রাসনোইয়ার্স্ক, তাইসেৎ, ইর্খুটস্ক, চিতা এবং খার্বারোভস্ক হইয়া পূর্বে ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত বিস্তৃত। লেনিনগ্রাদ হইতে একটি রেলপথ ভোলোগ্দা, মলটোভ ও স্বার্দলোভস্ক হইয়া ওমস্ক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। রেলপথে স্বার্দলোভস্ক চেলিয়াবিন্স্কের সহিত সংযুক্ত। লেনিনগ্রাদ-স্বার্দলোভস্ক-চেলিয়াবিনস্ক-ভ্লাডিভস্টক—এই হ্রস্বতর পথে লেনিনগ্রাদ হইতে ভ্লাডিভস্টকের দূরত্ব ৫৪০০ মাইল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই রেলপথের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই পথ সাইবেরিয়ার পূর্ব অঞ্চলের সহিত মস্কোকে সংযুক্ত করে। ইহা সুদূর প্রাচ্য হইতে ইউরোপ যাতায়াতের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী পথ। কুজবাস অঞ্চলের কয়লা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ ও অন্যান্য নানাবিধ খনিজ পদার্থ, সাইবেরিয়ার 'তৈগা' বনাঞ্চলের বিপুল কাষ্ঠ

সম্পদ ও পশুলোম এবং অন্যান্য অঞ্চলের নানাবিধ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথেই রুশিয়ার নানাস্থানে পরিবাহিত হয়। এই পথে দুইটি গাড়ী পাশাপাশি যাতায়াত করিতে পারে। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে প্রায় ৯½ দিন সময় লাগে।

(২) **ট্রান্স-কাস্পিয়ান বা তুর্কিস্তান রেলপথ**—এই পথ কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ক্রাসনোভোডস্ক হইতে তুর্কিস্তানের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের মধ্য দিয়া মার্ভ, সমরখন্দ, ফারগানা ও তাসখন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তথা হইতে রেলপথটি উত্তর দিকে প্রসারিত হইয়া আরল হ্রদের পূর্ব প্রান্ত দিয়া চ্কালভ (ওরেনবার্গ) ও কুইবিশেভ (সামারা) হইয়া মস্কো পযন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথে কার্পাস, গম, বীট, শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি পরিবাহিত হয়। মার্ভ হইতে এই পথের একটি শাখা আফগানিস্তানের প্রান্তসীমায় কুস্‌থ পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথ ভবিষ্যতে ভারত ও রুশিয়া তথা ইউরোপের সহিত পশ্চিম পাকিস্তান হইয়া সংযোগ রক্ষা করিবার উপায় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, বর্তমানে পঃ পাকিস্তানের কোয়েটা হইতে রেলপথ পারস্য সীমান্তের জাহিদান পযন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। কুস্‌থ হইতে জাহিদানের দূরত্ব ৪০০ মাইল মাত্র। এই ৪০০ মাইল রেলপথ নির্মিত হইলে পশ্চিম ইউরোপের সহিত পাকিস্তানের মাধ্যমে ভারতের রেল-সংযোগ সাধিত হইবে।

সাইবেরিয়ার সহিত মধ্য এশিয়ার সংযোগকারী **তুর্ক-শিব** রেলপথটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই রেলপথটি নোভোসাইবিরিস্ক হইতে দক্ষিণে সেমিপালাটিনস্ক ও আলমা আতা হইয়া টাসখেণ্ট পযন্ত বিস্তৃত। এই পথে প্রধানতঃ সাইবেরিয়ার গম ও কাঠ এবং মধ্য এশিয়ার কার্পাস ও রেশম পরিবাহিত হয়। এশীয়-রুশিয়া অপেক্ষা ইউরোপীয়-রুশিয়াতেই রেলপথের প্রসার অধিক। সম্প্রতি পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সহিত সংযোগকারী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি নূতন নূতন রেলপথ নির্মিত হইতেছে। পণ্য পরিবহনে রুশিয়ার রেলপথসমূহ জলপথের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এশিয়া—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত জাপান, পাকিস্তান, চীন ও ভারতেই রেলপথের প্রসার সমধিক। জাপানের রেলপথসমূহ ৩′ ৬″ মাপের। চীনে সরকার নিয়ন্ত্রিত ১০,০০০ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। তিয়েনসিন হইতে পিপিং ও হ্যাংকাউ পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথই চীনের সবপ্রধান রেলপথ। তিয়েনসিন রেলপথে মুকদেনের সহিত সংযুক্ত। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ মুকদেনকে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের সহিত সংযুক্ত করে। তিয়েনসিন সাংহাইএর সহিত রেলপথে সংযুক্ত। পিকিং হইতে একটি রেলপথ উত্তর-পশ্চিমে কালাগান এবং অপর একটি রেলপথ মঙ্গোলিয়ার পাওটো পর্যন্ত

বিস্তৃত। পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত লুঘাই রেলপথ উই নদীর তীরবর্তী সিয়েন্‌কে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। মালয়ের রেলপথসমূহ সংকীর্ণ মাপের এবং ইহারা শ্যামদেশের রেলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত। ইন্দোচীনের রেলপথসমূহও চীনের রেলপথের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। জাভাতেও রেলপথের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্গত বাগদাদ একটি সংকীর্ণ মাপের রেলপথের সাহায্যে বসরার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

ভারতের রেলপথ (Indian Railways)

স্থলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন রেলপথ। তবে ভারতীয় রেল-চলাচল-ব্যবস্থা **ত্রুটি** (defects)-বহুল, কারণ:—(১) বর্তমানে (১৯৬০-৬১) ভারতে মাত্র ৩৫,৩৯৫ ৬ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। রেলপথের প্রসারণে ভারত এশিয়া মহাদেশে প্রথম ও পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও ভারতের ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত ও ঘন বসতিপূণ দেশের পক্ষে ইহা অতি সামান্য। প্রতি ১০০ বর্গমাইলে যুক্তরাজ্যে ২০ মাইল, কিন্তু ভারতে মাত্র ২ ৮ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। আবার ভারতে "চওড়া" (৫´৬"), "মিটার" (৩´৩⅜" ও "সংকীর্ণ" (২´৬" ও ২´) এই তিন মাপের রেলপথ থাকায় অনেক সময় এক মাপের গাড়ী হইতে অন্য মাপের গাড়ীতে পণ্য বোঝাই করিতে বহু সময় ও ব্যয় লাগিয়া যায়। (৩) এদেশের রেলপথসমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্মিত হয় নাই এবং দেশের বহু প্রয়োজনীয় স্থানেও ইহারা বিস্তৃত হয় নাই। (৪) গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য ভূপ্রকৃতি হেতু আসাম, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, মধ্যভারত ও পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে রেলপথ একেবারেই বিস্তার লাভ করে নাই।

ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস (Regrouping of Indian Railways)—১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সমতাযুক্ত অবিচ্ছিন্ন অংশের অন্তর্গত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বহুদূরবিস্তৃত রেলপথের অংশবিশেষ লইয়া এক একটি রেলাঞ্চল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলপথসমূহের পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয়। এই পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয় তিনটি **কারণে**—(১) স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতভুক্তির ফলে সমস্ত রেলপথই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং ইহার সমাধানের জন্য পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; (২) রেলচলাচল ব্যবস্থা অল্পব্যয়ে অধিকতর কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন হয়; এবং (৩) ভারতীয় রেলপথসমূহ বিভিন্ন মাপের হওয়ায় পণ্য পরিবহনে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রবর্তিত নূতন ব্যবস্থায় এক একটি রেলাঞ্চলকে এক এক প্রকার

মাপের রেলপথ অধিক দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পণ্য চলাচল দ্রুততর হইবে এবং রেলপথসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও হইবে অল্প। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে ভারতে ৬টি আঞ্চলিক রেলপথ গঠিত হয়। পরিচলন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট তারিখে প্রাক্তন পূর্ব রেলপথটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পূর্ব ও দঃ পুঃ এই দুইটি রেলাঞ্চল এবং ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী উত্তর-পূর্ব রেলাঞ্চলটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া উঃ পুঃ ও উঃ পুঃ সীমান্ত এই দুইটি রেলাঞ্চলের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিম্নে ভারতের রেলাঞ্চলসমূহ বিবৃত হইল।*

(১) **উত্তর রেলপথ (Northern Railway)** (৬৪৪০'০১ মাইল)—পাঞ্জাব, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান এবং বারাণসী পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের সমগ্র উত্তরাংশের মধ্য দিয়া উত্তর রেলপথ প্রসারিত। সদর কার্যালয় দিল্লী। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ—(১) দিল্লী-আলিগড়-এলাহাবাদ-মোগলসরাই ; (২) দিল্লী-আম্বালা (তথা হইতে সিমলা)-লুধিয়ানা-জলন্ধর (মুকেরিয়ান-পাঠানকোট)-অমৃতসর ; (৩) মোগলসরাই-কাশী-লক্ষ্ণৌ-মোরাদাবাদ-লাকসার (সাহারানপুর-আম্বালা-অমৃতসর)-হরিদ্বার-দেরাদুন ; (৪) দিল্লী-রোটাক-জাখাল-ভাটিণ্ডা-ফিরোজপুর ; (৫) ভাটিণ্ডা-বিকানীর-যোধপুর ; এবং (৬) দিল্লী-রেওয়ারী-হিসার-রতনগড়-যোধপুর-পঃ পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এই রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কার্পাস; চিনি, গম, জোয়ার, বাজরা, পশম, তৈলবীজ, লবণ, পশুচর্ম প্রভৃতি প্রধান। পাঞ্জাব (অমৃতসর, লুধিয়ানা), দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের (কানপুর) কার্পাস ও পশম বয়ন শিল্পাঞ্চল, উত্তর প্রদেশের কাঁচ, চর্ম ও শর্করা শিল্পাঞ্চল-সমূহ এই রেলপথেই পরস্পর সংযুক্ত।

[(১) মুকেরিয়ান হইতে পাঠানকোট পর্যন্ত ২৭ মাইল বিস্তৃত নব-নির্মিত মুকেরিয়ান-পাঠানকোট রেলপথটি অমৃতসর-পাঠানকোট রেলপথ অপেক্ষা ভারতকে কাশ্মীরের ৪৪ মাইল নিকটতর করিয়াছে। পাঠানকোট হইতে একটি রাস্তা জম্মু এবং তথা হইতে ৯০০০´ উচ্চ বানিহাল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া শ্রীনগর পৌঁছে। ভারত-কাশ্মীর পথের এই অংশ ৫ মাসকাল বরফাবৃত থাকে। (২) চুনার-রবার্টসনগঞ্জ-চার্ক নামক আর একটি নব-নির্মিত রেলপথ চুনার হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।]

(২) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway)**—(৩০৫৭'৭৩ মাইল)—সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। এই রেলপথ উত্তরপ্রদেশের উত্তর ভাগ এবং উত্তর বিহারের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথে প্রচুর ইক্ষু, তামাক, চা, পাট, খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনারস, চুন, সিমেণ্ট, কয়লা, কাষ্ঠ ও ধান পরিবাহিত হয়। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ—(১) কাটিহার-

* বেসরকারী তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত ৮৪৫ মাইল রেলপথ এই পুনর্বিন্যস্ত রেলপথের অন্তর্ভুক্ত নহে।

মান্‌সী-হাজীপুর-ছাপরা-গোরক্ষপুর-গোণ্ডা-সীতাপুর-পিলভিত-বেরেলি ; (২) বৃন্দাবন-হাথরাস-কাসগঞ্জ-বেরেলি-কাঠগুদাম ; (৩) গোরক্ষপুর-মৌ-কাশী-এলাহাবাদ ; (৪) হাজীপুর-মজঃফরপুর-মতিহারী-রক্সাউল ; ও (৫) গোণ্ডা-লক্ষ্মৌ-কানপুর-কাসগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্মৌ ও বারাণসীতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরবিহার ও উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশের শর্করা ও পাট শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত।

(৩) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-East Frontier Railway)**—(১৭৪৮·৮৭ মাইল)—সদর কার্যালয় পাণ্ডু এই রেলপথ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং আসামের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই পথে চা, পাট, খনিজ তৈল, কমলা, আনারস, ইক্ষু, তামাক, ধান, বেত, চুন, সিমেন্ট, কয়লা ও কাষ্ঠ পরিবাহিত হয়। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ (১) মণিহারীঘাট-কাটিহার-বারসোই-কিষণগঞ্জ-শিলিগুড়ি-বাগরাকোট-মালজংশন - মাদারীহাট-হাসিমারা-আলিপুরদুয়ার-ফকিরাগ্রাম-বঙ্গিয়া-আমিনগাঁও (ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া)-পাণ্ডু-গৌহাটি-লামডিং-তিনসুকিয়া-সাইখোয়াঘাট ; ও (২) লামডিং-হাফলং-বদরপুর-শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ কাটিহারে উত্তর-পূর্ব রেলপথের সহিত এবং সাহেবগঞ্জে পূর্ব রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা শিল্প এবং আসামের খনিজ তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেলপথের দান অতুলনীয়।

[পূর্ব-রেলপথে কলিকাতা হইতে বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ হইয়া সকরিগলিঘাট পর্যন্ত পৌছান যায়। তথা হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের মণিহারীঘাট-সাইখোয়াঘাট শাখাপথে আসাম পৌছান চলে। ইহাই **আসাম লিঙ্ক (Assam Link) পথ**। এই পথের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কারণ এই পথেই আসাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ হইতে চা, কাষ্ঠ, তৈল, সিমেন্ট ও পাট কলিকাতা বন্দরে আসে এবং কলিকাতা হইতে আসাম ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে প্রেরিত হয়।]

(৪) **পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway)** (২৩৫১·০৭ মাইল)—সদর কার্যালয় কলিকাতা। এই পথের শাখাপ্রশাখাসমূহ গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিয়দংশ ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক, চাউল, পাট, সার, ইক্ষু, চা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ (১) হাওড়া-আসানসোল-ধানবাদ-গোমো-গয়া-ডিহিরি-মোগলশরাই ; (২) হাওড়া-আসানসোল-কিউল-পাটনা-মোগলশরাই ; (৩) কলিকাতা-বারহারওয়া-সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর-জামালপুর-কিউল ; (৪) কলিকাতা-মুর্শিদাবাদ-লালগোলাঘাট এবং (৫) গোমো-বরকাখানা-ডালটনগঞ্জ-ডিহিরি পর্যন্ত বিস্তৃত

ছোটনাগপুরের খনি ও তৎসংক্রান্ত শিল্পাঞ্চল, কলিকাতা শিল্পাঞ্চল ব্যতীত রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি, ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, ডালমিয়ানগর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত। এই পথ মোগলশরাইতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railway) (৩৬৪০·৫৩ মাইল)—এই রেলাঞ্চলটি পঃ বঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার ও অন্ধ্র রাজ্যের কিয়দংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। সদর দপ্তর কলিকাতা। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ (১) হাওড়া-খড়্গপুর-টাটানগব-রাউর-কেলা-বিলাসপুর-রায়পুর-ভিলাই-গণ্ডিয়া-নাগপুর, (২) হাওড়া-খড়্গপুর-বালেশ্বর-কটক (পুরী)-বহরমপুর-ভিজিয়ানাগ্রাম-ওয়ালটেয়ার, (৩) রামপুর-তিতিলাগড-ভিজিয়ানাগ্রাম ; (৩) খড়্গপুর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-আদ্রা-গোমো ; এবং (৫) টাটানগর-চাণ্ডিল-আদ্রা-আসানসোল পযন্ত বিস্তৃত। নাগপুর হইতে জব্বলপুর হইয়া কাটনি এবং খনি অঞ্চল সমূহেব মধ্য দিয়া প্রসারিত বেলপথ-সমূহ ইহার অন্তর্গত। এই রেলপথ আসানসোলে পূঃ রেলপথের সহিত; কাটনি ও জব্বলপুরে মধ্য রেলপথের সহিত এবং ওয়ালটেয়ারে দঃ রেলপথের সহিত সংযুক্ত। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, চুনাপাথর, চাউল, কাষ্ঠ, লাক্ষা প্রভৃতি এই পথে পরিবাহিত হয়। টাটা, রাউরকেলা ও ভিলাই-এর ইস্পাত কেন্দ্র ও বহুবিধ খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই পথ প্রসারিত।

(৬) **পশ্চিম রেলপথ** (Western Railway) (৬০৬৪·৬৪ মাইল)—সদর দপ্তরখানা বোম্বাই। এই পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা গুজরাট ও উত্তর মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের দক্ষিণাংশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাস এবং কাঠিয়াবাড়ের লবণ ও রাসায়নিক শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া প্রসারিত হওয়ায় এই রেলপথ প্রচুর কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য এবং যই, চীনাবাদাম, চিনি, লবণ, খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি পরিবহন করে। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহের মধ্যে (১) বোম্বাই-সুরাট-বরোদা-আমেদাবাদ-ভিরমগাম, (২) বরোদা-রতলাম-কোটা-মথুরা; (৩) আমেদাবাদ-আবুরোড-মারওয়ার-আজমীঢ়-জয়পুর-আলোয়ার (দিল্লী), (৪) আজমীঢ়-চিতোর-রতলাম-ইন্দোর-খাণ্ডোয়া, (৫) ভিরমগাম-রাজকোট-দ্বারকা-ওখা এবং (৬) দিশা-গান্ধীধাম পথই প্রাচীন। ১৭০ মাইল দীর্ঘ নব-নির্মিত দিশা-গান্ধীধাম শাখাপথটি ১৯৫৪-৫৫ সালে নির্মিত গান্ধীধাম-কাণ্ডলা (৬·২ মাইল) শাখাপথটির সাহায্যে কাণ্ডলা বন্দরকে ইহার পশ্চাদ্-ভূমির সহিত সংযুক্ত করিতেছে। বেয়ানা হইতে আগ্রা হইয়া কানপুর এবং সুরাট হইতে ভুষওয়াল হইয়া নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথসমূহও এই রেলাঞ্চলের অন্তর্গত।

(৭) **মধ্য রেলপথ** (Central Railway) (৫৪৮২·৭৭ মাইল)—সদর দপ্তর

খানা বোম্বাই। এই রেলপথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহীশূরের উত্তরাংশ, মহারাষ্ট্রের মধ্যাংশ এবং মাদ্রাজের পশ্চিমাংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। কার্পাস, ম্যাঙ্গানীজ, কাষ্ঠ, গম, চিনি, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, চর্ম
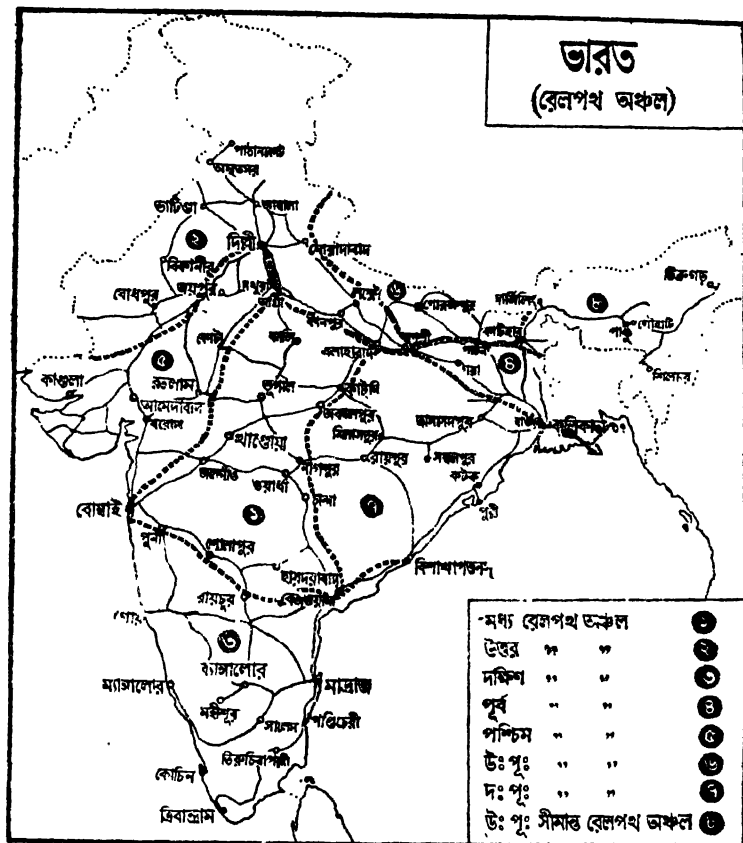
৬৩ নং চিত্র—ভারতের রেলপথ অঞ্চলসমূহ

প্রভৃতি পণ্য এই পথে পরিবাহিত হয়। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাপ্রশাখা সমূহ (১) বোম্বাই-ভূষওয়াল-খাণ্ডোয়া-ইতরসী-ভূপাল-ঝাঁসী-আগ্রা-মথুরা-দিল্লী, (২) বোম্বাই-পুনা-ওয়াড়ি-রায়চুর; (৩) দিল্লী-ইতরসী-নাগপুর-ওয়ার্ধা-কাজিপেট-বেজওয়াড়া (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস পথ); (৪) ইতরসী-নাগপুর; (৫) ইতরসী-এলাহাবাদ; (৬) বোম্বাই-ভূষওয়াল-নাগপুর ও (৭) মনমদ-ঔরঙ্গাবাদ-হায়দরাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। রায়চুর ব্যাঙ্গালোরে সহিত ও বেজওয়াড়া মাদ্রাজের সহিত শাখা-পথের দ্বারা সংযুক্ত। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কার্পাস, সিমেণ্ট ও খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত।

(৮) **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railway) (৬১৬৪·৯৪ মাইল)—সদর কার্যালয় মাদ্রাজ। এই রেলপথের শাখাপ্রশাখাসমূহ দঃ মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ, অন্ধ্রের বৃহত্তম অংশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালার জনসমৃদ্ধ ও উর্বর ভূমিভাগের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই পথের বড মাপের প্রধান প্রধান শাখাগুলি (১) মাদ্রাজ-নেলোর-বেজওয়াড়া-ওয়ালটেয়ার ; (২) মাদ্রাজ-জলারপেট-ব্যাঙ্গালোর ; (৩) মাদ্রাজ-আর্কোনাম-গুণ্টাকল-রায়চুর ; এবং (৪) মাদ্রাজ-সালেম-সোরান্নুর-কোজিকোড-ম্যাঙ্গালোব পর্যন্ত বিস্তৃত। মাদ্রাজের সহিত কলিকাতা ও বোম্বাই এবং জলারপেটের সহিত ব্যাঙ্গালোর ও উটাকামণ্ড রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। এই পথের মাঝারি মাপের প্রধান প্রধান শাখাগুলি (১) ব্যাঙ্গালোর-বিরুর-লোণ্ডা-মিরাজ-পুনা , (১) বেজওয়াড়া-গুণ্টাকল-বেলারী-লোন্ডা-মার্মাগাও ; (৩) গুণ্টাকল-বেজওয়াড়া-মসলিপট্টম ; (৪) মাদ্রাজ-তাঞ্জোর-ত্রিচিনপল্লী-ধনুষ্কোটি ; এবং (৫) মাদ্রাজ-ত্রিচিনপল্লী-বিরুধনগর-মাদুরা-কুইলন-ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হরিহর হইতে ব্যাঙ্গালোর ও বিরুধনগর হইতে তুতিকোরিন পযন্ত রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথে খাদ্যশস্য, কার্পাস, তৈলবীজ, লবণ, চিনি, তামাক, কাষ্ঠ, ইক্ষু, চা, কফি, মশলা, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, মোটরগাড়ী, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ আকর ও চর্ম প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হয়। এই রেলপথের শাখাসমূহ মাদ্রাজ, কোচিন, তুতিকোরিন, আলেপ্পি, কুইলন ও কালিকট বন্দরের সহিত সংযুক্ত। মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরার কার্পাস শিল্প কেন্দ্র, ব্যাঙ্গালোরের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও ভদ্রাবতীর ইস্পাত কারখানা এই রেলপথেই পরস্পর সংযুক্ত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রেলপথ (Indian Railways under Five-Year Plans)—**প্রথম পরিকল্পনায়** রেলপথসমূহের পুনর্গঠনের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনার কাযকালে ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথের নির্মাণ, ৪৩০ মাইল পুরাতন রেলপথের সংস্কার, ৪৬ মাইল সংকীর্ণ মাপের রেলপথকে মাঝারী মাপের রেলপথে পরিবর্তন, এবং "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ" ও "ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী" এই দুইটি কারখানা স্থাপন করা হয়। এই পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের উন্নয়নমূলক কাযে ব্যয় হয় ৪২৩·৭৩ কোটি টাকা। **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** কাযকালে রেলপথের পুনর্গঠন ও সংস্কার-সাধন কার্য চলিতে থাকে, বহু নূতন রেলপথ নির্মিত হয় এবং বহু এঞ্জিন, ও চারিচাকাযুক্ত মালগাড়ীর বগী রেলবিভাগের আয়ত্তে আসে। মাঝারি মাপের রেলপথের বগী নির্মাণের উপযোগী একটি কারখানা স্থাপন, বর্তমান রেলকারখানাগুলি উন্নতি সাধন, চিত্তরঞ্জন ও "টেলকো" কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, বহু রেলপথের সংস্কার সাধন ও দ্বিত্বকরণ, মাঝারি মাপের রেলপথকে বড় মাপের রেলপথে পরিবর্তন, বিদ্যুচ্চালিত ও ডিসেল-

চালিত রেলপথের পত্তন, রেলকর্মীদের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি কার্য করা হয়। এই সমস্ত বাবদ ব্যয় হয় অনুমান ১১২১·৫ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে রেলপথে পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীর পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রেলপথের গঠনমূলক কার্যসূচী অনুসৃত হইবে (রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের ১৫৪ মিলিয়ন টন হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ২৪৫ মিঃ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন)। এই পরিকল্পনা কালে বহু নূতন চারি চাকাযুক্ত মালগাড়ীর বগী নির্মাণ ও পুরাতন বগীর সংস্কার সাধন, পুরাতন ও জীর্ণ রেলপথসমূহের পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধন, বগী নির্মাণ কারখানা-সমূহের সম্প্রসারণ, "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ" কারখানা কর্তৃক বিদ্যুচ্চালিত রেলএঞ্জিন নির্মাণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, বহু রেলপথের দ্বিত্বকরণ, বিদ্যুচ্চালিত রেলপথের প্রসারণ, বহু নূতন রেলপথের পত্তন, রেলসেতুর সংস্কার সাধন ও নূতন নূতন রেলসেতুর পত্তন, রেল-কর্মীদের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নতি সাধন, রেলযাত্রীদের সুখ-সুবিধামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যে ১৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the importance of transport system for the economic development of a country.

(দেশগত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৮৬-২৮৭)

2. Describe the relative advantages and disadvantages of rail and motor transport system.

(রেলপথ ও মোটরপথে পরিবহন ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

3. Discuss the factors that control the laying down of railway lines. What are trans-continental railways ? Describe some of the more important trans-continental railways of the World. (C. U. '55, 58)

(রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। মহাদেশীয় রেলপথ কাহাকে বলে? পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২৯৪, ২৯৫-৩০৩)

4. Describe the rail transport system of India with special reference to the various railway zones of the country. (C. U. '54, '55, '56)

(ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস উল্লেখপূর্বক ভারতের রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩০৩-৩০৮)

5. Describe the roadways of India indicating the steps that have been taken in recent years for the improvement of roadways in the country.

(পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের রাস্তা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। বর্তমানকালে ভারতীয় রাস্তাসমূহের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৮৯-২৯২)

6. Describe and locate the various land frontier routes of India.

(ভারতের সীমান্ত পথসমূহের বর্ণনা কর এবং মানচিত্র অঙ্কন করিয়া ঐ পথগুলি দেখাও।)

(পৃঃ ২৯২-২৯৩)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—জলপথ

জলপথ বলিতে আন্তর্দেশিক (Inland) ও সামুদ্রিক (Oceanic) এই উভয়বিধ জলপথকেই বুঝাইয়া থাকে। আন্তর্দেশিক জলপথ বলিতে নাব্য নদনদী ও আভ্যন্তরীণ খালপথ এবং সামুদ্রিক জলপথ বলিতে প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ ও সামুদ্রিক খালপথসমূহকেই বুঝায়। আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের গুরুত্ব প্রধানতঃ আন্তর্বাণিজ্যে কিন্তু সামুদ্রিক জলপথের মৌলিক গুরুত্ব বহির্বাণিজ্যে।

আন্তর্দেশিক জলপথ বনাম **স্থলপথ** (Inland water transport system *versus* land transport system)—স্থলপথের তুলনায় আন্তর্দেশিক জলপথের প্রধান অসুবিধা এই যে—(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। (২) স্থলপথের ন্যায় জলপথের পোতসমূহ যদৃচ্ছ চলাচল করিতে পারে না ; কারণ, অনেক সময়েই নদীর গতি এবং পণ্য-পরিবহনের দিক এক নহে। অপর পক্ষে স্থলপথ অপেক্ষা আন্তর্দেশিক জলপথের প্রধান সুবিধা এই যে—(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যয় স্থলপথ অপেক্ষা অনেক কম, কারণ (ক) জলপথের নির্মাণ-ব্যয় নাই, (খ) জলপথের পোতচালনার জন্য অল্প ইন্ধনশক্তি ও শ্রমিকের প্রয়োজন, (গ) জলপথের পোতনির্মাণ-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং (ঘ) জলপথে বিপদাশঙ্কা অল্প হওয়ায় পণ্য-বীমার হারও সামান্য। (২) জলপথে-দূর-দূরান্তরের সহিত সংযোগ স্থাপনে কোন বাধা নাই, কিন্তু স্থলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যবস্থা বহুবিধ বিধিনিষেধ দ্বারা শৃঙ্খলিত। এই সমস্ত কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন, অথচ দ্রুত পচনশীল নহে এইরূপ পণ্যই জলপথে

পরিবাহিত হইয়া থাকে। আবার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশসমূহে আন্তর্দেশিক জলপথগুলিই পরিবহন ব্যবস্থার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। ব্রাজিলের আমাজন নদী ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

আন্তর্দেশিক জলপথ (Inland Waterways)—নদনদীর তীরেই প্রথম মানব সভ্যতার সূত্রপাত হয়। তাই আদিম কাল হইতেই মানুষ এই সকল জলপথ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। আজিকার দিনে রেলপথের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আন্তর্দেশিক পরিবহন ব্যবস্থায় বহুক্ষেত্রে নাব্য নদনদী ও খালপথের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। কেবলমাত্র পর্বতাঞ্চল এবং উষ্ণ ও হিম মরু অঞ্চলসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নাব্য জলপথের গুণাগুণ—পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন। (১) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ **গভীর** ও **বিস্তৃত** হওয়া প্রয়োজন। কঙ্গো, আমাজন ও জাম্বেজী নদী স্থানে স্থানে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বাণিজ্যপোত চলাচলে বিঘ্ন উৎপাদন করে। (২) আন্তর্দেশিক নদনদী অস্বাভাবিক **স্রোত ও জলপ্রপাত মুক্ত** হওয়া প্রয়োজন। রুশিয়ার ভল্‌গা নদী সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহা সুনাব্য, কিন্তু ভারতের ব্রহ্মপুত্র, আফ্রিকার জাম্বেজী ও নীল নদের উচ্চ অংশ অত্যন্ত স্রোত ও জলপ্রপাতযুক্ত হওয়ায় বাণিজ্যপোত চলাচলে বিঘ্ন উৎপাদন করে। (৩) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের **জলপ্রবাহ** সারা বৎসরই **সমান** থাকা প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়ার নদীসমূহ বৎসরের ছয়মাসকাল বরফাবৃত থাকায় এই নদীসমূহ সমস্ত বৎসর ধরিয়া পণ্য পরিবহনের অনুপযুক্ত থাকে। (৪) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের নাব্য অংশ **দীর্ঘ** হওয়া প্রয়োজন। ইয়াংসী নদী মোহানা হইতে চীনের অভ্যন্তরে প্রায় ১৬০০ মাইল পর্যন্ত নাব্য বলিয়া পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী, অন্যপক্ষে আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর নাব্য অংশ অতি সামান্য বলিয়া ইহা পণ্য পরিবহনের অনুপযুক্ত। (৫) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের নাব্য অংশ **সরল** হইলে ইহা পণ্য পরিবহনের বিশেষ সহায়ক হয়। আমেরিকার হাডসন এবং সেণ্ট লরেন্স নদী এই কারণে পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী। (৬) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ জনবহুল ও সমৃদ্ধ দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে ইহাদের উপযোগিতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। মধ্য ইউরোপের জনবহুল ও সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া রাইন ও দানিয়ুব নদীর গুরুত্ব অধিক। (৭) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ **মুক্ত সমুদ্রে পতিত** এবং ঐ সমুদ্র বরফমুক্ত হইলে পণ্য পরিবহনে ইহাদের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ কারণে রাইনের গুরুত্ব সুদীর্ঘ দানিয়ুব বা ভল্‌গা হইতে অধিক। (৮) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ বাণিজ্য পথের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। নদনদী

বাণিজ্য পথের অনুগামী না হইলে আন্তর্দেশিক জলপথ হিসাবে উহাদের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। বাণিজ্য পথ হিসাবে সাইবেরিয়ার ওব নদীর গুরুত্ব এই কারণেই হ্রাস পাইয়াছে।

পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আন্তর্দেশিক খালপথসমূহ নিম্নরূপ হইলে উহাদের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।—(১) নাব্য খালপথ যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইবে তাহা বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (২) নাব্য খালপথসমূহ সমতল ভূমিভাগের উপর দিয়া প্রসারিত হইলে উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বন্ধুর পার্বত্য ভূমিভাগের উপর দিয়া খালপথ প্রসারিত হইলে 'লকগেট' (lock gate) বা জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী ফটকের সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহা ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। (৩) নাব্য খালপথসমূহ দুইটি নাব্য নদীপথের সহিত (যেরূপ রাইন-মার্ন খালপথ) অথবা সাগরের সহিত (যেরূপ বাল্টিক-কৃষ্ণসাগর খালপথ) সংযোগ সাধন করিলে উহাদের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পায়। (৪) উপকূলীয় সমুদ্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হইলে দেশাভ্যন্তরে উপকূলের সমান্তরালে প্রসারিত নাব্য খালসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। যেরূপ চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানাল।

উল্লেখযোগ্য আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ

উত্তর আমেরিকা—রকি পর্বতমালা উঃ আমেরিকার প্রধান জল-বিভাজিকা। জলপ্রবাহের দিক অনুসারে উঃ আমেরিকার নদীসমূহকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত নদী, যথা—ইউকন, ফ্রেজার, কলম্বিয়া, স্নেক, স্যাক্রামেণ্টো ও কলোরাডো। (২) সুমেরু সাগরে পতিত নদী, যথা—মেকেঞ্জী। (৩) হাডসন উপসাগরে পতিত নদী, যথা—স্যাসকাচুয়ান ও রেড্। (৪) মেক্সিকো উপসাগরে পতিত নদী, যথা—মিসিসিপি ও ইহার উপনদী মিশৌরী, আরকানসাস, রেড ওহিও। (৫) আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত নদী, যথা—সেণ্ট লরেন্স, হাডসন ও ইহার উপনদী মোহাক, ডেলাওয়ার, সাসকিহানা ও পটোম্যাক। উঃ আমেরিকার নদীগুলির মধ্যে উপসাগর ও মহাসাগরে পতিত পূর্ব উপকূলের নদীসমূহই সুনাব্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী। সুপিরিয়ার, ইরি, অণ্টেরিও, হুরন ও মিচিগান উত্তর আমেরিকার উল্লেখযোগ্য হ্রদ। ইহারাও নাব্য। উঃ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ জলভাগ পরিবহন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ক্যানাডার মেকেঞ্জি, স্যাসকাচুয়ান, ইউকন, নেলসন, আলবানি, কলম্বিয়া, ফ্রেজার, স্কীনা প্রভৃতি নদীগুলির কোন কোনটি শীতকালে বরফাবৃত

থাকায় এবং কোন কোনটি খরস্রোতা হওয়ায় সুনাব্য নহে। তবে সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরন, অন্টেরিও ও ইরি হ্রদ এবং সেন্ট লরেন্স নদী সংযোগে গঠিত জলপথটি এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সহায়ক।

৬৪ নং চিত্র—উত্তর আমেরিকার নাব্য জলপথসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্দেশিক জলপথসমূহও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান নদী মিসিসিপি ও ইহার বিভিন্ন উপনদীসমূহ দেশাভ্যন্তরে সুবিস্তৃত নাব্য জলপথের সৃষ্টি করিয়াছে। ২৫০০ মাইল দীর্ঘ পৃথিবীর দীর্ঘতমা নদী **মিসিসিপি** ইটাস্কা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজ মোহানায় বদ্বীপ সৃষ্টি করতঃ মেক্সিকো উপসাগরে পড়িতেছে। মোহানা হইতে ইহা সেন্ট পল বন্দর পর্যন্ত প্রায় ২০০ মাইল নাব্য। সেন্ট লুই অঞ্চলে রকি পর্বত হইতে উৎপন্ন মিশৌরী নদী (২৪৭৫ মাইল) ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মধ্য গতিতে পশ্চিমে রকি পর্বত হইতে উৎপন্ন আরকানসাস ও রেড্ এবং পূর্বে আপালাচিয়ান মালভূমি হইতে উত্থিত ওহিও ইহার উপনদী। এই নদীগুলিও সুনাব্য। রেলপথ প্রস্তুত

হইবার পূর্বে মিসিসিপি ও ইহার উপনদীসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল। তবে মিসিসিপি নদী সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলেও বর্তমানে ইহার গুরুত্ব সমধিক হ্রাস পাইয়াছে। কারণ মিসিসিপি নদী দক্ষিণ-বাহিনী কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রধানতঃ পুব বা পশ্চিমমুখী। তথাপি বর্তমানে কৃষি ও শিল্পাঞ্চলসমূহের পণ্য এবং পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা এই নদীপথেই দেশান্তরে নীত হয়। সেণ্ট লুই হইতে প্রসারিত মিসিসিপির দক্ষিণাংশ স্থানে স্থানে ২০ হইতে ৮০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। মিসিসিপির এই অংশে প্রবল বন্যা হয় বলিয়া উভয় তীরে অসংখ্য বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। ওহিও ও ইহার উপনদী মনঙ্গাহালা এবং আলবানিও স্থনাব্য। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলে আপালাচিয়ান পর্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া হাডসন, ডেলাওয়ার ও পটোম্যাক নদী আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। এই নদীগুলি ক্ষুদ্র হইলেও নৌচালনার বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইহাদের মোহানায় পোতাশ্রয় এবং তীরে প্রয়োজনীয় বন্দর নির্মিত হইয়াছে। সেণ্ট লরেন্স নদী ও বৃহৎ হ্রদ পাঁচটির সমন্বয়ে গঠিত জলপথটি এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক।

সেণ্ট লরেন্স—বৃহৎ হ্রদসমূহের জলপথ (St. Lawrence—Great Lakes Waterway)—যুক্তরাষ্ট্রের সমভূমি ও ক্যানাডীয় শীল্ডের সীমা-
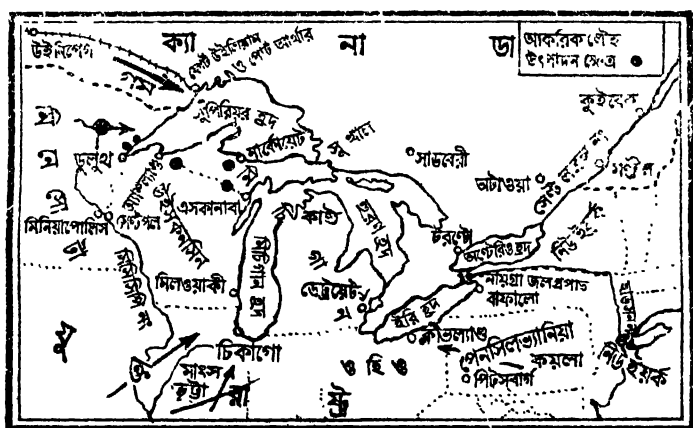
৬৫নং চিত্র—সেণ্টলরেন্স-বৃহৎ হ্রদপথ

রেখার উপর অবস্থিত সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরণ, ইরি ও অণ্টেরিও নামে যে পাঁচটি হ্রদ রহিয়াছে উত্তর আমেরিকার পক্ষে উহাদের অবদান অবর্ণনীয়। সেণ্ট লরেন্স নদী এই হ্রদসমূহের সহিত সংযুক্ত থাকায় আটলাণ্টিক উপকূল হইতে এই মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ জলপথ। কিন্তু এই হ্রদগুলি বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত। সুপিরিয়র হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০২', মিচিগান

ও হুরণ ৫৮১', ইরি ৫৭৩', এবং অণ্টেরিও ২৪৭' উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং উচ্চতর হ্রদ হইতে জল নিম্নতর হ্রদে অবতরণ করিবার সময় বৃহৎ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। সুপিরিয়র ও হুরণ হ্রদের মধ্যবর্তী সেণ্ট মেরী জলপ্রপাত অতিক্রম করিবার জন্য **'সু' খাল,** হুরণ ও ইরি হ্রদের মধ্যে **'সেণ্ট ক্লেয়ার' খাল,** এবং ইরি ও অণ্টেরিও হ্রদের মধ্যে নায়গ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করিবার জন্য **'ওয়েল্যাণ্ড' খাল** কাটিয়া এই জলপথটিকে নাব্য করা হইয়াছে। অণ্টেরিও হ্রদ মণ্ট্রীলের নিকট সেণ্ট লরেন্স নদীর সহিত খাল দ্বারা সংযুক্ত। ইহার ফলে নদী ও হ্রদ পথে সমুদ্রের তীর হইতে দেশাভ্যন্তরের প্রায় ২০০০ মাইল পর্যন্ত যাতায়াত করা চলে। তবে এই পথটি বৎসরে প্রায় ৫ মাস কাল বরফাবৃত থাকায় সেই সময়ে এই পথে পরিবহন বন্ধ থাকে—তথাপি এই পথের শ্রেষ্ঠত্ব ন্যূন হয় নাই। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রদেশ হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত পণ্য-চলাচল এই পথে অত্যন্ত সুগম ও সুলভ হইয়াছে। এই পথে সুপিরিয়র হ্রদ সন্নিহিত লৌহখনিসমূহ হইতে আকরিক লৌহ বাফেলো, ক্লীভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট, শিকাগো প্রভৃতি হ্রদ-তীরস্থ শিল্পকেন্দ্রসমূহে পরিবাহিত হয় এবং বিভিন্ন কয়লাখনি অঞ্চলসমূহ হইতে কয়লা হ্রদপথে এই অঞ্চলে আসে। আবার প্রেয়রী অঞ্চলের গমও এই পথেই পরিবাহিত হইয়া বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে পৌছে। গম পরিবহনের সুবিধা হেতু হ্রদসন্নিহিত বাফেলো, রচেস্টার, ডুলুথ, অণ্টেরিও প্রভৃতি স্থানে ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে। এই পথে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত বহু কাষ্ঠ ও খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। আবার এই হ্রদপথে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কাঁচামালের সাহায্যে শিকাগোর ন্যায় বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। হ্রদপথের সুবিধা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেলপথসমূহ শিকাগোর ন্যায় হ্রদসন্নিহিত কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে।

আবার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও নায়গ্রা জলপ্রপাতের দান অতুলনীয়। ক্যানাডার অন্তর্গত দক্ষিণ অণ্টেরিও ও কুইবেক প্রদেশের শিল্পাঞ্চল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাফেলো, রচেস্টার ও নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই নায়গ্রা প্রপাত হইতে উদ্ভূত জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ হ্রদসমূহ ও সেণ্ট লরেন্স নদী হইতে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রচুর মৎস্যও ধৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—দক্ষিণ আমেরিকার নাব্য নদীগুলির মধ্যে আমাজন, প্লাটা ও অরিনোকো প্রধান। পেরু প্রদেশে আন্দিজ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাজিলের অরণ্যময় সেলভা ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া **আমাজন** নদী আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। নিরক্ষীয় অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহার জলপ্রবাহ সারাবৎসরই সমান এবং ইহার অববাহিকা

বহুদূর পর্যন্ত বন্যার জলে প্লাবিত থাকে। ফলে এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। ইহা মোহানা হইতে প্রায় ২৬০০ মাইল পর্যন্ত নাব্য। আমাজন সুনাব্য নদীপথ হইলেও ঘন বনাকীর্ণ, জনবিরল এবং অনুন্নত প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ সামান্য। ইহার বাম তীরে
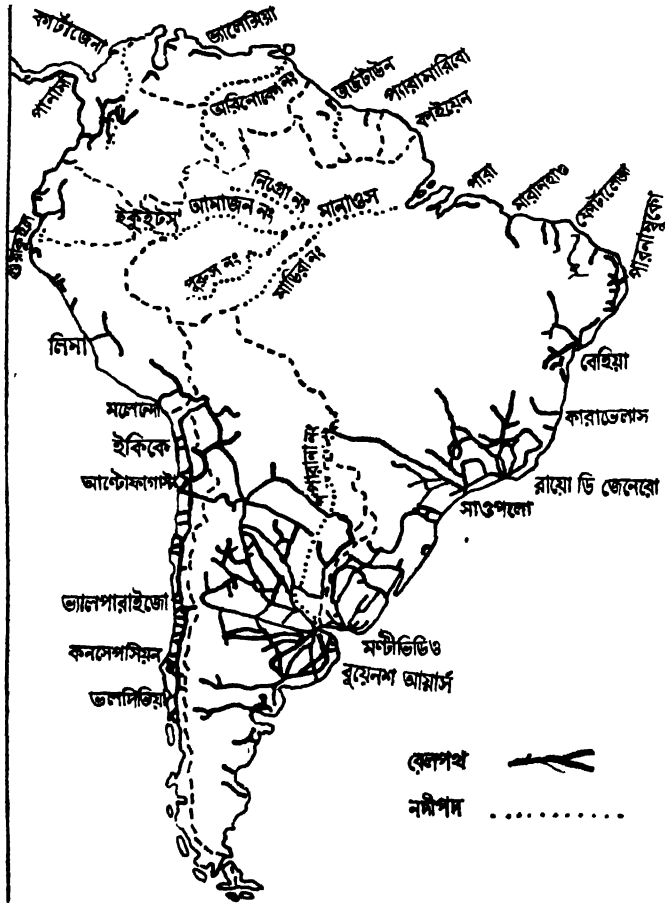
৬৬নং চিত্র—দক্ষিণ আমেরিকার নাব্য জলপথ ও রেলপথ সমূহ

রায়ো-নিগ্রো এবং দক্ষিণ তীরে রায়ো-মাডিরা প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ খরস্রোতা উপনদী রহিয়াছে। ব্রাজিলের পর্বতশ্রেণীতে উৎপন্ন **পারানা** এবং মত্তোগ্রসো-উচ্চভূমিতে উৎপন্ন **পারাগুয়ে** দক্ষিণে কিয়দ্দুর আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত প্রবাহ পারানা-পারাগুয়ে নামে পরিচিত। মোহানার নিকট ইহার সহিত উরুগুয়ে নদীর মিলন ঘটিয়াছে; পরবর্তী অংশ **প্লাটা**

নামে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। প্লাটার মোহানা উপসাগরের ন্যায় প্রশস্ত। এই মিলিত জলস্রোত কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবহুল আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিলের সর্বপ্রধান জলপথ। এই নদী মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল সুনাব্য। **অরিনোকো** নদী গিয়ানা মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ভেনেজুয়েলার ল্লানো প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উহা মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল সুনাব্য। উত্তরাংশে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাব্য নদীগুলির মধ্যে ম্যাগডালিনাই প্রধান। আন্দিজের মধ্যস্থলে টিটিকাকা মালভূমিতে (১২,০০০ ফিট উচ্চ) অবস্থিত টিটিকাকা একটি উল্লেখযোগ্য হ্রদ। এই মহাদেশের প্রধান প্রধান নাব্য নদীসমূহ পূর্ব প্রবাহিণী। পশ্চিম প্রবাহিণী নদীসমূহ নাব্য জলপথ হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ নদনদীর সংখ্যা অতি সামান্য। অধিকাংশ নদী বর্ষাকালে পুষ্ট হয় এবং অন্য সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়। গ্রেট ডিভাইডিং পর্বত অস্ট্রেলিয়ার জলবিভাজিকা। ইহার পূর্বাঞ্চলের ফিজরয়, ব্রিসবেন প্রভৃতি নদীসমূহ ক্ষুদ্র ও খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। আবার ডিভাইডিং পর্বতের পশ্চিম ঢালের নদীসমূহ অন্তর্বাহিনী। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার **মারে-ডার্লিং** নদীই এই মহাদেশের একমাত্র নাব্য নদীপথ। এই নদী অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পর্বতের পশ্চিম ঢালে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইতেছে। ঐ পর্বতের শৃঙ্গগুলি তুষারাবৃত থাকায় এবং ঐ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই নদীটি কখন শুষ্ক হয় না। তবে এতদঞ্চলে মোটরপথে চলাচল ব্যবস্থা প্রসার লাভ করায় বর্তমানে এই নদীপথটির গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এই নদী হইতে খাল কাটিয়া ভূমিতে জলসেচন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

আফ্রিকা—আয়তনের তুলনায় আফ্রিকায় আভ্যন্তরীণ জলভাগের পরিমাণ অধিক নহে। দক্ষিণ-পুর্বের উচ্চ মালভূমি আফ্রিকার প্রধান জল-বিভাজিকা। দেশটির অধিকাংশই মালভূমি বলিয়া নদীসমূহ প্রাথমিক ও মধ্যগতিতে নাব্য, কিন্তু শেষগতিতে খরস্রোতা বলিয়া ইহারা নৌচালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী নহে। **নীল** (৪০০০ মাইল) আফ্রিকার দীর্ঘতম নদ। ইহা মোহানা হইতে খার্টুম নগর পর্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল সারা-বৎসরই নাব্য। ৩০০০ মাইল দীর্ঘ **কঙ্গো** নদীর অববাহিকা অঞ্চল প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল। নায়াসা হ্রদের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হইয়া ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। এই নদী নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃষ্টির জলে সর্বদাই পূর্ণ থাকে। মালভূমি অঞ্চলে স্ট্যানলী জলপ্রপাত পর্যন্ত ইহা প্রায় ১০০০ মাইল নাব্য। কঙ্গোর প্রধান উপনদী **উবাঙ্গী**ও সুনাব্য। **নাইজার** (২৩০০ মাইল) কং পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম সুদানকে বিধৌত করিয়া গিনি উপ-

সাগরে পড়িতেছে। ইহা ৫০০ মাইল নাব্য। **জাম্বেজী** (১৮০০ মাইল) পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া আফ্রিকার পূর্বাংশ বিধৌত করিয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইতেছে। মোহানা হইতে ইহা প্রায় ২৫০ মাইল নাব্য। আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত দক্ষিণ আফ্রিকার **অরেঞ্জ** ও ভারত মহাসাগরে পতিত **লিম্পোপো** বাণিজ্যপোত চলাচলের উপযোগী নহে। ইহা ছাড়া টাঙ্গানিয়াকা ও নিয়াসা হ্রদসমূহও সুনাব্য।

ইউরোপ—সুনাব্য নদনদীর সংখ্যার দিক হইতে ইউরোপ মহাদেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। নদীগুলি দীর্ঘ না হইলেও প্রায় সর্বত্রই নাব্য ও খালপথে পরস্পর সংযুক্ত। শিল্পসমৃদ্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ইহারা বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক। সমুদ্র হইতে নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা রহিয়াছে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান বন্দর ইউরোপীয় নদীগুলির মোহানায় অবস্থিত। আল্পস্ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রাইন (৭৬০ মাইল) উত্তর সাগরে, রোন (৪৯০ মাইল) ভূমধ্যসাগরে এবং পো (৪১৫ মাইল) আড্রিয়াতিক সাগরে পড়িতেছে। মধ্যভাগের পার্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ভিশ্চুলা (৬৩০ মাইল) ও ওডার (৫৮০ মাইল) বাল্টিক সাগরে, এবং এলব (৬৯০ মাইল) উত্তর সাগরে পড়িতেছে। ফ্রান্সের সেন (৪৮০ মাইল) ইংলিশ চ্যানেলে, লোয়ার (৫৭০ মাইল) এবং গ্যারন (৩৫০ মাইল) বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে। স্পেন ও পর্তুগালের মধ্য দিয়া ডুরো (৪৬০ মাইল), টেগাস (৫১০ মাইল) ও গুয়াদালকুইভার আটলাণ্টিক মহাসাগরে এবং এব্রো (৪২০ মাইল) ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। নিস্টার (৭০০ মাইল), নিপার (১২০০ মাইল) এবং ডন (১২০০ মাইল) কৃষ্ণসাগরে, ভল্গা (২২০০ মাইল) কাস্পিয়ান সাগরে এবং পেচোরা ও ডুইনা উত্তর সাগরে পড়িতেছে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নদী **দানিয়ুব** (১৭২৫ মাইল) জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্ট হইতে উৎপন্ন হইয়া দঃ জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহানায় বিস্তৃত বদ্বীপ সৃষ্টি করতঃ কৃষ্ণ সাগরে পড়িতেছে। দঃ পূঃ ইউরোপের ইহাই প্রধান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবাহী নদীপথ। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট প্রভৃতি শহর এই নদীতীরে অবস্থিত। এই নদীর অববাহিকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয় এবং উহা এই নদীপথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বন্দরে প্রেরিত হয়। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের আন্তর্দেশিক নাব্য জলপথসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাজ্য—ব্রিটেনে বহুসংখ্যক নদনদী এবং প্রায় ২৪০০ মাইল নাব্য খালপথ রহিয়াছে। খালগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার খাল এবং

স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়ান খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাঞ্চেস্টার খাল যুক্তরাজ্যের সর্বপ্রধান নাব্য খাল, মার্শে নদীর তীর হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই খালটি ৩৫½ মাইল দীর্ঘ, তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ ১২০´ এবং গভীরতা ২৮´। বর্তমানে এই খালপথে কার্পাসবাহী পোতসমূহ ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত পৌছিতে পারে। ১৮৯৫ সালে ইহা খনন করা হয়। এই খালপথটি ম্যাঞ্চেস্টার বন্দরটিকে সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত করিয়াছে বলিয়া অনেকে এই খালপথটিকে আন্তর্দেশিক জলপথের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। দেশাভ্যন্তরে রেলপথসমূহ প্রসার লাভ করায় বর্তমানে ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি নাব্য খালপথ লকগেটের সাহায্যে পিনাইন পর্বতমালার মধ্য দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম প্রবাহিণী নদীসমূহের সংযোগ সাধন করিতেছে।

ফ্রান্স—ফ্রান্সের **জলপথ**সমূহ আন্তর্দেশীয় পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী। রোন, সীন, লয়ার ও গ্যাবন এই কয়টি ফ্রান্সের প্রধান নদীপথ। **রোন** নদী (৪৯০ মাইল) সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দর মার্শাই ইহার মোহানায় অবস্থিত। ইহার উচ্চ অংশ খরস্রোতা বলিয়া সুনাব্য নহে। **রাইন-রোন-খাল** দ্বারা ইহা জার্মানীর রাইন নদীর সহিত সংযুক্ত। **সীন** (৪৮০ মাইল) নদী বার্গাণ্ডির পর্বতাঞ্চল হইতে উৎপন্ন

৬৭নং চিত্র—ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ জলপথ

হইয়া প্যারীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইংলিশ চ্যানেলে পড়িতেছে। মোহানা হইতে ইহা প্যারী পর্যন্ত নাব্য। এই পথে বহু পণ্য পরিবাহিত হয়। সীনের নাব্য অংশ **বার্গাণ্ডি খালের** সাহায্যে রোনের সহিত এবং **রাইন-মার্ন খালের** সাহায্যে রাইনের সহিত সংযুক্ত। সীনের উপনদী **ইয়োন, মার্ন** ও **ওইজ**ও সুনাব্য। ওইজ নদীপথে প্রচুর কয়লা প্যারী পর্যন্ত পরিবাহিত হয়। বিস্কে উপসাগরে পতিত **লয়ার** (৫৭০ মাইল) সুনাব্য নদীপথ। **ক্যানাল-ডু-সাঁৎর** দ্বারা **সাওন**কে লোয়ার-এর সহিত এবং **নান্তে-ব্রেস্ত খাল** দ্বারা লায়ার নদীকে ব্রেস্ত-বন্দরের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। **গ্যারন** (৩৫০ মাইল) ও **ডরডন** ফ্রান্সের সুনাব্য নদীপথ। **ক্যানাল ডু মিদি** গ্যারকনে

রোন-এর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সহিত সংযুক্ত করে। বর্তমানে **মার্শাই-রোন** খালের সাহায্যে রোন-নদীর বালিয়াড়ী ধ্বংস করা হইতেছে। এই খাল রাইন নদীকে পোর্ত-দ্য-ব্যু, এতাঙ্গ-ক্যারু, এতাঙ্গ-দ্য-বেয়র্ এবং রোভ সুরঙ্গের মধ্য দিয়া মার্শাই বন্দরের সহিত সংযুক্ত করে।

এই সকল নদী ও ইহাদের বহুসংখ্যক উপনদী সুনাব্য খাল দ্বারা এরূপভাবে সংযুক্ত যে উত্তরে সীন নদীর মোহানায় হাব্‌র বন্দর ও উত্তর-পশ্চিমের ব্রেস্ত বন্দর হইতে অভ্যন্তর ভাগের প্রায় সমস্ত শিল্পবাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়াই দক্ষিণে মার্শাই বন্দর পর্যন্ত জলপথে যাতায়াত করা চলে। আবার ফ্রান্সের জলপথসমূহ বেলজিয়াম ও জার্মানীর জলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত থাকায় ইহাদের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্সের জলপথসমূহের কয়েকটি ত্রুটিও রহিয়াছে। (১) আভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের অপ্রাচুয, (২) জলপথে পণ্য পরিবহনে দীর্ঘ সময় ব্যয়, এবং (৩) স্থল ও জলপথের মধ্যে পণ্য পরিবহনের পথ পরিবর্তনের সময় উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাব। ফ্রান্সে ৭০০০ মাইলেরও অধিক নাব্য জলপথ রহিয়াছে।

জার্মানী—জার্মানীর আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ বিশেষ উন্নত ধরণের। দেশের মধ্য দিয়া যে সমস্ত নদী প্রবাহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে রাইন, ওয়েজার, এলব, ওডার, ভিশ্চুলা ও দানিয়ুব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলির সমস্তই সুনাব্য। ইহাদের মধ্যে দানিয়ুব ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানীর পণ্য চলাচলের দিক হইল প্রধানতঃ পূর্ব-পশ্চিম-মুখী। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নদীগুলিকে খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া পূর্ব-পশ্চিমমুখী জলপথসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রাইন পর্বতের নিম্ন অংশে জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ ও নিবিড় বসতি পূর্ণ রূহ্‌ঢ় অঞ্চলটি অবস্থিত। কিন্তু রাইন নদীটি হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুক্ত সমুদ্রে পতিত হওয়ায় এই নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থায় জার্মানী অপেক্ষা হল্যাণ্ডেরই অধিকতর সুবিধা হইয়াছে। রূহ্‌ঢ় শিল্পাঞ্চলের শিল্পসামগ্রী জার্মানীর নিজস্ব সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য রাইন নদীকে পূর্বদিকে প্রবাহিত এমস্‌ নদীর সহিত এমস্‌-ডর্টমাণ্ড খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া উত্তর সাগরের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। রাইন নদীটি পশ্চিম দিকে বেলজিয়াম রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত মিউজ নদীর সহিত খালপথে সংযুক্ত। মিউজ নদীটি আবার ফ্রান্সের অন্তর্গত সীন-এর উপনদী মার্ন-এর সহিত এবং রাইন নদীটি ফ্রান্সের রোন নদীর সহিত খালের সাহায্যে সংযুক্ত রহিয়াছে। এইভাবে জার্মানী হইতে আন্তর্দেশিক জলপথে অনায়াসেই বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পৌঁছান যায়। রাইন-এর উপনদী মেইন লুডউইগ খালের সাহায্যে দানিয়ুব

নদীর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে উত্তর সাগর হইতে বাণিজ্য-পোতসমূহ এমস-ডর্টমাণ্ড খাল—রাইন-মেইন-লুডউইগ খাল—দানিয়ুব জলপথে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত পৌছিতে পারে।

জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ ও নিবিড় বসতিপূর্ণ মধ্যাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত এলব নদীর উভয় তীরে হামবুর্গ, ম্যাগডিবার্গ, ড্রেসডেন প্রভৃতি বহু বিখ্যাত শিল্প নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদীটি ওয়েজার নদী ও মিটেল্যাণ্ড খালের সাহায্যে রাইন নদীর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বদিকে কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত ওডার নদী এলব নদীর সহিত খালপথে

৬৮নং চিত্র—জার্মানীর আভ্যন্তরীণ জলপথ

সংযুক্ত। ওডার নদী আবার ভিশ্চুলা নদীর সহিত ওডার-ভিশ্চুলা খালের সাহায্যে সংযুক্ত রহিয়াছে। জার্মানীর সমগ্র উত্তরাঞ্চল ব্যাপিয়া খালগুলি জালের ন্যায় বিস্তৃত থাকায় উহারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জার্মানীর উত্তরাংশ দিয়া প্রসারিত কিয়েল খাল বাল্টিক ও উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। ইহা ৬১ মাইল দীর্ঘ, ৩৮′ গভীর এবং ১৪৪′ প্রশস্ত। ১৮৯৫ সালে ইহার খননকার্য শেষ হয়। এই খালটি জার্মানীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিয়েল বন্দর এই খালের উপর অবস্থিত। বর্তমানে ইহা পশ্চিম জার্মান সাধারণতন্ত্র এলাকার মধ্যবর্তী।

রুশিয়া—এই বহু বিস্তৃত ও সমভূমিপ্রায় দেশটিতে **জলপথে** পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মোট পণ্যের ১০% জলপথে পরিবাহিত হয়। রুশিয়ায় বর্তমানে ২৪৮,৪০০ মাইল নাব্য **জলপথ** রহিয়াছে, তবে ইহার মাত্র ¼ অংশ পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইতেছে। **ইউরোপীয় রুশিয়ার** নাব্য নদীপথসমূহের মধ্যে পূর্বদিকে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত ভল্গা এবং ইহার প্রধান উপনদী ওকা ও কামা, দক্ষিণে আজভ সাগরে পতিত ডন ও ইহার প্রধান শাখা নদী ডোনেৎস্, কৃষ্ণ সাগরে পতিত নীপার, নীস্টার ও দানিয়ুব; উত্তরে রিগা উপসাগরে পতিত ডুইনা ও শ্বেত সাগরে পতিত উত্তর ডুইনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় রুশিয়ার পূর্বভাগের আর্থিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই অঞ্চলের নদীসমূহ। শিল্পপ্রধান এবং নিবিড় বসতিপূর্ণ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই ইউরোপের বৃহত্তম নদী ভল্গা (২৪০০ মাইল)

ও তাহার উপনদী ওকা ও কামা এবং পেচোরা, উঃ ও পঃ ডুইনা প্রবাহিতা। তবে নাব্য জলপথ হিসাবে রুশিয়ার নদীসমূহের কয়েকটি ত্রুটিও রহিয়াছে। যেরূপ—(১) শীতকালে নদীসমূহ বরফাবৃত থাকে এবং বরফ গলিলে নদীসমূহে প্লাবন হয়, আবার গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ হ্রাস পায়। (২) নদীপথে বহু খরস্রোত ও বালিয়াড়ি রহিয়াছে। (৩) নদীসমূহের গতিপথ বহুক্ষেত্রেই সরল নহে। (৪) শ্রেষ্ঠ নদী ভল্গা কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হওয়ায় ইহার উপযোগিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। (৫) উত্তরের নদীসমূহ বিরল-বসতিপুর্ণ এবং অনুন্নত অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রুশিয়ার জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি এই নদীসমূহের মধ্যে পরস্পরসংযোগকারী খাল কাটিয়া এবং নদী-সমূহের গভীরতা সম্পাদন করিয়া ইহাদের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। ভল্গা নদীপথে এই রাষ্ট্রের প্রায় ⅓ অংশ পণ্য পরিবাহিত হয়। "গ্রেট ভল্গা স্কীম" নামক পরিকল্পনার সাহায্যে এই নদীসমূহের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। উত্তর ডুইনা এবং পেচোরা নদী ও লেনিনগ্রাদ বন্দর ভল্গার সহিত খালপথে সংযুক্ত। ইহাতে তুন্দ্রা অঞ্চল হইতে রুশিয়ার দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত নৌ-চলাচল সম্ভব হইয়াছে। বাল্টিক-শ্বেতসাগর খাল, মস্কো-ভল্গা খাল, ডন-ভল্গা খাল প্রভৃতির সাহায্যে ইউরোপীয় রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নৌপথে যাতায়াত করা চলে। মস্কো জলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল। খাল ও নদীপথে মস্কো বাল্টিক, শ্বেত, কাস্পিয়ান, আজভ ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযুক্ত থাকায় মস্কোকে "পঞ্চসমুদ্রের বন্দর" (Port of the five seas) বলা হয়। নীপার নদীতে বাঁধ দিয়া ইহার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং নীপারের উপনদী বেরেসিনাকে পশ্চিম ডুইনার সহিত সংযুক্ত করায় বাল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযোগ সাধিত হইয়াছে। উত্তরাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ, দক্ষিণাঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য, ডন অববাহিকা অঞ্চল হইতে কয়লা, ককেশাস অঞ্চল হইতে কার্পাস ও তৈল, ইউরাল অঞ্চল হইতে খনিজ দ্রব্যসমূহ জলপথে মস্কো লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চলে আনীত হয়। **এশীয় রুশিয়ার** নাব্য জলপথসমূহের মধ্যে সাইবেরিয়ার ওব ও ইহার শাখানদী ইরতিশ, ইনিসি, সেলেঙ্গা ও আঙ্গারা; লেনা ও আমুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাইবেরিয়ার নদীসমূহ (১) বিরলবসতিপুর্ণ এবং অনুন্নত অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, (২) বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবৃত এবং (৩) পুর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত না হওয়ায় পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী নহে। সম্প্রতি ভল্গার শাখানদীগুলিকে ওব ও ইরতিশ জলপথের সহিত এবং ওব, ইনিসি ও লেনার পুর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত শাখানদীসমূহকে খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে চলিয়াছে। আবার বর্তমানে উত্তরসাগরের সমুদ্রপথে মার্মানস্কের সহিত ভ্লাডিভস্টকের সংযোগ সাধিত হওয়ায় এবং উত্তর

উপকূলাঞ্চলে নূতন নূতন বন্দর সৃষ্টি হওয়ায় এই নদীসমূহের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্য এশিয়ার তারিম, ইউরাল, সির ও আমু নদীই উল্লেখযোগ্য। তবে নদীসমূহ স্বল্পজলবিশিষ্ট ও বালিয়াড়ি-সংকুল হওয়ায় সুনাব্য নহে কিন্তু সেচকার্যের সহায়ক। সির ও আমু কতকাংশে নাব্য। মধ্য এশিয়ার সমস্ত নদীই অন্তর্বাহিণী।

এশিয়া—মধ্যভাগের পার্বত্যভূমিই এশিয়ার প্রধান জলবিভাজিকা। এই উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হইয়া নদীসমূহ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর মহাসাগরে পতিত নদীসমূহের মধ্যে ওব, ইনিসি ও লেনা অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকায় নাব্য নহে। প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত নদীসমূহের মধ্যে আমুর, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং কতকাংশে নাব্য। মেকং ও মেনাম দক্ষিণ চীন সাগরে পড়িতেছে। ভারত মহাসাগরে পতিত নদীসমূহের মধ্যে সালুয়েন ও ইরাবতী মার্তাবান উপসাগরে; গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে; সিন্ধু আরব সাগরে; এবং টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস শেষ গতিতে মিলিত অবস্থায় সাত-এল-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়িতেছে। সালুয়েন ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই সমভূমি অংশে নাব্য। অন্তর্বাহিণী নদীগুলির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার তারিম লবনর হ্রদে, ইউরাল কাস্পিয়ান সাগরে, সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া আরল হ্রদে, হেলমন্দ হামুন হ্রদে ও জর্ডান নদী মরু সাগরে পড়িতেছে। এশিয়ায় বহু হ্রদও রহিয়াছে। কাস্পিয়ান, আরল, বলখাস, উরুমিয়া, লবনর, হামুন, মরুসাগর, তুজগুল ও ভান লবণাক্ত জলের এবং বৈকাল, উলার ও মানস সরোবর স্বাদু জলের হ্রদ। পরিবহন কার্যে নদী ও খাল পথের ব্যবহার চীন ও ভারতেই অধিক।

চীন—সেচ কার্য ও পণ্য পরিবহনে চীনের **নদী**সমূহ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং এই তিনটিই চীনের প্রধান নদী। এই নদীগুলির সমস্তই পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত। চীনের দীর্ঘতমা নদী **ইয়াংসি** (৩৬০০ মাইল) তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র মধ্য চীনকে বিধৌত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতেছে। এই নদীর অববাহিকা অতিশয় উর্বর এবং চীনের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীই এস্থানে বাস করে। এই নদী সমুদ্র হইতে প্রায় ১৬০০ মাইল পর্যন্ত সুনাব্য। কৃষিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ চীনের অভ্যন্তরভাগের ইহাই একমাত্র বাণিজ্য পথ। ইউনান মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া **সিকিয়াং** চীনের দক্ষিণ অংশ বিধৌত করিয়া চীন সাগরে পড়িতেছে। এই নদী মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল নাব্য। কুয়েনলুন পর্বত হইতে নির্গত হইয়া **হোয়াংহো** বা **পীতনদী** (২৭০০ মাইল) চীনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পেচিলি উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার নিম্ন অংশ উত্তর চীনের প্রধান নদীপথ। ইহা পীতবর্ণ পলল আনয়ন করিয়া নদীগর্ভ

পূর্ণ করে এবং মধ্যে মধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করে। ইহার প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত হওয়ায় এবং কয়েকবার ইহার গতি পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-নাশ ও আবাসস্থল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে "চীনের দুঃখ" বলা হয়। এই নদী সুনাব্য নহে। নদীসংযোগকারী **নাব্য খালের** সংখ্যার দিক হইতে চীনদেশ পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেশে ২৫,০০০ মাইল নাব্য খাল রহিয়াছে। বাণিজ্যপোত চলাচল, জলসেচ ও জলনিষ্কাশন প্রভৃতি কার্য এই খালগুলির সাহায্যে পরিচালিত হয়। ৬৬০ মাইল দীর্ঘ 'গ্র্যাণ্ড খাল'ই চীনের দীর্ঘতম নাব্য খাল। ইহা ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো-র বদ্বীপকে সংযুক্ত করিয়াছে।

ভারতের আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ
(Inland Waterways of India)

ভারতে রেলপথের পরেই আন্তর্দেশিক জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। ভারতে মোট ৮০০০ মাইল সুনাব্য নদীপথ এবং ১২০০০ মাইল সুনাব্য খালপথ রহিয়াছে। নদীপথসমূহ উত্তর ভারতে এবং খালপথসমূহ পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজেই প্রধানতঃ বিস্তৃত। তবে জলপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি সামান্য।

পণ্য পরিবহন কার্যে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, বিশেষতঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আসাম ও কলিকাতার মধ্যে পরিবাহিত ২৫ লক্ষ টন পণ্যের প্রায় অর্ধাংশই আন্তর্দেশিক জলপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যেও আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পরিবহন কার্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ঐ রাজ্যের জলপথসমূহ দেশাভ্যন্তরের সহিত উপকূলাঞ্চলের বহু অপ্রধান বন্দরের এবং প্রধান বন্দর কোচিনের সংযোগ সাধন করিতেছে। উড়িষ্যার বদ্বীপাঞ্চলে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদঞ্চলের কেন্দ্রপাড়া ও তালডাণ্ডা খাল এবং উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলের খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের পণ্য পরিবহন কার্যেও আন্তর্দেশিক জলপথ-সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা **উত্তর ভারতের** প্রধান নাব্য **নদনদী**। উত্তর ভারতের নদীসমূহ সারাবৎসরই তুষার-গলা জল ও বৃষ্টির জলে পূর্ণ থাকে। ইহারা দীর্ঘ ও অল্প স্রোতযুক্ত হওয়ায় নৌ-চলাচলের বিশেষ উপযোগী। ইহাদের ঢালগুলি সুস্পষ্ট, তবে ইহারা মধ্যে মধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে।

গঙ্গা (১৫০০ মাইল)—ইহা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বারের নিকট সমতলভূমিতে প্রবেশ করে, পরে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের

মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট ভাগীরথী ও পদ্মা নামে যথাক্রমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুর্বে প্রবাহিত হইয়া মোহানায় বদ্বীপ সৃষ্টি করতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। ভাগীরথীর নিম্ন অংশের নাম হুগলী নদী। গঙ্গার অববাহিকা অতিশয় উর্বর। এই নদী মোহানা হইতে বহুদুর পর্যন্ত নাব্য। সমভূমিতে ইহার দক্ষিণ তীরে যমুনা ও উহার উপনদী চম্বল ও বেতোয়া এবং শোন নদ আর বাম তীরে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী এই কয়টি উপনদী আছে। এই উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা ও ঘর্ঘরা বহুদূর পর্যন্ত এবং শোন, গোমতী ও গণ্ডক কিছুদূর পর্যন্ত নাব্য। গঙ্গার তীরে হরিদ্বার, ফরক্কাবাদ, কনৌজ, কানপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, কাশী, গাজীপুর, পাটনা, ভাগলপুর, প্রভৃতি নগর; যমুনার তীরে দিল্লী, মথুরা, আগ্রা ও এলাহাবাদ এবং ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা অবস্থিত। নদীপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য ভাগীরথী, গণ্ডক, কুশী, শোন, ঘর্ঘরা ও যমুনা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য।

ব্রহ্মপুত্র (১৬৮০ মাইল)—এই নদ তিব্বতের মানস সরোবর হইতে নির্গত হইয়া তিব্বতে সানপো নামে বহুদূর প্রবাহিত হইবার পর আসামের উত্তর-পুর্ব কোণে সদিয়া নামক স্থানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। আসামের মধ্য দিয়া প্রথমে পশ্চিম ও পরে সমকোণে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পুর্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। ইহার প্রধান প্রধান উপনদীসমূহের মধ্যে দক্ষিণতীরের সুবর্ণশ্রী, মানস, তোর্সা, তিস্তা, করতোয়া, এবং বামতীরের ডিবং, লোহিত, ডিহং ও ধনশ্রী উল্লেখযোগ্য। তিব্বতে সানপো, উঃ পুঃ আসামে ডিহং এবং নিম্নতর অংশে ব্রহ্মপুত্র এই তিন নামে ব্রহ্মপুত্র পরিচিত। ইহা মোহানা হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ৮০০ মাইল সুনাব্য। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি; লোহিতের তীরে সদিয়া; তোর্সার তীরে কুচবিহার এবং তিস্তার তীরে জলপাইগুড়ি অবস্থিত। নূতন নূতন দ্বীপ ও বালিয়াড়ির সংগঠন এবং বর্ষাকালে প্রবল স্রোত ব্রহ্মপুত্র নদে নৌ-চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের মধ্যে নর্মদা ও তাপ্তী পুর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও মহানদী পশ্চিম হইতে পুর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। দক্ষিণ-ভারতের নদীসমূহ বরফ-গলা জলে পুষ্ট নহে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে ইহারা প্রায়ই শীর্ণ বা শুষ্ক হইয়া যায়। আবার বর্ষাকালে ইহারা অত্যন্ত খরস্রোতা হয় বলিয়া নাব্য নহে। নদীগুলি দৈর্ঘ্যেও অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহাদের গতিপথ নির্দিষ্ট কিন্তু ঢাল সুস্পষ্ট নহে। ইহারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের

বিশেষ উপযোগী। নর্মদা মহাকাল পর্বত, তাপ্তী মহাদেব পর্বত, গোদাবরী (মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্ররাজ্য), কৃষ্ণা (মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্ররাজ্য) ও কাবেরী (মহীশূর ও মাদ্রাজ) পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে এবং মহানদী (মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা) সাতপুরা পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। প্রাণহিতা (পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গার মিলনে উৎপন্ন), ইন্দ্রাবতী ও মঞ্জীরা গোদাবরীর ; ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার ; সিমলা, হেনাবতী ও অমরাবতী কাবেরীর এবং বৈতরণী ও -ব্রাহ্মণী মহানদীর প্রধান উপনদী। ইহা ছাড়া উত্তর পেনার ও দক্ষিণ পেনার নামে আরও দুইটি নদী মহীশূরের পর্বতাঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া পূর্বঘাটের মধ্য দিয়া বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। নর্মদার তীরে জব্বলপুর ও ব্রোচ ; তাপ্তীর তীরে সুরাট ; মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও কটক ; গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রী ; কৃষ্ণার তীরে সাতারা ও বেজওয়াডা এবং কাবেরীর তীরে ত্রিচিনপল্লী ও কুম্ভকোণম শহর অবস্থিত।

ভারতে নদীসংযোগকারী **খাল**সমূহও জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থার বহু সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ইস্টার্ন ও সার্কুলার খাল (পূর্ববঙ্গেও বিস্তৃত), উত্তর প্রদেশে হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্যে গঙ্গানদীর খাল, মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর সংযোজক বাকিংহাম খাল, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কুর্নুল-কুডাপ্পা খাল এবং উড়িষ্যার উপকূলবর্তী খাল এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা-উপকূলের এবং মাদ্রাজ ও মহানদীর বদ্বীপাঞ্চলের খালসমূহের পরস্পর সংযোগ সাধনের দ্বারা কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত খাল-পথে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "সেণ্ট্রাল ইরিগেশান অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন" নামক সংস্থাটি ভারতীয় নদীপথসমূহের সম্যক উন্নতি বিধান কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথম **পরিকল্পনার** কার্যকালে ১৯৫২ সালে "দি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড" নামক একটি সংস্থা এই দুইটি নদীপথের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য সরকার সমূহের যৌথ প্রয়াসে স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত বাকিংহাম খালের উন্নতি সাধন, কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম উপকূলের খালটির বাডাগাডা হইতে মাহে পর্যন্ত প্রসারণ, "জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীজ"কে উহাদের পণ্যবাহী নৌ-বহরের সংস্কার সাধন কল্পে সরকার কর্তৃক ২ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দান এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পথে নৌচলাচলের উন্নতি সাধন প্রভৃতি কার্য সম্পূর্ণ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ১০ বৎসরে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের উন্নতি কল্পে মোট ব্যয় হয় প্রায় ১ কোটি টাকা।

আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে "দি ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কমিটি" নামক একটি সমিতি ১৯৫৯ সালে একটি তথ্যপূর্ণ

বিবরণী এবং আন্তর্দেশিক জলপথ সমূহের সামগ্রিক উন্নতি কল্পে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করেন। এই সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট সুপারিশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কালে পাণ্ডুতে একটি আন্তর্দেশিক বন্দর স্থাপন এবং দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত খাল সমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে "জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানীজ"কে অধিকতর আর্থিক সাহায্য দান করা হইবে; আন্তর্দেশিক জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার উপদেষ্টা সংস্থারূপে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করা হইবে; ব্রহ্মপুত্র ও সুন্দরবনাঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা খনন যন্ত্র ও কয়েকটি মোটরলঞ্চ ক্রয় করা হইবে; প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারণ করা হইবে; গৌহাটির নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশে ভাটার সময় জল থাকে না তাহার উন্নতি বিধান করা হইবে; এবং সুন্দরবনাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে নৌকা গুণ টানিয়া লইবার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইবে। কেরালা রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের খালটির উন্নয়ন ও অধিকতর প্রসারণ, উড়িষ্যার তালডাণ্ডা ও কেন্দ্রপাড়া খাল দুইটির উন্নয়ন, রাজস্থান খালের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যসূচীও গৃহীত হইবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রায় ৭·৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ভারতের জলপথসমূহের অধিকতর উন্নতি সাধিত হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমুদ্রপথ (Ocean Routes)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধানতম অংশই সমুদ্রপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপথের কয়েকটি স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে: উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রাঞ্চল ব্যতীত সমুদ্রপথে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে। আবার সমুদ্রপথের নির্মাণ ও সংরক্ষণ ব্যয় একেবারেই নাই বলিয়া সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ব্যয় অতি সামান্য।

পৃথিবীর পণ্যবাহী নৌবহর (World's Merchant Marine)—পৃথিবীর পণ্যবাহী নৌবহরের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য কয়েকটি সংজ্ঞার (terms) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যথা—(১) 'কার্গো টনেজ' (Cargo Tonnage) বলিতে পরিবাহিত পণ্যের ওজন বুঝাইয়া থাকে। এই ওজন সাধারণতঃ গুরুটন (long ton) বা লঘুটন (short ton)-এ প্রকাশ করা হয়।[১] (২) 'ডেডওয়েট টনেজ' (Deadweight Tonnage, DWT) বলিতে জাহাজটি সর্বাধিক যে পরিমাণ পণ্য বহন করিতে সক্ষম তাহাকে বুঝাইয়া থাকে। (৩) 'গ্রোস রেজিস্টার্ড টনেজ' (Gross Registered Tonnage, GRT) বলিতে জাহাজের অন্তর্গত মোট স্থানকে

---

১ long ton—২২৪০ পাউণ্ড, short ton—২০০০ পাউণ্ড।

বুঝাইয়া থাকে। প্রতি ১০০ ঘন ফুট স্থানকে ১ টন পণ্যের সমান বলিয়া ধরা হয়। (৪) 'নীট রেজিস্টার্ড টনেজ' (Net Registered Tonnage, NRT) বলিতে এঞ্জিন, নাবিকদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি দ্বারা অধিকৃত স্থান বাদ দিয়া কেবলমাত্র যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের উপযোগী মোট স্থানকে বুঝাইয়া থাকে। (৫) 'ডিস্‌প্লেস্‌মেণ্ট টনেজ' (Displacement Tonnage) বলিতে পরিপূর্ণরূপে পণ্য বোঝাই জাহাজটি যে পরিমাণ জল অপসারণ করে তাহাকে বুঝাইয়া থাকে। অপসারিত প্রতি ৩৫ ঘনফুট জলকে ১ টন পণ্যের সমান বলিয়া ধরা হয়।

লয়েডের হিসাব হইতে (Lloyds Register) জানা যায় যে ১০০ GRTর অনধিক স্থানযুক্ত জাহাজগুলি বাদে ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে মোট জাহাজের পরিমাণ ছিল ৮৪,৫৮৩,১৫৫ GRT। ইহার মধ্যে একযোগে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অধিকারে ছিল ৫৪% এবং একক বিচারে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যের অধিকারেই ছিল ২২%। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এ বিষয়ে স্থান ছিল নরওয়ে, পানামা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, জাপান ও ইতালীর অধিকারে জাহাজের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে জাহাজ চালনায় খনিজ তৈলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বাষ্পচালিত জাহাজের পরিমাণ আজও প্রায় অর্ধেকের অধিক। পালতোলা জাহাজের প্রচলন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

সমুদ্রপথে পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত জাহাজগুলিকে (সাধারণতঃ ৪০০০ GRT-এর অধিক স্থান যুক্ত) সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। (১) 'ট্র্যাম্প' (Tramp) বা পণ্যবাহী জাহাজ—এইগুলি সুনির্দিষ্ট সময় তালিকা বা পথ অনুসারে না চলিয়া যেখানে যে সময়ে প্রয়োজন পণ্য পরিবহন করে। এই শ্রেণীর জাহাজগুলির মোট পরিমাণ ৫,০০০,০০০ NRT-র অনধিক। (২) 'লাইনার' (Liner) বা যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ—এই জাহাজগুলি সুনির্দিষ্ট সময়, তালিকা ও পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে। সমুদ্রপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৮০%এরও অধিক বর্তমানে এই শ্রেণীর জাহাজের দ্বারাই পরিবাহিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাহাজগুলি ৬০০০GRT-র অধিক স্থানযুক্ত হইয়া থাকে। ১৯৫০ সালের লয়েডের হিসাব হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীর ৮টি 'লাইনার'-এর প্রত্যেকটি ৩০,০০০ GRT-র অধিক স্থানযুক্ত এবং ৫৩টির প্রত্যেকটি ২০,০০০ GRT হইতে ৩০,০০০ GRT-র মধ্যে। বৃহদায়তন 'লাইনার'গুলির ৬৫%ই (৩৯টি) ব্রিটেনের অধিকারে ছিল।

সমুদ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাব (Geographical factors affecting the selection of ocean routes)—অগাধ সমুদ্রের মধ্যে

জাহাজ চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ আছে। সাধারণতঃ এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাইতে বাণিজ্যপোতসমূহ "বৃহৎ বৃত্তপথ" (great circle route) অনুসরণ করে ; কারণ পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে-কোন দুইটি বিন্দুর বিভিন্ন সংযোগরেখার মধ্যে বৃহৎ বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্যই সর্বাপেক্ষা অল্প। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই পথ অনুসরণের সুযোগ হয় না ; অল্প হইলেও এই পথে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে পণ্য ও কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাব থাকিতে পারে ; কোথাও কোথাও এরূপ পথ বৎসরের মধ্যে দীর্ঘকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে ; স্থানে স্থানে আবার থাকে বাত্যা ও কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব, প্রতিকূল সমুদ্রস্রোত এবং মরুভূমির অবস্থান। এই সমস্ত কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতসমূহ বৃহৎ বৃত্তপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ পথের নিকটবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য ও কয়লার প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং যে পথ বাত্যা, কুয়াশা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত সেই পথেই পরিচালিত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ (Principal ocean routes) : পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ হইল—

(ক) **উত্তর আটলান্টিক পথ (North Atlantic Route)**—পরিবাহিত পণ্য, যাত্রী ও ডাক চলাচলের পরিমাণ অনুযায়ী বিচার করিলে, এই পথটির গুরুত্ব হইয়া দাঁড়ায় সর্বাধিক। ইহা ইউরোপের পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে বিস্তৃত। এই পথে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বনজ ও প্রাণিজ দ্রব্য, গম, ভুট্টা, তামাক, খনিজতৈল, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, লৌহ ও ইস্পাত, তাম্র, রৌপ্য, এ্যালুমিনিয়াম, কার্পাস, মৎস্য, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপ মহাদেশে **রপ্তানী** এবং ইউরোপ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমেরিকায় **আমদানী** হয়। তবে সম্প্রতি ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্প প্রসার লাভ করায় এখন আর ইউরোপ হইতে এদিকে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য বেশি চালান আসে না। এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত **বন্দর**গুলির মধ্যে ইউরোপের গ্লাসগো, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, সাদাম্পটন, লণ্ডন, আমস্টারডাম, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রিমেন, আন্টোয়ার্প, লা হেভ্‌র, শেরবুর্গ ও লিসবন ; এবং উত্তর আমেরিকার কুইবেক, মণ্ট্রীল, হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্ট জন, বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, চার্লস্টন, গ্যালভেস্টন এবং নিউ অরলিয়ঁ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর আটলান্টিক পথের দ্রুত **উন্নতির কারণ**—(১) এই পথের প্রায় সমস্ত বন্দরই একটি বৃহৎ বৃত্তাংশে অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যপোতগুলি হ্রস্বতম পথ অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়। (২) আটলান্টিক সমুদ্রপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জ অথবা মগ্নভূমির সংখ্যা অল্প। (৩) এই পথের অন্তর্গত বন্দরসমূহ স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট। (৪) এই পথের উভয় প্রান্তেই প্রচুর কয়লা পাইবার সুবিধা আছে। (৫) এই পথের উভয় প্রান্তে অবস্থিত দুইটি অংশেরই

লোকবসতি ঘন, অধিবাসীদের জীবনমান উন্নত এবং বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণও অধিক।

(ঘ) **ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল-ভারতমহাসাগর পথ** (**Mediterranean-Suez-Asiatic Route**)—পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রী চলাচলের পরিমাণ বিবেচনা করিলে এই পথটিকে উত্তর আটলান্টিকের পথের পরেই স্থান দিতে হয়। এটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন সমুদ্রপথই এত অধিক সংখ্যক দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে নাই।

এই পথে বাণিজ্যপোতগুলি লণ্ডন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া জিব্রাল্টার, মাণ্টা ও সৈয়দ বন্দরের মধ্য দিয়া সুয়েজখাল অতিক্রম করিয়া প্রথমে সুয়েজ বন্দরে এবং পরে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছে। এডেন হইতে এই পথের প্রধান শাখা (কখন কখন বোম্বাই হইয়া) কলম্বো পর্যন্ত যায় এবং অপর শাখা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরিয়া মোম্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজাম্বিক হইয়া ডারবান পর্যন্ত পৌঁছে। কলম্বো হইতে এই পথের এক শাখার গতি কলিকাতায়; আর এক শাখা ফ্রীম্যাণ্টল ও মেলবোর্ন হইয়া সিডনী এবং সেখান হইতে নিউজীল্যাণ্ডের ওয়েলিংটন বা অকল্যাণ্ড গিয়া পৌঁছিয়াছে; অপর আর একটি শাখা গিয়াছে সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং ও সাংহাই এবং আরও একটি শাখা গিয়াছে রেঙ্গুন পর্যন্ত।

এই পথে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে চা, রেশম, পাট, তৈলবীজ, চর্ম, ধাতু আকরিক, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম,
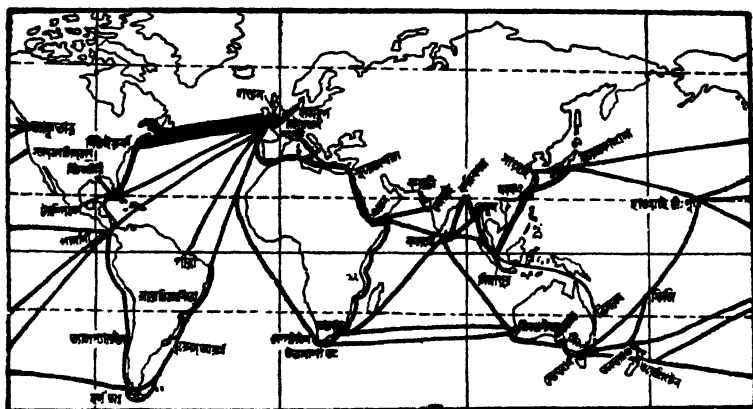
৬৯ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ

মাংস, গম, ময়দা, মদ্য, গঁদ, স্বর্ণ, তাম্র, শর্করা, তামাক, রবার, খেজুর, মুক্তা, খনিজ তৈল, কফি, সয়াবিন, রাং, লবঙ্গ, হস্তিদন্ত, চাউল, সেগুন কাষ্ঠ,

নারিকেলের শাঁস, মশলা প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং ইউরোপ হইতে এই সমস্ত দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ বন্দরগুলিও এই পথে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলির বাণিজ্যিক পণ্যও এই পথেই পরিবাহিত হয়।

জিব্রাল্টার, সৈয়দ, এডেন, কলিকাতা, কলম্বো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দর হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করিবার সুবিধা থাকায় এই বাণিজ্য পথটির দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

সুয়েজখাল-পথে জাহাজ চলাচলের জন্য উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয় বলিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডগামী অল্পমূল্যের গুরুভার পণ্যসমূহ সাধারণতঃ উত্তমাশা অন্তরীপ-পথে পরিবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বহু যাত্রী যাতায়াতের ব্যয় লাঘবের জন্য অন্তরীপ-পথেই অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড গিয়া থাকে।

(গ) **আটলান্টিক-পানামা-প্রশান্তমহাসাগর পথ** (**Atlantic-Panama-Pacific-Route**)—এই পথ প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব উপকূলের দেশগুলির সহিত পানামা খালের মারফৎ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, জাপান, চীন এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দেশগুলির সংযোগ সাধন করে। এই পথে পেরুর লিমা ও চিলিব ভ্যালপ্যারাইসো বন্দরের সহিত ইউরোপের বন্দরগুলিব বাণিজ্যও চলিয়া থাকে। এই পথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে রেশম, চা, শর্করা, শণ, তৈলবীজ, কার্পাস, ধাতুদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, পশুলোম, গবাদি-পশু, গম প্রভৃতিই প্রধান। নিউইয়র্ক, কোলন, সানডিয়াগো, ভ্যানকুভার, প্রিন্স রূপার্ট, ক্যালাও এবং অকল্যাণ্ড এই পথের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য বন্দর।

(ঘ) **উত্তমাশা অন্তরীপ পথ** (**Cape Route**)—এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে বিস্তৃত। ম্যাডিরা অথবা ক্যানারী দ্বীপ হইতে এই পথের বাণিজ্য-পোতসমূহ কয়লা বোঝাই করে। এই পথে আফ্রিকা হইতে তালতৈল, রবার, গঁদ, হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ, চর্ম, স্বর্ণ, হীরক, কোকো, তাম্র, উট-পাখীর পালক প্রভৃতি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে গম, ভুট্টা, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, কয়লা এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই সমস্ত দেশে আমদানী হয়। তবে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি সামান্য। এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইউরোপের লণ্ডন, লিভারপুল, কার্ডিফ, সাদাম্পটন, আন্টোয়ার্প, সোয়ানসী, লা হাবর, লিসবন, অ্যাসেন্সন; আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ, ইস্টলণ্ডন, কেপটাউন; এবং অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড, মেলবোর্ন, সিডনী ও ব্রিসবেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) **দক্ষিণ আটলাণ্টিক পথ** (South Atlantic Route)—এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহকে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ও পূর্ব উপকূলের হ্যাভানা, ভেরাক্রুজ, পার্নাম্বুকো, বেহিয়া, ট্যাম্পিকো, রায়ো-ডি-জেনেরো, স্যাণ্টোমা, বুয়েনস আয়ার্স, মণ্টেভিডো এবং রোজারিও বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। এই পথে অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাডিরাতে কয়লা বোঝাই করে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ হইতে শর্করা, কলা, কফি, কোকো, রবার, গম, পশম, মাংস, চর্ম, তিসি, কাষ্ঠ, কার্পাস, তামাক, রৌপ্য, হীরক, গবাদি পশু প্রভৃতি এই পথে ইউরোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে আমদানী হইয়া আসে। এই পথে অতি সামান্য পরিমাণ পণ্য চলাচল করে।

[দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে আফ্রিকা ও পশ্চিমদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। এই উভয় মহাদেশই ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুন্নত এবং উভয় দেশেরই উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রায় অনুরূপ। ইহার ফলে এই উভয় মহাদেশের মধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যের একান্ত অভাব। এই কারণে দক্ষিণ আটলাণ্টিক জলপথ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে।]

(চ) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ** (Pacific Routes)—এই পথ পূর্ব-এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের বন্দরগুলির সহিত আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সংযোগ স্থাপন করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথগুলির মধ্যে বর্তমানে নিম্নলিখিত পথগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) সিড্নী অথবা অকল্যাণ্ড হইতে ফিজি, সামোয়া বা হনলুলু হইয়া স্যানফ্রান্সিস্কো বা ভ্যান্কুভার। (২) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই হইতে নাগাসাকি, কোবে এবং ইয়োকোহামা হইয়া ভ্যান্কুভার ও সীট্ল। (৩) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই হইতে হনলুলু হইয়া স্যানফ্রান্সিসকো, লস্ এঞ্জেলস্ এবং পানামা। (৪) মেলবোর্ন এবং সিড্নী হইতে অকল্যাণ্ড বা ওয়েলিংটন হইয়া পানামা।

এই পথে সুদূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, সয়াবিন, সয়াবিন তৈল, খেলনা, চা, চর্ম, পশুলোম, শণ, নারিকেলের শাঁস, শর্করা, রবার, ধান, রাং প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকায় আসে এবং আমেরিকা হইতে কার্পাস, কাষ্ঠ, মাংস, মৎস্য, গম, ময়দা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানী হয়।

[প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথসমূহ অন্যান্য সমুদ্রপথ অপেক্ষা অনুন্নত। **কারণ** —(১) এই পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত পূর্ব এশিয়ার যোগ ; অথচ এই দুইটি অংশই আধুনিক বৈষয়িক সভ্যতায় পশ্চাৎপদ। তাই এই পথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ কম। (২) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ সমস্ত দেশই প্রায় একজাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, কাজেই এই সমস্ত

দেশের মধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যের অভাব। (৩) এই বিস্তীর্ণ জলভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, বন্দর এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব।

এই জলপথের গুরুত্ব বর্তমানে অধিক না হইলেও ভবিষ্যতে প্রাচ্যদেশের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পথে বাণিজ্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। পানামা খাল কাটার পর হইতে এবং চীন ও জাপানের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

সামুদ্রিক খালপথ (Ship Canals)

আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে সমুদ্র-সংযোগকারী খালপথের গুরুত্বও কম নহে। এই সমস্ত খালপথে সমুদ্রগামী পোতসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে পারে। এই শ্রেণীর খালসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)—সুয়েজ খাল ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ১৮৫৯ সালে ফরাসী পূর্তবিদ্ ফার্ডিনাণ্ড-ডা-লেসেপস্ মিশরের খেদিভের অনুমতি লইয়া এই খাল খনন আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ সাল হইতে এই খাল দিয়া সমুদ্রগামী পোতসমূহ চলাচল সুরু করে। সুয়েজ খাল দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০৩ মাইল, তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ প্রায় ১০০ ফুট এবং সর্বাল্প গভীরতা প্রায় ৩৬ ফুট। পূর্বে সুয়েজ খাল একটি সংঘের পরিচালনাধীন ছিল এবং এই সংঘের সর্বপ্রধান অংশীদার ছিল যুক্তরাজ্য। তবে দেশ হিসাবে ইহা মিশরের অন্তর্গত। ১৯৬৮ সালে পূর্বোক্ত সংঘের সহিত মিশরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার এবং সেই সময়ে এই খালপথটি মিশরের পূর্ণ আয়ত্তে আসিবার কথা ছিল, তবে ইহার পূর্বেই ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সুয়েজ খালকে মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়।* ১৮৮৬-৮৮ সালের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধ এবং শান্তি যে কোন সময়েই যে কোন দেশের অর্ণবপোত স্ব স্ব জাতীয় পতাকাসহ এই খালপথে যাতায়াত করিতে পারে। এই খাল খননের পর হইতেই পশ্চিম ও
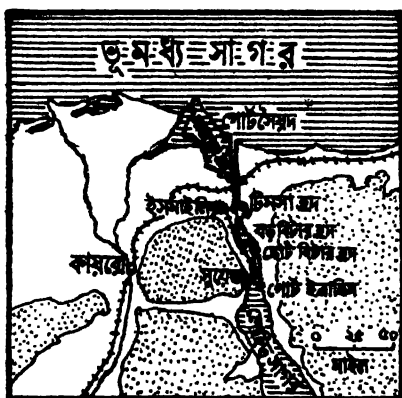
৭০ নং চিত্র—সুয়েজ খাল

* তবে এই পথে চলাচল-ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রহিয়াছে। এই খাল ব্যবহারকারীদের সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১৫টি দেশ লইয়া একটি "সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সংঘ" গঠিত হয়।

দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলির সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৬০০০ জাহাজ এই পথে যাতায়াত করে; তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যের; অবশিষ্টাংশ ইতালী, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের। এই খাল দিয়া দৈনিক ৪০টি পোত যাতায়াত করিতে পারে।

সুবিধা—(১) সুয়েজ পথে জাহাজসমূহ বহু সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশ স্পর্শ করিয়া যায় বলিয়া এই পথে পরিবহনযোগ্য বহু যাত্রী ও পণ্য পায়। (২) সুয়েজ খালপথের উভয়প্রান্তে ও মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে জাহাজ চলাচলের ইন্ধন ও পানীয় জলের সরবরাহ প্রচুর। পশ্চিমপ্রান্তে ইউরোপে কয়লা এবং পূর্বপ্রান্তে ব্রহ্মদেশ ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে খনিজ তৈল রহিয়াছে। (৩) পূর্ব-এশিয়ার বন্দরসমূহ সুয়েজপথে ইউরোপীয় বন্দরসমূহের নিকটতর। অন্তরীপ পথের তুলনায়, সুয়েজ পথে ইউরোপের লিভারপুল হইতে বোম্বাই ৪৫৪১ মাইল, বাটাভিয়া ২৬৮৯ মাইল, হংকং ৩৩১০ মাইল, এবং সিড্‌নী ৩৯১ মাইল নিকটতর। (৪) এই পথ পুরাতন পৃথিবীর অন্তর্গত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলির মধ্যে দ্রুত ও সুলভ সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। (৫) এই পথে কমন্‌ওয়েলথ্‌-এর অন্তর্গত সিংহল, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, এবং মালয়, হংকং প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন দেশসমূহের সংযোগ; তাই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে এই পথের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

অসুবিধা—(১) এই খাল অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বৃহদাকারের জাহাজ ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। বর্তমানে এই অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে, কারণ এখন ৪০,০০০ টনের অধিক জাহাজও এই খালপথে যাতায়াত করিতে পারে। (২) এই পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত পৌছিতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। (৩) এই পথে যাতায়াত করিতে হইলে কর দিতে হয়। পুর্বে এই করের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত ব্যাহত হইত, তবে বর্তমানে এই করের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় পুর্ব অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।
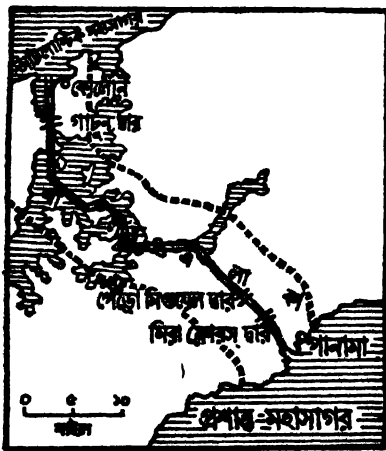
৭১নং চিত্র—পানামা খাল

পানামা খাল (Panama Canal)—পানামা খাল আটলাণ্টিক ও

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতেছে। পূর্বে সমুদ্রপথে আমেরিকার পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্তে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল হর্ণ অন্তরীপ পথ (হর্ণ অন্তরীপ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত)। পানামা খাল খননের পর হইতে হর্ণ অন্তরীপ পথের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

পানামা খাল ৪০½ মাইল দীর্ঘ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর অঞ্চল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পর্যন্ত এই খালের দৈর্ঘ্য ৫০·৭ মাইল। ইহা প্রস্থে ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট এবং ৪১ ফুট গভীর। গাটুন ও মিরাফ্লোরস্ হ্রদ দুইটি সংযুক্ত করিয়া খালটিকে আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই খালটি অতিক্রম করিতে প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈনিক এই খালপথে ৪৮টি জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। ১৯১৪ সালের ১১ই আগস্ট হইতে এই খালে জাহাজ চলাচল সুরু হয়। এই খাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন।

সুবিধা :—(১) এই পথ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলকে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের এবং পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহের নিকটতর করিয়াছে। ইহার ফলে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল-সমূহ দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ভ্যালপ্যারাইসো ম্যাজেলান প্রণালী পথে ৮,৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৪,৬০০ মাইল। নিউইয়র্ক হইতে ম্যাজেলান্ প্রণালী পথে ওয়েলিংটন ১১,৩০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৮,৫০০ মাইল। (২) পানামা খাল ইউরোপ হইতে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজীল্যাণ্ড যাইবার পথে এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের নিকটতর করিয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে সিডনী সুয়েজ পথে ১৩,৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৯,৭০০ মাইল। লিভারপুল হইতে পানামা পথে সিডনী ও ওয়েলিংটন যথাক্রমে ১২,৪০০ মাইল ও ১১,১০০ মাইল, কিন্তু সুয়েজ পথে এ দু'টির দূরত্ব যথাক্রমে ১২,২০০ মাইল এবং ১২,৫০০ মাইল। (৩) প্রয়োজন হইলে পানামা খালপথে যুদ্ধ-জাহাজসমূহ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে দ্রুত যাতায়াত করিতে পারে। (৪) এই পথের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নতিও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। (৫) আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ হইতে জাপানের দূরত্ব এই পথে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ইয়োকোহামা পানামাপথে ৯,৭০০ মাইল কিন্তু সুয়েজ পথে ১৩,১০০ মাইল। (৬) এই পথে জাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানীর অপ্রতুলতা নাই।

অসুবিধা—(১) পানামা খাল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ায় জাহাজসমূহকে 'লকে'র সাহায্যে অ-সমতল সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়া যাতায়াত করিতে

হয়। (২) পানামা খালের উভয় পার্শ্বে সুয়েজ খালের ন্যায় জনবহুল ও শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল নাই। (৩) পানামা খালের সাহায্যে কেবলমাত্র আমেরিকা মহাদেশেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; অন্য কোন দেশের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। (৪) বিস্তৃত প্রশান্তমহাসাগর বক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব এই পথের প্রসারকে অত্যন্ত ব্যাহত করিয়াছে।

ভারতের সমুদ্রপথ

ভারতের সমুদ্রপথ (Ocaen routes of India)—ভারত হইতে বিদেশাভিমুখে বিভিন্ন সমুদ্রপথসমূহ প্রধানতঃ কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম্, মাদ্রাজ, কোচিন এবং বোম্বাই বন্দর হইতে প্রসারিত। ভারতীয় জাহাজগুলি বর্তমানে ভারত-যুক্তরাজ্য-ইউরোপ, ভারত-জাপান, ভারত-মালয়, ভারত-পূঃ আফ্রিকা, ভারত-পারস্য উপসাগর উপকূল, এবং ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই ছয়টি পথে চলাচল করে। প্রথমোক্ত চারিটি পথে ভারতীয় জাহাজগুলি পণ্য ও শেষোক্ত দুইটি পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করিয়া থাকে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত এই জাহাজগুলির (৪১টি) পরিমাণ ছিল ২৭৩,৯৪৯ GRT। সরকার কর্তৃক পরিচালিত 'ইস্টার্ন সিপিং কর্পোরেশন' (১৯৫৬) সমুদ্রপথে ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়া এবং সুদূর ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং 'ওয়েস্টার্ন সিপিং কর্পোরেশন' (১৯৫৬) ভারত-পারস্য উপসাগর, ভারত-লোহিত সাগর এবং ভারত-পোল্যাণ্ড সমুদ্রপথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।* ভারত-সোভিয়েট রাষ্ট্র সমুদ্রপথটি (১৯৫৬) ভারতের সহিত রুশিয়ার কৃষ্ণসাগর-তীরস্থিত বন্দরগুলির সংযোগ সাধন করে। তৈল পরিবহনের জন্য সম্প্রতি (১৯৫৬) দুইটি ট্যাঙ্কার নৌবহরেরও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ভারতের উপকূলীয় সমুদ্রপথ ও বাণিজ্য (Coastal shipping and coastal trade of India)—একই দেশের উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলে তাহাকে উপকূলীয় বাণিজ্য বলে। সমুদ্রপথে ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে যে বাণিজ্য চলে তাহাই ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্য। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক নহে, কারণ (১) ভারতের পূর্ব উপকূল অগভীর এবং জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিঘ্নজনক, (২) পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণভাগ বালিয়াড়ী ও উপহ্রদ সংকুল এবং ঐ অঞ্চলের সমুদ্র বর্ষাকালে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ হওয়ায় নৌ-চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক, (৩) এদেশের অধিকাংশ বন্দর ও নগর

* ১৯৬১ সালের ২রা অক্টোবর "ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন" ও "ওয়েষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন" এই দুইটি সংস্থাকে একত্রিত করিয়া "দি সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড" নামক একটি সরকারী সংস্থায় পরিণত করা হইয়াছে।

রেলপথের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরভাগের সহিত সংযুক্ত থাকায় উপকূল পথে বাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক অল্প, আবার (৪) উপকূলাঞ্চলে উন্নতশ্রেণীর বন্দরের স্বল্পতা, অপেক্ষাকৃত বিরল লোকবসতি এবং ভারতীয় জাহাজ শিল্পের অনুন্নতি হেতু এই শ্রেণীর বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন, প্রধান ও অপ্রধান বন্দর-গুলির উন্নতিসাধন ও শিল্প সম্প্রসারণমূলক যে কার্যসূচী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসার লাভ করিবে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে মোট ৮১টি জাহাজ (২৩৬,৬৮২ GRT) উপকূলীয় সমুদ্রপথে বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত ছিল।

ভারত সরকার পণ্যবাহী নৌবহর সংক্রান্ত যে নীতি (সিপিং পলিসি কমিটি, ১৯৪৯) গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে ১৯৫১ সাল হইতে উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ এবং আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে সিংহল ও নিকটবর্তী অন্যান্য দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ৭৫% ও দূরবর্তী অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যের ৫০% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিবাহিত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ভারতে ২০ লক্ষ GRT পরিমিত জাহাজের প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বর্তমানে উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ, নিকটবর্তী

সমুদ্রপথে পরিবহন কার্যে লিপ্ত জাহাজের পরিমাণ, ১৯৫১-১৯৬৫

(লক্ষ GRT)

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা		তৃতীয় পবিকল্পনা	
	১৯৫০-৫১ ভিত্তি বৎসরের উৎপাদন	১৯৫৫-৫৬ প্রকৃত উৎপাদন	১৯৫৫-৫৬ ভিত্তি বৎসরের উৎপাদন	১৯৬০-৬১ প্রকৃত উৎপাদন	১৯৬০-৬১ ভিত্তি বৎসরের উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ
উপকূলীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত	২·১৭	২·৪০	২·৪০	২·৯২	২·৯২	১·৩২৫
বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত	১·৭৪	২·৪০	২·৪০	৬·১৩	৬·১৩	২·৪২০
মোট	৩·৯১	৪·৮০	৪·৮০	৯·০৫	৯·০৫	৩·৭৪৫
মোট ব্যয়[১] (কোটি টাকা)	১৮·৭		৫২·৭ (অনুমিত)		৫৫ (অনুমিত)	

দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ৪০% এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। উপকূল পথে ভারতের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে নানাপ্রকার পণ্য পরিবাহিত

হইয়া থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে কলিকাতা হইতে কয়লা, কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ হইতে কার্পাস, খনিজ তৈল, লবণ এবং উড়িষ্যা হইতে চাউল প্রভৃতি পণ্যের পরিমাণই অধিক। অল্পব্যয়ে খাদ্য ও কাঁচামাল পরিবহনের জন্য উপকূলীয় সমুদ্রপথসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সমুদ্রপথে ভারতীয় জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় **পরিকল্পনার** ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত ভাগ উপরের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে।

এই পরিকল্পনা কালে অপরিস্রুত খনিজ তৈল আমদানীর জন্য দুইটি এবং খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য একটি ট্যাঙ্কার নৌবহরেরও প্রবর্তন করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1 State the relative advantages aud disadvantages of inland water-transport systems.

(আন্তর্দেশিক জলপথ ও স্থলপথসমূহের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধাগুলি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৩১০-৩১১)

2. Mention the chief geographical factors which make a river a highway of commerce Illustrate your answer by a few examples (C. U '52)

(দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক নাব্য জলপথসমূহের গুণাগুণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৩১১-৩১২)

3. Examine the importance of the Great Lakes St. Lawrence system to the U. S. A. and Canada (C U. '50)

(যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পক্ষে সেন্টলরেন্স—বৃহৎ হ্রদসমূহের জলপথটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩১৪-৩১৫)

4. Describe the inland navigation systems of France and Germany.

(ফ্রান্স ও জার্মানীর আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহ বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩১৯-৩২১)

5. Describe the inland navigation system of India.

(ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহ বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩২৪-৩২৭)

6. Discuss the geographical factors that affect the selection of ocean trade routes.

(সমুদ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাবসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩২৮-৩২৯)

7. Describe the North Atlantic and the Mediterranean-Suez-Asiatic routes

(উত্তর আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল-ভারতমহাসাগর সমুদ্রপথ দুইটি বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩২৯-৩৩১)

8. Describe the Suez and Panama canals indicating their respective merits and defects. (C. U. '59)

(আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখপূর্বক সুয়েজ ও পানামা-খাল পথ দুইটি বর্ণনা কর ।)

(পৃঃ ৩৩৩-৩৩৬)

9. Describe the coastal shipping and coastal trade of India. (C. U '59)

(ভারতের উপকূলীয় সমুদ্রপথ ও উপকূলীয় বাণিজ্যের বর্ণনা কর ।) (পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭)

10. Describe the inland navigation system of the U. S. S. R.

(রুশিয়ার আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের বর্ণনা কর ।) (পৃঃ ৩২১-৩২৩)

11. Describe the trade route from Liverpool to Bombay *via* the Suez canal, naming four important ports of call. State the principal advantages of this route over the route *via* the Cape of Good Hope. (H. S. '61)

(লিভারপুল হইতে সুয়েজ খাল পথে বোম্বাই পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্র পথটির বর্ণনা কর এবং এই পথের অন্তর্গত যে সমস্ত বন্দরে জাহাজ ধরে সেইরূপ চারিটি প্রধান প্রধান বন্দরের নাম লিখ । উত্তমাশা অন্তরীপ-পথ অপেক্ষা এই পথের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলির উল্লেখ কর ।) •

(পৃঃ ৩২৯-৩৩০ ও পৃঃ ৩৩১)

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—বিমানপথ

বিমানপোত বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য আবিষ্কার। দ্রুতগামী বিমানপোত চলাচলের ফলে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন ছিল না, তবে উহার পর হইতেই বিমানপথগুলির দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বিমানবহরের পণ্যবহনের ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

জল ও স্থলপথ বনাম **বিমানপথ (Surface transport *versus* Air transport)**—বিমান পথের প্রধান সুবিধা এই যে এই পথে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে অতি দূর পথ অতিক্রম করা যায় এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার দিক হইতে বিমানপথ বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে স্থল বা জলপথের তুলনায় বিমানপথ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, আকাশপথে বৃহদায়তন, গুরুভার দ্রব্যের পরিবহন বর্তমানে চলে না এবং অদূর ভবিষ্যতেও চলিবে কিনা বলা দুষ্কর। তবে যাত্রী, ডাক, এবং মূল্যবান, অল্পায়তন ও লঘুভার পণ্য এবং

দ্রুতপচনশীল দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে বিমানপথের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।' এই সমস্ত পণ্যসম্ভার পরিবহনে বিমানপথ জল ও স্থলপথের সহিত বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

বিমানপথ-নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical factors affecting the selection of air routes)—বিমানপথে পোত চালনার অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি নির্দিষ্ট পথেই বিমানপোত চলাচল করে। এই সকল পথ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। (১) যেখানে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত অত্যধিক কিংবা আবহাওয়া প্রায়ই কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, সেখানে বিমানপথ প্রসার লাভ করে না। বায়ুপ্রবাহের বেগ এবং গতিও বিমানপথ নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মরুভূমি অঞ্চলে বিমানপথের প্রসার কম। (২) বিমানপোতের অবতরণের জন্য বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমির প্রয়োজন। তাই অত্যন্ত বন্ধুর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বিমানঘাঁটি দৃষ্ট হয় না এবং বিমানপথও প্রসার লাভ করিতে পারে না। (৩) বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ও সমুদ্রাঞ্চলে বিমানপোতের অবতরণযোগ্য স্থানের অভাব থাকায় অরণ্য ও সমুদ্রের হ্রস্বতম অংশের উপর দিয়া বিমানপথ নির্ধারিত হয়। (৪) আন্তর্দেশিক বিমানপথের ক্ষেত্রে দেশের আয়তন বৃহৎ না হইলে বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা অনুভব করা যায় না। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট-ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃহদায়তন দেশসমূহে আন্তর্দেশিক বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। অপরপক্ষে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় অল্প আয়তনযুক্ত দেশসমূহে আন্তর্দেশিক বিমানপথ তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই।

উপরোক্ত অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়াও কোন অঞ্চলের জনসংখ্যাধিক্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা ঐ অঞ্চলে বিমানপথের ব্যাপক প্রসারে সহায়তা করে। অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকায় পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে, রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিমানপথ সর্বাধিক প্রসারলাভ করিয়াছে।

বিমানপথের শ্রেণীবিভাগ (Classification of air routes)—পৃথিবীর বিমানপথগুলিকে প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। স্থানীয় বিমানপথসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে আঞ্চলিক বিমানপথসমূহের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং আঞ্চলিক বিমানপথসমূহ মহাদেশীয় বিমানপথসমূহের সহিত সংযুক্ত থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপথসমূহের ব্যাপক প্রসারের পক্ষে তিন শ্রেণীর

অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন—(১) বিমানপোতের উড্ডয়ন, চালনা ও অবতরণ-সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ের কারিগরী সাফল্য; (২) বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবসায়িক সাফল্য; এবং (৩) পৃথিবীর সমস্ত দেশের উপর দিয়া বিমানপোত পরিচালনার অবাধ স্বাধীনতা।

সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যোমযানবিজ্ঞান (aeronautical science) এত দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিমানপোত সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে কারিগরী সাফল্য আশাতীতরূপে অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিমান পথে পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। তবে বিমানপোতসমূহের আন্তর্জাতিক চলাচলের ক্ষেত্রে বাধানিষেধমূলক আইন-শৃঙ্খলা থাকায় বিমানপোতসমূহ যথেচ্ছ চলাচল করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমানপোত চলাচল সংস্থাটি (International Civil Aviation Organisation) বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহার সর্তগুলি সর্বজাতিস্বীকৃত না হইলেও এইগুলিই বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রচলিত রীতি নির্ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সর্তগুলির দ্বারা প্রথমতঃ কোন বৈদেশিক রাজ্যের উপর দিয়া ঐ রাজ্য সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিমানপোত চালনা করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ, বিমানপোত চালনা করার অনুমতি পাইলেও কেবলমাত্র রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পথেই বিমানপোতকে চালনা করা যাইতে পারিবে। এই সমস্ত বিধিনিষেধের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপথসমূহের ব্যাপক প্রসারের পথে বহু বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বিমান-পথে চলাচল ব্যবস্থা রাজ্য সরকার সমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য সরকার আন্তর্দেশিক বিমানপথসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে, আবার বহুক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত অংশীদারী সূত্রে যৌথভাবে ইহাদের পরিচালনা করিতেছে। অতএব বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপোত পরিচালনার নীতি মূলতঃ রাজ্যসরকারসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া থাকে।

উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথ (Principal international air routes)—পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথগুলিকে প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই পথে বিমানপোত চলাচল ব্যবস্থা ফরাসী, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ পোতসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পথে বিমানপোতগুলি লণ্ডন হইতে

প্যারী, মার্শাই, এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, আম্মান, বাগদাদ, বসরা, বেহ্‌রিন, সাবজাহ্, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ও বাটাভিয়া হইয়া উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে পৌঁছায়। ডারউইন হইতে এই পথের এক শাখা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রিসবেন, সিডনী, মেলবোর্ন ও এ্যাডিলেড পর্যন্ত যায় এবং অপর শাখা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও পশ্চিম উপকূল ধরিয়া পার্থ পর্যন্ত পৌঁছায়। ফরাসী ও ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রিত বিমানপোতসমূহ মোটামুটিভাবে উপরোক্ত পথটিরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

(খ) **ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপোতসমূহ**—এই পথে বিমান-চলাচল ব্যবস্থা ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইতালীয় বিমানপোতগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত বিমানপথ ইংল্যাণ্ড (সাদাম্পটন) হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাগোস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন পর্যন্ত প্রসারিত। ফরাসী-নিয়ন্ত্রিত বিমানপথের এক শাখা আলেকজান্দ্রিয়া হইয়া বাথার্স্ট পর্যন্ত এবং অপর শাখা মাদাগাস্কার পর্যন্ত এবং ইতালী-নিয়ন্ত্রিত বিমানপথ ত্রিপলি এবং কায়রো হইয়া আবিসিনিয়ার আদ্দিস্-আবাবা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(গ) **ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপোতসমূহ**—এই পথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি পথই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও বুয়েনশ-আয়ার্স বিমানপথ**—এই পথে বিমানপোতগুলি মার্শাই, জিব্রাল্টার, আফ্রিকার ডাকার বা বাথার্স্ট হইয়া এবং তথা হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ব্রাজিলের নাটালে পৌঁছে। নাটাল বিমানপথে রায়ো-ড-জেনিরো ও বুয়েনশ-আয়ার্সের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। নাটাল হইতে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিমানপথসমূহ প্রসারিত রহিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপ, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিমানপথের গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। (২) **উত্তর-আটলাণ্টিক বিমানপথ**—এই পথ ইউরোপ ও উঃ আমেরিকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতেছে। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাগুলি লণ্ডন, শ্যানন, ও গ্যাণ্ডার হইয়া অটাওয়া ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত; প্যারী, লিসবন, আজোর্স ও বারমুডা হইয়া নিউইয়র্ক পর্যন্ত; এবং স্টকহলম্, অসলো ও গ্যাণ্ডার হইয়া অটাওয়া ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

(ঘ) **আমেরিকা এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমানপথ**—এই পথ স্যানফ্রান্সিস্‌কো, লস্ এঞ্জেলস্ ও সীটল হইতে প্রসারিত হইয়াছে। স্যানফ্রান্সিস্‌কো ও লস্ এঞ্জেলস্ হইতে প্রসারিত পথ দুইটি হনলুলু হইতে ম্যানিলা, সাংহাই, নিউজীল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সীটল হইতে প্রসারিত পথটি ক্যানাডার পশ্চিম-উপকূলাঞ্চল ধরিয়া টোকিও ও সাংহাই পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

(ঙ) **উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই বিমান-পথ বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথের এক শাখা বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নাটাল, ত্রিনিদাদ, হাইতি, কিউবা এবং ফ্লোরিডা হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে এবং অপর শাখা বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে মেণ্ডোজা, ভ্যালপ্যারাইসো, কিউবা এবং মিয়ামি হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে।

(চ) **পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই পথ পঃ ইউরোপকে রুশিয়ার মধ্য দিয়া পূর্ব এশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিতেছে। এই পথে বিমানপোতগুলি মস্কো হইতে কাজান, ওমস্ক, নোভোসাইবিরিস্ক, ইর্খুটস্ক, চিতা, স্থিয়েস্কা ও খার্বারোভস্ক হইয়া ভ্লাডিভস্টকে পৌছে।

বিমানপথে পণ্য-পরিবহন ও যাত্রীদের চলাচল সম্পর্কে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ভারতের বিমানপথ

ভারতের বিমানপথ (**Air transport system of India**)—বিমানপথের প্রসারণ ও বিমানপোতের চলাচলের দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারতের বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলিকাতা (দমদম) এবং দিল্লীতে (পালাম) তিনটি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রহিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে বেসামরিক বিমানবিভাগের আয়ত্তে ৮৫টি বিমানঘাঁটি ছিল। ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরেই বিমানঘাঁটি রহিয়াছে।

বিমানপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ নির্ভর করে দেশগত আর্থিক সঙ্গতির উপর। ভারতে বিমানপথ বিস্তারের ভৌগোলিক ও অন্যান্য সুবিধা যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পসমূহ সম্যক প্রসার লাভ করিলে এবং খনিজ তৈলের মূল্য হ্রাস পাইলে বিমানপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও কাশ্মীর রাজ্যের পক্ষে বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র 'আসাম লিঙ্ক' পথ ব্যতীত ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া কলিকাতা বন্দরের সহিত আসামের অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। এই দীর্ঘ রেলপথে পরিবহনের ব্যয় ও সময় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। এই কারণে আসামের পক্ষে বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। আসাম রাজ্যের দুই পার্শ্বে অবস্থিত ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের পক্ষেও বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাশ্মীরের সহিত মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র বাণিহাল সুড়ঙ্গপথেই চলিয়া থাকে। তবে এই পথ অতিরিক্ত বৃষ্টি ও তুষার

পাতের ফলে মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। এই কারণে এই রাজ্যের পক্ষেও বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ।

যাহাতে বেসামরিক বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হয়, দেশগত উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হয়, বিমানপোত-সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, সংস্কার-কারখানাসমূহ ও যন্ত্রবিদ্‌গণকে সম্পূর্ণরূপে কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে, প্রয়োজনীয় মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় এবং যাত্রীদের সকল প্রকার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়া যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১লা আগস্ট হইতে বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থার **জাতীয়করণ** করা হয়। ঐ সময় হইতে আভ্যন্তরীণ এবং নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বিমানপথে চলাচল-ব্যবস্থা **ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন** কর্তৃক এবং আন্তর্জাতিক চলাচল ব্যবস্থা **এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল** কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। নবগঠিত প্রতিষ্ঠান দুইটির নানাবিধ কার্যাবলীর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনকল্পে একটি সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, মিশর, ফ্রান্স, জাপান, হল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রুশিয়ার সহিত বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি ইতঃপুর্বেই সম্পাদিত হইয়াছে এবং লেবানন, ইরান, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সহিত চুক্তি শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রথম **পরিকল্পনাকালে** নূতন নূতন বিমান ঘাঁটির নির্মাণ, দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিমান পোত সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অধিকতর সমাবেশ প্রভৃতি ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অধিকতর যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিমানপথের প্রসারণ ও বিমান ঘাঁটি সমূহের উন্নয়ন মূলক কার্যাদি অনুসৃত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচলের উন্নয়ন কল্পে মোট ব্যয় হয় প্রায় ২৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিমানঘাঁটি সমূহের উন্নয়ন ও প্রসারণ এবং নূতন নূতন বিমান ঘাঁটির নির্মাণ, দূরদূরান্তরের সহিত দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিমান পথের প্রসারণ, বিমান পোত চালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারণ ও নানাবিধ গবেষণামূলক কার্যাদির প্রবর্তন করা হইবে। এই সমস্ত কার্য বাবদ মোট ব্যয় হইবে অনুমান ২৫ কোটি টাকা।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনটির বিমানপোতগুলি নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান পথসমূহে চলাচল করে :—(১) বোম্বাই-দিল্লী, (২) বোম্বাই-আমেদাবাদ-জয়পুর-দিল্লী, (৩) বোম্বাই-বরোদা-আমেদাবাদ, (৪) বোম্বাই-করাচী, (৫) বোম্বাই-কলিকাতা, (৬) বোম্বাই-নাগপুর-কলিকাতা, (৭) বোম্বাই-

মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর, (৮) বোম্বাই-হায়দরাবাদ-মাদ্রাজ-কলম্বো, (৯) বোম্বাই-ইন্দোর-গোয়ালিয়র-দিল্লী, (১০) বোম্বাই-পুণা-ব্যাঙ্গালোর, (১১) বোম্বাই-ভবনগর-রাজকোট, (১২) বোম্বাই-হায়দরাবাদ, (১৩) বোম্বাই-জামনগর-ভুজ-করাচী, (১৪) দিল্লী-অমৃতসর-লাহোর-কাবুল-কান্দাহার, (১৫) দিল্লী-কলিকাতা, (১৬) দিল্লী-লাহোর, (১৭) দিল্লী-যোধপুর-করাচী, (১৮) দিল্লী-আগ্রা-পাটনা-বাগডোগরা-ডিব্রুগড, (১৯) দিল্লী-অমৃতসর-জম্মু-শ্রীনগর, (২০) কলিকাতা-এলাহাবাদ-কানপুর-দিল্লী, (২১) কলিকাতা-পাটনা-বেনারস-লক্ষ্ণৌ-দিল্লী, (২২) কলিকাতা-চট্টগ্রাম, (২৩) কলিকাতা-পাটনা-মজঃফরপুর-কাটমাণ্ডু, (২৪) কলিকাতা-ঢাকা, (২৫) কলিকাতা-বাগডোগরা, (২৬) কলিকাতা-গৌহাটী-মোহনবাড়ী (ডিব্রুগড), (২৭) কলিকাতা-ভুবনেশ্বর-বিশাখাপত্তনম-মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর, (২৮) কলিকাতা-আগরতলা-শিলচর-ইম্ফল, (২৯) মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর-কোয়েম্বাটোর-কোচিন-ত্রিবান্দ্রাম, এবং (৩০) শ্রীনগর-লেহ। ১৯৬০-৬১ সালে এই কর্পোরেশনটির অধীনে ৫৪টি ড্যাকোটা, ৫টি স্কাইমাস্টার ও ১০টি ভাইকাউণ্ট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে এই কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বিমানপোতসমূহ ১·৯৪ কোটি মাইল নির্দ্দিষ্ট পথে চলাচল করে এবং ৭০৩ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অতিরিক্ত চারিটি ভাইকাউণ্ট বিমানপোত এবং বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থায় ড্যাকোটা বিমানপোত পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ২৫টি আধুনিক বিমানপোত এই কর্পোরেশনের আয়ত্তে আসিবে। এই পরিকল্পনা-কালে কর্পোরেশনের অধীনস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ, বিমানপোত-কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং আধুনিক বিমানপোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমানে নাগপুরের মাধ্যমে দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে রাত্রিকালে এই কর্পোরেশনের বিমানপোত-সমূহে ডাক চলাচল করিতেছে।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিমানপোত সমূহ নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান পথসমূহে চলাচল করিতেছে :—(১) কলিকাতা-বোম্বাই-বসরা-কায়রো-জেনেভা-লণ্ডন, (২) কলিকাতা-ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-জাকর্তা, (৩) কলিকাতা-ব্যাংকক-হংকং-টোকিও, (৪) বোম্বাই-এডেন-নাইরোবি। ১৯৬০-৬১ সালে এই কর্পোরেশনটির অধীনে ৯টি সুপারকনষ্টিলেশন, ৩টি বোইং ৭০৭ জেট এবং ১টি ডি. সি. ৩, বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে এই বিমানপোত-সমূহ ৭৪·৩৫ লক্ষ মাইল নির্দ্দিষ্ট পথে চলাচল করে ও ১২১টি দেশের সহিত সংযোগ সাধন করে। ঐ সালে পরিবাহিত যাত্রীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৯,৩৮৫ জন। **তৃতীয় পরিকল্পনা**কালে অতিরিক্ত ৪টি জেট বিমানপোত এই কর্পোরেশনের আয়ত্তে আসিবে এবং বোম্বাইতে একটি জেট-এঞ্জিন সংস্কার কারখানা স্থাপিত হইবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিমানপথেও ভারতের মধ্য দিয়া বৈদেশিক বিমান চলাচল করে—(১) **ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার কর্পোরেশন** (বি-ও-এ-সি)

৭২ নং চিত্র—ভারতের বিমানপথসমূহ

—(১) লণ্ডন-মাল্টা-কায়রো-বসরা-করাচী-দিল্লী-কলিকাতা-টোকিও-সিডনী, (২) লণ্ডন-করাচী-বোম্বাই-কলম্বো। (২) **ট্রান্স ওয়ার্লড্ এয়ার লাইন**—(টি-ডব্লিউ-এ)—ওয়াশিংটন-লণ্ডন-প্যারী-বোম্বাই। (৩) **এয়ার ফ্রান্স**—প্যারী-কায়রো-করাচী-কলিকাতা-সাইগন। (৪) **ডাচ এয়ার লাইন** (কে-এল-এম)—আমস্টার্ডম-করাচী-কলিকাতা-সিঙ্গাপুর-বাটাভিয়া। (৫) **প্যান-আমেরিকান ওয়ার্লড্ এয়ারওয়েজ**—(১) কলিকাতা-দিল্লী-করাচী-লণ্ডন-গ্যাণ্ডার-নিউইয়র্ক, (২) কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-হনলুলু-স্যানফ্রান্সিস্‌কো। (৬) **স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজ**—অসলো-করাচী-কলিকাতা-ব্যাংকক। (৭) **এয়ার সিলোন**—কলম্বো-মাদ্রাজ-বোম্বাই-করাচী-লণ্ডন। (৮) **চায়না ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন**—কলিকাতা-রেঙ্গুন-কুনমিং-হংকং। (৯) **ইরান এয়ারওয়েজ**—বোম্বাই-তেহরাণ।

(১০) **ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ**—(১) করাচী-দিল্লী, (২) করাচী-বোম্বাই, (৩) ঢাকা-দিল্লী, (৪) ঢাকা-কলিকাতা এবং (৫) কলিকাতা-চট্টগ্রাম। (১১) **কোয়াণ্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ**—লণ্ডন-কলিকাতা-সিডনী। (১২) **বার্মা এয়ারওয়েজ**—রেঙ্গুন-আকিয়াব-কলিকাতা।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the relative merits and defects of surface transport and air transport systems.

(জল ও স্থলপথ এবং বিমানপথের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর।)

(পৃঃ ৩৩৯-৩৪০)

2. Enumerate the geographical factors that influence the selection of the air routes of the world. Describe the principal international air routes of the world.

(বিমানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের নির্দেশ কর। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩৪০ ও পৃঃ ৩৪১-৩৪৩)

3 Discuss the development of air transport system in India.

(ভারতীয় বিমানপথের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩৪৪-৩৪৭)

পঞ্চদশ অধ্যায়

বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি

বন্দর

বন্দর (Port)—অন্যত্র রপ্তানীর জন্য যেখানে পণ্যসম্ভার জাহাজে (অথবা বিমানপোতে) বোঝাই করা হয় এবং যেখানে আমদানীকৃত মাল জাহাজ (অথবা বিমানপোত) হইতে খালাস করিয়া জলপথে বা স্থলপথে অন্যত্র প্রেরণ করা হয় সেই স্থানকে বন্দর বলে। বন্দর নৌপথ ও স্থলপথের সংযোগ-স্থল।

অবস্থান অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to location)—বন্দর প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, সামুদ্রিক ও নদী-প্রান্তিক। **(১) সামুদ্রিক বন্দর (Ocean ports)**—সামুদ্রিক বন্দরকে দেশের বহির্বাণিজ্যের দ্বার-পথ বলা যাইতে পারে। অবস্থান অনুসারে সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) দেশাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট উপসাগরের উপর অবস্থিত **উপসাগরীয় বন্দর (Bay ports)**, যথা—যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ভারতের সুরাট ও কাম্বে প্রভৃতি। উপসাগরীয় বন্দরগুলির পোতাশ্রয় স্বভাবতঃ প্রশস্ত, নিরাপদ ও গভীর হইয়া থাকে। (খ) নদী-মোহানায় অবস্থিত **মোহানা বন্দর (Estuarine ports)**,—যেরূপ—গঙ্গার

মোহানায় কলিকাতা, কর্ণফুলীর মোহানায় চট্টগ্রাম প্রভৃতি। নদীবাহিত প্রচুর পঙ্ক ও আবর্জনা নদীমোহানায় সঞ্চিত হয় বলিয়া মোহানা বন্দরের পোতাশ্রয় সাধারণতঃ অগভীর হইয়া থাকে। (গ) সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত চলাচলের উপযোগী খালের উপর অবস্থিত **খালবন্দর** (Canal ports), যথা সুয়েজ খালের উভয়প্রান্তে অবস্থিত সুয়েজ ও সৈয়দ বন্দর। (ঘ) **সমুদ্র উপকূলের মুক্ত বন্দর** (Open roadsteads)—এইরূপ বন্দরগুলি সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গ ও উর্মি-তাড়িত বালুরাশির প্রভাবে বহু অসুবিধা ভোগ করে। বোলন এই শ্রেণীর বন্দর। উপসাগর ও নদী মোহানার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বন্দরগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এই সমস্ত বন্দরের পোতা-শ্রয়গুলি সাধারণতঃ নিরাপদ, গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং এই সমস্ত বন্দর নদীপথে পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সুগম যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে পারে।

(২) **নদীপ্রান্তিক বন্দর** (River ports)—নদীপথে ভ্রমণকারী বাণিজ্যিক পোতসমূহ দূরদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যসম্ভার যে স্থানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেয় এবং দূরদেশে রপ্তানীর জন্য পণ্যসম্ভার যে স্থানে জাহাজে বোঝাই করে সেই স্থানকে নদীপ্রান্তিক বন্দর বলে। গোয়ালন্দ পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত নদীপ্রান্তিক বন্দর। কোন কোন ক্ষেত্রে নদীপ্রান্তিক বন্দরের প্রভাব সামুদ্রিক বন্দর অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে, কারণ নদী-প্রান্তিক বন্দরের মাধ্যমে দেশগত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সুসম্পন্ন হয়। দেশাভ্যন্তরে নদীপ্রান্তিক বন্দরের প্রাচুর্য, পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যয় ও সময় বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেশগত উন্নতির সহায়তা করে। তবে নিম্নলিখিত সুযোগসুবিধাগুলি বর্তমান না থাকিলে নদীপ্রান্তিক বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যেরূপ (১) যে নদীর উপর বন্দর গড়িয়া উঠিবে উহা সারাবৎসরই সুনাব্য থাকা প্রয়োজন। (২) নদীপ্রান্তিক বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বিস্তৃত, জনবহুল ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (৩) নদীপ্রান্তিক বন্দরের সহিত জলপথে বা স্থলপথে পশ্চাদ্‌ভূমির সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৪) নদীপ্রান্তিক বন্দর নৌপথ ও স্থলপথ (যথা—খুলনা) অথবা দুইটি নৌপথের সংযোগস্থলে (যথা—পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গোয়ালন্দ) অবস্থিত হইলে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। (৫) নদীপ্রান্তিক বন্দরের পোতাশ্রয় আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to the nature of trade)—বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে আবার বন্দরগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা, (ক) **আমদানী-প্রধান বন্দর** (Import ports)—যেরূপ, রুশিয়ার আর্কেঞ্জেল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বন্দর, (খ) **রপ্তানী-প্রধান-বন্দর** (Export ports)—যেরূপ, রুশিয়ার ওডেসা ও আরবের মোকা বন্দর; (গ) **আড়ত-**

দারী বন্দর (Entrepots)—যে বন্দর হইতে আমদানীকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া যায় সেই বন্দরকে আড়তদারী বন্দর বলে এবং সেই ধরণের বাণিজ্যকে বলে আড়তদারী বাণিজ্য। ভারত হইতে চা সাধারণতঃ লণ্ডন বন্দরে প্রেরিত হয় এবং লণ্ডন হইতে ঐ চা ইউরোপের নানা দেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং ভারতীয় চা-এর ক্ষেত্রে লণ্ডন আড়তদারী বন্দর। এইরূপ হামবুর্গ, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, সৈয়দ বন্দর আড়তদারী বন্দরের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নিম্নলিখিত সুযোগসুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে আড়তদারী বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে—(১) যে সমস্ত পণ্য লইয়া আড়তদারী বন্দর গড়িয়া উঠিবে সে সমস্ত পণ্য দীর্ঘকালস্থায়ী, সহজে বহনযোগ্য, অথচ উচ্চমূল্যের হওয়া প্রয়োজন। মশলা, রেশম, চা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পণ্য। (২) বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপত্তিস্থল এবং আমদানীকারক বন্দরের মধ্যে দূরত্ব যত অধিক হইবে আড়তদারী বন্দরের গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাইবে। (৩) আড়তদারী বন্দর দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ অবস্থান এইরূপ হইলে পণ্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজসাধ্য হয়। (৪) যে সমস্ত অঞ্চল হইতে পণ্য আমদানী বা যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য রপ্তানী করা হইবে সে সমস্ত অঞ্চলের সহিত আড়তদারী বন্দরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। (৫) রপ্তানীকারক ও আমদানীকারক দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যবসায় বা মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা থাকিলে আড়তদারী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to the nature of harbours)—পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি হিসাবে বন্দরগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, সেগুলিকে বলে **স্বাভাবিক বন্দর (Natural ports)**, যথা—বোম্বাই, লিভারপুল, সিড্‌নী, স্যানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি। (খ) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম, সেগুলিকে বলে **কৃত্রিম বন্দর** (Artificial ports)। মাদ্রাজ একটি কৃত্রিম বন্দর।

সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতি (Conditions for the development of good sea ports)—নিম্নলিখিত সুযোগগুলি বর্তমান থাকিলে সামুদ্রিক বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে।

(১) **আদর্শ পোতাশ্রয় (Ideal harbour)**—নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে পোতাশ্রয় আদর্শস্থানীয় হয়। (ক) পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ বাত্যা, সমুদ্রস্রোত, তরঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পোতাশ্রয় এবং উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা আবশ্যক। সিড্‌নী, লণ্ডন, বোম্বাই, করাচী, স্যানফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি বন্দরের পোতাশ্রয় উপযুক্ত পরিমাণে গভীর বলিয়া এই

সমস্ত বন্দর দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। (গ) পোতাশ্রয় এবং ইহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ সারাবৎসরই বরফ ও কুয়াশা হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। উত্তর রুশিয়ার উপকূলাঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবৃত থাকায় এই অঞ্চলে কোন উন্নতিশীল বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। (ঘ) অধিকসংখ্যক বাণিজ্যপোত যাহাতে একত্রে পোতাশ্রয়ে থাকিতে পারে ও চলাচল করিতে পারে তজ্জন্য পোতাশ্রয়টি প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। (ঙ) উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ বিঘ্নহীন ও সহজ হওয়া এবং উভয় অঞ্চলের সমুদ্রতল যথাসম্ভব সমান হওয়া প্রয়োজন। হংকং বন্দরে বাণিজ্যপোতগুলি অত্যন্ত সহজভাবে জেটি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। অপরপক্ষে কলিকাতা, নিউ অরলিয়ঁ, গুয়াকুইল প্রভৃতি বন্দরের প্রবেশপথ এরূপ বক্র ও বিঘ্নসংকুল যে উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে এই সমস্ত বন্দরের জেটি পর্যন্ত পৌঁছিতে প্রচুর সময় ও যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন হয়। (চ) পোতাশ্রয় সন্নিহিত অঞ্চলে বাণিজ্যপোত মেরামত ও জেটি নির্মাণের উপযোগী পর্যাপ্ত স্থান থাকা প্রয়োজন।

(২) **ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা** (**Accommodation facilities**)—বন্দরে বাণিজ্যপোতে ও বাণিজ্যপোত হইতে পণ্য বোঝাই ও খালাসের সুবিধা, যাত্রীদের আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা, পণ্য-উত্তোলক যন্ত্র, পণ্য মজুত রাখিবার ছাউনী, জেটি হইতে গুদামঘর পর্যন্ত পণ্যচলাচলের সুবিধার জন্য জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা, পোতসমূহ মেরামতের জন্য সুযোগ্য স্থান, বন্দরের সন্নিকটে ইন্ধন দ্রব্য ও সুপেয় জল, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি বর্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বন্দরের অবস্থান বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(৩) বিস্তৃত, জনবহুল, সমৃদ্ধ ও সহজ পরিবহনব্যবস্থাসম্পন্ন **পশ্চাদ্‌ভূমি** (**Hinterland**)—যে সকল অঞ্চলের রপ্তানীদ্রব্য কোন একটি বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় এবং ঐ বন্দরের মধ্য দিয়া আনীত পণ্য যে সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland) বলে। যথা—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশের কিয়দংশ কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্গত ; কারণ বঙ্গদেশের পাট, আসামের চা, উড়িষ্যা ও বিহারের লৌহ, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ প্রভৃতি দ্রব্য কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। আবার যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্য কলিকাতা বন্দর দিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয়। কোন কোন বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ, অনেক সময় একই অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য দুই বা ততোধিক বন্দর মারফৎ রপ্তানী হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রাইন নদীর অববাহিকার পণ্য জার্মানীর ব্রিমেন, হল্যাণ্ডের রটারডাম এমন কি অনেক সময় বেলজিয়ামের আন্টোয়ার্প বন্দর মারফৎও রপ্তানী হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার

রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌ভূমিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেরূপ পূর্ববঙ্গ পূর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে উহা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবে বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে পশ্চদ্‌ভূমি আমদানীপ্রধান (distributory) বা রপ্তানীপ্রধান (contributory) হইতে পারে।

বন্দরের উন্নতি বিশেষ করিয়া নির্ভর করে উহার পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তার ও সমৃদ্ধির উপর। পশ্চাদ্‌ভূমি, **প্রথমতঃ**, সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি উর্বর ও সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত অধিক এবং এই বন্দর এত উন্নতিশীল। অপরপক্ষে সিন্ধুনদের মোহানায় অবস্থিত করাচী বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বলিয়া উহা বন্দর হিসাবে কলিকাতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। **দ্বিতীয়তঃ**, পশ্চাদ্‌ভূমি জনবহুল হওয়া প্রয়োজন। জনবহুল পশ্চাদ্‌ভূমির চাহিদা মিটাইতে বহুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ বন্দর বিস্তৃত, জনবহুল ও সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমির জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক পণ্যের অপ্রতুলতা থাকায় এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল জনবিরল হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বন্দর বিশেষ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। **তৃতীয়তঃ**, বন্দরের সহিত পশ্চাদ্‌ভূমির যোগাযোগরক্ষার জন্য জলপথ বা স্থলপথে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার বিস্তারের উপর পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। **চতুর্থতঃ**, পশ্চাদ্‌ভূমির অধিবাসীদের বাণিজ্যে আসক্তি থাকা প্রয়োজন।

কখনও কখনও একই পশ্চাদ্‌ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক বন্দর গড়িয়া উঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের অন্তর্গত ওখা, পোরবন্দর, কাম্বে, ব্রোচ, সুরাট প্রভৃতি বন্দরগুলি প্রায় একই পশ্চাদ্‌ভূমিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যে বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অধিক এবং আমদানী-রপ্তানীর ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প সেই বন্দরের উন্নতিই দ্রুত হয়।

নিউইয়র্ক পৃথিবীর একটি উন্নতিশীল বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় আদর্শস্থানীয় এবং পশ্চাদ্‌ভূমিও বিশেষ সমৃদ্ধ ও জনবহুল। বন্দর হইতে রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে এই বন্দর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে প্যারা একটি সামুদ্রিক বন্দর, কিন্তু ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি বিশেষ সমৃদ্ধ না হওয়ায় উহা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র

নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র সৃষ্টির কারণ (Factors responsible for the growth of towns and trade centres)—নগর ও বাণিজ্য

কেন্দ্র সৃষ্টির প্রধান প্রধান কারণ আমরা নিম্নলিখিত ভাবে নির্দেশ করিতে পারি :—

(১) **তীর্থস্থান** স্বভাবতঃই জনসমাগমের ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগরে পরিণত হয় ; যথা—মক্কা, কাশী, গয়া, লাসা প্রভৃতি। (২) **স্বাস্থ্যকর স্থান**ও জনসমাগমের ফলে নগরে পরিণত হয় ; যথা—ওয়ালটেয়ার, চুনার. মধুপুর, দার্জিলিং, সারাটোগা, ভিসি, বাথ ইত্যাদি। (৩) **শিক্ষাকেন্দ্র** হিসাবেও পৃথিবীতে বহু নগরের সৃষ্টি হইয়াছে ; যথা—শান্তিনিকেতন, আলিগড, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি। (৪) **ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র**ও শহরে পরিণত হয়। যথা—আগ্রা, মুর্শিদাবাদ, টোকিও, ব্যাংকক, দিল্লী প্রভৃতি। (৫) সামরিক সঙ্কটক্ষেত্রের কেন্দ্ররূপে ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য **দুর্গাবাস**রূপে বহু নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—কোয়েটা, পেশোয়ার, জিব্রাল্টার, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি। (৬) **বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য** হেতু নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, কোডারমা প্রভৃতি স্থান শহরে পরিণত হইয়াছে। (৮) **শক্তি সম্পদের** কেন্দ্রস্থলে বহু নগবের উৎপত্তি হয়। যথা—কয়লার প্রাচুর্যহেতু রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ; তৈলের প্রাচুর্যহেতু ডিগবয় ; এবং জলশক্তির কেন্দ্র হিসাবে ভারতেব শিবসমুদ্রম্ বিখ্যাত নগরে পবিণত হইয়াছে। (৮) **পর্বত ও সমভূমির সঙ্গমস্থলে** কালক্রমে নগরের উৎপত্তি হয়। যথা—ইতালীর মিলান, আসামের ইম্ফল প্রভৃতি। (৯) **বাণিজ্যপথের সংযোগ-ক্ষেত্রে** শহর গড়িয়া উঠে ; যথা—এলাহাবাদ, লীয়ঁ, মানাওস্ ইত্যাদি শহর নদনদীর সঙ্গমক্ষেত্রে অবস্থিত। উইনিপেগ, শিকাগো, টরন্টো প্রভৃতি বিমানপথের সংযোগক্ষেত্রের শহর এবং কায়রো, ভিয়েনা, দিল্লী প্রভৃতি নগর দুই বা ততোধিক স্থলপথের সংযোগক্ষেত্রে অবস্থিত। (১০) **শ্রমশিল্প কেন্দ্র** শহরে পরিণত হয় ; যথা—জামসেদপুর, ম্যাঞ্চেস্টার, পিট্স্বার্গ প্রভৃতি। (১১) **বাণিজ্যকেন্দ্রে** নগরের উৎপত্তি হয় ; যথা—মূলতান, শিকারপুর, শিকাগো ইত্যাদি। (১২) পণ্যবহনের পদ্ধতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বহু নগরের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর সামুদ্রিক বন্দরসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পৃথিবীতে ১ লক্ষ অধিবাসী-সম্পন্ন ছয় শতেরও অধিক নগরী রহিয়াছে। ইহার প্রায় ৪০% ইউরোপ মহাদেশেই বিদ্যমান।

তবে এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কারণ নির্দেশ করার পদ্ধতি যারপরনাই কৃত্রিম। কোনও শহরই সামান্য একটি কি দুইটি কারণে গড়িয়া উঠে না, প্রত্যেকটি শহরেরই উৎপত্তি ঘটে বহুবিধ জটিল কার্য-কারণ পরম্পরার পারম্পরিক সম্বন্ধের ফলে। উত্তর প্রদেশের কাশী, তিব্বতের লাসা, আরবের মক্কা প্রভৃতি শুধু তীর্থস্থান বলিয়াই শহরে পরিণতি লাভ করে নাই, এগুলি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং বহু পথের স্বাভাবিক মিলনক্ষেত্রও বটে।

প্রধান আমদানী দ্রব্য। সুয়েজ খাল কাটার পর হইতে এই বন্দরের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। **ব্রিন্দিসি (Brindisi)**—ইতালীর দক্ষিণ অংশে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ব্রিন্দিসি একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্বে ইহা ডাক জাহাজের একটি প্রধান বন্দর ছিল। **ত্রিয়েস্তি (Trieste)**—ইতালীর উত্তরাঞ্চলে লম্বার্ডি সমভূমির পূর্বপ্রান্তে আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ত্রিয়েস্তি একটি বিখ্যাত আড়তদারী বন্দর। মধ্য ইউরোপের দানিয়ুব অববাহিকা অঞ্চলের বহুবিধ পণ্য এই বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। **মস্কো (Moscow)**—মোস্কাভা নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো রুশিয়ার রাজধানী, শিল্প ও বাণিজ্য পথের কেন্দ্র, ও "পঞ্চ সমুদ্রের বন্দর"। (খাল ও নদীপথে মস্কো বাল্টিক, শ্বেত, কাস্পিয়ান, আজভ ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযুক্ত থাকায় মস্কোকে "পঞ্চ সমুদ্রের বন্দর" বা Port of the five seas বলা হয়।) বস্ত্র, চর্মদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাগজ প্রভৃতির কারখানা এতদঞ্চলে রহিয়াছে। **লেনিনগ্রাদ (Leningrad)**—নিভা নদীর তীরে অবস্থিত লেনিনগ্রাদ বিখ্যাত বাল্টিক সাগরস্থ বন্দর ও শিল্পাঞ্চল। এই বন্দর বৎসরে প্রায় ৫ মাস কাল বরফাবৃত থাকে। জাহাজ-নির্মাণ, কাগজ ও এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। **ওডেসা (Odessa)**—কৃষ্ণসাগরের উত্তরতীরে অবস্থিত ওডেসা দক্ষিণ রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ গম রপ্তানীর বন্দর। **আস্ট্রাখান (Astrakhan)**—কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত আস্ট্রাখান দক্ষিণ রুশিয়ার একটি বিখ্যাত বন্দর ও মৎস্য ব্যবসায়ের কেন্দ্র।

এশিয়া ঃ রেঙ্গুন (Rangoon)—ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত রেঙ্গুন শহর ব্রহ্মদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। ইরাবতীর উর্বর উপত্যকা লইয়া গঠিত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি স্থলপথে ও জলপথে এই বন্দরের সহিত সংযুক্ত। চাউল, খনিজ তৈল ও সেগুন কাষ্ঠ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য এই বন্দরের প্রধান আমদানী। **সিঙ্গাপুর (Singapore)**—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ঐ রাজ্যের রাজধানী সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। ইহা উপদ্বীপের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। ইহা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ আড়তদারী বন্দর এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথের ও ব্রিটিশ রণতরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধগামী প্রায় সমুদয় বাণিজ্যপোতই এখানে কয়লা বোঝাই করে। রবার, রাং, নারিকেলের শাঁস, আনারস, মশলা, দারুচিনি প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, খনিজ তৈল, কলকব্জা, তামাক, শর্করা প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **হংকং (Hongkong)**—চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সিকিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত হংকং দ্বীপ

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, আড়তদারী ও জাহাজনির্মাণ-কেন্দ্র। সমগ্র দক্ষিণ চীন এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। চা, শর্করা, ধান, কার্পাস, চাউল, তামাক, ধাতু পদার্থ, কয়লা, ময়দা, খনিজ তৈল, আফিং প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, তৈল ও চর্বি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **সাংহাই** (Shanghai)—চীনের পূর্ব উপকূলের মধ্যাঞ্চলে ইয়াংসি নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত সাংহাই চীনের সর্বপ্রধান নগর, আড়তদারী কেন্দ্র এবং সমগ্র এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় অগভীর। ইয়াংসিং নদীর উর্বর ও জনবহুল অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, চা, তামাক, রেশম, আফিং, সয়াবিন প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এই বন্দর রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রবয়নশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **ইয়োকোহামা** (Yokohama)—টোকিওর দক্ষিণে টোকিও উপসাগরের অন্তর্গত হন্‌সু দ্বীপের উপর অবস্থিত ইয়োকোহামা জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশম ও রেশমজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, চীনামাটির দ্রব্য, চা, চাউল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, কার্পাস, ময়দা, শর্করা প্রভৃতিই প্রধান। **ওসাকা** (Osaka)—ওসাকা উপসাগরের মুখে অবস্থিত ওসাকা জাপানের দ্বিতীয় নগর ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। মুদ্রণ, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও কাগজ এই অঞ্চলের অন্যান্য শিল্প। **কোবে** (Kobe)—ওসাকা হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কোবে জাপানের দ্বিতীয় বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাহাজ, রবার, দিয়াশলাই ও রেশম শিল্পের কেন্দ্র। **টোকিও** (Tokyo)—হনসু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত টোকিও জাপানের রাজধানী, শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র ও পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। **কলম্বো** (Colombo)—সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কলম্বো ঐ দ্বীপের রাজধানী, বন্দর এবং বিখ্যাত আড়তদারী কেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। সমগ্র সিংহল দ্বীপ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। সুয়েজ খালপথে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব এশিয়াগামী প্রায় সমুদয় বাণিজ্যপোতই এই বন্দরে কয়লা লয়। নারিকেল, নারিকেল তৈল, দারুচিনি, রবার প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং কয়লা, খনিজতৈল, চিনি, চাউল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাচ প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **এডেন** (Aden)—আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এডেন উপসাগরের তীরে অবস্থিত এডেন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক বন্দর ও আড়তদারী কেন্দ্র। সুয়েজ খালপথে যাতায়াতকারী বাণিজ্যপোতসমূহ এই বন্দরে কয়লা বোঝাই করে। ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার পর্বতাঞ্চলে উৎপন্ন কফি এই বন্দর দিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ

ভারতের বন্দরসমূহ

ভারতের সুদীর্ঘ উপকূলভাগ প্রায় অভগ্ন। **পশ্চিম উপকূলের** নিকট দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূলভাগ সংকীর্ণ, উপকূলসংলগ্ন সমুদ্র সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময়। সেইজন্য এ অঞ্চলে পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাণ্ডলা, বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন এই চারিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে। আবার কাণ্ডলা, বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলাঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মে হইতে আগস্ট মাস পযন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। **পূর্ব উপকূল** সংলগ্ন সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল হওয়ায় পূর্ব উপকূলে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব উপকূলেব মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলিকাতা বন্দরেব পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর।

এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশেব জন্য ভারতে প্রধান প্রধান* (Major ports) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পশ্চিম উপকূলের কাণ্ডলা, বোম্বাই ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও কলিকাতা ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে এই ছয়টি বন্দর অতি সামান্য। ইহাদের মাধ্যমে মাত্র ৩·৩ (১৯৬০-৬১) কোটি টন পণ্য চলাচল করে।

ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর মারফৎ পণ্য চলাচলের পরিমাণ ও আয়

১৯৬০-৬১

বন্দর	বন্দরে প্রবেশকারী জাহাজ		আমদানী (লক্ষ টন)	রপ্তানী (লক্ষ টন)	আয়ের উদ্বৃত্ত (+) অথবা ঘাটতি (−)
	সংখ্যা	পরিমাণ (গ্রোস টন)			
কলিকাতা	১৭৮৬	৩৪৩·৪৬	৫৪·০৫	৩৯·৪৫	(+) ৫০·৩৯
বোম্বাই	৩২৬৯	২০০·৭১	১০৬·২৫	৩৮·৬৪	(+) ৩[illegible]১·৭৮
মাদ্রাজ	১২০৪	৮৪·৮৬	২০·৯৪	৮·৯৬	(+) ৪৮ ০৪
বিশাখাপত্তনম্	৬২২	৪৪·১০	১৩·৬৪	১৪·৩৯	(+) ৩৬ ৫৩
কোচিন	১৩৩৭	৭০·৮৯	১৫·৯৫	৩·৮০	(+) ২·০৭
কাণ্ডলা	২৯৪	১৯·৩০	১২·১১	১·৩৬	(+) ৫·০৬
মোট	৮৪৮২	৭৬৩·৩২	২২২·৯৪	১০৮·৬০	(+) ৪৬১·৭৩

* পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, পশ্চাদ্‌ভূমির প্রসার ও সমৃদ্ধি, বাণিজ্যের পরিমাণ প্রভৃতির তারতম্য হিসাবে ভারতের বন্দরসমূহ প্রধান ও অপ্রধান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল বন্দরের মারফৎ বার্ষিক পাঁচ লক্ষাধিক টনের পণ্য চলাচল করে সেগুলিকে প্রধান বন্দর বলা হয়। অপরগুলি অপ্রধান বন্দর।

ভারতে প্রায় ২২৫টি অপ্রধান বন্দর (Minor ports) রহিয়াছে, তবে উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০টি বন্দর মারফৎ প্রায় ৬০ লক্ষ টন পণ্য চলাচল করে। ইহাদের মধ্যে ১৮টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেরূপ—ওখা, পোরবন্দর, কালিকট, তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, কাকিনাড়া, মণ্ডলিপত্তনম্‌, কুড্ডালোর, আলেপ্পি, ভবনগর, বেদি, নবলক্ষ্মী, কুইলন, সুরাট প্রভৃতি। প্রধান বন্দরগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং অপ্রধান বন্দরসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক শাসিত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় বন্দর (Indian ports under Five Year Plans)—প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে (১) করাচীর পরিবর্ত বন্দর হিসাবে কাণ্ডলাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিবর্তন, (২) বোম্বাই বন্দর সংলগ্ন তৈল শোধনাগারসমূহের জন্য বোম্বাই বন্দরের উন্নয়ন, (৩) বর্তমান বন্দরগুলির পুনর্গঠন ও উন্নতিসাধন, (৪) কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দরের সম্প্রসারণ, (৫) অপ্রধান বন্দরসমূহের মাধ্যমে পণ্য চলাচল ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং কয়েকটি অপ্রধান বন্দরের উন্নয়ন প্রভৃতি কল্পে মোট ব্যয় হয় ২৭.৬ কোটি টাকা। এই পাঁচ বৎসরে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর ৬টি বন্দরের মাধ্যমে পণ্য চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের ২.০ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে দাঁড়ায় ২.৫ কোটি টন। **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** কার্যকালে প্রথম পরিকল্পনায় গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ কার্যাবলীর সম্পূর্ণতার উপরে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও কোচিন বন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতিসাধন; মালপে, পারাদিপ ও ম্যাঙ্গালোর বন্দরের পোতাশ্রয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপক অনুসন্ধান এবং কয়েকটি নূতন বাতিঘরের স্থাপন ও পুরাতন বাতিঘরেব সংস্কার সাধন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বন্দর উন্নয়ন বাবদ মোট ব্যয় হয় ৩৩.৪ কোটি টাকা। বন্দর উন্নয়ন মূলক নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ প্রধান প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে প্রায় ৩.৩ কোটি টন পণ্য চলাচল করে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বন্দর উন্নয়নকল্পে নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুসৃত হইবে—(১) পূর্ব পরিকল্পনায় গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ কার্যাবলী সম্পূর্ণ করা হইবে; (২) বোম্বাই বন্দরের উন্নয়ন ও প্রসারণ করা হইবে; (৩) কলিকাতা বন্দরের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কল্পে হলদিয়ায় একটি উপবন্দর স্থাপন করা হইবে এবং গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনাটি গৃহীত হইবে। হলদিয়ার উপবন্দরটি কলিকাতা হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হইবে এবং এই বন্দর মারফৎ গুরুভার দ্রব্যাদি, যেরূপ কয়লা, লৌহ আকর, খাদ্যশস্য প্রভৃতি চলাচল করিবে। হলদিয়ার বন্দরটি একটি প্রস্তাবিত রেলপথের সাহায্যে কলিকাতা-খড়্গপুর রেলপথের সহিত

সংযুক্ত থাকিবে। (৪) টিউটিকোরিন ও ম্যাঙ্গালোর এই অপ্রধান বন্দর দুইটি মারফৎ যাহাতে সারাবৎসরই পণ্য চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এবং বন্দর দুইটির সম্প্রসারণ করা হইবে। ম্যাঙ্গালোর বন্দর মারফৎ যাহাতে চিতলদ্রুগ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ হইতে বার্ষিক ২০ লক্ষ টন পরিমিত লৌহ আকর রপ্তানী করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। (৫) "দি ইণ্টারমিডিয়েট পোর্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটি" (১৯৬০)-র সুপারিশ অনুসারে পারাদ্বিপ, নিন্দাকারা, কারওয়াড, কাকিনাড়া, মগুলিপত্তম্, কুড্ডালোর, রত্নগিরি, বেদী, ভবনগর, পোরবন্দর, ওখা প্রভৃতি অপ্রধান বন্দরগুলির এরূপ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হইবে যাহাতে ভারতের অপ্রধান বন্দরগুলি মারফৎ ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ বৎসরে ৯০ লক্ষ টন পণ্য চলাচল করিতে সক্ষম হয়। (৬) বহু পুরাতন বাতিঘরের সংস্কার ও নূতন নূতন বাতিঘরের স্থাপন করা হইবে। এই কার্য বাবদ প্রায় ১১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছের বন্দর (Ports of Kathiawar and Cutch) : কাণ্ড্লা (Kandla)—কচ্ছের রাজধানী ভুজ হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে নবনির্মিত কাণ্ড্লা বন্দর অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, গভীর ও সুরক্ষিত। গুজরাট রাজ্য, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মধ্য ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই বহুবিস্তৃত পশ্চাদ্ভূমি লবণ, সিমেণ্ট, কাচ, মৎস্য প্রভৃতি শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সাজিমাটি, কয়লা, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হওয়ায় এস্থানে বন্দর গঠন ও সম্প্রসারণের উপযুক্ত বিস্তৃত ভূভাগ রহিয়াছে। ১৭৭ মাইল দীর্ঘ দিশা-গান্ধীধাম রেলপথ ও ৬·২ মাইল দীর্ঘ গান্ধীধাম-কাণ্ড্লা রেলপথ নির্মাণের ফলে ইহা পশ্চিম রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ১৩৭ মাইল দীর্ঘ ঝাণ্ড্-কাণ্ড্লা রেলপথ নির্মাণেরও একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। কাণ্ড্লা বন্দরের কয়েকটি অসুবিধাও রহিয়াছে। সমুদ্র হইতে এই বন্দরের পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং এই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। তবে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। **বেদী (Bedi)**—কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম বন্দর ও অগভীর পোতাশ্রয়। এই বন্দরের উপকূল-বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক। **ওখা (Okha)**—কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম প্রান্তের বন্দর ওখা একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় কিন্তু পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ বিঘ্নসঙ্কুল। পশ্চাদ্ভূমি জনবিরল ও অসমৃদ্ধ হওয়ায় এবং বন্দরের সহিত পশ্চাদ্ভূমির উপযুক্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকায় ইহার উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। একটি রেলপথের দ্বারা ইহা আমেদাবাদের সহিত সংযুক্ত।

তৈলবীজ ও কার্পাস এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং বয়ন যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, লৌহজাত দ্রব্য, শর্করা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান আমদানী পণ্য। **পোরবন্দর** (Porbandar)—কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত এই বন্দর উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রগামী জাহাজ এখানে আসিতে পারে না। সিমেণ্ট ও গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তর এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

কঙ্কণ উপকূলের বন্দর (Ports of the Konkon coast): **বোম্বাই** (Bombay)—ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও প্রধানতম বন্দর। এই বন্দর একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ইহার পোতাশ্রয় সুরক্ষিত, স্বাভাবিক, ১৪ মাইল দীর্ঘ, ৫ মাইল প্রশস্ত ও ২২′-৪০′ গভীর। এই বন্দর দিয়া সারা-বৎসরই পণ্য চলাচল করে। সমগ্র মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, রাজস্থানের পূর্বাঞ্চল, মহীশূরের উত্তরাংশ ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রচুর কার্পাস, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম ও বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। বোম্বাই বন্দর পশ্চিম ও মধ্য রেলপথের দ্বারা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির বিভিন্ন অংশের সহিত সংযুক্ত। কার্পাস, তৈলবীজ, পশম ও পশম-জাত দ্রব্য, চর্ম, ম্যাঙ্গানীজ, খাদ্যশস্য ও বয়নজাত দ্রব্যাদি এই বন্দর দিয়া রপ্তানী হয় এবং রেলের ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ী, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-জাত দ্রব্য আমদানী হয়। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোম্বাই বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চল। কার্পাস-বস্ত্রবয়ন এস্থানের প্রধান শিল্প। **মালপে** (Malpe)—পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মালপে একটি সুরক্ষিত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বিখ্যাত মৎস্য আহরণ কেন্দ্র। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই বন্দরটির উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। **মার্মাগাও** (Murmugao)—ইহা গোয়ার বন্দর। অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। বাদাম, কার্পাস, নারিকেল ও ম্যাঙ্গানীজ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **ম্যাঙ্গালোর** (Mangalore)—বোম্বাই ও কোচিন বন্দরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ম্যাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের একটি অপ্রধান বন্দর। ইহা দক্ষিণ রেল-পথের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষ স্টেশন এবং রাস্তার সাহায্যে হাসানের সহিত সংযুক্ত। গোলমরিচ, চা, কাজু বাদাম, কফি, চন্দনকাষ্ঠ, রবার, সার প্রভৃতি এই বন্দরের উল্লেখযোগ্য রপ্তানী দ্রব্য। সম্প্রতি এই বন্দরটির উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

মালাবার উপকূলের বন্দর (Ports of the Malabar coast): **কালিকট** (Calicut) (কোঝিকোড়)—কোচিন হইতে ৯০ মাইল উত্তরে দক্ষিণ রেলপথের অন্তর্বর্তী কালিকট কেরালা রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের বন্দর,

অগভীর পোতাশ্রয় ও বস্ত্রশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। নারিকেলের দড়ি, ছোবড়া, নারিকেলের শাঁস, কফি, চা, লঙ্কা, আদা, রবার, বাদাম, প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের সময় এই বন্দর দিয়া বাণিজ্য চলাচল বন্ধ থাকে। **কোচিন** (Cochin)—কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত কোচিন একটি উন্নতিশীল বন্দর, নবনির্মিত পোতাশ্রয় ও অন্যতম নৌ-ঘাটি। রেলপথে ইহা মাদ্রাজের সহিত সংযুক্ত। নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া ও দড়ি, চা, কফি, লঙ্কা, রবার, এলাচ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য। কোচিন নারিকেল তৈলের জন্য বিখ্যাত।

করোমণ্ডল উপকূলের বন্দর (Ports of the Coromondal coast): **তুতিকোরিন** (Tuticorin)—মাদ্রাজের অন্তর্গত তুতিকোরিন দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা ইহা মাদুরার সহিত সংযুক্ত। সিংহলের সহিত এই বন্দরের বাণিজ্যসম্পর্ক ব্যাপক। চাউল, ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, গবাদি পশু, এলাচ প্রভৃতি এই বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য। উপকূলাঞ্চল হইতে মুক্তা সংগৃহীত হয়। **মাদ্রাজ** (Madras)—ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও বন্দর। মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণ পূর্বাধের প্রায় সমগ্র অংশই এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা এই বন্দরটি পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। এই বন্দর দিয়া ধান, খাদ্যশস্য, কয়লা, তৈল, সার, কাগজ, কাষ্ঠ, মোটর গাড়ী, সাইকেল, স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী হয় এবং বাদাম, চর্ম, তামাক, ধাতু আকরিক, কার্পাস দ্রব্য, সার, কফি প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়। সংকীর্ণ ও অসমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব হেতু মাদ্রাজ বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যা উপকূলের বন্দর (Ports of the Orissa coast): **বিশাখাপত্তনম্‌** (Vishakhapattanam)—কলিকাতা হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মাদ্রাজ হইতে ৩২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশাখাপত্তনম্‌ অন্ধ্ররাজ্যের একটি নূতন উন্নতিশীল বন্দর। এই বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য খনিজ ও বনজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। বন্দরটি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। রায়পুর হইতে বিশাখাপত্তনম্‌ পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকায় মধ্যপ্রদেশের খনিজ, বনজ ও কৃষিজ দ্রব্য এই বন্দর দিয়াই রপ্তানী হয়। ইহা ভারতের [illegible] জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এই বন্দর দিয়া ম্যাঙ্গানীজ, তৈলবীজ, খইল, হরীতকী ও বনজ দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং লৌহজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হয়। কটকের ৫৫ মাইল পূর্বে পূর্ব উপকূলে অবস্থিত **পরাদ্বিপ** (Paradip) বন্দরটির

উন্নয়নমূলক কার্যসূচী দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে গৃহীত হয়। **কলিকাতা (Calcutta)**—ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। কলিকাতা সমুদ্র হইতে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমি জনবহুল, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ এবং উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থাযুক্ত। উঃ পূঃ, পূর্ব ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা এবং স্থল ও জলপথে কলিকাতা বন্দরের পণ্য উহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত আদানপ্রদান করা হয়। হুগলী নদী ক্রমশঃ অগভীর হইয়া উঠায় জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বদাই মাটি কাটিয়া নদীগর্ভ গভীর রাখিতে হয়। ফলে এই বন্দরের সংরক্ষণ ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা বন্দরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, কয়লা, অবিশুদ্ধ লৌহ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী এবং শিল্প ও রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, মদ্য, লবণ, মোটরগাড়ী, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই কলিকাতা বন্দর দিয়া যায়। বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাট-শিল্পকেন্দ্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে কলিকাতা বন্দরের সুবৃহৎ পোতাশ্রয় কিং জর্জ ডক অবস্থিত।

ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ

অমৃতসর (Amritsar)—পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর উত্তর রেলপথের শেষ শ্রেষ্ঠ রেলকেন্দ্র ও শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। এ স্থানের স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত। ইহা কৃষিজ দ্রব্য, কার্পাস ও পশম বস্ত্রের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। অমৃতসরের গালিচা, পশমী শাল এবং নক্সাদার কাষ্ঠদ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের সহিত ভারতের সমগ্র বাণিজ্যই অমৃতসরের ভিতর দিয়া চলাচল করে। কার্পাসবয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, গেঞ্জি, মোজা এবং চর্ম শিল্প এ স্থানের অন্যান্য শিল্প। **জলন্ধর (Jullandhar)**—পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত সেনানিবাস ও কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র। **চণ্ডীগড় (Chandigarh)**—পাঞ্জাবের রাজধানী। **লুধিয়ানা (Ludhiana)**—জলন্ধর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত লুধিয়ানা পাঞ্জাবের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানের রেশম, কার্পাস ও পশমবয়ন শিল্প এবং গেঞ্জি ও মোজা প্রস্তুত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুধিয়ানাতে সৈন্যদের জন্য পাগড়ী প্রস্তুত হয়। **সিমলা (Simla)**—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০′ উচ্চে হিমালয়

পর্বতগাত্রে অবস্থিত সিমলা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও মনোরম শৈলাবাস। মার্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই স্থান হইতে তিব্বত ও চীনের আড়তদারী বাণিজ্য চলাচল করে। **পাঠানকোট (Pathankote)**—পাঞ্জাবের উত্তরাংশে অবস্থিত পাঠানকোট উত্তর রেলপথের শেষ রেল স্টেশন। এস্থান হইতে মোটর ও আকাশপথে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর সংযুক্ত।

দিল্লী (Delhi)—উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে আরাবল্লী পর্বত ও থর মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে এবং পূর্বে গঙ্গার ও পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার মধ্যবর্তী শৈলশিরার প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী ভারতের রাজধানী। এই নগর উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পশ্চিম হইতে গঙ্গার অববাহিকার মধ্যে ইহাই প্রবেশদ্বার। ইহা রেলপথের একটি বিখ্যাত সঙ্গমস্থল। কার্পাস, শর্করা ও ময়দা শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে রহিয়াছে। দিল্লীর নক্সাদার স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্য, রেশম, কার্পাস ও পশম দ্রব্য, মস্‌লিন, গজদন্ত, জরীর কার্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোরাদাবাদ (Moradabad)—দিল্লী হইতে ১০০ মাইল পূর্বে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত মোরাদাবাদ উত্তর প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য রেল জংসন ও শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের নক্সাদার পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, এনামেল শিল্প এবং ছুরি ও কাঁচি বিখ্যাত। এস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী হয়। **আলিগড় (Aligarh)**—উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এ স্থানের তালা, ছুরি-কাঁচি, পিতল-কাঁসার দ্রব্য, কাঁচের চুড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য এবং দুগ্ধশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থান হইতে প্রচুর মাখন ও ঘি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **আগ্রা (Agra)**—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ও ঐতিহাসিক নগর উচ্চশ্রেণীর কারুশিল্প ও নক্সাদার মর্মর দ্রব্যের জন্য এস্থান প্রসিদ্ধ। আগ্রার নিকটেই দয়ালবাগে জুতা, গালিচা এবং পিতলের তৈজসপত্র প্রস্তুত হয়। এস্থানের তাজমহল পৃথিবীবিখ্যাত। **ফিরোজাবাদ (Firozabad)**—আগ্রার কিছু পূর্বে অবস্থিত ফিরোজাবাদ কাঁচ শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। **কানপুর (Kanpur)**—গঙ্গাতীরে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কানপুর উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। এস্থান কার্পাস ও পশম বয়নশিল্প, শর্করা শিল্প, চর্ম শিল্প ও তৈল নিষ্কাশন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কানপুরে প্রচুর তাঁবু প্রস্তুত হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিমান বন্দর। **লক্ষ্ণৌ (Lucknow)**—গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম নগর ও রাজধানী। এস্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে। এস্থানের রৌপ্য ও স্বর্ণদ্রব্য, হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠের

কারুশিল্প, মৃৎপাত্র এবং গন্ধদ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার কৃষিজাত দ্রব্য এস্থান হইতে নানাদিকে রপ্তানী হয়। লক্ষ্ণৌ অনেকগুলি রেলপথের কেন্দ্র। **এলাহাবাদ (Allahabad)**—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশের পুরাতন রাজধানী ও হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এস্থানে সরিষার তৈল, শর্করা, কাঁচ ও ময়দার বহু কারখানা রহিয়াছে। ইহা উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত রেলওয়ে জংসন ও বিমানঘাঁটি। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে জোয়ার, বাজরা, তিসি, তামাক, আম, পেয়ারা প্রভৃতি এস্থানে সংগৃহীত হয়, এবং পরে এস্থান হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে বিভিন্ন দিকে রপ্তানী হয়। **মির্জাপুর (Mirzapur)**—এলাহাবাদের ৪৫ মাইল পূর্বে গঙ্গাতীরে অবস্থিত মির্জাপুর উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের গালিচা, ছুরি-কাঁচি, মৃৎপাত্র, পিত্তল শিল্প এবং প্রস্তর দ্রব্য বিখ্যাত। **বারাণসী (Varanashi)**—গঙ্গাতীরে অবস্থিত বারাণসী হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর। ইহা খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে তৈল, শর্করা ও ময়দার বহু কারখানা রহিয়াছে। বারাণসী রেশমশিল্প ও জরীর কাজের জন্য বিখ্যাত। কাঠের পুতুল, জর্দা, গালার চুড়ি, হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি, কম্বল, রেশম দ্রব্য, তিসি, সরিষা, শর্করা, ছোলা, আম, পেয়ারা, কাঁচ ও ধাতুদ্রব্য এস্থান হইতে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বারাণসীর অনতিদূরে সারনাথ অবস্থিত। **গোরক্ষপুর (Gorakhpur)**—রাপ্তী নদীর বামতীরে অবস্থিত গোরক্ষপুর উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা ময়দা, কাষ্ঠ ও শর্করা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

পাটনা (Patna)—গঙ্গা নদীর তীরে পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত পাটনা বিহারের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে চিনি ও বিজলী বাতি প্রস্তুত হয়। এইস্থান হইতে প্রচুর লঙ্কা রপ্তানী হয়। এস্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। পাটনার নিকট প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র অবস্থিত। **রাঁচি (Ranchi)**—বিহারের অন্তর্গত রাঁচি একটি মনোরম শৈলাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে রেশম ও লাক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে। ইহার কিছু দূরেই বিখ্যাত হুড্রু জলপ্রপাত রহিয়াছে। **কোডারমা (Kodarma)**—বনাঞ্চলের নিকট অবস্থিত কোডারমা বিহারের অতি প্রসিদ্ধ অভ্র উত্তোলন কেন্দ্র। **ডালমিয়া-নগর (Dalmianagar)**—শোন নদের উপর পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত ডালমিয়ানগর বিহারের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের শর্করা ও সিমেণ্ট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। **ঝরিয়া (Jharia), বোকারো (Bokaro), ধানবাদ (Dhanbad),**

গোমো (Gomoh) ও **বার্মো** (Bermo)—বিহারের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি অঞ্চল। বোকারোতে সম্প্রতি একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (১.৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) স্থাপিত হইয়াছে। **গিরিডি** (Giridih)—বিহারের অন্তর্গত গিরিডি অভ্র ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। **সিন্ধ্রি** (Sindhri)—বিহারের অন্তর্গত ও ধানবাদের ১৬ মাইল দঃ পূর্বে অবস্থিত সিন্ধ্রিতে এশিয়ার বৃহত্তম সার তৈয়ারীর কারখানা অবস্থিত। এখানে একটি সিমেণ্টের কারখানাও আছে। নিকটেই কয়লার খনি ও দামোদর অববাহিকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি থাকায় শহরটির ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর।

কালিম্পঙ (Kalimpong)—দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত কালিম্পঙ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শৈলাবাস। তিব্বতের সহিত স্থলপথের বাণিজ্য এই স্থান দিয়া চলাচল করে। কালিম্পঙ পশম বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। গালিচা, শাল ও নানাবিধ পশমজাত দ্রব্য এস্থানে পাওয়া যায়। **শিলিগুড়ি** (Siliguri)—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত পঃ বঙ্গের শিলিগুড়ি কাষ্ঠ, চা, কমলা, আনারস প্রভৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্রও বটে। **মুর্শিদাবাদ** (Murshidabad)—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ অতি প্রাচীন শহর; বাংলার মুসলমান নবাবের শেষ রাজধানী। এস্থানের রেশম ও কার্পাস বয়নশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী হয়। **শ্রীরামপুর** (Serampur)—হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত শ্রীরামপুর পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পাট ও কাগজ শিল্পের কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিয়াছে। **রাণীগঞ্জ** (Ranigunj)—পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কয়লাখনি অঞ্চল। এস্থানে কাগজের কল ও মৃৎশিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। **আসানসোল** (Asansol)—পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি ও উন্নতিশীল শিল্পাঞ্চল। এস্থানের নিকটে কুলটি ও বানপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, অমৃপনগরে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা, মৃৎশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল রহিয়াছে। **বাটানগর** (Batanagar)—কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর তীরে বাটানগর পশ্চিম বঙ্গের একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এই স্থানে বাটা কোম্পানীর জুতা নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা রহিয়াছে। **বহরমপুর** (Berhampur)—পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত রেশম শিল্পের কেন্দ্র। **চিত্তরঞ্জন** (Chittaranjan)—পঃ বঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত ও পঃ বঙ্গের অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে। নিকটেই **রূপনারায়ণপুরে** (Rupnarayanpur) টেলিফোনের তার নির্মাণের একটি বৃহৎ সরকারী কারখানা রহিয়াছে।

শিলং (Shillong)—খাসিয়া পর্বতের ক্রোড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০'

উচ্চে অবস্থিত এবং গৌহাটির সহিত মোটরপথে সংযুক্ত শিলং আসামের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈলাবাস। নানাবিধ ফল, কাষ্ঠ, চা প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলের পণ্য এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। **গৌহাটি** (Gauhati)—ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত গৌহাটি আসামের বৃহত্তম নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চা, এণ্ডি বস্ত্র এবং কাষ্ঠ এইস্থানের রপ্তানী দ্রব্য। এস্থানের কামাখ্যা দেবীর মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে জলপথে স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। **ডিব্রুগড়** (Dibrugarh)—ব্রহ্মপুত্র তীরে-অবস্থিত ডিব্রুগড আসামের বিখ্যাত নদী-বন্দর। এই স্থান হইতে চা, কাষ্ঠ ও ডিগবয় অঞ্চলের খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। **ডিগবয়** (Digboi)—আসামের অন্তর্গত লখিমপুর জেলার ডিগবয় তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ।

কটক (Cuttack)—কলিকাতা হইতে ২৫৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানদী ও তাহার এক শাখা কাঠজুড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে দঃ-পূঃ রেলপথের উপর অবস্থিত কটক উড়িষ্যার পুরাতন রাজধানী, বিখ্যাত রেলকেন্দ্র, প্রধান শহর ও বন্দর এবং কাষ্ঠ রপ্তানীর অন্যতম কেন্দ্রস্থল। লাক্ষার পুতুল ও বালা, জুতা, খেল্‌না, চিরুণী এবং কাষ্ঠের দ্রব্য এস্থানে প্রস্তুত হয়। **ভুবনেশ্বর** (Bhubaneswar)—ইহা উড়িষ্যার নূতন রাজধানী, একটি তীর্থস্থান,ও বিমানঘাঁটি। **পুরী** (Puri)—উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্তী বিখ্যাত তীর্থস্থান, স্বাস্থ্যাবাস ও বন্দর। পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার এখানে প্রস্তুত হয়। এইস্থানের সমুদ্র অগভীর বলিয়া উপকূলাঞ্চল হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে জাহাজসমূহ নোঙ্গর করে। **সম্বলপুর** (Sambalpur)—মহানদীর তীরে অবস্থিত সম্বলপুর উড়িষ্যার একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস ও রেশমবয়ন-কেন্দ্র। এই স্থান পূর্ব রেলপথের একটি শাখাপথের দ্বারা নাগপুর ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত। ইহার অনতিদূরে হীরাকুদে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সম্বলপুর শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জব্বলপুর (Jabalpur)—নর্মদার উপত্যকার মুখে অবস্থিত জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটি বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও শিল্প-নগর। এইস্থানের সিমেণ্ট, কাঁচ, চুন, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, বয়নশিল্প, রেলকারখানা ও গোলাবারুদের কারখানা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রচুর মর্মরপ্রস্তর পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত বিদ্যমান। **ভুপাল** (Bhopal)—মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও একটি শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র। **কাটনী** (Katni)—মধ্যপ্রদেশের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান নগরী। এস্থানে সিমেণ্ট ও এ্যালুমিনিয়ামের বৃহৎ কারখানা রহিয়াছে। মধ্য রেলপথ দ্বারা কাটনী জব্বলপুরের সহিত সংযুক্ত। এস্থানের তৈজসপত্র, প্রস্তরদ্রব্য ও কৃষিজ দ্রব্য

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **ইন্দোর** (Indore)—মধ্যপ্রদেশের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। এস্থানে বহু কাপড়ের কল, ময়দার কল, পিতল, কাঁসা ও ধাতুদ্রব্যের কারখানা রহিয়াছে। **গোয়ালিয়র** (Gwalior)—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালিয়র একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এখানে একটি সিগারেটের কারখানা রহিয়াছে। এস্থানের প্রস্তর শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অমরাবতী (Amraoti), **আকোলা** (Akola), **ইয়োটমল** (Yeotmal) ও **ওয়ার্ধা** (Wardha)—মহারাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বাণিজ্যের কেন্দ্রসমূহ। **আমেদাবাদ** (Ahmedabad)—কাম্বে উপসাগর হইতে ৫০ মাইল অভ্যন্তরে সবরমতী নদীর বাম তীরে পশ্চিম রেলপথের উপর অবস্থিত আমেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্পাস শিল্পাঞ্চল ও নবগঠিত গুজরাট রাজ্যের রাজধানী। **নাসিক** (Nasik)—পশ্চিমঘাট পর্বতের সানুদেশে গোদাবরী নদীর উৎসমুখে অবস্থিত নাসিক একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থক্ষেত্র। তামা, পিতল ও কাঁসার দ্রব্যাদি এস্থানে প্রস্তুত হয়। **পুণা** (Poona)—পশ্চিমঘাট পর্বতক্রোড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৬০′ উচ্চে অবস্থিত পুণা মারাঠা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ইহা বস্ত্র ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পের বাণিজ্যকেন্দ্র। **বেলগাঁও** (Belgaon)—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাঁও কার্পাস ব্যবসায় এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **সুরাট** (Surat)—তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত সুরাট গুজরাটের অন্যতম প্রাচীন বন্দর এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র নির্মাণের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এস্থানে কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিয়াছে। বর্তমানে এই বন্দরের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। **ব্রোচ** (Broach)—পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রাচীন বন্দর ব্রোচ গুজরাটের অন্তর্গত। এই বন্দরের উপকূল-বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বরোদা** (Baroda)—গুজরাটের অন্তর্গত এবং ক্যাম্বে উপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত বরোদা কার্পাস শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। **নাগপুর** (Nagpur)—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যপথে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নাগপুর প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী এবং বর্তমানে নবগঠিত মহারাষ্ট্রের একটি আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ও বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থান কার্পাস, কাঁচ ও মৃৎশিল্পে বিশেষ উন্নত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানীজ এই স্থানের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য। ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র ও বিমানবন্দরও বটে।

ত্রিচিনপল্লী (Trichinopalli বা Tiruchirapalli বা Tiruchi)—দক্ষিণ রেলপথের উপর অবস্থিত ত্রিচিনপল্লী বা তিরুচিরাপল্লী মাদ্রাজ রাজ্যের একটি বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন ও তীর্থস্থান। এ স্থানের কার্পাস শিল্প, চুরুটের কারখানা ও চাউলের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **মাদুরা** (Madura)—মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত মাদুরা দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত

তীর্থস্থান। এ স্থানের কার্পাস ও রেশম দ্রব্য, তামা, কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য বিখ্যাত। মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দর্য বিখ্যাত। **কোয়েম্বাটোর** (Coimbatore)—মাদ্রাজের উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ কার্পাস শিল্পাঞ্চল। এ স্থানে শর্করা শিল্পের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে। এই স্থান কার্পাস ও বাদামের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। পাইকারা জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কারখানা হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ এই স্থানের শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত হয়।

বেজওয়াড়া (Bezwada)—কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত বেজওয়াডা অন্ধ্ররাজ্যের একটি বৃহৎ রেল জংশন ও শিল্পকেন্দ্র। **হায়দরাবাদ** (Hyderabad)—কৃষ্ণার উপনদী মুছির তীরে অবস্থিত হায়দরাবাদ অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ও অন্যতম শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা স্থল, জল ও বিমান পথের কেন্দ্রস্থলও বটে।

শ্রীনগর (Srinagar)—ঝিলম্ নদীর তীরে উলার হ্রদের নিকট একটি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। এস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। এই স্থান শাল, কম্বল, টুইড, রেশম, নক্সাদার কাষ্ঠ দ্রব্য এবং নানাবিধ ফলের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

যোধপুর (Jodhpur)—রাজস্থানেব অন্তর্গত যোধপুর মরুঅঞ্চলের দুর্গনগরী ও বিমান বন্দর। এই স্থানের প্রস্তর, লবণ, পশম ও কার্পাস শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **জয়পুর** (Jaipur)—রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর ঐ রাজ্যের বৃহত্তম নগর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানের মৃৎশিল্প, কারুশিল্প এবং নক্সাদার প্রস্তর ও পিতলের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়পুরের অনতিদূরে অভ্রের খনি রহিয়াছে।

ব্যাঙ্গালোর (Bangalore)—মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ও দঃ রেলপথের উপর অবস্থিত ব্যাঙ্গালোর ঐ রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এস্থানে বহু কার্পাস, রেশম ও চর্মের কারখানা, তৈলের কল, রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, সাবানের কারখানা, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। এই স্থানে বিমানপোত নির্মাণ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এস্থানের কৃষি ও দুগ্ধ সরবরাহের গবেষণাগার ও বিজ্ঞানপরিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। **মহীশূর** (Mysore)—মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত মহীশূর ঐ রাজ্যের একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র।

ত্রিবান্দ্রাম (Trivandrum)—কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম ঐ রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এ স্থানে নারিকেলের দড়ি, পেন্সিল, হাতীর দাঁতের কাজ, সিমেণ্ট প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

প্রশ্নমালা

1. Define a port. Explain the different classes of ports with conspicuous examples.

(বন্দর কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বন্দরের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর।)

(পৃঃ ৩৪৭-৩৪৯)

2. State the necessary conditions for the development of good sea ports. Illustrate your answer with suitable examples. (C. U. '47, '52, '55, '56 ; H. S. '63)

(সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৩৪৯-৩৫১)

3. Explain and illustrate the factors responsible for the growth and development of towns and commercial centres of the world.

(নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টির কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ৩৫১-৩৫২)

4. Account for the commercial importance of the following :—Sydney, Brisbane, Durban, Port Said, Buenos Aires, Montreal, Vancouver, New York, Boston, New Orleans, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Liverpool, Glasgow, Cardiff, Hamburg, Rotterdam, Antwerp, Gibraltar, Marseilles, Trieste, Singapore, Hongkong, Shanghai, Yokohama, Colombo, Aden. (C. U. '47, '48, '49, '50, '57)

(নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত ? সিডনী, ব্রিসবেন, ডারবান, পোর্ট সৈয়দ, বুয়েনস আয়ার্স, মন্ট্রিল, ভ্যানকুভার, নিউইয়র্ক, বোষ্টন, নিউ অরলিন্স, লস এঞ্জেলস, সীটল, স্যান ফ্রান্সিসকো, লিভারপুল, গ্লাসগো, কার্ডিফ, হামবুর্গ, রটারডাম, আন্টোয়ার্প, জিব্রাল্টার, মার্সাই, ট্রিয়েষ্টি, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়োকোহামা, কলম্বো, এডেন।) (পৃঃ ৩৫৩-৩৬২)

5. What are the major and minor ports of India ? Give some examples of each. What steps have been taken in recent years for the development of Indian ports ? (C. U. '52)

(ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দর বলিতে কি বুঝ ? প্রত্যেক শ্রেণীর বন্দরের উদাহরণ দাও। ভারতীয় বন্দরসমূহের উন্নয়ন কল্পে বর্তমান কালে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ?)

(পৃঃ ৩৬৩-৩৬৫)

6 Compare and contrast the east coast of India with the west coast in respect of : (a) Suitability for locating ports and harbours and (b) Economic activities in the coastal plains. (C. U. '58)

((ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং (খ) অর্থনৈতিক সঙ্গতির দিক দিয়া ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা কর।) (পৃঃ ৮৭-৮৮ ও পৃঃ ৩৬৩)

7. Name the important Indian ports you would touch at on your voyage from Karachi to Chittagong in a coastal steamer. Describe these ports. (C. U. '48)

(ভারতের উপকূলপথে জাহাজে করিয়া করাচি হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাইতে যে যে প্রধান প্রধান বন্দরে তোমার জাহাজ থামিবে তাহাদের নাম কর এবং বন্দরগুলি বর্ণনা কর।)

(পৃঃ ৩৬৫-৩৬৮)

8. Describe the hinterland and the nature of trade of the following ports: Kandla, Bombay, Cochin, Madras, Vishakhapattanam, Calcutta. (C. U. '51, '53, '55, '56,)

(নিম্নলিখিত বন্দরসমূহের পশ্চাৎভূমি ও বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর :—কাণ্ডলা, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, ও কলিকাতা।) (পৃঃ ৩৬২-৩৬৮)

9. Account for the commercial importance of the following:

Amritsar, Jullandhar, Chandigarh, Simla, Delhi, Aligarh, Agra, Firozabad, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Gorakhpur, Dalmianagar, Bokaro, Sindhri, Kalimpong, Serampur, Asansol, Chittaranjan, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Bhubaneswar, Bhopal, Indore, Ahmedabad, Nagpur, Tiruchi, Coimbatore, Hyderabad, Srinagar, Bangalore, Trivandrum. (C. U. '53, '55, '56, '57, '58)

(নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত? অমৃতসর, জলন্ধর, চণ্ডীগড়, সিমলা, দিল্লী, আলীগড়, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, ডালমিয়ানগর, বোকারো, সিন্ধ্রী, কালিম্পঙ, শ্রীরামপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ডিগবয়, ভুবনেশ্বর, ভূপাল, ইন্দোর, আমেদাবাদ, নাগপুর, তিরুচি, কোয়েম্বাটোর, হায়দরাবাদ, শ্রীনগর, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম।) (পৃঃ ৩৬৮-৩৭৪)

10. Write notes on *any four* of the following with special reference to their location and commercial importance—(i) Aberdeen, (ii) New Orleans (iii) Mombasa, (iv) Singapore, (v) Odessa, (vi) Vancouver, (vii) Dum Dum, (viii) Tokyo. (H. S. 61)

(অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত স্থানসমূহ সম্পর্কে টীকা লিখ :— (i) এ্যাবারডিন, (ii) নিউ অরলিন্স, (iii) মোম্বাসা, (iv) সিঙ্গাপুর, (v) ওডেসা (vi) ভ্যানকুভার, (vi) দমদম, (viii) টোকিয়ো।) (পৃঃ ৩৫৩-৩৬২)

11. Write notes on *any four* of the following with special reference to their location and commercial importance :—(a) Hongkong, (b) Colombo, (c) Chicago, (d) Rio de Janeiro, (e) Johannesburg, (f) Melbourne, (g) Southampton. (H. S. '63)

(অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত স্থান সমূহ সম্পর্কে টীকা লিখ :— (ক) হংকং, (খ) কলম্বো, (গ) শিকাগো, (ঘ) রায়ো-ড-জেনেরো, (ঙ) জোহানেসবার্গ, (চ) মেলবোর্ন, (ছ) সাদাম্পটন।) (পৃঃ ৩৫৩-৩৬২)

চতুর্থ খণ্ড

গৌণ উৎপাদন

ষোড়শ অধ্যায়

গৌণ উৎপাদন

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার পরেই গৌণ-উৎপাদন বা শ্রমশিল্পের স্থান। কারণ প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যসামগ্রী ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও বহুক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চাষের ক্ষেত্র হইতে আহৃত পাট ভোগ-কেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও চট, থলে, দড়ি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হয় না, বহুক্ষেত্রে ইহা এই ভাবে রূপান্তরিত হইয়াই তবে ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হয়। অনুরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত ধান চাউলে, কার্পাস বস্ত্রে, লৌহ আকরিক ইস্পাতে রূপান্তরিত না হইলে উহা মানুষের ব্যবহারোপযোগী হয় না। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদির এই রূপান্তরীকরণকে গৌণ উৎপাদন (secondary production) বা শ্রমশিল্প বলা হয়। অর্থনীতির ভাষায় গৌণ উৎপাদনের দ্বারা প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আকারগত উপযোগের (form utility) সৃষ্টি করা হয়। সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এরূপ গৌণ উৎপাদনের প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রমশিল্পের শ্রেণীবিভাগ (Types of manufactures)— শ্রমশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে শ্রমশিল্পের প্রকৃতি নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। যুগে যুগে যেরূপ প্রাথমিক উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমোন্নতি হইয়াছে গৌণ উৎপাদন পদ্ধতিও তেমনি অতীতের সরল ও অনাড়ম্বর গৃহশিল্প হইতে বর্তমানের অত্যন্ত জটিল ও বৃহদায়তন শ্রমশিল্পে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে মানুষ কেবলমাত্র নিজের বা নিজ পরিবারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থানীয় কাঁচামালকে শারীরিক শ্রমের সাহায্যেই ব্যবহারো-

পযোগী করিয়া তুলিত। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর এইরূপ রূপান্তরীকরণকে বলা হইত কুটির বা **গৃহশিল্প** (Primitive বা **Household manufactures**)। এইরূপ শ্রমশিল্পে মূলধন অথবা পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ কোন প্রভাবই অনুভূত হইত না। সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এই জাতীয় শ্রমশিল্পের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইলেও অদ্যাপি পৃথিবীর বহু অনুন্নত অংশে এইরূপ শ্রমশিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল, ক্রান্তীয় আফ্রিকা এবং মধ্য ও দঃ-পূঃ এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং নিম্নজীবনমানসম্পন্ন অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রমশিল্পের প্রসারই সর্বাপেক্ষা অধিক।

ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া পৃথিবীর বহু অঞ্চলে গৃহশিল্পসমূহ ক্রমশঃই **ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে** (Workshop type বা Community type) পরিণত হইতে থাকে। গৃহশিল্প পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্পী দক্ষতা অর্জন করিল তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হইল। এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বহু দেশে গৃহশিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং সমস্ত কাঁচামালকে মনুষ্য, পশু, বাতাস অথবা জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে শিল্পীয় পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বিক্রয় করাই হইল এই সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত দেশসমূহ, পশ্চিম ইউরোপ এবং উঃ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের শিল্পপ্রধান অংশেও অদ্যাবধি এই জাতীয় শ্রমশিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তবে ব্যাপকভাবে এইরূপ শ্রমশিল্পের প্রসার দেখা যায় চীন, জাপান, কোরিয়া ও ভারতে।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার এবং এই সমস্ত আবিষ্কারকে কাজে লাগাইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিরাট শিল্প-বিপ্লব ঘটে তাহারই ফলে **আধুনিক বৃহদায়তন শ্রমশিল্প** (Modern factory type)-সমূহের উদ্ভব হয়। পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল এই বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারকে শিল্পকার্যে যত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলই আধুনিক শ্রমশিল্প সংস্থাপনে তত অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। এই আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞান শ্রমশিল্পে প্রয়োগের ফলে শিল্পকার্যে কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন হেতু শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও আশাতীত রূপে হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে শ্রমশিল্পের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইলেও আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এমনকি একই দেশে গৃহশিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও বৃহদায়তন আধুনিক শ্রমশিল্পের পাশাপাশি অবস্থান পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমেরিকায় গৃহশিল্প

আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক। জাপান, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির স্থায় শ্রমশিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে তো গৃহশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিশিষ্ট স্থানই রহিয়াছে।

শ্রমশিল্পের একদেশীভবন (Localisation of industries)—সাধারণতঃ এক-এক প্রকারের শ্রমশিল্প এক-এক প্রকার অনুকূল অবস্থার সমাবেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে। ইহাকেই বলে শ্রমশিল্পের 'একদেশীভবন'। কলিকাতার আশেপাশে ভাগীরথীতীরের পাট-কলগুলি এই ব্যাপারের একটি চমৎকার নিদর্শন। বোম্বাই-এর কার্পাসবয়ন, উঃ প্রদেশের শর্করা শিল্প, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পুস্তক-ব্যবসায়ের কেন্দ্রীভবনও ইহার বিভিন্ন নিদর্শন।

একদেশীভবনের কারণ (Causes of localisation)—(ক) **ভৌগোলিক কারণ:** (১) **জলবায়ু**—শিল্পের একদেশতা নির্ণয়ে ইহার প্রভাব অসামান্য। ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গঠনে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ুর প্রয়োজন। সেই কারণে আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাসশিল্প, শুষ্ক জলবায়ুযুক্ত ইয়র্কশায়ারে পশমশিল্প, বুদাপেস্ট এবং করাচীতে ময়দাশিল্প এবং ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত লস্ এঞ্জেলস্-এর হলিউডে চলচ্চিত্রশিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। জলবায়ু আবার শিল্পদ্রব্যের চাহিদা, কাঁচামালের উৎপাদন, শ্রমিকের সরবরাহ ও তাহাদের কর্মনৈপুণ্য, পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্পাগারের আয়তন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবেও শিল্প সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। (২) **কাঁচামালের নিকটবর্তিতা**—কাঁচামালকে রূপান্তরিত করাই হইল শ্রমশিল্পের প্রধান কায। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অপর্যাপ্ত সেই সমস্ত অঞ্চলে ঐ সমস্ত কাঁচামালকে ভিত্তি করিয়া নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। তবে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবর্তিত হইলে যে সমস্ত কাঁচামাল হীনভার (weight-losing raw materials) হইয়া পড়ে (যেমন ধাতুদ্রব্য, ইক্ষু ইত্যাদি) সেইরূপ কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্পসমূহ কাঁচামালের উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না (যেরূপ টাটানগরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, উঃ প্রদেশের শর্করা শিল্প প্রভৃতি), কারণ সে সব স্থলে কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় অত্যধিক হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবর্তিত হইলে যে সমস্ত কাঁচামাল হীনভার হয় না (pure raw materials) সেই সমস্ত কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্প (যেরূপ বয়নশিল্পে ব্যবহৃত কার্পাস, রেশম, পশম, পাট প্রভৃতি) কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহু দূরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (যেরূপ গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের বয়ন শিল্প) আবার শিল্পকার্যে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহ গুরুভার ও স্বল্পমূল্যবিশিষ্ট (যেরূপ কাষ্ঠ) অথবা দ্রুত পচনশীল (যেরূপ দুগ্ধ) হইলে ঐ সমস্ত কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্প (যেরূপ

কাষ্ঠমণ্ড, মাখন, পনীর প্রভৃতি) কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। (৩) **শক্তিসম্পদের নিকটবর্তিতা**—শিল্প যেখানে ইন্ধনশক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভরশীল সেখানে কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই শিল্পের একদেশতা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কোন কোন শিল্পে নিযুক্ত দুই চারিটি কাঁচামাল ব্যতীত অধিকাংশ কাঁচামালই কয়লা অপেক্ষা লঘুভার। এজন্য কাঁচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পরিবহনের ব্যয় অপেক্ষা কয়লা খনি অঞ্চলে কাঁচামাল পরিবহনের ব্যয় অল্প। এই কারণে পৃথিবীর, বিশেষতঃ ইউরোপের, অধিকাংশ কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্প একদেশতা লাভ করিয়াছে। আবার কয়েকটি শিল্পে (যেরূপ লৌহ ও ইস্পাত, কাঁচশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, আলকাতরাজাত রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি) কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য। সেজন্য যেসব অঞ্চলে কয়লার খনি আছে পৃথিবীর সব দেশেই সেই সমস্ত অঞ্চলেই এই সমস্ত শিল্পের পত্তন হইয়াছে। তবে বর্তমানকালে শিল্প সংগঠনে খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্পসমূহের বিকেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এবং শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নিয়ন্ত্রণে শক্তি সম্পদের অবস্থানের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) **অর্থনৈতিক কারণ**—(১) **বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তিতা**—উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার বা চাহিদা পাওয়া যায় বলিয়া বৃহৎ বৃহৎ শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কলিকাতার পাটশিল্প ও বোম্বাই-এর কার্পাসশিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে পৃথিবীর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমানে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বলিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বাজারকেই বুঝায় না, দেশ দেশান্তরের বাজারকেও বুঝাইয়া থাকে। (২) **শ্রমিক সরবরাহের নিকটবর্তিতা**—ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব হয় না বলিয়া শিল্পসমূহ প্রসারলাভ করিতে পারে। আবার শ্রমিকের নিপুণতার জন্যও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠে ; যেরূপ, জার্মানীর রাসায়নিক শিল্প। (৩) **মূলধনের প্রাচুর্য**—আধুনিক শিল্পগঠনে মূলধনের প্রভাব অসামান্য। তবে কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতির তুলনায় মূলধনের গতিশীলতা অধিক বলিয়া শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ে মূলধনের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। সাধারণতঃ শহরগুলিতে মূলধন-সরবরাহকারী ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী বা ধনী লোকের প্রাচুর্য থাকায় এই সমস্ত স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। (৪) **পরিবহনের সুব্যবস্থা**—কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হইয়া থাকে।

(গ) **ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণ—সরকারের সহায়তা—** দেশীয় সরকারের সাহায্য ও উৎসাহের ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান একদেশীভূত হইয়া থাকে। কাশ্মীরের শালবয়ন শিল্প ও ঢাকার মসলিন শিল্প এইরূপ একদেশীভবনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

(ঘ) **শিল্পের একদেশতা**—শিল্পের একদেশতাই পরবর্তী কালে আরও অধিক একদেশতার কারণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কলিকাতায় নূতন পুস্তকের দোকান স্থাপন করিতে হইলে পুস্তকব্যবসায়ী কলেজ স্কোয়ারের সন্নিকটেই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করে।

উপরোক্ত অনুকূল অবস্থাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অবস্থার সমন্বয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই সাধারণতঃ শিল্পের একদেশীভবন হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের পাটশিল্পের জন্য শ্রমিক বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আনীত হয় সত্য, কিন্তু কাঁচামাল, যানবাহন, মূলধন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুবিধা থাকায় এই শিল্প কলিকাতার উপকণ্ঠেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহ (Great manufacturing regions of the World)—শ্রমশিল্পের একদেশতা নির্দেশক অবস্থাগুলির পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক এত জটিল যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এইরূপ ধারণা অংশতঃ সত্য হইলেও স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রমশিল্পের একদেশতা নির্দেশক অবস্থাসমূহ

৭৩নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহ

বিশেষ অনুকূল হওয়ায় কেবলমাত্র পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলেই আধুনিক শ্রমশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। এই দুইটি শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রধানটি হইল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ এবং দ্বিতীয়টি হইল উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশ।

আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পৃথিবীর মোট শিল্প-সামগ্রীর ⅔ অংশই এই দুইটি অঞ্চল একযোগে উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অতি প্রধান শিল্পাঞ্চল দুইটি ব্যতীত পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্পাঞ্চলও রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্য-ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, রুশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি শিল্পাঞ্চলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ক্রান্তীয় আর্দ্র নিম্নভূমি ও হিমমরু অঞ্চলসমূহে অদ্যাবধি কোন বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের পত্তন হয় নাই।

উত্তর আমেরিকা—উত্তর আমেরিকার তথা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প-বলয়টি উত্তরে মেইন ও মেরীল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণে বাল্টিমোর পর্যন্ত এবং পূর্বে নিউইংল্যাণ্ড রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল হইতে পশ্চিমে সিনসিনাটি, শিকাগো এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রমশিল্পে নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিকের প্রায় ৮০% এই শিল্পবলয়টির অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্পকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগের উত্তরার্ধে এই অতি প্রধান **শিল্পবলয়টির অবস্থিতির কারণ** প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) এতদঞ্চলের আবহাওয়া অনুকূল ও ভূমিভাগ উর্বর হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অধিক, (২) মিসিসিপি ও সেণ্ট লরেন্স—বৃহৎ হ্রদসমূহ দ্বারা সৃষ্ট সুন্দর জলপথের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার লাভ, (৩) উপকূলাঞ্চল ভগ্ন হওয়ায় নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতির ন্যায় সুন্দর সুন্দর বন্দরের সান্নিধ্য, (৪) আপালাচিয়ান ও উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রধান প্রধান কয়লা ও তৈল খনিসমূহের অবস্থিতি, নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ এবং এই সমগ্র অঞ্চলটিতেই লৌহ আকর ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্য, (৫) প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ, (৬) স্থলপথে যানবাহন ব্যবস্থার সম্যক উন্নতি সাধন, এবং সর্বোপরি (৭) শিল্পদক্ষ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সর্বপ্রথম নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে বসতিস্থাপন এবং পরবর্তীকালে শ্রমশিল্পসমূহের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ সম্প্রসারণ। তবে শ্রমশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বলয়টির সীমানার বহির্ভাগেও কয়েকটি শ্রমশিল্প কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

এই শিল্পবলয়টির মধ্যে আবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য **শিল্পাঞ্চল** রহিয়াছে। যথা—(১) **নিউ ইংল্যাণ্ড শিল্পাঞ্চল**—আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও খনিজতৈল, শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুর্য এবং ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু এই অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন, কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড, চর্ম ও ধাতু দ্রব্যের নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) **মধ্য আটলাণ্টিক শিল্পাঞ্চল**—বন্দর, আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা, শ্রমিক ও বাজারের সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) **মধ্য নিউইয়র্ক শিল্পাঞ্চল**—কয়লাখনির সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ও বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) **মোহেক্রো-**

অণ্টেরিও শিল্পাঞ্চল—হ্রদপথে যানবাহনের সুবিধা এবং আকরিক লৌহ, আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়লা ও জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য হেতু এই অঞ্চলে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তবে উহাদের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পই উল্লেখযোগ্য। (৫) **পিট্‌সবার্গ-ইরি শিল্পাঞ্চল**—হ্রদ ও রেলপথে যানবাহনের সুবিধা এবং খনিজ তৈল, আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও স্বাভাবিক গ্যাসের সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁচনির্মাণ, বয়ন ও রবারজাত দ্রব্যের শিল্পই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৬) **ডেট্রয়েট শিল্পাঞ্চল**—হ্রদ ও রেলপথে যানবাহনের সুবিধা এবং আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়লা ও সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের লৌহের প্রাচুর্য ও সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৭) **সিনসিনাটি-ইণ্ডিয়ানাপোলিস শিল্পাঞ্চল**—পশ্চিমে ভুট্টা বলয় এবং পূর্বে কয়লাক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলে খাদ্য-সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মোটর গাড়ী ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পাঞ্চলটি আপালাচিয়ান কয়লাখনি ও পূর্ব-মধ্য কয়লাখনির মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ায় এই উভয় অঞ্চল হইতে কয়লার সরবরাহ পাইয়া থাকে। (৮) **মিচিগান হ্রদ সন্নিহিত শিল্পাঞ্চল**—এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, মোটর গাড়ী, যন্ত্রপাতি, মাংস হিমায়ন, চর্ম, কাগজ প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প উল্লেখযোগ্য। শিকাগো ও মিলওয়াকী এই অঞ্চলের মধ্যমণি। এই শিল্পাঞ্চলটি প্রধানতঃ পূর্ব-মধ্য কয়লাখনি হইতে কয়লার সরবরাহ লইয়া থাকে। তবে, আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়লাও এতদঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য শিল্পবলয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য—(১) **দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল সন্নিহিত অংশ**—এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত বয়ন, বনজ ও রাসায়নিক শিল্পেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আপালাচিয়ান কয়লাক্ষেত্রের সান্নিধ্য, পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ, সুলভ শ্রমিক, লৌহ আকরিক, কার্পাস ও অন্যান্য কাঁচামালের সরবরাহ হেতু এই অঞ্চলটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। (২) **মধ্যাঞ্চলের সমভূমি**—এতদঞ্চলের মিনিয়াপোলিস্, সেণ্ট পল, ওমাহা, কানসাস সিটি, সেণ্ট লুই, হাউস্টন প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলিতে মাংস হিমায়ন, তৈল পরিস্রাবণ, কার্পাস সম্প্রেষণ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ প্রধানতঃ অন্তর্দেশীয় কয়লাখনিসমূহকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলাঞ্চল**—এই অঞ্চলের অন্তর্গত পাগেট-সাউণ্ড ও উইলামেট উপত্যকা অঞ্চলে বনজশিল্প, স্যান ফ্রান্সিসকো অঞ্চলে তৈল-পরিস্রাবণ, ইস্পাতশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ এবং লসএঞ্জেলস্-স্যানডিয়েগো

অঞ্চলে চলচ্চিত্র, তৈল পরিস্রাবণ, বিমানপোত নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলসমূহের সহিত ঐ দেশের কয়লাখনিসমূহের সম্পর্ক ততটা নিবিড় নহে। পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা খনি ও তৎসংশ্লিষ্ট লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং দক্ষিণ আপালাচিয়ান কয়লা খনি ও তৎসংশ্লিষ্ট-শিল্পাঞ্চলটি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন শিল্পাঞ্চলই কয়লাখনিসমূহকে ভিত্তি করিয়া প্রসার লাভ করে নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে পেনসিলভ্যানিয়া এবং উত্তর ও মধ্য আপালাচিয়ান কয়লা খনির সান্নিধ্য হেতু নিউ ইংল্যাণ্ড, মধ্য আটলাণ্টিক, মধ্য নিউইয়র্ক, নায়গ্রা-অণ্টারিও, পিটস্‌বার্গ-ইরি, ডেট্রয়েট ও মিচিগান হ্রদ সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলসমূহ; দক্ষিণ-আপালাচিয়ান কয়লা খনির সান্নিধ্য হেতু দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল সন্নিহিত শিল্পকেন্দ্রসমূহ; অন্তর্দেশীয় কয়লা খনির (পূর্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধ্য) সান্নিধ্য হেতু সিনসিনাটি-ইণ্ডিয়ানাপোলিস্ ও মধ্যবর্তী সমভূমির শিল্পাঞ্চলসমূহ; রকি পর্বতাঞ্চলের কয়লাখনির সান্নিধ্য হেতু এতদঞ্চলে ধাতুনিষ্কাশন-শিল্প এবং পশ্চিম উপকূলের খনিসমূহের সান্নিধ্য হেতু প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের শিল্পাঞ্চলসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপ—নিবিড় লোকবসতি, জনসাধারণের উন্নতিশীল জীবনমান, চাহিদার ব্যাপকতা, নিপুণ ও দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও তাহাদের নব নব উদ্ভাবনী শক্তি, কয়লা সম্পদ এবং শিল্পোপযোগী নানাবিধ কাঁচামালের প্রাচুর্য হেতু ইউরোপ শিল্পসংগঠনে সকল মহাদেশের অগ্রণী। কয়লা-প্রধান অঞ্চলেই শিল্পের প্রসার অধিক। মধ্য ইউরোপের অন্তর্গত গ্রেট ব্রিটেন হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম ও মধ্য জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, দঃ পোল্যাণ্ড এবং মধ্য রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শিল্পবলয়ে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। একমাত্র মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ধাতুদ্রব্যের শিল্প ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় শিল্প সংগঠনেই ইউরোপ পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

ব্রিটেন পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহের অন্যতম। কয়লার প্রাচুর্যহেতু ব্রিটেনের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলই কয়লাখনিসমূহকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেনের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ নিম্নে বিবৃত হইল। (১) **স্কটল্যাণ্ডের কয়লাক্ষেত্র**—ইহা তিনটি পর্যঙ্কে বিভক্ত। (ক) পূর্বভাগে লোথিয়ান-ফাইফ পর্যঙ্কের কয়লাকে ভিত্তি করিয়া এডিনবার্গ অঞ্চলে কাগজ শিল্প, ছাপাখানা, বই-বাঁধাই, মদ্য প্রভৃতি শিল্প এবং কির্কাল্ডি, ফকল্যাণ্ড ও নিউবার্গ অঞ্চলে তৈলাক্ত ক্যাম্বিস নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (খ) পশ্চিমে আয়ারশায়ার পর্যঙ্কের কয়লাকে ভিত্তি করিয়া কিলমারনক, আয়ার, গিরভান এবং মেবোল অঞ্চলে যন্ত্রপাতি নির্মাণ, চর্ম ও পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (গ) মধ্য পর্যঙ্কের অন্তর্গত ল্যানার্কশায়ার খনিকে ভিত্তি

করিয়া ক্লাইড অববাহিকায় জাহাজ নির্মাণ; মাদারওয়েল, কোটব্রীজ, এয়ারডায়ার ও ফলকার্ক অঞ্চলে লৌহের কারখানা; স্টার্লিং এবং আলোয়া অঞ্চলে পশম শিল্প এবং গ্লাসগো অঞ্চলে যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ময়দা, কাগজ, সাবান, কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য-পর্যঙ্কের উৎপাদনই অধিকতর। (২) **নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লাক্ষেত্র**—টাইন ও উইয়ার মোহানায় জাহাজ নির্মাণ, টী নদীর মোহানায় লৌহ ও ইস্পাত এবং বিলিংহামের রাসায়নিক শিল্প এই কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলে উৎপন্ন কয়লার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগই সাধারণ অবস্থায় বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। (৩) **ক্যাম্বারল্যাণ্ডের কয়লাক্ষেত্র**—ইহা তুলনায় ক্ষুদ্রতর, তবে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লাক্ষেত্রের ন্যায় ইহাও সমুদ্রগর্ভে, আইরিশ সমুদ্রে অনুপ্রবিষ্ট। এ অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত কয়লা সংগ্রহের স্থান। (৪) **ইয়র্ক, নটিংহাম ও ডার্বির কয়লাক্ষেত্র**—এ অঞ্চলেই হইল ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং অঞ্চলের পশমবয়নকেন্দ্র এবং ইয়র্কশায়ারের শেফাল্ড অঞ্চলের লৌহশিল্পের কেন্দ্র। এখানকার কয়লা প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়। (৫) **ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লাক্ষেত্র**—ব্রিটেনের কার্পাসশিল্প, বৈদ্যুতিক ও বয়ন যন্ত্রপাতি, রবারজাত দ্রব্য ও কাগজের কারখানা এই কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার কয়লা প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। (৬) **নর্থ স্টাফোর্ডশায়ারের** কয়লাক্ষেত্র হইতেছে মৃৎশিল্পের কেন্দ্র; যেরূপ স্টোক, টানস্টল, লংটন, ফেণ্টন প্রভৃতি অঞ্চল। **সাউথ স্টাফোর্ডশায়ারের** কয়লা-ক্ষেত্রেই বার্মিংহাম, ডাড্‌লে, উলভারহ্যাম্পটন, ব্রমউইচ প্রভৃতির ন্যায় মিডল্যাণ্ড বা মধ্যদেশের বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চলের অবস্থান। এ অঞ্চলে শুধু **লিস্টারশায়ারের** কয়লা ক্ষেত্রেই শিল্পের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। তবে হিক্‌লে ও লাফবরো অঞ্চলের গেঞ্জি ও মোজার কারখানাসমূহ এই খনি হইতেই কয়লা গ্রহণ করে। (৭) **পূর্ব শ্রপশায়ার** কয়লাক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাত, টালি ও ইষ্টক ও মৃত্তিকার নল নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৮) **ওয়ারউইকশায়ারের** কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়া কভেন্ট্রিতে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৯)

৭৪নং চিত্র—ব্রিটেনের কয়লাক্ষেত্র ও শিল্পাঞ্চল

উত্তর ওয়েলস্‌ কয়লাক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রাইবো ও মস্টিনে লৌহের কারখানা, ফ্লিন্ট-এ রাসায়নিক শিল্প, রেশম ও কাগজের কল এবং কয়াবন অঞ্চলে ধাতু শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। **দক্ষিণ ওয়েলস্‌**-এর **কয়লাক্ষেত্র** হইতেছে বিদেশে কয়লা রপ্তানীর একটি প্রধান কেন্দ্র। তবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিহেতু উৎপাদিত কয়লার মূল্যবৃদ্ধি, পরিবর্ত শক্তিসম্পদ-রূপে জলবিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন কয়লাখনির আবিষ্কার এবং দেশাভ্যন্তরে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধিহেতু দক্ষিণ ওয়েলসের কয়লার খনি হইতে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এই কয়লাক্ষেত্রেও শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। এ্যাবারডায়ার, কার্ডিফ, সোয়ানসী, পোর্ট-ট্যালবট অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প; পন্টিপুল অঞ্চলে বাং-ঢালাই; এবং সোয়ানসী অঞ্চলে নিকেল, দস্তা ও তাম্র নিষ্কাশন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। **ডীন জঙ্গলের** কয়লাক্ষেত্র আকারে ক্ষুদ্র। **পূর্ব-কেন্টের** কয়লাক্ষেত্রে বিশেষ কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

মহাদেশীয় ইউরোপের অন্তর্গত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে শিল্পের প্রসার সমধিক। বস্তুতঃ সমগ্র উঃ ও উঃ পূঃ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী এবং সুইজারল্যাণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ এক অতিবৃহৎ শিল্পবলয়ের অন্তর্গত। এতদঞ্চলে শিল্পসমাবেশের মূল কারণ হইল লোরেনের লৌহ আকরিক এবং বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রের একত্র অবস্থিতি।

উত্তর ফ্রান্সের কয়লাক্ষেত্র এবং জলবিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহকে ভিত্তি করিয়া ক্যামব্রেতে ক্ষৌমবস্ত্র, রুবেতে পশমবস্ত্র, এ্যামিয়ে ও রুয়ে-তে কার্পাসবস্ত্র, লীল, রুবে, ভ্যালেসিয়ে-তে লৌহ-ইস্পাত ও বয়নশিল্প; তুর্কোয়াঁতে বয়নশিল্প, লীল অঞ্চলে শর্করা ও আরাস অঞ্চলে গালিচা ও পর্দা প্রভৃতির কারখানাসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রধান শিল্পবলয়টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও মধ্যভাগের অধিত্যকা অঞ্চলে লা ক্রজো কয়লার খনিকে ভিত্তি করিয়া যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্রনির্মাণশিল্প এবং স্যাঁতেতিয়েঁ কয়লার খনিকে কেন্দ্র করিয়া লৌহ, ইস্পাত ও রেশম বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

উত্তর ফ্রান্সের কয়লার খনির অনুপ্রবিষ্ট অংশ ও সেম্বারমিউজ উপত্যকার অন্তর্গত কয়লা ও লৌহ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া **বেলজিয়ামে** নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সার্লরোয়া-তে পৃথিবীর বৃহত্তম কাঁচ নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানীর সার, রূঢ় এবং ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। রূঢ় কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়া যে বিরাট ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল কেন্দ্র হইল এসেন শহর। বার্মেন, হাজেম, বোচান, ডর্টমাণ্ড, ডুসেলডর্ফ, ডইসবার্গ প্রভৃতি শহরেও লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। রাইন

অববাহিকার অন্তর্গত লুডুইগস্থাফেন, লেভারকুসেন, ফ্রাঙ্কফার্ট ও ডার্মস্টাড অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প ; ব্যাভেরিয়ার নুরেমবার্গ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শিল্প ; রূঢ় অঞ্চলের বার্মেন ও এল্‌বারফিল্ড-এ বয়নশিল্প (প্রধানতঃ পশম), ক্রেফেল্ড-এ রেশম, স্টাটগার্ট-এ হোসিয়ারী দ্রব্য, ফ্রেবার্গ-এ ঘড়ি, মিউনিক-এ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিই হইল এতদঞ্চলের প্রধান প্রধান শিল্প।

পর্যাপ্ত লিগনাইটের সরবরাহ ; ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা খনির অবস্থিতি ; জলবিদ্যুৎ, লৌহ আকরিক, পটাস ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সরবরাহ হেতু জার্মানীর দক্ষিণাংশের মধ্যভাগ ও বোহেমিয়া অঞ্চলকে লইয়া **মধ্য ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চলটি** গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক নিরাপত্তা হেতু পশ্চিমের রাইন-ওয়েস্টফ্যালিয়া শিল্পাঞ্চল হইতে শিল্পের বিকেন্দ্রীভবনই এতদঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ। সাইলেশিয়া অঞ্চলে কয়লা, দস্তা, ও লৌহ আকরিকের পাশাপাশি অবস্থান হেতু ধাতুশিল্প ও বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চলটি পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্প অঞ্চলটির সহিত নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে।

কয়লা-সম্পদহীন **দক্ষিণ-ইউরোপের** সুইজ্যারল্যাণ্ড, ইতালী (পো নদীর অববাহিকা অঞ্চল), এবং উঃ পূঃ স্পেনে (ক্যাটালোনিয়া) জলবিদ্যুতের সাহায্যে নানাবিধ লঘু শিল্পের (যেরূপ খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত শিল্প, বয়ন, ঘড়ি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প) প্রসার ঘটিয়াছে। বর্তমানে অবশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে সরকারী সহায়তায় আমদানীকৃত কয়লা ও কাঁচামালের সাহায্যে দক্ষিণ ইউরোপের বহু অঞ্চলে নানাপ্রকারের গুরুশিল্পও (heavy industries) প্রসারলাভ করিতেছে। রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ এবং কয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির অপ্রাচুর্য হেতু বলকান উপদ্বীপাঞ্চলে আধুনিক বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের প্রসার নিতান্তই সামান্য।

রুশিয়া—রুশিয়ার শিল্পসমূহ কয়েকটি শিল্পাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ শক্তি, লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামালের পারস্পরিক সান্নিধ্যই হইল এই শিল্পাঞ্চলসমূহের আর্থিক ভিত্তি। **ইউরোপীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত নিম্নলিখিত শিল্পাঞ্চলসমূহই উল্লেখযোগ্য—(১) **মস্কো-লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চল**—শিল্পাঞ্চলসমূহের পূর্বদিকে বিকেন্দ্রীভবন এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বর্তমানে এই শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। **লেনিনগ্রাদে** বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জাহাজ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, **মস্কোতে** বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিমানপোত, মোটর গাড়ী প্রভৃতি নির্মাণ, **টুলাতে** যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, **গর্কিতে** মোটর গাড়ী, ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত নির্মাণ, **আইভানোভোতে** কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, এবং **ভরোনেজ**-এ বিমানপোত নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ টুলা ও ডনেৎস কয়লা-

ক্ষেত্র হইতে কয়লা গ্রহণ করে। (২) **ইউক্রেন-ডন শিল্পাঞ্চল**—ডন অঞ্চলের কয়লা, ক্রিভয়রগ অঞ্চলের লৌহ আকরিক ও নিপ্রোপেস অঞ্চলের

৭৫নং চিত্র—সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্পাঞ্চলসমূহ

বিদ্যুৎ সরবরাহকে ভিত্তি করিয়া এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক

অবস্থায় এই অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রের ৭০% এ্যালুমিনিয়াম ও ৪৫% ইস্পাত উৎপাদিত হয়। **রুস্টভ-অন-ডনে** লৌহ ও ইস্পাত, **কিয়েভ**-এ চিনি ও চর্মজাত দ্রব্য এবং **খারকভ**-এ ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। (৩) **ইউরাল শিল্পাঞ্চল**—কয়লা, লৌহ-আকরিক, খনিজ তৈল এবং অলৌহবর্গীয় ধাতব খনিজের পাশাপাশি অবস্থান হেতু ইহা বর্তমানে একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। **ম্যাগনিটোগর্স্ক** রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত-উৎপাদন কেন্দ্র। **নিজনিট্যাগিল**-এ রাসায়নিক শিল্প, ধাতুশিল্প ও রেলগাড়ী নির্মাণ, **স্বার্দলভস্ক**-এ অস্ত্রশস্ত্র, **চেলিয়াবিন্স্ক**-এ ট্র্যাক্টর, বিমান পোত, ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রশস্ত্র, **ডেগটিয়ার্কা**তে তাম্র ও স্বর্ণ নিষ্কাশন এবং **ওস্ক** অঞ্চলে নিকেল ও ক্রোম নিষ্কাশন উল্লেখযোগ্য। (৪) **কারেলিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল**—কোলা উপদ্বীপ হইতে কারেলিয়া যোজক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বনজ শিল্প, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ ও খনিজ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। (৫) **ট্রান্সককেশিয়া অঞ্চল**—এই অঞ্চলের অন্তর্গত **টিফলিস ও এরিভান**-এ ধাতুশিল্প ও তৈল পরিস্রাবণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **এশীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহ হইল: (১) **সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক অঞ্চল**—পঃ সাইবেরিয়ার অন্তর্গত কুজনেৎস্ক কয়লাখনি এবং ইউরাল ও আলটাই পর্বতাঞ্চলের লৌহ আকরিকের উপর নির্ভর করিয়া এ অঞ্চলে লৌহ-ইস্পাত, ধাতুশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **সেমিপালাটিন্স্ক**-এ ময়দা ও মাংস শিল্প, **বার্ণাউল**-এ কার্পাস বয়ন এবং **স্ট্যালিনিস্ক**-এ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উল্লেখযোগ্য। (২) **সোভিয়েট মধ্য এশিয়া অঞ্চল**—কারাগাণ্ডার কয়লা খনিকে ভিত্তি করিয়া এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। **ফার্গানা, আসখাবাদ ও টাসখেণ্ট** অঞ্চলে কার্পাস ও রেশম বয়ন, **চিমখেণ্ট** অঞ্চলে সীসক ও দস্তা নিষ্কাশন, **পির বলখাস** অঞ্চলে তাম্র নিষ্কাশন, **কারাগাণ্ডা**-তে কয়লা উত্তোলন এবং **ফার্গানা ও বুখারা**-তে খনিজ তৈল উত্তোলন উল্লেখযোগ্য। (৩) **সাইবেরিয়ার সুদূরপ্রাচ্য অঞ্চল**—১৯৪১ সালের পর হইতে এই অঞ্চলে শিল্পের দ্রুত প্রসার দেখা যাইতেছে। **কমসোমোলস্ক** এবং **খারবারোভস্ক** অঞ্চলে তৈল পরিস্রাবণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল শিল্প-সংগঠনে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে।

শিল্প-সংগঠনের দিক হইতে গত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য হেতু রুশিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এশিয়া—ইউরোপ ও উঃ আমেরিকার শিল্পাঞ্চলসমূহ যেরূপ কয়লা-খনিসমূহকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে **পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার** ক্ষেত্রে কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চল সমূহের সহিত সেরূপ কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। এতদঞ্চলের দেশসমূহের আর্থিক অনুন্নতিই ইহার মূল কারণ।

কৃষিপ্রধান **চীন** দেশে শিল্পের ব্যাপারে কুটির শিল্পই উল্লেখযোগ্য। যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের প্রসার এখনও অতি সামান্য। আবার উৎপাদন পদ্ধতিও আদিম প্রকৃতির। উল্লেখযোগ্য যন্ত্রশিল্প হিসাবে রেশম, কার্পাস ও পশম বয়ন (সাংহাই, নানকিং, নিগপো, হ্যাংচাউ, উসিহ্), সিগারেট, উদ্ভিজ্জ তৈল ও চিনামাটির দ্রব্য (প্রধানতঃ ফিসে ও চাংসা অঞ্চল) প্রভৃতিই প্রধান। বর্তমানে শান্‌সি ও শেন্‌সি কয়লা খনিকে ভিত্তি করিয়া হেনিয়াং ও চিংলিংচেন অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। হ্যাংকাউ ও সাংহাই অঞ্চলে ময়দার কল এবং সাংহাই-এ জাহাজ নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সিমেণ্ট, কাগজ, শর্করা, চর্ম, মুদ্রণশিল্প প্রভৃতি প্রধান।

গণতান্ত্রিক চীনে শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ, শিল্প বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক ভৌগোলিক পরিবেশগুলি এই দেশের পক্ষে অনুকূল। দেশটি আয়তনে বৃহৎ ও সুসংবদ্ধ, অবস্থানটিও উন্নতির সহায়ক। এই দেশে বহু উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং বহু উর্বরা নদী অববাহিকাও বর্তমান। আবার এই দেশের উপকূলাঞ্চলে ও মধ্যভাগে বৃষ্টিপাতও সুপ্রচুর। লৌহ, কয়লা ও সম্ভবতঃ খনিজ তৈল এবং সম্ভাব্য জলবিদ্যুতের পরিমাণও প্রচুর। আর সর্বোপরি এদেশের লোকবসতি নিবিড়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত **জাপান** শিল্পসংগঠনে পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিত। জাপানের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, শিল্পোন্নতির জন্য জাপান সরকারের নানাবিধ সাহায্যদান, অনুকূল জলবায়ুর প্রভাব, শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বনজ, কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ কাঁচামালের প্রচুর উৎপাদন, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয়ের স্বল্পতা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা, সুন্দর সুন্দর বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি জাপানীদের অতুলনীয় দেশাত্মবোধই ছিল এই আশাতীত **শিল্পোন্নতির কারণ।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের অর্থ নৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও জাপান আর্থিক-ক্ষেত্রে পুনর্গঠন ও উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়।

জাপানী শিল্প সংগঠনের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** হইল যে এখানকার অধিকাংশই কুটির শিল্প অথচ ইহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং কয়লার অপ্রাচুর্য হেতু প্রচুর জলবিদ্যুৎশক্তির দ্বারা শিল্পকার্য পরিচালনা করে। জাপানের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের সমভূমিতে টোকিও হইতে নাগাসাকি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলেই সীমাবর্দ্ধ। এই অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড় এবং পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত ধরণের। এই সমগ্র অঞ্চলটিকে আবার কয়েকটি **উপশিল্পাঞ্চলে** বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **টোকিও-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল**—কয়লা ও জলবিদ্যুতের সহজলভ্যতা ও বন্দরের সান্নিধ্য-

হেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, রসায়ন, জাহাজ নির্মাণ, বয়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানী শিল্পসামগ্রীর ৩০% এই অঞ্চলই সরবরাহ করে, তবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পাগারই
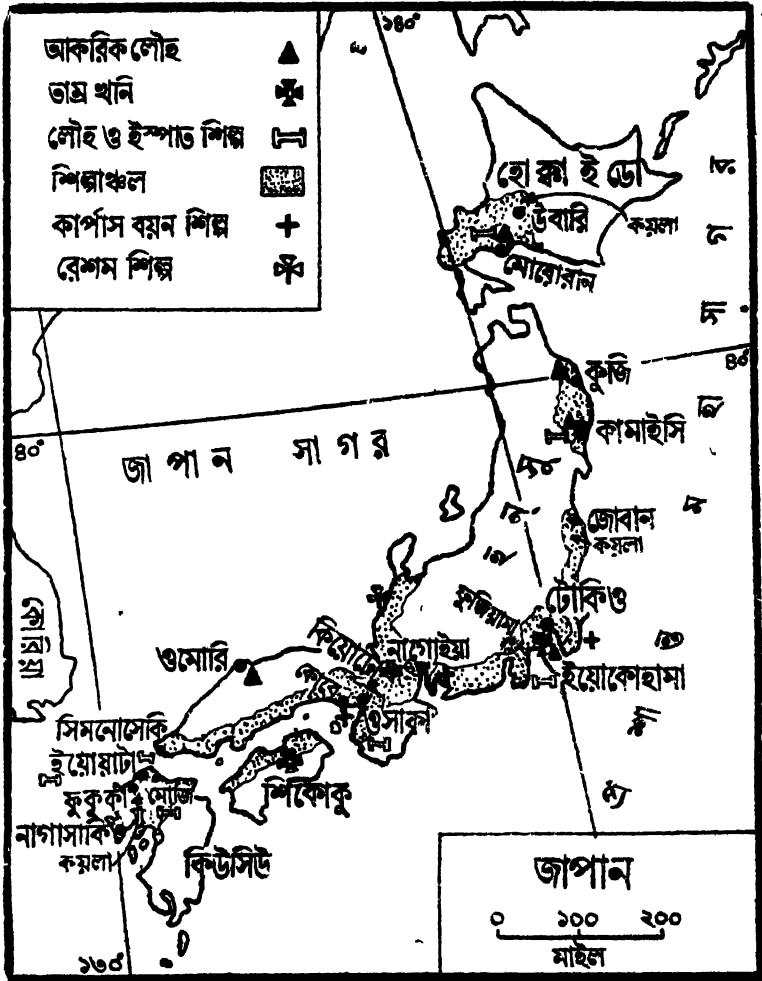
৭৬ নং চিত্র—জাপানের শিল্পাঞ্চলসমূহ

ক্ষুদ্রায়তনের। (২) **নাগোইয়া অঞ্চল**—টোকিও উপসাগর সন্নিহিত এই অঞ্চলে রেশম ও কার্পাস বয়ন শিল্প, যন্ত্রপাতি, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি নির্মাণের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) **কোবে-ওসাকা বা কিনকি শিল্পাঞ্চল**—ওসাকা উপসাগর সন্নিহিত কোবে-ওসাকা সমভূমির অন্তর্গত এই

শিল্পাঞ্চলটি প্রধানতঃ বয়ন শিল্পের জন্যই বিখ্যাত, তবে লৌহ ও ইস্পাত, কলকব্জা, জাহাজ নির্মাণ, তৈলশোধন প্রভৃতির কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) **উত্তর কিউসিউ শিল্পাঞ্চল**—কিউসিউ দ্বীপের কয়লার খনির অন্তর্গত সিমোনোসেকি প্রণালীর তীরে অবস্থিত এই শিল্পাঞ্চলটি জাপানের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। এই অঞ্চলে মাটির খেলনা, যন্ত্রপাতি ও খাদ্য সংরক্ষণের কারখানা প্রভৃতি রহিয়াছে।

ভারতে কুটির শিল্পের প্রসারই সমধিক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পসমূহ প্রসার লাভ করিতে থাকিলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সংগঠন অতি সাম্প্রতিক কালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে শিল্পসামগ্রী উৎপাদিত হইত প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্যই। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যাদির বৈদেশিক রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে শিল্পাঞ্চল হিসাবে ভারতের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতকে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ গোলার্ধ—দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নতিশীল অঞ্চলসমূহ সাধারণতঃ কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের রপ্তানীতেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আধুনিক বৃহদায়তন শ্রমশিল্প সংগঠনে ইহারা তাদৃশ উন্নতি লাভ কারতে সক্ষম হয় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও কয়লার অভাবহেতু এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা কয়লার প্রাচুর্য সত্ত্বেও শিল্পদ্রব্যের চাহিদার স্বল্পতা হেতু শ্রমশিল্প সংগঠনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার **আর্জেন্টিনা** ও **ব্রাজিলে** খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত শিল্প এবং বয়ন শিল্পের প্রসারই সমধিক। কারণ, এতদঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমশিল্পে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহৃত হইতে পারে, অল্প কয়লা ও নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং যে সমস্ত শ্রমশিল্প স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম সেইরূপ শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠাই সম্ভব। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় মাংস সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প, ময়দার কল, বয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতির নির্মাণ প্রভৃতি হইল **আর্জেন্টিনার** প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প। আর্জেন্টিনার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজধানী বুয়েনশ আয়ার্স অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও স্থানীয় চাহিদার ব্যাপকতা হেতু পাট শিল্প, বস্ত্র বয়ন, রাসায়নিক শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি শ্রম-শিল্পের পত্তন হইয়াছে। কয়লার অভাব হেতু ব্রাজিলের পর্যাপ্ত লৌহ সম্পদ এখনও পর্যন্ত কাজে লাগান যাইতেছে না।

লোকসংখ্যার অপ্রতুলতা, পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা, কৃষি ও পশু পালনের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহের আপেক্ষিক সুবিধা, মহাদেশটির

অধিকাংশেই প্রতিকূল জলবায়ুর আধিপত্য, শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতির অনুসরণ, ভূমিভাগের এক বিশাল অংশে ইউরোপীয়দের বসবাসের অসুবিধা, শক্তি সম্পদের অপ্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে এতাবৎকাল পর্যন্ত **অস্ট্রেলিয়ায়** যন্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সরকারের নানাবিধ চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল নূতন নূতন শ্রমশিল্পের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প (সিডনী ও মেলবোর্ন), পশম ও কার্পাস বয়ন শিল্প (পূর্বাঞ্চল), এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই (সিডনী) প্রধান। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে শর্করা ও চর্মশিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, মোটর গাড়ী, ট্র্যাক্টর, সংবাদপত্রের কাগজ এবং কৃত্রিম রেশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষা কাঁচামালের উপর শাসকশ্রেণীর লোকেদের বিশেষ নজর, স্থানীয় অধিবাসী ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ, শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির অভাব প্রভৃতি কারণে **দক্ষিণ আফ্রিকায়** শিল্পের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। তবে বর্তমানে স্বর্ণ ও হীরকের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় কৃষিজ, খনিজ এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার লক্ষিত হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you mean by localisation of industries ? Give an account of the factors influencing localisation of industries with illustration. (C. U. '49, H. S. '63)

(শ্রমশিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ ? একদেশীভবনের কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক লিখ।) (পৃঃ ৩৭৯-৩৮১)

2. Give a brief account of the great manufacturing regions of the world.

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৩৮১-৩৯৩)

3. Give a brief account of the manufacturing belt of the U. S. A.

(যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প বলয়টি সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৩৮২-৩৮৪)

4. Give an account of the major coal-fields of the U. S. A. and indicate their influence on the location of industries in the country. (C. U. '50, '52, '55)

(যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা খনিসমূহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ এবং দেশের শিল্প সংগঠনে কয়লাখনি সমূহের প্রভাব নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২১৩-২১৪ ও পৃঃ ৩৮২-৩৮৪)

5. Describe briefly the major coal-fields of Europe and associated manufacturing industries. (C. U. '53).

(ইউরোপ মহাদেশের কয়লা খনি সমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।) (পৃঃ ২১৫-২১৬ ও পৃঃ ৩৮৪-৩৮৭)

6. Give a brief account of the manufacturing belt of western Europe.

(পশ্চিম ইউরোপের শিল্প বলয় সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৩৮৪-৩৮৭)

সপ্তদশ অধ্যায়

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমশিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাঁচামালই শিল্পদ্রব্যে পরিণত হইলে হীনভার হইয়া পড়ে বলিয়া বিভিন্ন কাঁচামাল (কয়লা ও কোক, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য লৌহ সংকর ধাতব খনিজ), জলসরবরাহ এবং বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা, মূলধন ও সুলভ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ, উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা, কারখানা স্থাপনের উপযোগী বিস্তৃত সমতলভূমিভাগের সহজলভ্যতা প্রভৃতির উপরেই এই শিল্পের একদেশতা নির্ভর করে।

লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাতের উৎপাদন (Production of steel from iron ore)—প্রথমে আকরিক লৌহ, কোক কয়লা ও চুনাপাথর একত্রে বাতচুল্লীতে (blast furnace) ঢালিয়া দিয়া গালান হয়। বাতচুল্লীর প্রচণ্ড তাপে লৌহ আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থ চুনাপাথরের চুনের সহিত মিশিয়া গাদ (slag) রূপে উপরে ভাসিয়া উঠে এবং চুল্লীর নীচে গলিত লৌহ সঞ্চিত হয়। এই গলিত লৌহকে ছাঁচে ঢালিয়া লৌহ পিণ্ড* pig iron) প্রস্তুত করা হয়। লৌহ পিণ্ডে বিশুদ্ধ লৌহ ব্যতীতও অঙ্গার, গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহা অতিশয় ভঙ্গুর হয়।

এই লৌহ পিণ্ডকে নানা আকারে ঢালাই করিয়া (iron castings) নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। লৌহ পিণ্ডকে পুনরায় গালাইয়া অঙ্গার প্রভৃতি খাদের পরিমাণ হ্রাস করাইলে নমনীয় পিষ্ট লৌহ (wrought iron) পাওয়া যায়। ইহা লৌহ পিণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর নহে বলিয়া ইহাকে পিটাইয়া নানা আকারের পাত প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পিষ্ট লৌহের সহিত সামান্য অঙ্গারচূর্ণ ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়া অথবা সরাসরি লৌহ পিণ্ডের সহিত ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত (steel) প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ম্যাঙ্গানীজ সহযোগে লৌহ পিণ্ড গালাইবার সময়ে নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি বিভিন্ন লৌহ সংকর ধাতব খনিজ পদার্থসমূহের ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

---

*বাতচুল্লীতে ১ টন লৌহ পিণ্ড উৎপাদন করিতে ১·৭ টন লৌহ আকরিক, ·৯ টন কোক কয়লা, ·৪ টন চুনাপাথর, ·২ টন অন্যান্য দ্রব্য এবং ৪ টন বাতাসের প্রয়োজন হয়। উৎপাদিত প্রতি টন লৌহ পিণ্ডের সহিত ·৫ টন গাদ এবং ৬ টন গ্যাসও উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ইস্পাত উৎপাদনের বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট ইস্পাত উৎপাদনের জন্য পিষ্ট লৌহের সহিত অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মাটির পাত্রে গালান হয়। ইহাকে পাত্রে গালাই করার পদ্ধতি (crucible process) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ইস্পাতের উৎপাদন ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। বেসেমার পদ্ধতিতে (Bessemer process) লৌহ পিণ্ড যে পাত্রে গালান হয় তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া শীতলবায়ু প্রবলবেগে সঞ্চালিত করা হয় এবং বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে লৌহ পিণ্ডের অঙ্গারকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরে উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গার ও ম্যাঙ্গানীজ যোগ করিয়া ইস্পাতের উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ইস্পাত অতি সুলভ হয় তবে ইস্পাতের উৎপাদন সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নহে বলিয়া উৎপাদিত ইস্পাত বিশেষ উচ্চশ্রেণীর হয় না। ওপেন হার্থ পদ্ধতি (open hearth process) বা মুখ খোলা চুল্লীতে লৌহ গালাইবার পদ্ধতি অনুসারে গলিত লৌহের মধ্য দিয়া শীতল বায়ু সঞ্চালন করার পরিবর্তে উপরিভাগে বাতাসের সংস্পর্শ বজায় রাখিবার জন্য পাত্রের মুখ খুলিয়া রাখা হয়। তবে বেসেমার পদ্ধতি অপেক্ষা ইহার উৎপাদন ব্যয় অধিক। লৌহের সহিত অতিরিক্ত ফসফরাস মিশ্রিত থাকিলে বেসেমার পদ্ধতির রকমফের করিয়া চুনের সাহায্যে লৌহ গলাইয়া উহা হইতে ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। ইহাকে টমাস গিলক্রিস্ট পদ্ধতি (Thomas Gilchrist process) বলা হইয়া থাকে। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈদ্যুতিক চুল্লীর (electric furnace) সাহায্যে ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎপাদিত ইস্পাত অতিশয় সুলভ হইয়া থাকে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ একযোগে পৃথিবীর মোট ঢালাই লৌহ (Pig Iron) ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় ৭০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। নিম্নের সংখ্যামান হইতে পৃথিবীর ইস্পাত শিল্পের বর্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে:— ১৯৪৯-৫১ সালের গড (ইস্পাত) উৎপাদন ছিল ১৮৭,৬৪,০০০ টন। উহার ৪৫% উৎপাদন করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র, ১৬% সোভিয়েট রাষ্ট্র, ৯% যুক্তরাজ্য, ৬% পঃ জার্মানী, ৫% ফ্রান্স, ৩% জাপান, ২% ক্যানাডা ও ১৪% অন্যান্য দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এতাদৃশ

উন্নতির কারণ—(১) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিকের প্রাচুর্য, উহাদের পাশাপাশি অবস্থান ও পরিবহনের সুবিধা, (২) দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, (৩) লৌহজাত দ্রব্যের প্রচুর স্থানীয় চাহিদা, (৪) জলবিদ্যুৎশক্তির প্রাচুর্য, (৫) পর্যাপ্ত মূলধনের সরবরাহ, (৬) দৈহিক শ্রমের অনুকূল জলবায়ু ও (৭) স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন (Regional distribution and localisation)—যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা মূলতঃ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে। তবে ঐ অঞ্চল ব্যতীতও দক্ষিণ আপালাচিয়ান এবং পশ্চিমাঞ্চলেও এই শিল্পের সামান্য প্রসার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। **উত্তর-পূর্বাঞ্চল** বলিতে উত্তরে মেইন এবং মেরীল্যাণ্ড প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মিসিসিপি নদী এবং দক্ষিণে ওহিও ও পটোম্যাক নদীর উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের তিনটি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **হ্রদ অঞ্চল**—সুপিরিয়র হ্রদ সন্নিহিত ডুলুথ, মিচিগান হ্রদ সন্নিহিত ক্যালুমেট, ইরি হ্রদ সন্নিহিত ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড ও বাফেলো প্রভৃতি বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। হ্রদ অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলি আপালাচিয়ান কয়লাখনি অঞ্চল হইতে কয়লা ও মেসাবী, ভারমিলিয়ন, গোগেবিক, কুইনা এবং মার্কেট লৌহখনি অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক ব্যবহার করে। এই অতি বিস্তৃত হ্রদ অঞ্চলটির মধ্যে শিকাগো, ইণ্ডিয়ানা পোতাশ্রয়, গ্যারী ও জোলিয়েট লইয়া গঠিত অঞ্চলটিতেই সমগ্র হ্রদ অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাতের ৫০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ১৬% উৎপাদিত হইয়া থাকে। একদেশীভবনের ক্ষেত্রে টোলেডো হইতে ইরি পর্যন্ত প্রসারিত নিম্ন হ্রদ অঞ্চলের অন্তর্গত ইস্পাতের কারখানাগুলির বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে, কারণ এই অঞ্চলটিতেই কয়লা, কোক ও আকরিক লৌহের একত্র সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। হ্রদ অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহ সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। (২) **উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চল**—পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়া হইতে পূর্ব ওহিও পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। পিটস্‌বার্গ এই অঞ্চলের মধ্যমণি। এ স্থানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের কারণ—(ক) উত্তর আপালাচিয়ান কয়লাখনিসমূহ হইতে পর্যাপ্ত কোক কয়লার এবং সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চল হইতে হ্রদ ও রেলপথে অল্পব্যয়ে লৌহ আকরিকের সরবরাহ, (খ) লৌহজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, (গ) রেল ও জলপথে যানবাহনের সুবিধা, এবং (ঘ) ওহিও নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা হইতে প্রচুর জলের সরবরাহ। ইয়ংস্টাউনেও প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হয়। (৩) **মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের

আটলান্টিক উপকূল সন্নিহিত মধ্যবর্তী রাষ্ট্রসমূহ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তবে পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া ও মেরীল্যাণ্ড সন্নিহিত স্থানসমূহই এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যমণি। নিউইয়র্ক, বাফেলো, জনস্টাউন, ভার্জিনিয়া, ফিলাডেলফিয়া, বাল্‌টিমোর প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাতকেন্দ্র। চিলি, কিউবা প্রভৃতি দেশ হইতে আকরিক লৌহ আমদানীর সুবিধা, উপকূলাঞ্চলে অবস্থান-হেতু উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানীর সুবিধা, সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, পর্যাপ্ত জল ও শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে মধ্য আটলান্টিক অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। তবে সংযোজন ব্যয় অধিক হওয়ায় এতদঞ্চলে উৎপাদিত ইস্পাত দ্রব্যের মূল্যও অধিক। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া যায়।

দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল—এই অঞ্চলের অন্তর্গত আলাবামা রাজ্যের বার্মিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। কয়লা, লৌহ আকরিক, এবং চুনাপাথর ও ডোলোমাইট-এর পাশাপাশি অবস্থান, যানবাহনের সুব্যবস্থা, সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। এতদঞ্চলে কাঁচামালের সংযোজন ব্যয় অল্প হইলেও স্থানীয় লৌহ আকরিক ফসফরাস সমৃদ্ধ হওয়ায় ব্যয়বহুল 'ডুপ্লে' প্রথা (Dupleix process) ব্যতীত লৌহ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না, ফলে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত ঢালাই লৌহ উত্তরাঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া যায়।

পশ্চিমাঞ্চল—যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত ডেনভার, পুয়েব্লো, স্যানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেল্‌স্ এবং পাগেট সাউণ্ডে সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ স্থানীয় আকরিক ও কয়লার সাহায্যেই উৎপাদন কার্য চালাইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা মিটাইবারই প্রয়াস পায়। আকরিক, মূলধন ও শ্রমিকের স্বল্পতাই এতদঞ্চলে এই শিল্পটির প্রসারের অন্তরায় স্বরূপ।

বর্তমান অবস্থা (Present position)—উৎপাদনবৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ওয়ারসেস্টার, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি বয়নকেন্দ্রসমূহে বয়ন যন্ত্রপাতি; নিউ ইয়র্ক, পিট্‌স্‌বার্গ এবং হার্টফোর্ডে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি; শিকাগো ও মিলওয়াকীতে কৃষি-যন্ত্রপাতি, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, পিটস্‌বার্গ ও সেণ্ট লুই অঞ্চলে রেলগাড়ী; মিচিগান (ডেট্রয়েট), ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, উইস্‌কনসিন এবং ইলিনয় অঞ্চলে মোটর গাড়ী এবং বাল্‌টিমোর, ওহিও, পেনসিল্‌ভ্যানিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ভার্জিনিয়া, ওকল্যাণ্ড, সীটল প্রভৃতি অঞ্চলে জাহাজ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে লৌহজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

ইউরোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বহু দেশেই লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদিত হইলেও কেবলমাত্র দুইটি অঞ্চলেই ইহার উৎপাদন সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একটি হইল গ্রেট ব্রিটেন এবং অপরটি হইল ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের মধ্য দিয়া পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অববাহিকা পযন্ত প্রসারিত ত্রিভুজাকৃতি শিল্পবলয়টি।

গ্রেট ব্রিটেন—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন (Regional distribution and localisation)—গ্রেট ব্রিটেনের অনেক কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটেই লৌহ আঁকরিক থাকাতে ঐ সমস্ত অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে এই শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **স্কটল্যাণ্ড অঞ্চল**—সমুদ্রসান্নিধ্য এবং লৌহ আকরিক ও কয়লার পাশাপাশি অবস্থানহেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। গ্লাসগো ও কোটব্রীজ অঞ্চলে ঢালাই লৌহ এবং মাদারওয়েল, উইসেণ্ড, গ্লাসগো ও কোটব্রীজ অঞ্চলে ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। (২) **টী-নদীর মোহানা অঞ্চল**—ক্লীভল্যাণ্ড পর্বতাঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপাদন, দক্ষিণ-পশ্চিম ডারহাম অঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর কয়লা ও উইয়ারডেল অঞ্চল হইতে চুনাপাথরের সরবরাহ, সমুদ্রসান্নিধ্যে অবস্থানহেতু আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কনসেট ও পশ্চিম হার্টলপুল এই অঞ্চলের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। (৩) **পশ্চিম উপকূলাঞ্চল**—প্রচুর হেমাটাইট লৌহ আকরিক ও পযাপ্ত চুনাপাথরের সরবরাহ, ডারহাম কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবর্তিতা, সমুদ্রসান্নিধ্যহেতু আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি অবস্থা এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একদেশীভবনের সহায়তা করে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত অধিকাংশ ঢালাই লৌহ শেফিল্ড, বেলফাস্ট, দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌, স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। (৪) **দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌ অঞ্চল**—লান্‌লে, সোয়ানসী, ব্রিটনফেরী, পোর্ট ট্যালবট, কার্ডিফ প্রভৃতি দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌-এর প্রধান প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। যানবাহনের অধিকতর সুযোগ ও রাং ঢালাই শিল্পের সুবিধার জন্য দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌-এর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পূর্ব উপকূল অপেক্ষা পশ্চিম উপকূলেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। (৫) **লিনকনশায়ার অঞ্চল**—ফ্রডিংহাম এবং স্কানথ্রোপ

অঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপাদন, ইয়র্কশায়ার কয়লা খনি অঞ্চলের নৈকট্য, আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। (৬) **অন্যান্য অঞ্চল**—গ্রেট ব্রিটেনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বহু স্থানেও লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়র্কশায়ার এবং ডার্বিশায়ার অঞ্চলে কাঁচা লোহা, দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার এবং উত্তর ওয়েল্‌স্ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, নর্দাম্পটনশায়ার ও লিস্টারশায়ার অঞ্চলে কাঁচা লোহা এবং শেফিল্ড অঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

বর্তমান অবস্থা (Present position)—গ্রেট ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে পরিমাণ লৌহ ও আকরিক ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ৭৫ ভাগই বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদিত হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে। মধ্যাঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহ বর্তমানে ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বার্মিংহাম—নল, পিন, ছিপ এবং মোটর গাড়ী নির্মাণে, শেফিল্ড—ছুরি, কাঁচি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে, বোল্টন, ওল্ডহাম এবং কেইলি—মাকু এবং বয়নযন্ত্র নির্মাণে, ক্রস্‌টলে, ডনকাস্টার, ডার্বি, অসওয়েস্ট্রী এবং গ্লাসগো—রেলগাড়ী নির্মাণ ও মেরামতী কাযে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ হইতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, যথা—কোকের মূল্যবৃদ্ধি, আকরিকের উৎপাদন হ্রাস, পুরাতন পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি কারণে ব্রিটেনে এই শিল্পের অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তথাপি ইহা সত্য যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্রিটেন অদ্যাপি পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে।

মহাদেশীয় ইউরোপ (Continental Europe)—উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও জার্মানীর রুঢ় অববাহিকা লইয়া গঠিত ত্রিভুজাকৃতি শিল্পবলয়টি গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চলটির কয়েকটি স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ লোরেনের সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রটি এই শিল্পবলয়টির মধ্যভাগে অবস্থিত। অবশ্য এই সমগ্র শিল্পবলয়টি বিদেশ হইতে উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক আমদানীও করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পবলয়টির অন্তর্গত প্রতিটি ইস্পাত কেন্দ্র এক বা একাধিক কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আবার সমুদ্রোপকূলের নিকটে অবস্থিত ইস্পাত কেন্দ্রসমূহের পক্ষে বিদেশ হইতে কয়লা ও কোক আমদানীর সুবিধাও

রহিয়াছে প্রচুর। তৃতীয়তঃ, এতদঞ্চলের ইস্পাত-কেন্দ্র-সমূহ আন্তর্দেশীয় জলপথ ও রেলপথে একদিকে কয়লা ও লৌহ ক্ষেত্রসমূহের সহিত এবং অন্য দিকে সামুদ্রিক বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, এই ত্রিভুজাকৃতি শিল্পাঞ্চলটি ইউরোপীয় প্রধান শিল্প বলয়টির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এতদঞ্চলে উৎপাদিত ইস্পাত দ্রব্যের চাহিদাও ব্যাপক।
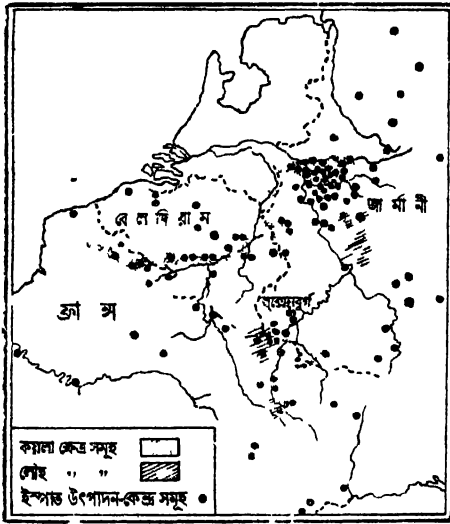
৭৭নং চিত্র—মহাদেশীয় ইউরোপের ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ

জার্মানীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রধানতঃ রুঢ় অববাহিকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এসেন হইল এই অঞ্চলের মধ্যমণি। **ফ্রান্সের** অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ কয়লা ও আকরিক ক্ষেত্রের নিকটেই অবস্থিত। লোরেনের নান্সি, নর্মাণ্ডির কায়েন, মধ্যবর্তী অধিত্যকার স্যাঁতেতিএঁ এবং উত্তর-পূর্বের কয়লাখনি সন্নিহিত ভ্যালেন্সিএঁ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লারমফেরঁ ও প্যারী অঞ্চলে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বেলজিয়ামের** লৌহ আকরিক ও কয়লার সংস্থান অতি সামান্য। লীজ এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইস্পাত কেন্দ্র। কয়লা ও লৌহ আকরিকের সান্নিধ্যহেতু **লুক্সেমবুর্গে** ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

পর্যাপ্ত কয়লা সম্পদের অবস্থিতি ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য **সাইলেশিয়ায়** লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই অঞ্চলটির অধিকাংশই পোল্যাণ্ডের এবং সামান্য অংশ চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত।

যুক্তরাজ্য ও জার্মানী হইতে আমদানীকৃত কয়লা ও কোকের সাহায্যে স্থানীয় (এলবা দ্বীপ) লৌহ আকরিককে কাজে লাগাইবার জন্য সম্প্রতি **ইতালিতে** কয়েকটি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

উচ্চশ্রেণীর আকরিক, কাঠকয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, যুক্তরাজ্য হইতে কয়লা আমদানীর সুবিধা, রেল ও জলপথে সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগহেতু অধুনা **সুইডেন** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুইডেনের অধিকাংশ ইস্পাত-

শিল্পকেন্দ্র মধ্যভাগের হ্রদসন্নিহিত অঞ্চলসমূহেই সীমাবদ্ধ। দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ সামান্য হইলেও উৎপাদিত ইস্পাত অতি উচ্চ শ্রেণীর।

রুশিয়া—রুশিয়া বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন কয়লা-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশাভ্যন্তরে বহুস্থানে ইস্পাত উৎপাদিত হইলেও দক্ষিণ ইউক্রেন, দক্ষিণ ইউরাল, মস্কো-টুলা এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক অঞ্চলেই ইস্পাতের উৎপাদন অধিক। দক্ষিণ ইউক্রেনের অন্তর্গত ক্রিভয়রগ, জেরঝিন্স্ক (Dezerzhinsk), নিপ্রোপ্রেটোভস্ক, গরলোভ্কা, ঝানভ্ (Zhdanov) বা ম্যারিউপোল, স্ট্যালিনো, মাকিয়েভকা, ইয়েনাকিয়েভো, ভরোশিলোভস্ক ও ভরোশিলোভগ্রাদ; মস্কো-টুলা অঞ্চলের অন্তর্গত টুলা, লিপেৎস্ক, ভরোনেঝ ও গর্কি, ইউরাল অঞ্চলের অন্তর্গত ম্যাগনিটোগর্স্ক, চেলিয়াবিন্স্ক ও স্বার্দলোভস্ক এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলের অন্তর্গত নোভোসাইবিরিস্ক, বানাউল, স্ট্যালিনিস্ক, প্রোপোপভ্স্ক, কেমেরোভো ও টোমস্ক উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ। লেনিনগ্রাদ, টাসখেণ্ট ও কমসোমলস্ক অঞ্চলেও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে।

এশিয়ার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে দক্ষিণ-পূব এশিয়ার অন্তর্গত জাপান, মাঞ্চুরিয়া, চীন এবং ভারতই উল্লেখযোগ্য।

উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক ও কয়লার অভাব সত্ত্বেও ফিলিপিন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, মালয়, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত লৌহ আকরিক, লৌহ পিণ্ড ও কোক এবং দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত জল-বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর কিউসিউ, টোকিও-ইয়োকোহামা এবং কোবে-ওসাকা শিল্পাঞ্চলেই **জাপানের** লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশের ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপকূলাঞ্চলেই একদেশীভূত হইয়াছে। কিউসিউ দ্বীপের অন্তর্গত ইয়া-ওয়াটার বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

চীনের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ ইয়াংসী নদীর নিম্নপর্যংকে এবং সাংটাং উপদ্বীপাঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের ইস্পাত কারখানা সমূহ জামসেদপুর, আসানসোল, ভদ্রাবতী, ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুর অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে।

কোরিয়া (হেইজো) এবং মাঞ্চুরিয়া (আনসান) অঞ্চলেও ইস্পাত উৎপাদিত হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশসমূহ একযোগে পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট লৌহ ও ইস্পাতের মাত্র ৫% উৎপাদন করিয়া থাকে।

অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধের শ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদক দেশ। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলাঞ্চল ব্যাপিয়া উচ্চশ্রেণীর কয়লা রহিয়াছে কিন্তু দেশটি লৌহ আকরিক সম্পদে নিতান্তই দরিদ্র। আকরিক লৌহ সমুদ্রপথে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আয়রন-নব (Iron knob) এবং কুলান দ্বীপের ইয়াম্পী অঞ্চল হইতে পূর্ব উপকূলে কয়লাক্ষেত্রের সান্নিধ্যে অবস্থিত ইস্পাত কেন্দ্রসমূহে আনীত হয়। পূর্ব উপকূলের নিউক্যাসল, কেম্বলা ও লিথগো অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র আধুনিক ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি **দক্ষিণ আফ্রিকায়** অবস্থিত। কয়লা, আকরিক লৌহ ও চুনাপাথরের সান্নিধ্যহেতু প্রিটোরিয়া ও নিউক্যাসল অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে **ব্রাজিল** শীর্ষস্থান অধিকার করে। বর্তমানে ব্রাজিলের ইটাবিরা অঞ্চলে (মিনাস গেরায়েস্) সরকারী তত্ত্বাবধানে যে লৌহখনি উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ লৌহখনি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রধানতঃ কয়লার অপ্রাচুর্যহেতু অতি সামান্য লৌহই উত্তোলিত হইতেছে। উত্তোলিত লৌহের অধিকাংশই ভিক্টোরিয়া বন্দরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। সম্প্রতি রায়ো-ডি-জেনিয়োর উত্তর দিকে অবস্থিত ভোল্টা রেডোণ্ডা (Volta Redonda) অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মিনাস গেরায়েস (Minas Geraes), সাওপাউলো এবং করাম্বা অঞ্চলেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে। ভোল্টা রেডোণ্ডা অঞ্চলের খনিটি মিনাস গেরায়েস অঞ্চলের লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও লৌহ সংকরধাতব খনিজ এবং ৫০০ মাইল দূরবর্তী সাণ্টা ক্যাথারিনার পূর্বাংশের কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে।

মধ্য চিলির দক্ষিণাংশে উপকূল সন্নিহিত হুয়াচিপাটো (Huachipato) অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে। উত্তর চিলির লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানীজ, মধ্য চিলির কয়লা, এবং দক্ষিণাঞ্চলের একটি দ্বীপ হইতে আনীত চুনাপাথর এই শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত ইস্পাত স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আকরিক লৌহের প্রাচুর্য এবং কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি দ্রব্যের লৌহক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থান ভারতীয় লৌহ শিল্পের উন্নতির সহায়ক।* ১৯৫০-৫১ সালে এই শিল্পের অন্তর্গত তিনটি প্রতিষ্ঠানে ৬১ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৬০,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ঐ সালে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১০·১৫ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৩·৫ লক্ষ টন ঢালাই লৌহ (ফাউণ্ড্রীর জন্য) ও ৯·৭৬ লক্ষ টন ইস্পাত।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—১৮৭৫ সালে আসানসোলের নিকটবর্তী কুলটি অঞ্চলে ভারতে সর্বপ্রথম ঢালাই লোহার উৎপাদন আরম্ভ হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে।

(১) **জামসেদপুর অঞ্চল**—এই অঞ্চলে ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার "টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ"-এর কারখানা অবস্থিত। এই কারখানা ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ সাল হইতে লৌহ উৎপাদন আরম্ভ করে। নিম্নলিখিত অনুকূল কারণে জামসেদপুর অঞ্চলে এই শিল্প একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে—(ক) জামসেদপুর হইতে মাত্র ৪৫ মাইল দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষানী অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিকের প্রচুর সরবরাহ; (খ) ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র জামসেদপুর হইতে মাত্র ১১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত; (গ) জামসেদপুর হইতে মাত্র ১১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙ্গপুর হইতে ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট-এর পর্যাপ্ত সরবরাহ; (ঘ) কলিকাতা বন্দর জামসেদপুর হইতে মাত্র ১৫৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত; (ঙ) এই সমুদয় অঞ্চলই দঃ পূর্ব রেলপথ এবং উহার শাখাপথের দ্বারা জামসেদপুর ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত; (চ) রেল কোম্পানীও অপেক্ষাকৃত সুলভ ভাড়ায় টাটা কোম্পানীর মাল আমদানী-রপ্তানী করে; (ছ) জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগারসমূহে মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের

* ১ টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে ০·৯ টন লৌহ আকর, ০·৫৭৫ টন কোক, ০·৩৬৫ টন ষ্টীম, কয়লা, ০·৬৫১ টন চুনাপাথর, ১ টন ডলোমাইট, ০·১৫ টন ম্যাঙ্গানীজ, ও ০·০৩ টন তাপসহ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সরবরাহ হয়; (জ) সুবর্ণরেখা নদী এই শিল্পাগারসমূহে প্রচুর জল সরবরাহ করে। গ্রীষ্মকালে এই নদী শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া বাঁধ দিয়া নদীর জল ধরিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; তখন টাটা কোম্পানী সাধারণের ব্যবহার্য ও যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ইস্পাত অতি দক্ষতার সহিত উৎপাদন করে। এই কারখানায় উৎপাদিত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ইস্পাতের মধ্যে "টিস্‌ক্রম্ ইস্পাত", "টিস্‌কোর ইস্পাত", "গুলিরোধক সামরিক ইস্পাত" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারখানাটির সম্প্রসারণ-কল্পে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ইহাকে ১০ কোটি টাকা ঋণ দান করেন।

(২) **বার্নপুর অঞ্চল**—১৯৩৬ সালে বার্নপুরের "ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ" এবং হীরাপুরের "বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং" একত্রিত হইয়া "ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল" নাম ধারণ করে, এবং ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী "ট্যারিফ বোর্ডের" সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নির্দেশে "ষ্টীল কর্পোরেশন" ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহিত একত্রিত হয় এবং এই একত্রীভূত প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং। এই একত্রীভবনের ফলে ঐ কোম্পানীর ইস্পাত উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। উড়িষ্যার খনিসমূহ হইতে লৌহ আকর; রাণীগঞ্জের কয়লা; মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানীজ; পর্যাপ্ত জল; প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধনের প্রচুর সরবরাহ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত রেলপথে এই কারখানাটির যোগাযোগহেতু এই অঞ্চলে ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। এই নবগঠিত কোম্পানীটি উৎপাদন সম্প্রসারণকল্পে ভারত সরকারের নিকট হইতে ৫ কোটি টাকা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ৩'১৫ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

(৩) **মহীশূর অঞ্চল**—এই অঞ্চলে ভদ্রাবতী আয়রন ওয়ার্কস্ নামক লৌহ শিল্পাগার অবস্থিত। ২৮ মাইল দক্ষিণে বাবাবুদান পর্বতাঞ্চলের কেমাঙ্গুণ্ডি খনি হইতে লৌহ আকরিক, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশ হইতে ম্যাঙ্গানীজ এবং ১৪ মাইল পূর্বে ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে চুনাপাথর ভদ্রাবতীর শিল্পাগারে নীত হয়। ঐ অঞ্চলে প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ রহিয়াছে। তবে এই অঞ্চলে কয়লার অভাবহেতু সিমোগা ও কাডুর বনাঞ্চলের কাষ্ঠই পূর্বে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে যোগ জলপ্রপাত হইতে উৎপাদিত জল-বিদ্যুতের দ্বারা এই কারখানার কার্য পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি মহীশূর কারখানায় দুইটি নূতন বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠান লৌহ উৎপাদন আরম্ভ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানাটি সম্প্রসারণকল্পে ৬ কোটি টাকা ব্যয় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

দেশাভ্যন্তরে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ভারত সরকার সম্প্রতি তিনটি নূতন ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের প্রত্যেকটি বার্ষিক ১০ লক্ষ টন ইস্পাত এবং যে কোন একটি ৩·৫ লক্ষ টন
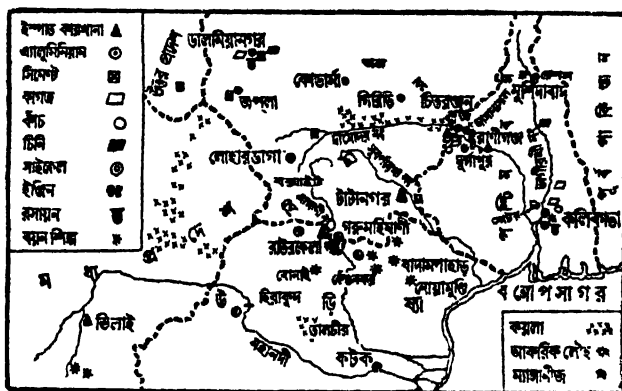
৭৮ নং চিত্র— ভারতের উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল

ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, আঞ্চলিক স্বয়ংপূর্ণতা ও পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিয়া উড়িষ্যার রাউরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুর অঞ্চলে এই তিনটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

রাউরকেলা—উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় ব্রাহ্মণী নদীর বামতীরে কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল পশ্চিমে দঃ পূঃ রেলপথের কলিকাতা-নাগপুর শাখাপথের উপর অবস্থিত রাউরকেলায় একটি ইস্পাতের কারখানা ভারত সরকার ক্রুপ-ডেমাগ নামক পশ্চিম জার্মানীর একটি ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক ও আর্থিক সহযোগিতায় নির্মাণ করাইয়াছেন। এস্থানে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। যেরূপ—(১) উড়িষ্যার বোনাই, কেওনঝড়, নোয়ামুণ্ডি, গুয়া প্রভৃতি লৌহখনিসমূহ ইহার অতি নিকটেই অবস্থিত; (২) উড়িষ্যার ইব, রামপুর, হিমগির, তালচের প্রভৃতি খনি হইতে প্রচুর স্টীম কয়লা পাওয়া যাইবে। কোক কয়লা আসিবে এখান হইতে ১৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঝরিয়ার খনি হইতে; অবশ্য ইহার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না, কারণ যে মালগাড়ীগুলি রাউরকেলা অঞ্চল হইতে জামসেদপুরে চুনাপাথর লইয়া যাইবে উহারা আসিবার পথে খালি না আসিয়া ঝরিয়া খনি হইতে কয়লা লইয়া আসিবে; (৩) এস্থান হইত মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত গাঙ্গপুরের বীরমিত্রপুর হইতে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়াও লানজিবর্ণা, গতিতনগর, পুর্ণপানি, বেলডিহি, ধবলকুণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যাইবে ; (৪) ডলোমাইট পাওয়া যাইবে রাউরকেলার অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর রাজ্যের পানপোষ ও আমঘাট এবং সম্বলপুর রাজ্যের সুলাই অঞ্চল হইতে ; (৫) এ স্থানের অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর, কেওনঝাড়, বোনাই, পাটনা ও কালাহাণ্ডির খনিসমূহ হইতে আসিবে ম্যাঙ্গানীজ ; (৬) ফায়ার ক্লে পাওয়া যাইবে রামপুর কয়লার খনি ও গাঙ্গপুর হইতে ; (৭) উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কোয়ার্টজ, ক্রোমিয়াম, ভ্যানেডিয়াম, গ্র্যাফাইট প্রভৃতিরও এ অঞ্চলে অসদ্ভাব নাই ; (৮) কাঁচামালসমূহের নিকটবর্তী অবস্থানহেতু ইহাদের সংযোজন ব্যয়ও হইবে অল্প ; (৯) ব্রাহ্মণী নদী হইতে প্রচুর জল ও হীরাকুঁদ হইতে বিদ্যুতের সরবরাহ আসিবে ; (১০) এস্থান রেলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে এবং (১১) পর্যাপ্ত সমতলভূমি, প্রচুর শ্রমিক ও গৃহ নির্মাণ দ্রব্যাদির সরবরাহও এস্থানে রহিয়াছে। ১৯৬১ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৭'২ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানাটির ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াইবে ১৮ লক্ষ টন।

ভিলাই—মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার অন্তর্গত ভিলাই কলিকাতা হইতে ৫৩০ মাইল দঃ পশ্চিমে দঃ পুঃ রেলপথের কলিকাতা-নাগপুর শাখাপথের উপর অবস্থিত। ভারত সরকার কর্তৃক রুশ সরকারের যান্ত্রিক ও আথিক সহযোগিতায় এ স্থানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রহিয়াছে—(১) ভিলাইয়ের দক্ষিণে ৫০ মাইলের মধ্যে প্রচুর লৌহ আকর রহিয়াছে। ইহাব মধ্যে ভিলাইয়ের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ঢালি-রাজহারা অঞ্চলের লৌহ আকর খুব উচ্চশ্রেণীর ; (২) ভিলাইয়ের উত্তরে অবস্থিত বিলাসপুরের করবাতে প্রচুর মধ্যম শ্রেণীর কয়লা রহিয়াছে, উচ্চশ্রেণীর কয়লা ভিলাই হইতে পশ্চিমে ১৬০ মাইলের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় ; (৩) ছত্রিশগড এলাকায় প্রয়োজনীয় চুনাপাথর এবং বিলাসপুরে প্রচুর ডলোমাইট পাওয়া যাইবে ; (৪) ম্যাঙ্গানীজ সম্পদে মধ্যপ্রদেশ ভারতে শীর্ষস্থানীয়, অতএব ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ইহার অভাব কোনদিনই হইবে না ; (৫) বর্তমানে ভিলাই হইতে ২০-২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত টুণ্ডলা জলাধার হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; (৬) এস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ; (৭) এ অঞ্চলে কর্মঠ শ্রমিকের প্রাচুর্যও রহিয়াছে। ১৯৬১ সাল নাগাদ ইহা ৭'৭ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়। তবে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ইহার ইস্পাতপিণ্ড (steel ingot) ও লৌহদণ্ড (pig iron) উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ টন।

দুর্গাপুর—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুর কলিকাতা হইতে ৯৮ মাইল পশ্চিমে পূর্ব-রেলপথের উপর অবস্থিত। এ অঞ্চলে কয়েকটি ব্রিটিশ ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও যান্ত্রিক সহযোগিতায় ভারত সরকার একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করাইয়াছেন। ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পক্ষে দুর্গাপুরের সুবিধা হইল :—(১) রাণীগঞ্জ কয়লা খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লা এবং দুর্গাপুরের "কোক ওভেন" কারখানা হইতে প্রচুর কোকের সরবরাহ ; (২) সিংভূমের বিভিন্ন খনি অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত লৌহ আকরের সরবরাহ ; (৩) উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ হইতে চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইটের পর্যাপ্ত সরবরাহ ; (৪) দুর্গাপুর জলাধার ও ডি. ভি. সি. হইতে প্রচুর জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ এবং (৫) রেল ও খালপথে কলিকাতার সহিত দুর্গাপুরের যোগাযোগ। রেলপথে এ স্থান ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৬১ সাল নাগাদ ইহা ৭'৯ লক্ষ টন ইস্পাত ও তজ্জাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়। তবে, তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ইহার ইস্পাত পিণ্ড ও লৌহদণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ও ৩ লক্ষ টন।

বর্তমান অবস্থা—মাদ্রাজ অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার স্থাপনের বহু সুবিধা রহিয়াছে। মাদ্রাজের সালেম ও ত্রিচিনপল্লী অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যায়। তবে কয়লার যে অভাব রহিয়াছে তাহা কাঠকয়লার সাহায্যে বা জল-বিদ্যুতের দ্বারা বহুলাংশে মিটান যাইতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে মাদ্রাজের নিভেলিতে একটি নূতন লৌহদণ্ড উৎপাদনের কারখানা এবং বিহার রাজ্যের বোকারোতে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড ও ৩'৫ লক্ষ টন লৌহ দণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত আর একটি নূতন কারখানার স্থাপন করা হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যাপক উন্নতি দেখা দিয়াছে। এই সময় হইতেই লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানাপ্রকার লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনেও ভারত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখানকার ইস্পাত অন্যান্য দেশের তুলনায় সুলভ। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতে প্রতিবৎসর গড়ে ৭৩ লক্ষ টন ইস্পাত ও ১৫ লক্ষ টন লৌহদণ্ডের চাহিদা দাঁড়াইবে। ১৯৬১ সাল নাগাদ ভারতের সমস্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা-গুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৭'৬ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬'৬-৮'৭ লক্ষ টন লৌহদণ্ড। ভারতকে এখনও প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের একটি বিশিষ্ট অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৫১ সালে আমদানীকৃত ইস্পাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১'৭৮ লক্ষ টন। এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—(১) মূলধনের অপ্রাচুর্য ; (২) শ্রমিক সংখ্যার

আধিক্য হেতু উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য ; (৩) ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত কয়লার অপ্রাচুর্য, এবং (৪) নিম্ন শ্রেণীর লৌহ ও কোক কয়লা সরবরাহের অপ্রাচুর্য ও অনিশ্চয়তা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঢালাই লৌহের উৎপাদন।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অধিকতর প্রসারণকল্পে বর্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ যে স্ব স্ব সম্প্রসারণ-নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহা ব্যতীতও **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যধারার নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) টাটা ও ইণ্ডিয়ান আয়রন এই প্রতিষ্ঠান দুইটিকে তাহাদের সম্প্রসারণের সুবিধার জন্য সরকারী অর্থানুকূল্য দান ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ইহাদের পরিচালনা ; (২) পরিবহন ব্যবস্থার সম্যক প্রসারণ ; (৩) সরকারী পরিচালনায় বোকারোতে একটি নূতন ইস্পাত ও নিভেলিতে একটি লৌহদণ্ড প্রস্তুতির কারখানা স্থাপন এবং ভিলাই, দুর্গাপুর, রাউরকেলা ও মহীশূরের ইস্পাত কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ ; (৪) এই শিল্পে ব্যবহৃত তাপসহ দ্রব্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধিকরণ, এবং (৫) উৎপাদন ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য কেবলমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্যেই ইস্পাতের ব্যবহার প্রবর্তন।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন ১৯৫০-৫১—১৯৬৫-৬৬

	একক	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
		উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	অনুমিত উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
ইস্পাত পিণ্ড (Steel ingots)	মিঃ টন	১·৪	১·৭	৬·০	৩·৫	১০·২	৯ ২
ইস্পাত (Finished Steel)	,,	০·৯৮	১·৩	৪·৫	২·২	৭·৫	৬
লৌহ দণ্ড (Pig iron)	,,	০·৩৫	০·৩৮	০·৯	০·৯	১·৫	১
সংকর ইস্পাত (Alloy Steel)	০০০ টন	...	...	৪০	৪০	২০০	২০০
ঢালাই ইস্পাত (Steel Castings)	মিঃ টন	...	...	০·১০	০·০৫	০·২০	০·২০
পেটা ইস্পাত (Steel Forging)	০০০ টন	...	...	৬০	৩৫	২০০	২০০

ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

জাহাজ নির্মাণশিল্প (Shipbuilding industry)—ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ—(১) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথের উপরই নির্ভরশীল। জলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত ভারতে ২০ লক্ষ GRT পরিমিত পণ্যবাহী নৌবহরের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৮০,০০০ GRT। (২) বর্তমানে সমুদ্রপথে নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৪০% ও দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৩) রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার দিক হইতেও উন্নততর ও শক্তিশালী নৌবহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (৪) ভারতে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাঁচামাল—যথা, লৌহ, কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও কাষ্ঠ এবং কারখানার কার্য করিবার নিমিত্ত সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে। এই সমস্ত কাঁচামাল ও শ্রমিক প্রয়োজনমত কার্যে নিয়োগ করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশসমূহের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে সেই অঞ্চলে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি থাকা প্রয়োজন—(১) গভীর জলযুক্ত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ; (২) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ; (৩) লৌহ ও ইস্পাত, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতি কাঁচা মালের সান্নিধ্য ও সহজলভ্যতা ; এবং (৪) সুলভ শ্রমশক্তির প্রাচুর্য।

শিল্পাঞ্চল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে "সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী" **বিশাখাপত্তনমে** ১০,০০০ টন পরিমিত পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করেন। একসঙ্গে অধিক সংখ্যক জাহাজ নির্মাণের জন্য বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ প্রাঙ্গণকে অধিকতর প্রসারিত করার প্রস্তাব চলিতেছে এবং অংশতঃ কার্যকরীও হইয়াছে। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ প্রাঙ্গণ স্থাপনের উপযোগী কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে—(১) বিশাখাপত্তনম বন্দরের পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও গভীর। (২) এই অঞ্চল জনবহুল না হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সস্তায় পাওয়া যায়। (৩) জামসেদপুর ও বরাকরের লৌহ কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত দঃ-পূর্ব রেলপথে অল্প ব্যয়ে এই অঞ্চলে আনয়ন করার সুবিধা রহিয়াছে। (৪) জাহাজের ডেক, কেবিন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৫) বিহার ও উড়িষ্যার গণ্ডোয়ানা কয়লা-বলয় হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা সংগ্রহ করিবার সুযোগও এ অঞ্চলে রহিয়াছে। (৬) ভারতের প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রসমূহের সহিত বিশাখাপত্তনম রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

(৭) মাদ্রাজ ও কলিকাতার শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহও বিশাখাপত্তনম হইতে দূরে নহে। (৮) নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে প্রচুর সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। (৯) বিশাখাপত্তনম-রায়পুর রেলপথে মধ্যপ্রদেশ হইতে শ্রমিক ও কাষ্ঠ সহজে আনয়ন করা যায়। এই সমস্ত কারণে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প অবস্থিতি লাভ করিয়াছে। ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ হইতে "সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং" ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত "হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ" নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫২ সালেই বিশাখাপত্তনমের এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে একটি **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** (১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৬-৫৭) গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে :—(১) ১৯৫৪-৫৬ সালের মধ্যেই এস্থানে জাহাজ নির্মাণের উন্নতিকল্পে ১১·৭৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, (২) আগামী কয়েক বৎসর এই শিল্পটিকে সরকারী অর্থানুকূল্য দিবার প্রস্তাব করা হয়, (৩) জাহাজ ক্রয়েচ্ছু প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রয়কালীন মোট মূল্যের ⅙ অংশ এবং অবশিষ্টাংশ ৫ হইতে ১০ বৎসরের সুবিধাজনক কিস্তিতে দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কেবলমাত্র ইস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন এবং ভারতীয় সামরিক বিভাগকে জাহাজের পূর্ণ মূল্যই ক্রয়কালে দিতে হইবে ; এবং (৪) সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ কারিগরী সাহায্য লাভের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ফরাসী জাহাজ নির্মাণ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়।

কলিকাতা বন্দর-অঞ্চলেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের বহু সুযোগ-সুবিধা আছে। কারণ এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, শ্রমিক ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের অতি নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংগঠনের পক্ষে কলিকাতার প্রধান অসুবিধা এই যে—(১) হুগলী নদীতে পলল সঞ্চয়ের ফলে এই নদী ক্রমশঃই অগভীর হইয়া পড়িতেছে। এই কারণে, এই নদীপথে ১০,০০০ টন অপেক্ষা অধিকতর মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না। (২) হুগলী নদীর অববাহিকা অঞ্চল জনবহুল হওয়ায় জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এস্থানে পাওয়া কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কলিকাতা জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প সম্প্রসারণের উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। কলিকাতা বন্দরের খিদিরপুর জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র হিসাবে খুব বিখ্যাত। বন্দর হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব, জাহাজ নির্মাণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুর্য, দক্ষ কারিগর ও বাংলায় জাহাজী নাবিকের সংখ্যাধিক্য এবং রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার দিক হইতে শক্তিশালী নৌবহরের বিপুল প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে কলিকাতা অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্প্রসারণের বিশেষ অনুপ্রেরণা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। **মাদ্রাজের** পোতাশ্রয় অগভীর ও কৃত্রিম হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প

সংগঠনের উপযোগী নহে। পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের **অন্তর্গত ভাভকাল** বন্দরে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ভদ্রাবতীর লৌহাগার হইতে ইস্পাত এবং মহীশূরের যোগপ্রপাত হইতে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। লৌহ ও ইস্পাত এবং কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকায় এবং পোতাশ্রয় জনবহুল হওয়ায় **বোম্বাই** অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে বোম্বাইতে একটি জাহাজ মেরামতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নয়নের যে হিসাব পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে ১৯৫৬-৫৭ সাল নাগাদ ভারতের উপকূল ও সমুদ্রগামী জাহাজের পরিমাণ মোট ৯ লক্ষ টন হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন জাহাজ ক্রয়ের জন্য কোম্পানীগুলিকে ১৫ কোটি টাকা ঋণ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিয়াছিলেন। পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও কিছু ঋণ পাইবে বলিয়া কমিশন আশা করেন। পরিকল্পনা কমিশন আরও মনে করেন যে জাহাজ ক্রয়েচ্ছু প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপরিকল্পিত ক্রয়ধারার সহিত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপরিকল্পিত উৎপাদন ধারার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই এই শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ভারতে ৯.০৫ লক্ষ টন পরিমিত জাহাজ নির্মিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ' নামক প্রতিষ্ঠানটির সম্প্রসারণ করা হইবে এবং বিশাখাপত্তনমে একটি ড্রাইডক নির্মাণ করা হইবে। এই কার্য সম্পূর্ণ হইলে বিশাখাপত্তনমে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ DWT পরিমিত জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই পরিকল্পনাকালে কোচিনে একটি নূতন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং ডিজেল চালিত সামুদ্রিক পোত নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইবে। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতে প্রস্তুত জাহাজের মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে অনুমান ১২.৮ লক্ষ GRT।

মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প (Automobile industry)—ভারতে বর্তমানে (৩১.৩.৬১) ৩.৯৪ লক্ষ মাইল রাস্তা রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে ১.৪৪ লক্ষ মাইল রাস্তা পাকা। ভারতে রেলপথ পর্যাপ্ত নয়, আবার বহুস্থান রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত নহে। সুতরাং এই বহুদূরবিস্তৃত দেশে মোটরযানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। লোকসংখ্যা অনুপাতে এই দেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪ জনের, ক্যানাডার প্রতি ৮ জনের, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে প্রতি ১৮ জনের, এবং ভারতে প্রতি ১৯০০ জনের ১খানা করিয়া মোটর গাড়ী রহিয়াছে। ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে ৬.২৭

কোটি টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী আমদানী হয়। ভারতীয় জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—বর্তমানে বেসামরিক চাহিদার পরিমাণ বৎসরে ২৫,০০০ মোটর গাড়ীর। ইহা ব্যতীত মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ, ইস্পাত, আলৌহবর্গীয় ধাতু-দ্রব্য, লৌহ-সংকর ধাতু, রবার এবং অন্যান্য কাঁচা মালও ভারতে প্রচুর রহিয়াছে। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মনে হয় ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে বর্তমানে (১৯৫০-৫১) ১২টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে; তবে ইহারা উৎপাদন অপেক্ষা সংযোজন কার্যই অধিক করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি (হিন্দুস্থান মোটর্স লিঃ [কলিকাতা] ও প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্ লিঃ [বোম্বাই]) প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-৫১ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধন (৯·৩ কোটি টাকা) এবং শ্রমিকের (৮০০০) মধ্যে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিল ৭ কোটি টাকারও অধিক মূলধন এবং প্রায় ৩০০০ শ্রমিক। ঐ সালে ১২টি প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭১,৭০০ এবং ১৬,৫১৯টি গাড়ী।

শিল্পাঞ্চল—১৯৪১ সালে **বোম্বাই**-এর উপকণ্ঠে মাতুঙ্গায় ভারতের প্রথম মোটর গাড়ী নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার ক্রাইস্‌লার কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। পর্যাপ্ত জল ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, সমভাবাপন্ন জলবায়ু, বোম্বাই শহরের ন্যায় সমৃদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, সুলভ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ এবং বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলের মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্পের সহায়তা করে। বোম্বাই অঞ্চলে মোট ৬টি মোটর গাড়ী নির্মাণের কেন্দ্র রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে **কলিকাতার** উপকণ্ঠে কোন্নগরে বিড়লা ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী নামে একটি মোটর শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা ও লৌহক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিতি, কলিকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশ হইতে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা, সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য, উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধ বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য প্রভৃতি সুবিধা থাকায় এই কারখানা কোন্নগরে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে মোট ৩টি মোটরগাড়ী নির্মাণ কেন্দ্র রহিয়াছে। **জামসেদপুর** এবং **ব্যাঙ্গালোরে**ও এইরূপ কারখানা স্থাপনের বহুবিধ সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। মাদ্রাজের **কোয়েম্বাটোরে** ৩টি মোটর শিল্প কারখানার পত্তন হইয়াছে।

এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—(১) জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় দেশাভ্যন্তরে মোটর গাড়ীর চাহিদার স্বল্পতা; (২) এই শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ও বৈদেশিক আমদানীর স্বল্পতা; (৩) মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ

নির্মাণের উপযোগী শিল্পের অভাব ; এবং (৪) সংযোজক ও উৎপাদকের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারকল্পে **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যধারার অনুমোদন করিয়াছেন :—(১) বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং অল্পমূল্যে উৎপাদন ব্যবস্থার অবলম্বন ; (২) নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গঠন করা অপেক্ষা বর্তমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দুইটিকে অধিকতর উৎপাদন কার্যে উৎসাহিত করা ; (২) সংযোজক প্রতিষ্ঠান-সমূহকে মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে উৎসাহিত করা ; (৪) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানীর সুবিধা দান এবং সংযোজক প্রতিষ্ঠানগুলির আমদানী হ্রাস করা , (৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের দ্বারা প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৬) মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশসমূহের মান নির্ধারণ করা। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল ও তৃতীয় পরিকল্পনার ভাগ বুঝা যাইবে।

বিভিন্ন প্রকার মোটর গাড়ীর উৎপাদন, ১৯৫০-৫১—১৯৬৫-৬৬

(একক : হাজার)

	১৯৫০-৫১ উৎপাদন	১৯৫৫-৫৬ উৎপাদন	১৯৬০-৬১ অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	১৯৬০-৬১ অনুমিত উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ উৎপাদন ক্ষমতা	১৯৬৫-৬৬ উৎপাদন
যাত্রীবাহী ছোট গাড়ী	১৬৫	২৫৩	২০	২১	৩০	৩০
নানাবিধ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত গাড়ী			২৮	২৮	৬০	৬০
জীপ ও ষ্টেশন ওয়াগন			৫৫	৫৫	১০	১০
টানিবার গাড়ী (trailer) সমেত						
আনুষাঙ্গিক সামগ্রী	...	...	০৭	অজ্ঞাত	২·৫	২৫
মোটর সাইকেল ও স্কুটার	.	১.৫	২৪	১৮	৪৮-৬০	৫০

বিমানপোত নির্মাণ শিল্প (Aircraft industry)—ভারতে বিমান পোত নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই দেশের বহুদূর বিস্তৃত আয়তন এবং এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের অত্যধিক দূরত্ব ; অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা ; পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যপথে অবস্থান হেতু ইউরোপ ও এশিয়া সংযোগকারী অধিকাংশ বিমানপথেরই ভারতের মধ্য দিয়া প্রসারণ ; ভারতে বিমানপোত চালনার অনুকূল জল-বায়ু ও আবহাওয়া ; প্রচুর বক্সাইট, জলবিদ্যুৎ এবং বিমানপোত নির্মাণের

উপযোগী কাষ্ঠের সরবরাহ এবং সর্বোপরি ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সামরিক ও অসামরিক বিমানপোতের চাহিদা ভারতে এই শিল্পের গঠন ও প্রসারণের বিশেষ সহায়ক।

শিল্পাঞ্চল—যুদ্ধের তাগিদে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং মহীশূর ও ভারত সরকার কর্তৃক সংযুক্তভাবে পরিচালিত "হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট ফ্যাক্টরী" **ব্যাঙ্গালোরে** বিমানপোত নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম বিমানপোত আকাশে উড্ডীন হয়। বর্তমানে মেরামতী কার্য এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ হইতে বিমানপোত নির্মাণের কার্য এই প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কারণে ব্যাঙ্গালোর বিমান কারখানার কেন্দ্ররূপে মনোনীত হইয়াছে—(১) পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় ব্যাঙ্গালোরের জলবায়ু শুষ্ক এবং সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত। এইরূপ জলবায়ু বিমানপোত নির্মাণের সহায়ক। (২) শিবসমুদ্রম্, সিম্‌সা ও যোগপ্রপাত হইতে উৎপাদিত সুলভ জলবিদ্যুতের সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর। (৩) ভদ্রাবতীর লৌহ শিল্পাগার ব্যাঙ্গালোরের নিকটেই অবস্থিত থাকায় এই শিল্পের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত সহজেই পাওয়া যায়। (৪) কেরালার অ্যালুমিনিয়াম কারখানা হইতে অতি সুলভে প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম-পাত সংগ্রহ করা যায়। (৫) সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্তী এবং দুই পর্বতমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বাভাবিক নিরাপত্তা রহিয়াছে। (৬) ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত হওয়ায় এই কারখানা প্রয়োজনানুসারে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। (৭) মহীশূরে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্য রহিয়াছে। **আসানসোল** এবং **জামসেদপুর** অঞ্চলেও বিমানপোত নির্মাণ শিল্প গঠনের বহু সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। উভয় অঞ্চলেই ইস্পাত ও কয়লার প্রাচুর্য রহিয়াছে। আসানসোলের নিকটে অনুপনগরে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা রহিয়াছে এবং জামসেদপুরের অনতিদূরে মুরীতে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়ামের পাতও উভয় স্থানেই পাওয়া যাইবে। এই দুই অঞ্চলের জলবায়ুও বিমানপোত নির্মাণ শিল্পের অনুকূল। দামোদর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে এই দুই অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে।

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইবে।

রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প (Locomotive industry)—১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতে রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইত না। ১৯৪৩ সালে জামসেদপুরে টাটা

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছোট মাপের রেলপথের ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্য স্থাপিত হয়। এই কারখানায় ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০০টি ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মাসিক ৭৫টি ইঞ্জিনে দাঁড় করান হইয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় প্রায় ৭ কোটি টাকা মূলধন ও ৪৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারত সরকার আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জনে বড় মাপের রেলপথের জন্য একটি ইঞ্জিন নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে কয়লা, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা হইতে কাষ্ঠ এবং কুল্‌টি এবং বার্নপুরের ইস্পাতের কারখানা হইতে ইস্পাতের সরবরাহ চিত্তরঞ্জনের এই শিল্পের উন্নতির বিশেষ সহায়ক। ১৯৫০ সালে এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়। চিত্তরঞ্জন কারখানায় ১৪'৯৮ কোটি টাকা মূলধন ও ৫০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে চিত্তরঞ্জন কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১২০ খানা হইতে বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ৩০০ খানা পর্যন্ত করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে চিত্তরঞ্জন কারখানাটির সম্প্রসারণ এবং এই কারখানায় বিদ্যুচ্চালিত ইঞ্জিন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই ইঞ্জিন সমূহে ব্যবহৃত মোটরগুলি আসিবে ভুপালের "দি হেভী ইলেকট্রিকালস্ লিঃ"-এর কারখানা হইতে। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল (সরকারী অংশে স্থাপিত কারখানার) এবং তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

রেল ইঞ্জিন ও বগীর উৎপাদন, ১৯৫০|৫১—১৯৬৫|৬৬

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	অনুমিত উৎপাদন	উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা
ইঞ্জিন :						
বাষ্পচালিত	৭.	১৭৯	৩০০	২৯৫	৩০০	১১৭৫
ডিজেল চালিত					অজ্ঞাত	৪৩৪
বিদ্যুৎচালিত					৬০	২৩২
মালগাড়ীর বগী (চারিচাকার হিসাবে)	২৯২৪	৪১,৯৬৬	২৬,০০০	২০,০০০	৩৩,৫০০	১০৯,৮৬৬
যাত্রীবাহী বগী	৪৭৯	[illegible],৩৮৪	১,৩০০	১,২১০	১,৪২০	৭,৮৭৩

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the regional distribution and indicate the present position of the iron and steel industry in the U. S. A. (C. U. '57)

(যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, একদেশীভবন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩৯৫-৩৯৭)

2. Give a brief account of the iron and steel industry of the U. K.

(যুক্তরাজ্যের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯)

3. Give a brief account of the iron and steel industry of continental Europe.

(মহাদেশীয় ইউরোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।)

(পৃঃ ৩৯৯-৪০১)

4. Name at least four important areas of iron and steel industry in Europe (excluding the U. K.) and state the reasons for their location mentioning one specialised branch of industry of each area. (H. S. '61)

(যুক্তরাজ্য ব্যতীত ইউরোপ মহাদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধ চারিটি দেশের নাম লিখ। এ সমস্ত অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবনের কারণ এবং ঐ অঞ্চলগুলির উৎপাদন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।) (পৃঃ ৩৯৯-৪০১)

5. Discuss the regional distribution, present position and future prospects of iron and steel industry of India. (C. U. '50, '51, '52, '54, '57)

(ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪০৩-৪০৮)

6. Give an account of the location of the new steel plants in India.

(ভারতের নূতন ইস্পাত কারখানাগুলির অবস্থান সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।)

(পৃঃ ৪০৫-৪০৭)

7. Write notes on the present-day development of automobile industry of India. (C. U. '53, 57)

(ভারতের মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃঃ ৪১১-৪১৩)

8. Examine the development of (a) ship building, (b) aircraft and (c) locomotive industries of India.

(ভারতের (ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প, (খ) বিমানপোত নির্মাণ শিল্প এবং (গ) রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ (ক) ৪০৮-৪১১, (খ) ৪১৩-৪১৪ এবং (গ) ৪১৪-৪১৫)

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাসায়নিক শিল্প

বর্তমান কালে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পকার্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধক, সোডিয়াম নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ সল্ট, সাধারণ লবণ এবং আলকাতরাই হইল রাসায়নিক শিল্পের প্রধান প্রধান উপকরণ। এই সমস্ত খনিজ দ্রব্য ব্যতীতও উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগৎ হইতে এবং বাতাস ও জল হইতে

রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল সংগৃহীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পাঞ্চলেই রাসায়নিক শিল্পের সংগঠন অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও জাপানেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক। বর্তমানে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

রাসায়নিক দ্রব্য—পৃথিবীতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি এত অসংখ্য প্রকারের যে ইহাদিগকে সামান্য কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। বহুবিধ প্রয়োজনীয় অম্ল (acids), যেরূপ সালফিউরিক এ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিড, এ্যাসেটিক এ্যাসিড ও সাইট্রিক এ্যাসিড; বহুবিধ প্রয়োজনীয় ক্ষার (alkalis), যেরূপ সোডিয়াম কার্বনেট; বহুবিধ ব্লিচিং কম্পাউণ্ড; এবং কৃত্রিম সার, বিস্ফোরক ও রঞ্জক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, সাবান, প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতিই রাসায়নিক শিল্পের প্রধান প্রধান উৎপাদিত সামগ্রী।

রাসায়নিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য শ্রমশিল্পের তুলনায় রাসায়নিক শিল্পের কয়েকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(১) অন্যান্য যে কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ বহুগুণে অধিক, (২) রাসায়নিক শিল্পে ক্রমাগত গবেষণার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদির এবং উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়; (৩) রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রথমতঃ গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রস্তুত করিয়া পরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বৃহদায়তন শিল্পাগার সমূহে উহাদের উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে অন্য কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করা হয় না; (৪) রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তিত হয় বলিয়া এই শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিরও দ্রুত পরিবর্তন আবশ্যক। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে; (৫) একই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ বহুপ্রকারের দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে; (৬) অন্যান্য কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া থাকে; এবং (৭) এই শিল্পে ব্যবহৃত বহু কাঁচামাল, যেরূপ বাতাস, জল, লবণ, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতির সরবরাহ প্রচুর ও সুলভ।

গুরু রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy chemicals)—সালফিউরিক এ্যাসিড, সোডাএ্যাশ, ক্লোরিন, কষ্টিক সোডা, কৃত্রিম সার প্রভৃতিই ইহার অন্তর্গত।

সালফিউরিক এ্যাসিড (Sulphuric Acid)—নানাবিধ শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও ব্যবহার দেশগত উন্নতি বা অবনতির সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট সালফিউরিক এ্যাসিডের ৪৭.৫% আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ৪৪%, ক্যানাডা ৩% এবং অন্যান্য

০'৫%), ৩৬% ইউরোপ (যুক্তরাজ্য ৮%, জার্মানী ৬%, ফ্রান্স ৫%, ইতালী ৫%, বেলজিয়াম ৪%, স্পেন ২%, নেদারল্যাণ্ড ২%, এবং অন্যান্য ৪%), ৯% রুশিয়া, ৩% অস্ট্রেলিয়া এবং ৪'৫% অন্যান্য দেশগুলি উৎপাদন করিয়া থাকে। গন্ধক ও পাইরাইট (pyrite) হইল ইহার উৎপাদনের প্রধান প্রধান কাঁচামাল।

সোডাএ্যাশ, ক্লোরিন এবং কষ্টিক সোডা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ক্ষার রসায়ন। বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাঁচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতিতে প্রচুর পরিমাণে **সোডাএ্যাশ (Soda Ash)** ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথর, লবণ ও কোক কয়লা ইহার প্রধান প্রধান কাঁচামাল। রুশিয়া, ব্রিটেন ও জার্মানী একযোগে যে পরিমাণ সোডাএ্যাশ উৎপাদন করে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সেই পরিমাণ সোডাএ্যাশ উৎপাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলেও বর্তমানে ইহা উৎপাদিত হইতেছে।

বীজাণুনাশক ও জল পরিশোধক হিসাবে এবং রঞ্জক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উৎপাদনে প্রচুর **ক্লোরিন (Chlorin)** এবং সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে প্রচুর **কস্টিক সোডা (Caustic Soda)** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ জলপথে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থাযুক্ত লবণক্ষেত্র সমূহের সান্নিধ্যেই গড়িয়া উঠে।

রাসায়নিক সার (Chemical Fertiliser)—গুরু রাসায়নিক শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুত শিল্প অন্যতম। নাইট্রোজেন ও ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, ফসফরাস্ ও পটাশ এই শিল্পের প্রধান প্রধান উপাদান।

নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন ঘটিত স্বাভাবিক সার গুয়ানো, মৎস্য, গোময়, মনুষ্য পুরীষ প্রভৃতি হইতে পাওয়া গেলেও সোডিয়াম নাইট্রেট বা সোরা হইতে আহৃত খনিজ নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রস্তুত রাসায়নিক সারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি সোরার একচেটিয়া কারবারী। বহুক্ষেত্রে এ্যামোনিয়াম সালফেটকে সোরার পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এ্যামোনিয়াম সালফেট কয়লার উপজাত সামগ্রী হিসাবে পাওয়া যায় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, কোরিয়া, ফ্রান্স এবং রুশিয়ায় ইহার উৎপাদন অধিক। পৃথিবীতে উৎপাদিত নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রায় ৫০% ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হয়। এই শ্রেণীর সার উৎপাদনে জার্মানী পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া গেলেও বায়ুমণ্ডল হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহার সরবরাহ অফুরন্ত। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদের প্রয়োজন হয় বলিয়া জার্মানী, নরওয়ে,

ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশে জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য হেতু ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ খাদ্য ফস্‌ফরাস সরবরাহকারী ফসফেট্ সাধারণতঃ মৃতপ্রাণীর হাড় হইতে পাওয়া গেলেও খনিজ ফস্‌ফেট্ হইতেই ইহার সরবরাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় খনিজ ফস্‌ফেট-এর উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রেই (রকি পর্বতাঞ্চল, ফ্লোরিডা ও আপালাচিয়ান অঞ্চল) সর্বাধিক। রুশিয়া (কোলা, মস্কো ও কাজাকস্তান), উত্তর আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহেও ইহার সরবরাহ প্রচুর। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গাদ (slag) হইতেও ফসফেট পাওয়া যায়। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ এইরূপ গাদ হইতেই ফসফেট ঘটিত সার প্রস্তুত করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, জার্মানী এবং নেদারল্যাণ্ড প্রচুর ফসফেট ঘটিত সার প্রস্তুত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই সারের উৎপাদন উত্তর আমেরিকার উৎপাদনের দ্বিগুণেরও অধিক।

পটাশ প্রধানতঃ জার্মানী (স্টাসফার্ট), ফ্রান্স (আলসাস), স্পেন (করডোবা), যুক্তরাষ্ট্র (কার্লসবাড, নিউইয়র্ক ও টেক্সাস), রুশিয়া (ইউরাল) এবং পোল্যাণ্ড (গ্যালিসিয়া) হইতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত অঞ্চলেই পটাশ ঘটিত সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিস্ফোরক দ্রব্য (Explosives)—পটাশিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা, গন্ধক, নাইট্রোসেলুলোজ, এ্যাসিটোন প্রভৃতি হইল বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতির প্রধান প্রধান কাঁচামাল। তবে ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নাইট্রোজেন প্রধানতঃ চিলির সোডিয়াম্ নাইট্রেট হইতে, কোকচুল্লীর উপজাত দ্রব্যাদি হইতে অথবা বাতাস হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সামরিক গুরুত্ব হেতু বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই ইহা উৎপাদিত হইতেছে।

বিশ্লেষিত রঞ্জক দ্রব্য (Synthetic dyes)—আলকাতরা হইতে উৎপাদিত বেনজলের সহিত সালফিউরিক এ্যাসিড মিশাইয়া রঞ্জক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ইহার উৎপাদন প্রচুর। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রচুর রঞ্জক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

ঔষধপত্র (Drugs and Medicines)—আর্সেনিক ও উহার নানাবিধ যৌগিক পদার্থ, এ্যাস্পিরিন, ফেনল, বার্বিটাল, সালফানিলামাইড, এ্যাটিব্রিন, প্যালাড্রিন, অরিয়ো-মায়োসিন প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্লেষিত ঔষধপত্র ইহার অন্তর্গত। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেই ইহাদের উৎপাদন সমধিক।

প্লাস্টিক্স্ (Plastics)—পৃঃ ২৭৭ দেখ।

সাবান ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি—সাবান, শ্যাম্পু, ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত ক্রীম,

বহুবিধ প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। সাবান প্রস্তুতিতে চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই এই সমস্ত শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান প্রস্তুতিতে ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

সিমেণ্ট (Cement)—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় বলিয়া ইহাকেও রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। গৃহাদি নির্মাণে ইহার ব্যবহার সমধিক। চুনাপাথর, কাদা, জিপসাম, বাতচুল্লীর গাদ, বেলেপাথর, কয়লা প্রভৃতিই হইল এই শিল্পের প্রধান প্রধান কাঁচামাল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই সিমেণ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি (জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া প্রভৃতি) একযোগে পৃথিবীর প্রায় ৭৫% সিমেণ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহ গুরুভার বলিয়া এই শিল্প সাধারণতঃ কাঁচামালের সান্নিধ্যেই গড়িয়া উঠে।

ভারতের রাসায়নিক ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ

ভারতের রাসায়নিক শিল্প—দেশরক্ষার্থ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থ নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে, কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সার প্রস্তুত করিতে ও নানাবিধ শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে দেশাভ্যন্তরে রাসায়নিক শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা যে-কোন রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এদেশে রাসায়নিক শিল্প প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ভারতের ২৫০টিরও অধিক ক্ষুদ্রায়তন রাসায়নিক শিল্পাগারে প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

শিল্পাঞ্চল—ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

(ক) **গুরু রাসায়নিক দ্রব্য**—গন্ধক ও তজ্জাত দ্রব্য, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড, সোডাএ্যাশ, কষ্টিক সোডা, এবং রাসায়নিক সার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নানাবিধ শিল্পে এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভারতে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমানে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, কানপুর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর গুরু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল, যেরূপ লবণ, চুনাপাথর, জিপসাম, বক্সাইট, জিরকন, ইলমেনাইট, বেরিলিয়াম, মোনাজাইট, কেওলিন

প্রভৃতি দ্রব্য, ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অঞ্চলে (দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোর) জ্বালানীর অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় ঐ সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ঐ সমস্ত অঞ্চলে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৫০।৫১—১৯৬৫।৬৬

(একক : হাজার টন)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	অনুমিত উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
সালফিউরিক এ্যাসিড	৯৯	১৬৪	৪৭৬	৩৬৩	১৭৫০	১৬০০
সোডা এ্যাস	৪৫	৮১	২৬৮	১৪৫	৫৩০	৪৫০
কষ্টিক সোডা	.১১	৩৫	১২৪	১০০	৪০০	৩৪০
ক্যালসিয়াম কারবাইড		৩	১৭	১০	৬৭	৬০
সোডিয়াম হাইড্রো-সালফাইট্			২·৩	০·৬	১২	১০
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড			৩	১·২	৯·৫	৮

(খ) **আলকাতরা-জাত রাসায়নিক দ্রব্য**—আলকাতরা হইতে বেনজল, এ্যানথ্রাসিন, এ্যানথ্রাসিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য রঞ্জক, বিস্ফোরক, গন্ধ দ্রব্য, প্লাষ্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা, কুলটি, জামসেদপুর, বোম্বাই, ঝরিয়া এবং হীরাপুর অঞ্চলে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। (গ) **বিদ্যুৎজাত রাসায়নিক দ্রব্য**—ক্যালসিয়াম কারবাইড, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এবং ফেরোম্যাঙ্গানীজ এই শ্রেণীর দ্রব্য। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহের উপর এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে। এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ভারতে অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে পশ্চিম বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমান অবস্থা—ভারতের বৃহদায়তন রাসায়নিক শিল্পাগারসমূহ

প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মহীশূর রাজ্যেই অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ভারতীয় রাসায়নিক-শিল্পের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র ভারতে যত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় ৪৮ ভাগই কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশের চাহিদার অনুপাতে নিত্যব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এদেশে এখনও অতি অল্প। তবে ভারত সরকার পুণাতে "ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবোরেটরিজ" নামে যে বৃহৎ রাসায়নিক শিল্পাগার স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত প্রায় ২৯.৮৯ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করে। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম কার্বনেট, কষ্টিক সোডা, এ্যাসিড, গন্ধক, ব্লিচিং পাউডার এবং গ্লিসারিনই প্রধান। সমগ্র আমদানীর ৬০% যুক্তরাজ্য, ৮০% জার্মানী, ১২% যুক্তরাষ্ট্র এবং সামান্য অংশ ইতালী ও জাপান সরবরাহ করে।

ভারতের সার প্রস্তুত শিল্প—ভারতে যে সার উৎপাদিত হয় তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(১) **নাইট্রোজেন-ঘটিত সার**—এযাবৎকাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট-ই সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; বিহার ও পঃ বঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলে কয়লা হইতে কোক তৈয়ারীর ৪টি কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে ইহা এতদিন পর্যন্ত প্রস্তুত হইতেছিল, তবে ১৯৩৯ সালে মহীশূরের বেলাগুলায় সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ইহার উৎপাদন কার্য সুরু হয়। কেরালার আলওয়াএ এবং বিহারের সিন্ধ্রীতেও সম্প্রতি ইহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সালফিউরিক এ্যাসিড ও জিপসাম এই শিল্পের প্রধান **কাঁচামাল**। ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত এশিয়ার বৃহত্তম সার উৎপাদন কারখানা "**সিন্ধ্রী** ফার্টিলাইজার অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্" বিহারে ধানবাদ হইতে ১৭ মাইল দঃ পূর্বে অবস্থিত। এই কারখানা ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস হইতে উৎপাদন কার্য আরম্ভ করে। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩.৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট। এই কারখানায় প্রতিদিন যে ৫০০-৬০০ টন কোক কয়লার প্রয়োজন হয়, তাহা আসে (১৯৫৪ সালে স্থাপিত) সিন্ধ্রীর নিজস্ব কোক কয়লা প্রস্তুতির চুল্লী হইতে। এই সার উৎপাদন কার্যে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন হয় বলিয়া গোয়াই নদীতে বাঁধ দিয়া জলসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধানবাদের কয়লাখনির নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানে কয়লারও প্রাচুর্য রহিয়াছে। সিন্ধ্রী উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। সিন্ধ্রীর কারখানা হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রতিদিন ১০০০ টন ক্যালসিয়াম

কার্বনেট পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা একটি সিমেণ্টের কারখানাও চালান যাইবে।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৩·৭ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট আমদানী হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার চাহিদা দাঁড়ায় ৬·১ লক্ষ টন। এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে গন্ধক সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং সিন্ধ্রী ব্যতীত অন্যান্য কারখানাগুলির উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **পরিকল্পনা কমিশন** মনে করেন যে এই শিল্পের অধিকতর প্রসারের জন্য (১) গন্ধকের পরিবর্তে জিপসামের ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ; (২) ভারত ও রাজ্য সরকারগুলির কৃষি বিভাগে এবং কৃষকদিগের নিকট প্রচার কার্যের দ্বারা ইহার চাহিদা বৃদ্ধি করাইতে হইবে ; (৩) সারের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করাইতে হইবে ; (৪) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য এদেশে পাওয়া যায় এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতিতে উহাদের ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণামূলক কার্য চালাইতে হইবে ; এবং (৫) ভারতে জিপসাম এবং পিরাইটস্ আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বারাণসীর "সাহু কেমিক্যালস্" কারখানাটির সম্প্রসারণ করা হইবে এবং মাদ্রাজের এন্নোরে, অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ ও কোঠাগুডিয়ামে, এবং মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহীশূর ও গুজরাটে কয়েকটি নূতন বেসরকারী কারখানার স্থাপন করা হইবে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সহায়তায় দুর্গাপুরেও একটি নূতন কারখানার স্থাপন করা হইবে।

(২) **ফস্‌ফেট্‌-ঘটিত সার :**—১৯৫১ সালে ভারতের ১৪টি কারখানায় (বোম্বাইয়ে ৭টি, মহীশূরে ২টি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, প্রাক্তন হায়দরাবাদ এবং দিল্লীর প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া) ৬১,০১৮ টন সুপার-ফসফেট্‌ উৎপাদিত হয় (মোট উৎপাদনের ক্ষমতা ১·২৩৫ লক্ষ টন)। রক ফসফেট্‌ ও সালফিউরিক এ্যাসিড এই শিল্পের প্রধান **কাঁচামাল**। রক ফস্‌ফেট বিদেশ হইতে আমদানী হয় এবং সালফিউরিক এ্যাসিড আমদানীকৃত গন্ধকের সাহায্যে এ দেশেই কেহ কেহ তৈয়ারী করিয়া লয়। দেশাভ্যন্তরে এই সারের চাহিদা বর্তমানে (১৯৫৫-৫৬) বার্ষিক প্রায় ১·২ লক্ষ টন। উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য এবং গন্ধকের অপ্রাচুর্যই এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**। **পরিকল্পনা কমিশন** এই শিল্পের প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার নির্দেশ দেন—(১) ফসফেট্‌ ঘটিত অন্যান্য সারের উৎপাদন, (২) 'কোট্‌কা' ফসফেট্‌ উৎপাদনের ব্যবস্থা (ইহাতে অল্প গন্ধক ব্যবহৃত হয়), (৩) দেশাভ্যন্তরে রক ফসফেটের অনুসন্ধানের ও ব্যবহারের প্রসারণ, (৪) মৃতাস্থি সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রবর্তন, (৫) সরকারের তরফ হইতে সুপার-ফসফেট্‌ উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং (৬) অন্যান্য ফসফেট-ঘটিত সারের মান নির্ধারণ।

(৩) **পটাস-ঘটিত সার**—ভারতে এই শ্রেণীর সার (১) বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব রাজ্যের পটাসিয়াম নাইট্রেট হইতে, (২) লবণ উৎপাদনের উপজাত দ্রব্য হিসাবে এবং (৩) গুড় হইতে প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজন বর্তমানে প্রায় ৩৭,৫০০ টনের। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে দেশে ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সার প্রস্তুত শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

সারের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১—১৯৬৫-৬৬

(একক : হাজার টন)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	অনুমিত উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
নাইট্রোজেন ঘটিত সার (নাইট্রোজেন ভিত্তিতে)	৯	৭৯	২৪৮	১১০	১০০০	৮০০
ফসফেট ঘটিত সার (P_2O_5 ভিত্তিতে)	৯	১২	৬০	৫৫	৫০০	৪০০

ভারতের সিমেণ্ট শিল্প—গৃহাদি নির্মাণে সিমেণ্ট একটি অপরিহার্য উপকরণ। ১ টন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে ১·৬ টন চুনাপাথর ও এঁটেল মাটি, ০·২ টন হইতে ০·৫ টন কয়লা এবং ০·০৩৫ টন জিপসাম **কাঁচামাল** রূপে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানেই রেলপথের নিকটেই পাওয়া যায়। এঁটেল মাটিও সর্বত্র পাওয়া যায়। ভারতে জিপসাম ও কয়লার উৎপাদনও প্রচুর।

শিল্পাঞ্চল—১৯০৪ সালে মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সিমেণ্ট তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের ১১টি সিমেণ্টের কারখানার মধ্যে বিহারে ৫টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাদ্রাজ-অন্ধ্রে ৫টি, সৌরাষ্ট্রে ৩টি, পেপস্যুতে ২টি এবং মহীশূর, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মধ্যভারতের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলির মোট উৎপাদনক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩২·৮ লক্ষ টন ও ২৬·৯২ লক্ষ টন। ঐ সালে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৩৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ভারতের মধ্যে **বিহার** সিমেণ্ট উৎপাদনে

প্রধান স্থান অধিকার করে। বিহারের ডালমিয়ানগর, জাপলা, চাঁইবাসা ও খেলারী সিমেণ্ট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ডালমিয়ানগরের সিমেণ্টের কারখানা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর ও গোয়ালিয়র; গুজরাটের পৌরবন্দর, মহীশূরের ব্যাঙ্গালোর; মাদ্রাজ-অন্ধ্রের মধুকরাই, বেজওয়াদা, ডালমিয়াপুরম ও মঙ্গলগিরি; পাঞ্জাবের অমৃতসর, ও প্রাক্তন হায়দরাবাদ সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে "এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং অব ইণ্ডিয়া" নামক একটি সংঘের কর্তৃত্বাধীনে ১২টি (মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৩ লক্ষ টন), ডালমিয়ার তত্ত্বাবধানে ৪টি (মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ৮·৩ লক্ষ টন), মহীশূর সরকারের তত্ত্বাবধানে ১টি (মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ০·৮৬ লক্ষ টন) এবং ৬টি স্বতন্ত্র (মোট উৎপাদনক্ষমতা ৬·৭ লক্ষ টন) প্রতিষ্ঠান ছিল। সিমেণ্টের উৎপাদন এবং মূল্য "এ. সি. সি. আই." সংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট উৎপাদিত হইতেছে তাহার দ্বারা দেশের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে রপ্তানী করার মত উদ্বৃত্ত থাকে। ইরাক, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সিমেণ্ট রপ্তানী হয়। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮,০০০ টন ও ১ লক্ষ টন। অবশ্য ভারত বিদেশ হইতেও সামান্য পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর সিমেণ্ট আমদানী করে। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০,০০০ ও ৮,০০০ টন।

ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—(১) বর্তমানে সিমেণ্টের কলগুলির মধ্যে ৮টিরই উৎপাদনক্ষমতা ১ লক্ষ টনেরও অল্প, এই কারণে ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে; (২) প্যাকিং, দূরবর্তী স্থান হইতে চুনাপাথর আনিবার ব্যয়, বিদেশ হইতে বর্তমানে বর্ধিত মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ব্যয়ে কয়লা আনাইতে হয় বলিয়া ভারতে সিমেণ্টের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলির নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (২) আঞ্চলিক চাহিদা মত প্রত্যেক রাজ্যেই সিমেণ্টের কল স্থাপন করা উচিত; (৩) বর্তমানে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় অধিক তাহাদিগকে যন্ত্রপাতির সংস্কার-সাধন ও উৎপাদনের সম্প্রসারণ দ্বারা উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস করাইতে হইবে; (৪) রাজ্য সরকারসমূহ সিমেণ্টের কলগুলিকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চুনাপাথর উৎপাদনের নিমিত্ত যাহাতে খনিসমূহের দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দান করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং (৫) বিদেশে ভারতীয় সিমেণ্টের রপ্তানী যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ ভারতের ২৭টি সিমেণ্টের কলের (বোম্বাইতে ২টি

এবং বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া নূতন কল) মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৪৬ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের সিমেণ্টের কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ও ৮৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১·৫ কোটি ও ১·৩ কোটি টন।

ভারতের কাচশিল্প—অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেশীয় প্রথায় ভারতে কাচ প্রস্তুত চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় যখন চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী হইতে কাচের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় সেই সময় হইতেই ভারতে আধুনিক ধরণের কাচশিল্প গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট ১৪৪টি বৃহদায়তন কাচ নির্মাণের কারখানায় ২৬০০০ শ্রমিক এবং ৫·৭৮ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন নিযুক্ত ছিল। এই সমস্ত কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২১৮,৮৫০ টন এবং ৯২,০০০ টন। ঐ সালে ভারতে ৯২টি কাচের চুড়ি তৈয়ারীর কারখানাও ছিল। এই সমস্ত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩৫,০০০ টন ও ১৪,০০০ টন।

বালি, সোহাগা, সোডাএ্যাশ, সল্টকেক, ডলোমাইট, চুনাপাথর, সোরা, গন্ধক, ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, কয়লা, সেলেনিয়াম ধাতু, তরল স্বর্ণ, আর্সেনিক অক্সাইড ও রং করিবার ঔষধাদিই কাচশিল্পের প্রধান প্রধান **কাঁচামাল**। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর বালি, ডলোমাইট, সোরা ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। সোহাগা, গন্ধক, ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, রং, সোডাএ্যাশ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

শিল্পাঞ্চল—বর্তমানে ভারতে দুইটি প্রথায় কাচ প্রস্তুত হয়—(ক) দেশীয় প্রথায় কুটিরশিল্প হিসাবে এবং (খ) আধুনিক প্রথায় যন্ত্রশিল্প হিসাবে।

(ক) দেশীয় প্রথায় ভারতের সর্বত্রই কাচ প্রস্তুত হয়। উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় এবং মহারাষ্ট্রের বেলগাঁও জেলায় এই শিল্পের প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক। কুটিরশিল্প হিসাবে মহীশূরেও কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত কাচের এবং আমদানীকৃত জাপানী কাচের প্রতিযোগিতায় ভারতের এই প্রাচীন কুটিরশিল্পটি প্রায় ধ্বংসের মুখে পৌঁছিয়াছে।

(খ) আধুনিক কাচের কারখানাগুলিতে কাচের পাত, কাচের ফাঁপা দ্রব্য ও কাচের চুড়ি প্রস্তুত হয়। কাচ নির্মাণের জন্য আধুনিক ধরণের কারখানাগুলি উত্তরপ্রদেশ (২১), মহারাষ্ট্র ও গুজরাট (২৩), পশ্চিমবঙ্গ (৩০), মাদ্রাজ (৮), বিহার (৮), মধ্যপ্রদেশ (৬), পাঞ্জাব (৪), দিল্লী (২), রাজস্থান (২), প্রাক্তন হায়দরাবাদ (২), কেরালা (২) ও উড়িষ্যায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়াও ৩৫টি কল গত কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আধুনিক কাচশিল্পের

প্রসার ব্যাপক। মোরাদাবাদ জেলার ভাজোই অঞ্চল ভারতে কাচের পাত উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র। ভারতের সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ⅚ অংশ চুড়ি ফিরোজাবাদে প্রস্তুত হয়। সিকোহাবাদ, হাথরাস, নৈনী এবং ভাজোই অঞ্চলে কাচের ফাঁপা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। উত্তরপ্রদেশের কাচশিল্প ছোট ছোট পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে বলিয়া এই শিল্প তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। কাচের বাতি, নল, ফ্লাস্ক, টেস্ট-টিউব প্রভৃতি দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই অঞ্চলের কারখানায় প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের কারখানায় প্রধানতঃ বোতল প্রস্তুত হয়। অমৃতসর ঐ রাজ্যের কাচশিল্পের কেন্দ্রস্থল।

বর্তমান অবস্থা—ভারতীয় কাচশিল্পের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। এদেশে কাচের আভ্যন্তরীণ চাহিদা খুব বেশী এবং কাচ প্রস্তুতের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামালসমূহেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে। কাচের পাত উৎপাদন শিল্পকে ১৯৫০ সাল হইতে সরকারী সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন" ভুরকাণ্ডা (বিহার) অঞ্চলের একটি কাচের পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দান করিয়াছেন। ভারতীয় কাচশিল্প আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও এডেন, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, আরব, ইরান, জাপান এবং অন্যান্য দেশে কাচ ও কাচের দ্রব্যাদি রপ্তানী করে।

এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত সোডা-অ্যাশের অপ্রাচুর্য এবং উৎপাদিত বালির অপকর্ষ, এবং (২) প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির অপকর্ষ। এই শিল্পের অধিকতর প্রসারের জন্য **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যসূচীর নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ যে আরও ১৪টি বৃহদায়তন আধুনিক কাচের কারখানা গড়িয়া উঠে তাহাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে; (২) প্রতি বৎসর যাহাতে অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ কাচের বাল্‌ব নির্মিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) এই শিল্পের উন্নতির জন্য "কাচশিল্প গবেষণাগার" স্থাপন করিতে হইবে এবং (৪) প্লেট কাচের আমদানীর পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস করাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ ২০ লক্ষ টাকায় দাঁড় করাইতে হইবে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে ৫৮·২০ ও ১৩৮·৬৯ লক্ষ টাকার কাচের জিনিসপত্র আমদানী হয় আবার ঐ দুইটি সালে ভারত হইতে ২৭·৪৫ ও ২৪·৪৫ লক্ষ টাকার কাচের জিনিস বিদেশে রপ্তানী হয়। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি কাশী ও কলিকাতায় দুইটি কাচশিল্প গবেষণাগার স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে কাচের কলগুলির মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ১·২৫ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালে কাচের কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩·৭০ লক্ষ টন ও ২·২৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৬·১৫ লক্ষ টন ও ৪·৭০ লক্ষ টন।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the manufatcture of heavy chemicals in the world.

(পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৪১৭-৪১৯)

2. State briefly the regional distribution and the present position of Indian chemical industry, (C. U. '51)

(ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃ: ৪২০-৪২৪)

3. Give an account of the recent development of the fertiliser industry of India.

(ভারতীয় সার প্রস্তুত শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃ: ৪২২-৪২৪)

4. Examine briefly the present-day development of Indian cement industry.

(ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।)

(পৃ: ৪২৪-৪২৬)

ঊনবিংশ অধ্যায়

বয়ন শিল্প

বয়ন শিল্পের অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ হইল কার্পাস বয়ন, পশম বয়ন, রেশম ও কৃত্রিম রেশম বয়ন শিল্প।

কার্পাস বয়ন শিল্প

বয়ন শিল্প সমূহের মধ্যে আবার কার্পাস বয়ন শিল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বপ্রধান কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশও কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

আঞ্চলিক বণ্টন—পৃথিবীর সর্বত্রই কার্পাস-বয়ন-শিল্পের প্রসার অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের সংখ্যামান হইতে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে
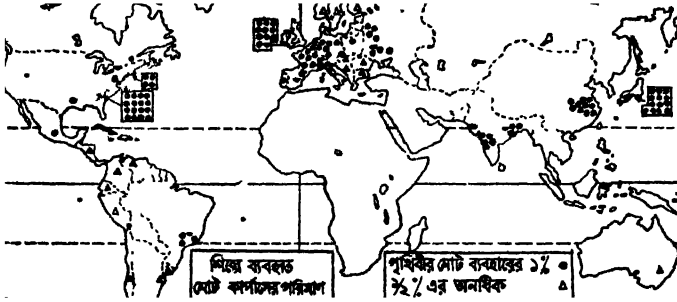
৭২নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস-বয়ন-কেন্দ্রসমূহ

কার্পাসের সূতা উৎপাদনের বর্তমান পরিমাণ বুঝা যাইবে :—১৯৫০ সালে মোট সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫,৩২৫,০০০ টন। ইহার মধ্যে ৩২% উৎপাদন করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র, ১৪% সোভিয়েট রাষ্ট্র, ১০% ভারত, ৭% যুক্তরাজ্য, ৫% পঃ জার্মানী, ৫% ফ্রান্স, ৪% জাপান এবং ৩% চীন বাদে অন্যান্য দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস বয়নশিল্প—কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের অল্পাধিক ১৬০০ কার্পাস শিল্পাগারে প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—আপালাচিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে উত্তরে মেইন হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার অন্তর্গত তিনটি অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল**—আর্দ্র জলবায়ু, দক্ষিণাঞ্চল হইতে কার্পাস আনয়নের সুবিধা, জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের নৈকট্য, জল ও স্থলপথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। তবে বর্তমানে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি ও নানাবিধ শ্রমিক সমস্যা, ক্রমবর্ধমান করভার, প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন, মুনাফার হ্রাস, বিশিষ্ট শ্রেণীর চাহিদা মিটাইবার প্রয়াসে সঙ্কুচিত উৎপাদন, এবং সর্বোপরি দক্ষিণাঞ্চলের কার্পাস শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। ফলরিভার, উত্তর অ্যাডামস্, হালিওক্স্, টটন, লোয়েল, লরেন্স, ম্যাঞ্চেস্টার,

কিচবার্গ, পটুকেট, ওয়ারউইক, উইনস্গেট এবং নিউস্টন্ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিল্প কেন্দ্র। নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই এবং রং ও ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) **দক্ষিণাঞ্চল**—পিয়েডমণ্ট বলয়ের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও আলাবামাতে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের নৈকট্য, মধ্য ও দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল হইতে কয়লা ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, মূলধন এবং সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের প্রাচুর্য, কার্পাস দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল ও ভোগকেন্দ্রের সহিত শিল্পাগারসমূহের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা এই শিল্পের প্রসারের সহায়ক। এই অঞ্চলে চুনবর্জিত নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। গ্রীনভীল, স্পার্টানবার্গ, গ্যাস্টোমা, চার্লোটে, কংকর্ড, কলাম্বাস, মেকন, অগাস্টা ও কলম্বিয়া অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পাগারসমূহ সুসজ্জিত এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যাদি ঈষৎ মোটা। ইহা চীন ও আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়।

(৩) **মধ্য আটলাণ্টিক অঞ্চল**—পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক এবং মেরীল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নৈকট্য, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে। এই অঞ্চলে সাধারণতঃ গেঞ্জি ও মোজার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। ফিলাডেলফিয়া গেঞ্জি, মোজা ও লেস উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্প—কার্পাস শিল্প সংগঠনে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাসশিল্প প্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে সমগ্র ব্রিটেনের প্রায় ৯০ ভাগ এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২৫ ভাগ মাকু চালু রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিকের প্রায় ৮০ ভাগই ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই একদেশীভবনের কারণ—(ক) এই অঞ্চলের জলবায়ু সারা বৎসরই আর্দ্র থাকায় কার্পাস বয়ন শিল্পের সহায়ক; (খ) এই অঞ্চলে চুনবর্জিত বিশুদ্ধ ও নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপা প্রভৃতি কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়; (গ) নিকটবর্তী ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লার সরবরাহ পাওয়া যায়; (ঘ) ল্যাঙ্কাশায়ারের ভূমিভাগ কৃষিকার্যের অনুপযোগী হওয়ায় এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এই শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে; (ঙ) লিভারপুল

বন্দরের সান্নিধ্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে কার্পাস আমদানী ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্ত্র রপ্তানীর সুবিধা দান করে; (চ) চেশায়ার অঞ্চলের রাসায়নিক শিল্প এই অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় বস্ত্র ধোলাই, রং এবং ছাপা প্রভৃতি কার্যের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদির সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর; (ছ) এই অঞ্চলে যানবাহনের প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পে **উৎপাদনবৈশিষ্ট্য** বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ওল্ডহ্যাম, বোল্টন, ম্যাঞ্চেস্টার, রকডেল, লেই, স্টকপোর্ট প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে সুতাকাটা অত্যন্ত ব্যাপক। ওল্ডহ্যাম ও রকডেল মধ্যমাকৃতি আঁশযুক্ত এবং বোল্টন ও ম্যাঞ্চেস্টার দীর্ঘআঁশযুক্ত কার্পাস হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বার্নলে, ব্ল্যাকবার্ন, প্রেস্টন, নেলসন, অ্যাক্রিংটন, ডারওয়েন্ট, কর্বি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে বস্ত্রবয়ন অত্যন্ত ব্যাপক। বোল্টন লেপ ও তোষক; রোসেণ্ডেল অঞ্চলের শিল্পাগারসমূহ চাদর; প্রেস্টন উচ্চশ্রেণীর জামার কাপড়; ব্ল্যাকবার্ন ও অ্যাক্রিংটন অল্পমূল্যের ধুতি; এবং নেলসন ও কর্বি উচ্চশ্রেণীর সাটিন, পপলিন, ব্রোকেড প্রভৃতি উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ম্যাঞ্চেস্টার, স্যালফোর্ড, স্টকপোর্ট, বিউরী, বোল্টন, রকডেল, র‍্যাডক্লীফ, হোয়াইটফীল্ড এবং মিড্‌লটন অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অবস্থা—১৯১৩ সালের পূর্বাবধি ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্প পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু ১৯১৩ সালের পর হইতে এই শিল্পের অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। (ক) কাঁচামালের অপ্রতুলতা, (খ) বিক্রয়-কেন্দ্রের অভাব, (গ) যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, (ঘ) শ্রমিক-সমস্যা ও শ্রমিকের মজুরীর আধিক্য, (ঙ) কৃত্রিম রেশম, নাইলন প্রভৃতি পরিবত সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার, (চ) প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি হেতু উৎপাদনব্যয়ের আধিক্য, (ছ) ভারত, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি পূর্বতন আমদানীকারক দেশগুলিতে কার্পাস শিল্পের গঠন ও প্রসার প্রভৃতি নানা কারণে ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। তবে একথা সত্য যে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস বস্ত্রের প্রস্তুতি ও ব্যবসায়ে ল্যাঙ্কাশায়ার আজিও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস ও উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে ল্যাঙ্কাশ্রায়ারের কার্পাস শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

* * *

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্প বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কার্পাসের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ কার্পাসই যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ব্রাজিল, পেরু, সুদান প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়। গ্রেট ব্রিটেন হইতে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানী হয় এবং নিম্নশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে,

আফ্রিকা, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে গ্রেট ব্রিটেন কার্পাস দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে।

উপরোক্ত অঞ্চল ব্যতীতও (১) ডার্বিশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের প্রান্তভাগে বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপা প্রভৃতির কায, (২) গ্লাসগো অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর পপলিন, মসলিন ও জামার কাপড ; পেস্‌লী অঞ্চলে সেলাইয়েব সুতা এবং (৩) আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট অঞ্চলেও কার্পাস শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

মহাদেশীয় ইউরোপের কার্পাস শিল্প—ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূমিভাগের পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল হইতে পূর্বে রুশিয়া এবং দক্ষিণে ইতালী ও স্পেন হইতে উত্তরে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য, এবং লেস, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রচুব পবিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। সমুদ্রসান্নিধ্য, নিবিড লোকবসতি, ব্যাপক চাহিদা, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিদ্যুৎ ও কয়লার প্রাচুর্য, চুনবর্জিত জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং উন্নত ধরণের পবিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কার্পাস শিল্পের উন্নতিও প্রসারেব কারণ। এতদঞ্চলে প্রধানতঃ আমদানীকৃত কার্পাসের সাহায্যেই বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ও উন্নতধরণের কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে ফ্রান্স (লীল, কয়েন, মূলহাউস্) পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পশ্চিম জার্মানী (বার্মেন ও এলবারফিল্ড), ইতালী (জেনোয়া), স্পেন (বার্সিলোনা), পোল্যাণ্ড (লোজ), হল্যাণ্ড (গ্রনিঙ্গেন, এনসেডে, এঙ্গেলো, আলমেলো, অলডেনজাল, গ্লেডারল্যাণ্ড, উঃ ব্র্যাবাণ্ট), বেলজিয়াম (ব্রুসেল্‌স্), সুইজারল্যাণ্ড (জুরিক) প্রভৃতি অঞ্চলেও কার্পাস শিল্পের প্রসার বর্তমানে পরিলক্ষিত হইতেছে।

রুশিয়ার কার্পাস বয়নশিল্প—দক্ষিণ রুশিয়া ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত কার্পাসের সরবরাহ এবং সুলভ শ্রমিক ও বিদ্যুৎ-শক্তির প্রাচুর্য হেতু রুশিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রধানতঃ আঞ্চলিক চাহিদা মিটাইবার জন্য রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করিলেও লেনিনগ্রাদ, আইভানোভা, ক্যালিনিন ও মস্কো অঞ্চলেই ইহার প্রসার সমধিক উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ককেসাস, ক্রিমিয়া, উজবেকিস্তান এবং পশ্চিম ও মধ্য সাইবেরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বৃহদায়তন কার্পাস বয়নকেন্দ্রসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে।

জাপানের কার্পাস বয়নশিল্প—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র এশিয়ার মধ্যে কার্পাস শিল্প সংগঠনে জাপান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিত। সম্প্রতি জাপানের এই শিল্পটি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

একদেশতা ও প্রসারের কারণ—কার্পাস শিল্পে জাপানের এতাদৃশ দ্রুত উন্নতির কারণ—(১) সমগ্র জাপানের, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণ অংশের আর্দ্র জলবায়ু, (২) সুলভ জলবিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাচুর্য, (৩) উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা, (৪) সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, (৫) চীন, ভারত এবং ইন্দো-নেশিয়ায় জাপানী দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, (৬) উন্নত ধরণের শিল্প সংগঠন এবং মধ্যস্থতার অপসারণ, (৭) জাপানে স্বয়ংক্রিয় বয়নযন্ত্র ব্যবহারের ফলে সুতার অপচয় হ্রাস, (৮) আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনব্যয়ের স্বল্পতা।

বর্তমান অবস্থা—জাপানের কার্পাস বয়নশিল্প সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক কার্পাস আমদানীর উপর (মুখ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও গৌণতঃ মিশর ও চীন হইতে), নির্ভরশীল। ওসাকা, টোকিও, নাগোয়া এবং কোবে অঞ্চলেই জাপানের কার্পাস শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ওসাকাতে কার্পাস বয়নশিল্প এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহাকে প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হয়। জাপানে সাধারণতঃ মোট কার্পাস দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে দীর্ঘ আঁশযুক্ত উচ্চশ্রেণীর মাকিন কার্পাস হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের কার্পাস দ্রব্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে জাপান বস্ত্র রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

চীন দেশের সাংহাই অঞ্চলেই কার্পাস বয়নশিল্পের প্রসার অধিক। **পাকিস্তানের** বিভিন্ন অঞ্চলেও কার্পাস বয়নশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। কার্পাস বয়ন **ভারতের** একটি উল্লেখযোগ্য এবং অতি প্রাচীন শিল্প। **মেক্সিকো** দেশের ওরিজাবা ও মেক্সিকো সিটি অঞ্চলে কার্পাস বয়ন প্রসার লাভ করিয়াছে।

সরকারী তত্ত্বাবধানে **ব্রাজিলের** রেসিফ (Recife) হইতে সাওপাওলো অঞ্চল ব্যাপিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস বয়ন বর্তমানে ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। এতদঞ্চল হইতে কার্পাস বস্ত্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। **অস্ট্রেলিয়া** ও **দক্ষিণ আফ্রিকাতে**ও কার্পাস বয়নের আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের কার্পাস বয়নশিল্প

কার্পাস বস্ত্র বয়ন ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম শিল্প। ভারত কার্পাসজাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয়, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক

সংখ্যার দিক হইতে তৃতীয় এবং উৎপাদনে প্রযুক্ত মাকুর দিক হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘুষুড়ী অঞ্চলে ১৮১৮ সালে ভারতের প্রথম কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও ১৮৫১ সালে বোম্বাই প্রদেশে কার্পাস শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারতীয় কার্পাস শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে। ১৯৫১ সালে ভারতে কার্পাস শিল্পাগারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৮টি। ১৯৫০-৫১ সালে এই সমস্ত শিল্পাগারে ১ কোটি মাকু, ৭ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এবং ১০০ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন খাটিতেছিল। এই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ৪৭৪'৩৬ কোটি গজ এবং ১৬৬'৩৭ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭১'৮ কোটি গজ ও ১১৭'৯ কোটি পাউণ্ড। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত হইতে সূতা ও বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭'৪৫ কোটি পাউণ্ড ও ১২৬'৯৫ কোটি গজ [পৃথিবীতে প্রথম স্থান]।

উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের একত্র সমাবেশ—বর্তমানে নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক—(১) **মহারাষ্ট্র ও গুজরাট** কার্পাসজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কলের সংখ্যার দিক হইতে ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোম্বাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর, বেলগাঁও, ব্রোচ, জলগাঁও এবং সুরাটে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে বোম্বাই শহরে ৬৩টি, আমেদাবাদে ৬৭টি এবং বোম্বাই রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ৪৯টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। এতদঞ্চলে কার্পাস শিল্পের একত্র সমাবেশ ও দ্রুত প্রসারের কারণ—(ক) খান্দেশ, বেরার, ওয়ার্ধা প্রভৃতি কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তিতা; (খ) মূলধনের প্রাচুর্য, (গ) উচ্চশ্রেণীর কার্পাস তন্তু উৎপাদনের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ুর বিদ্যমানতা, (ঘ) বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে বয়নযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর সুবিধা; (ঙ) কার্পাস শিল্পকেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ; (চ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা এই অঞ্চলের সংযোগ সাধন এবং (ছ) মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ। প্রধানতঃ মধ্যম শ্রেণীর হাল্কা বস্ত্রই এতদঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত হয়। তবে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনেও এই অঞ্চল বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বোম্বাইতে 'ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি'র গবেষণাগার অবস্থিত।

(২) **মাদ্রাজ অঞ্চল**—কার্পাস শিল্প সংগঠনে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পরেই মাদ্রাজের স্থান। ১৯৫০-৫১ সালে মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর, মাদুরা, মাদ্রাজ,

ত্তিনেভেলি, সালেম প্রভৃতি স্থানে ৭৭টি আধুনিক ধরণের কাপড়ের কল ছিল। আর্দ্র জলবায়ু, দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাসের পর্যাপ্ত স্থানীয় সরবরাহ, শিল্পকেন্দ্রসমূহে জলবিদ্যুতের ব্যবহার, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য, যানবাহনের সুবিধা এবং সর্বোপরি কার্পাস বস্ত্রের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা হেতু এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। রুমাল, কোট ও জামার কাপড়, ড্রিল, খাকী প্রভৃতি বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের কলসমূহ তাঁত শিল্পকে প্রচুর সূতা যোগান দেয়। মাদ্রাজী তাঁতের কাপড় বিখ্যাত।

(৩) **উত্তর প্রদেশ অঞ্চল**—কার্পাস শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চল ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। কানপুর এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। আগ্রা, আলিগড, বেরেলী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও বহু কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। উত্তর প্রদেশে ১৯৫০-৫১ সালে ২১টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। কার্পাসজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য ও উন্নত ধরণের যানবাহনের ব্যবস্থা এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের উন্নতির সহায়ক। তবে এই অঞ্চল হইতে কয়লার খনি ও কার্পাস উৎপাদক স্থানসমূহ বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সূতা, বস্ত্র, গেঞ্জী, মোজা, গালিচা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কানপুরের তাঁবুর কাপড় বিখ্যাত।

(৪) **পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চল**—১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম বঙ্গে ১৮টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। পশ্চিম বঙ্গের কার্পাস শিল্প হুগলী অববাহিকার অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠেই একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ—(ক) রেল ও জলপথে ভারতের প্রসিদ্ধ ক্রয়বিক্রয়-কেন্দ্রসমূহের সহিত কলিকাতা বন্দরের সংযোগ; (খ) কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য, (গ) ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনিসমূহের নিকটবর্তী অবস্থান হেতু প্রচুর শক্তিসম্পদের সুলভ সরবরাহ; (ঘ) পঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে প্রচুর সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ; (ঙ) কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহ ও ধনী সম্প্রদায় হইতে মূলধনের সরবরাহ; (চ) পশ্চিম বঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু; এবং (ছ) কার্পাসজাত দ্রব্যের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসারের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কলসমূহে যে পরিমাণ কার্পাসজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা দ্বারা স্থানীয় চাহিদাও

৮০নং চিত্র—উল্লেখযোগ্য বয়নকেন্দ্র-সমূহ

মিটান যায় না। অথচ কেবল মাত্র আভ্যন্তরীণ চাহিদাই যে ব্যাপক তাহা নহে ; আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতেও পশ্চিম বঙ্গের কার্পাসজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। তবে কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহ শিল্পকেন্দ্রসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বর্তমানে এখানকার কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্যই অধিক পরিমাণে ধুতি ও শাড়ী উৎপাদিত হইতেছে।

উপরোক্ত চারিটি অঞ্চল ব্যতীতও ১৯৫০-৫১ সালে পূঃ পাঞ্জাবে ৩টি, পেপস্থতে ১টি, দিল্লীতে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১১টি, হায়দরাবাদে ৬টি, আজমীঢ়ে ৪টি, রাজস্থানে ৭টি, মধ্যভারতে ১৬টি, ভূপালে ১টি, কচ্ছে ১টি, সৌরাষ্ট্রে ১০টি, উড়িষ্যায় ১টি, বিহারে ২টি, মহীশূরে ৮টি এবং কেরালায় ৯টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। দিল্লীর ধুতি, তাঁবু, চাদর প্রভৃতি দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—বর্তমানে ভারতে পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ১৫% বস্ত্র এবং ১৩% সূতা উৎপাদিত হইতেছে। ভারতীয় কার্পাস শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে (১) দেশাভ্যন্তরে কার্পাস উৎপাদনের স্বল্পতা, (২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতার স্বল্পতা, (৩) যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত বয়নযন্ত্রসমূহের অস্বাভাবিক ক্ষয় এবং (৪) কলের সূতা উৎপাদন ও তাঁত শিল্পের সহিত সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের অভাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে উৎপাদিত ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস ব্যতীতও পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, সুদান, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানীকৃত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতীয় কলগুলিতে ৩৫ লক্ষ গাঁইট কার্পাস ব্যবহৃত হয় কিন্তু ঐ সালে মোট উৎপাদিত কার্পাসের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৯·১ লক্ষ গাঁইট। তবে বর্তমানে ভারতের বহুস্থানে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপাদনের এবং সকল প্রকার কার্পাসের অধিকতর উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে এবং এই চেষ্টা ফলবতী হইতেও আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের বোম্বাই অঞ্চল হইতে **বিকেন্দ্রীভবন** বর্তমান কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বোম্বাই অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা রহিয়াছে দেশাভ্যন্তরে অবস্থিত অন্যান্য কার্পাস-শিল্পকেন্দ্রসমূহে উহা অপেক্ষাও অধিকতর সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। আমেদাবাদ, শোলাপুর, নাগপুর এবং কানপুর অঞ্চলে কাঁচামাল এবং বিক্রয়কেন্দ্রের অধিকতর নৈকট্য, স্থানীয় চাহিদার সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, এবং সুলভতর জমি ও শ্রমিকের বিদ্যমানতাই ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কারণে কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বোম্বাই অঞ্চল হইতে বিকেন্দ্রীভূত হইয়া উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসারের বিপুল **সম্ভাবনা** রহিয়াছে। কারণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা ছাড়াও বিদেশে ভারতীয় কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে উন্নতধরণের উৎপাদনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইলে, ভারত কার্পাস উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে এবং বহুমুখী পরিকল্পনার সহায়তায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন সুলভ হইলে, ভারত ভবিষ্যতে কাপড়ের কল ও তাঁত শিল্পের সাহায্যে দেশের চাহিদা মিটাইয়াও পৃথিবীর বাজারে, বিশেষতঃ চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যধারার নির্দেশ দিয়াছেন:—(১) কার্পাসজাত দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, (২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার সাধন করিয়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইহাদিগকে লাভজনক করিয়া তুলিতে হইবে; (৩) নূতন নূতন কল স্থাপন করিতে হইবে, (৪) তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইবে এবং (৫) এই শিল্পের সহিত তাঁত শিল্পের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। তাঁত শিল্প ও কাপড়ের কলগুলির সহিত সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে "টেক্সটাইল এনকোয়ারী কমিটি" নামক একটি অনুসন্ধানী সমিতি (১৯৫৪) নানারূপ ব্যবস্থার নিদেশ দিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে এই শিল্পের উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে বস্ত্র এবং সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১০'২ কোটি গজ ও ১৬৪'০ কোটি পাঃ। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৯৫৫-৫৬ সালে নির্দিষ্ট উৎপাদনের তাগ (৪৭০ কোটি গজ বস্ত্র ও ১৬৪ কোটি পাঃ সূতা)-এর মধ্যে বস্ত্র উৎপাদনের তাগ ভারতীয় কলগুলি ১৯৫৩ সালেই অতিক্রম করিয়া যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কার্পাস শিল্পাগারসমূহে মোট ৪৯ লক্ষ গাঁইট কার্পাস উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে বস্ত্র রপ্তানীর (আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে) পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭'৩ কোটি গজ। ১৯৫৫-৫৬ সালে কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৪১২টিতে। ঐ সালে এই কলগুলিতে ১৮৪ কোটি পাঃ সূতা উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত ১'২ কোটি মাকু এবং ৪৯৫ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত ২ লক্ষ তাঁত উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত ছিল। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট এই শিল্পসম্পর্কিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি অনুসৃত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে বার্ষিক ৫১২'৭ কোটি গজ বস্ত্র ও ১৭৫ কোটি পাউণ্ড সূতা। ঐ সাল নাগাদ কলগুলির বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের ক্ষমতা দাঁড়ায় যথাক্রমে বার্ষিক ৫৩০ কোটি গজ বস্ত্র ও ২১০ কোটি পাউণ্ড সূতা। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতীয় কলগুলির বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের ক্ষমতা

তথা প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৫৮০ কোটি গজ বস্ত্র ও ২২৫ কোটি পাউণ্ড সূতা।

পশমবয়নশিল্প

কুটিরশিল্প হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পশম উৎপাদক অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদনের দিক হইতে গ্রেট ব্রিটেন,
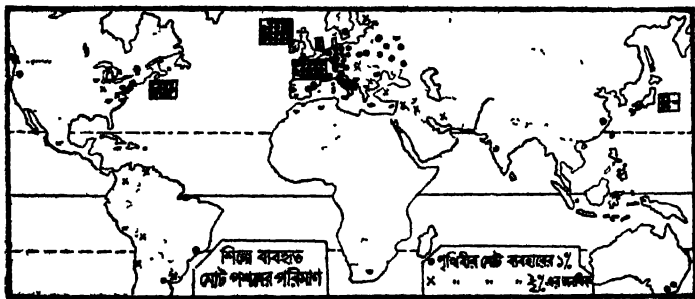
৮১নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম-বয়ন-কেন্দ্রসমূহ

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জার্মানীর পশমশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সমগ্র পশমশিল্পে যে পরিমাণ পশম ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় পশমশিল্পকেন্দ্রসমূহেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পশমশিল্প গ্রেট ব্রিটেন হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ক্যানাডা, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলেও পশমশিল্পের প্রসার দেখা যাইতেছে। নিম্নের সংখ্যামান হইতে ১৯৫০ সালে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে পশম সূতার উৎপাদন বুঝা যাইবে:—১৯৫০ সালে মোট পশম সূতার উৎপাদন ছিল ১,২৯৬,০০০ টন। উহার মধ্যে ২৮% উৎপাদন করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র, ১৯% যুক্তরাজ্য, ১২% সোভিয়েট রাষ্ট্র, ১০% ফ্রান্স, ৭% পঃ জার্মানী এবং ২৪% চীন বাদে অন্যান্য দেশ।

পশম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পশম উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে পশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই; **কারণ**—(১) এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হওয়ায় শ্রমিক সরবরাহ অপ্রচুর; (২) এই সমস্ত অঞ্চল বয়নযন্ত্র-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত; (৩) এই সমস্ত অঞ্চলে মৃদু ও স্বল্পকালস্থায়ী শীতকাল

এবং বিরল লোকবসতির দরুণ পশম বস্ত্রের চাহিদা অতি অল্প ; (৪) পরিষ্কৃত ও ধৌত পশম মূল্যবান এবং স্থায়ী বলিয়া এই সমস্ত পশম বহু দূর দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

গ্রেট ব্রিটেনের পশমবয়ন-শিল্প—পশমবয়ন-শিল্পের সংগঠনে ব্রিটেন পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—গ্রেট ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে এই শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে, কারণ—(১) ইয়র্কশায়ারের নিকটবর্তী পিনাইন পর্বতমালার গাত্র বহিয়া যে সমস্ত জলধারা পতিত হয় তাহাদের জল চুনবর্জিত ও নরম। তৈলাক্ত পশম পরিষ্কৃত করিবার পক্ষে এই শ্রেণীর জল একান্ত প্রয়োজনীয়। (২) ইয়র্ক-ডার্বি-নটিংহামশায়ার কয়লাখনির অঞ্চলসমূহ ইহার নিকটেই অবস্থিত। (৩) এই অঞ্চলে সুলভ শিল্পশ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ রহিয়াছে। (৪) পিনাইন পর্বতাঞ্চল হইতে প্রচুর পশমের সরবরাহ হয়। (৫) পশমজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যধিক। (৬) এই অঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় যানবাহন ও আমদানী-রপ্তানীর প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে। (৭) এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া পশমশিল্পের অনুকূল।

লীড্‌স, ব্র্যাডফোর্ড, হাডার্সফিল্ড, হ্যালিফ্যাক্স, ওয়েকফিল্ড, ডিউসবেরী এবং ব্যাটলী ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের বিখ্যাত পশমশিল্পকেন্দ্র। এই নাতিবিস্তৃত অঞ্চলটির মধ্যে আবার **উৎপাদনবৈশিষ্ট্য** পরিলক্ষিত হয়। ইয়র্কশায়ারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ব্র্যাডফোর্ড, হ্যালিফ্যাক্স, কেইলী প্রভৃতি পশমশিল্প-কেন্দ্রসমূহ অতি উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং হাডার্সফিল্ড, ডিউসবেরী, ব্র্যাডফোর্ড, লীডস্ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পশম-কেন্দ্রসমূহ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইয়র্কশায়ার ব্যতীতও (১) পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, উত্তর ম্যাঞ্চেস্টার (রক্‌ডেল এবং বিউরি), পূর্ব ম্যাঞ্চেস্টার (মস্‌লে এবং স্ট্যালীব্রীজ), (২) পশ্চিম ইংল্যাণ্ড (স্ট্রাউড, ডার্স্‌লে, উইট্‌নে, ট্রব্রিজ, কিডারমিনিস্টার), (৩) ওয়েলস (ক্যামার্থন-শায়ার), (৪) লীস্টারশায়ার (লীস্টার, মান্ত্র, উইগস্টন, লাফারবরো), (৫) স্কটল্যাণ্ড (হউইক) এবং (৬) আয়র্ল্যাণ্ড (বলিমেনা, বেলফাস্ট এবং কর্ক) অঞ্চলেও পশম শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা—গ্রেট ব্রিটেনের পশম শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র পশমের মাত্র ১৫ ভাগ গ্রেট ব্রিটেনে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা হইতে আমদানী হইয়া আসে। গ্রেট ব্রিটেন অতি উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানী করে। ভারত, জাপান, সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া, ডেনমার্ক, ইতালী, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ব্রিটেনের পশমজাত দ্রব্যের প্রধান গ্রাহক।

মহাদেশীয় ইউরোপের পশমবয়ন-শিল্প—উচ্চশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে **ফ্রান্স** পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের পশম শিল্প প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ফ্রান্সে উৎপন্ন পশমের পরিমাণ ঐ দেশের পশম শিল্পের চাহিদা অপেক্ষা অল্প হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পশম আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে ফ্রান্সে আমদানী হইয়া আসে। রুয়েঁ, রুবে, লীল, টুরকোয়াঁ ও রেইম ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য পশমশিল্প-কেন্দ্র। **বেলজিয়ামের** ব্রুসেলস্, **পশ্চিম জার্মানীর** রূঢ় অববাহিকা, **পূর্ব-জার্মানীর** স্যাক্সনী অঞ্চল এবং **পোল্যাণ্ডের** সাইলেশিয়া ইউরোপীয় পশম বয়ন শিল্পের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রসমূহ।

রুশিয়ার পশম বয়ন কেন্দ্রসমূহ ঐ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করিলেও মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ক্রিয়ানোভো, ক্লিন্‌ৎসি, পাভলোভস্কি প্রভৃতি স্থানে এবং ইউরোপীয় রুশিয়ার মধ্যভাগেই সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইউক্রেন, ককেসাস, কাজাকস্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও নূতন নূতন পশম বয়ন কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পশমবয়ন-শিল্প—যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসবয়ন-শিল্পের পরই পশম-বয়নশিল্পের স্থান। পশম-শিল্পের প্রসার যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তবে মেরীল্যাণ্ড হইতে ওহিও, পেনসিলভ্যানিয়া, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক এবং দক্ষিণ নিউ ইংল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া মেইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক। এই বহুবিস্তৃত অঞ্চলটির মধ্যে আবার ফিলাডেলফিয়া, প্রভিডেন্স, লোয়েল এবং অরসেস্টার অঞ্চলে বয়ন যন্ত্রপাতির নৈকট্য, অনুকূল জলবায়ু, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নিকটবর্তিতা, পশম বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা এবং পর্যাপ্ত নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহহেতু পশম বয়নশিল্প সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। এতদঞ্চলের ফিলাডেলফিয়া গালিচা তৈয়ারীর শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বহুল পরিমাণে পশম অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে। উৎপাদিত পশমবস্ত্রের অধিকাংশই দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়, অতি সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

জাপানের পশম শিল্প অন্যান্য শিল্পের ন্যায় তাদৃশ উন্নত নহে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমদানীকৃত পশমের সাহায্যে ওসাকা ও আইচি অঞ্চলে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **চীন** (সাংহাই), **অস্ট্রেলিয়া** (সিড্‌নী ও মেলবোর্ন), **ভারত** (পাঞ্জাব ও উঃ প্রদেশ), **ব্রাজিল** (রায়ো-ডি-জেনেরো), **আর্জেন্টিনা** (বুয়েনস আয়ার্স) প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

ভারতের পশম বয়ন শিল্প—পশম সরবরাহস্থলের নৈকট্য, সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য এবং উপযুক্ত জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ১৮৭৩ সালে

কানপুর ও ধারিওয়াল অঞ্চলে ভারতের প্রথম বৃহদায়তন পশম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৪৪টি বৃহদায়তন পশম শিল্পাগার ছিল। ইহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৪টি; বোম্বাইতে ৮টি, পঃ বঙ্গে ১টি; সৌরাষ্ট্রে ১টি; মহীশূরে ৩টি; কাশ্মীরে ১টি, এবং পূর্ব-পাঞ্জাবে ২৬টি কল ছিল। ঐ সালে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৮০০০ এরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক ও ৭ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন, ১.২ লক্ষ মাকু ও ২ হাজার শক্তিচালিত তাঁত নিযুক্ত ছিল। এই সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ২০১.৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮৪ লক্ষ পাউণ্ড পশম সূতা। উপরোক্ত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশমবয়ন প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে।

ভারতে বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ৭.২ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপাদিত হয়। তবে ইহার মাত্র ২৪০ লঃ পাঃ পশম শিল্পাগারসমূহে; ১০০ লঃ পাঃ কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে; ১৩২ লঃ পাঃ কম্বল তৈয়ারীতে; এবং ২৪৬ লঃ পাঃ রপ্তানী কার্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পশম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার অনুরূপ পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে প্রতি বৎসর ৩৩৯ লক্ষ পাঃ কাঁচা পশমের প্রায়োজন হয়। এই কলগুলি প্রতি বৎসর প্রায় ১৫০ হইতে ১৮০ লঃ পাঃ উচ্চশ্রেণীর পশম অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, তিব্বত, পারস্য, আফিগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করে। ভারতীয় পশমের অধিকাংশই পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিকানীর হইতে আসে। এই পশম অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারত উচ্চ-শ্রেণীর পশম উৎপাদনে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতীয় শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত মোট পশমের শতকরা ৪৯.৬ ভাগ দ্বারা কম্বল, ২৮.৭ ভাগ দ্বারা বস্ত্র, ১১.৬ ভাগ দ্বারা গালিচা, ৬.৮ ভাগ দ্বারা সূতা এবং অবশিষ্টাংশ দ্বারা অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরে ছাগের পশম হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র ও শাল প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরের শাল উৎপাদন কুটির শিল্প হিসাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে গালিচা এবং গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গেঞ্জি প্রস্তুত হয়।

ভারতীয় পশম শিল্পের প্রধান **অসুবিধা** এই যে এই দেশে শীতকাল অল্প-স্থায়ী হওয়ায় পশম দ্রব্যের চাহিদা অধিক নহে—বাৎসরিক মাত্র ২০০ হইতে ২১০ লঃ পাঃ। অপরপক্ষে পশম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই অল্পপরিমাণ চাহিদা মিটাইবার জন্য সারাবৎসরই চালু রাখিতে হয়, ফলে উৎপাদনের ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। আবার, কি পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা ভবিষ্যতে হইবে তাহাও সঠিক নিরূপণ করা এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভব নহে, ফলে, চাহিদা ও যোগানের তারতম্য হেতু পশমজাত দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগতই হ্রাস ও বৃদ্ধি

পাইতে থাকে। নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পশম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়া "ফেডারেশন অব উলেন ম্যানুফ্যাকচারার্স ইন ইণ্ডিয়া" নামক একটি সংঘ গঠন করা হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই শিল্পের দুইটি **সমস্যা** দেখা গিয়াছে। (১) উচ্চ শ্রেণীর পশম আমদানীর স্বল্পতা ও অসুবিধা এবং (২) দক্ষ কারিগরের অভাব। **পরিকল্পনা কমিশন** এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত কার্য-ধারার নির্দেশ দিয়াছেন—(১) নূতন কল স্থাপন অপেক্ষা বর্তমান কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; (২) মেষপ্রতি পশমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পশমের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে মেষজননকেন্দ্র স্থাপন করা; এবং (৩) পশম ধৌতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ সাধনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। উপরোক্ত কার্যধারা অনুসৃত হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ১১৯টি বৃহদায়তন পশম শিল্পাগার গড়িয়া উঠে। ঐ সালে এই কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে বার্ষিক ৩৮০ লক্ষ পাঃ সূতা এবং ৪৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র ও ২১৭ লক্ষ পাঃ সূতা এবং ১৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র। ঐ সালে কলগুলিতে ১.৬ লক্ষ মাকু ও প্রায় ৪ হাজার শক্তি-চালিত তাঁত উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে পরিকল্পনা কমিশন যে সমস্ত নির্দেশ দিয়াছেন তাহা কার্যকরী হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে ভারতীয় পশম শিল্পাগার সমূহের মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ লক্ষ পাঃ সূতা ও ৪৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ২৮০ লক্ষ পাঃ সূতা ও ১৫০ গজ বস্ত্র। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৬৭০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৪৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ৫২০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৩৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র।

রেশম বয়ন-শিল্প*

যুক্তরাষ্ট্রের রেশম বয়ন-শিল্প—রেশম-শিল্প সংগঠনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পূঃ পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া, দঃ নিউইংল্যাণ্ড, উঃ নিউজার্সি এবং দঃ নিউইয়র্ক অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার সমধিক। এই অঞ্চলে পৃথিবীর মোট রেশম দ্রব্য উৎপাদনের ৪০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট রেশম দ্রব্য উৎপাদনের ৮০% উৎপাদিত হয়। নিপুণ শ্রমিক ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, স্থানীয় চাহিদার ব্যাপকতা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, এবং পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা হেতু এই সমগ্র অঞ্চলটিতে রেশম বয়নশিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। শিল্পে ব্যবহৃত সমগ্র রেশমই জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে

*গুটি (cocoon) হইতে রেশম সূতার উৎপাদন—পৃঃ ১৪৪ দেখ।

আমদানী হইয়া আসে। রেশম দ্রব্যের ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

ইউরোপের রেশম বয়ন-শিল্প—পৃথিবীর মোট রেশম বস্ত্রের প্রায় ⅔ অংশই ইউরোপ মহাদেশে উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের ফ্রান্স ও ইতালীতেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক। সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। কয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ, রেশম বস্ত্রের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা, দক্ষিণ ইউবোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম সরবরাহ, এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থানীয় রেশমবয়নশিল্পসমূহকে শুল্কের সাহায্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ প্রভৃতিই হইল ইউরোপীয় রেশম বয়ন শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। লিয় **ফ্রান্সের** সর্বপ্রধান রেশমশিল্পকেন্দ্র। এই অঞ্চলে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ এবং রোন অববাহিকার কয়লা ও রেশমের প্রাচুর্য এই শিল্পের উন্নতির সহায়ক। শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত রেশমের পরিমাণ দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত রেশমেব পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ইতালী, জাপান ও চীন হইতেও ফ্রান্সে রেশম আমদানী করা হয়। স্যাঁতেতিয়েঁ, অ্যাভিগ্নঁ এবং নিমে অঞ্চলেও রেশম দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

উত্তরে পো অববাহিকা অঞ্চলে **ইতালীর** রেশম শিল্প সংগঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে রেশম, জলবিদ্যুৎ এবং সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য রেশম-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সহায়তা করে। কমো, মিলান ও বার্গামোতে রেশম সূত্র প্রস্তুত হয় এবং মিলানে রেশম বয়ন হইয়া থাকে। ইহা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-কেন্দ্র।

জার্মানীর স্যাক্সনী ও রাইন পর্যংকে বহু রেশম বয়ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ক্রেফেল্ড জার্মানীর বিখ্যাত রেশম বয়ন কেন্দ্র। **সুইজারল্যাণ্ডের** বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

যুক্তরাজ্যে রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। দক্ষিণ-পূর্ব চেশায়ার, উত্তর-পশ্চিম স্ট্যাফর্ডশায়ার, ম্যাকল্‌সফিল্ড, লীক এবং লংটন অঞ্চলেই এই শিল্পেব প্রসার ব্যাপক।

জাপানের রেশমবয়ন-শিল্প—জাপানে রেশমকীট পালন (sericulture) এবং গুটি হইতে রেশম সূত্র উৎপাদন একটি ব্যাপক শিল্প হইলেও রেশমবয়ন-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। জাপানের জলবায়ু রেশমকীট পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জাপানের অন্তর্গত হনসু দ্বীপের অনুর্বর ভূমিভাগে প্রচুর তুঁত গাছ জন্মিয়া থাকে। এই গাছের পাতা খাইয়াই গুটিপোকা বাঁচিয়া থাকে। জাপানে বৎসরে দুইবার (বসন্ত ও শরৎকালে) রেশমগুটির উৎপাদন করা হয়। গুটি হইতে সুতা উৎপাদন প্রধানতঃ কুটীর শিল্প হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। মধ্য হনসু (ফোলা ম্যাগনা, কোয়াণ্টা সমভূমি ও নাগোইয়া

অঞ্চল) ও কিউসিউ দ্বীপেই অধিক পরিমাণে রেশম সূতা উৎপাদিত হয়।

রেশম বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসিকাওয়া, কিয়োটো, কোয়াণ্টো, টোচিগি, ইমানসী প্রভৃতি অঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। এতদঞ্চলের রেশমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন। তবে হনসু দ্বীপের পশ্চিমতটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে রেশম শিল্পের বৃহদায়তন কারখানাও রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জাপান উৎপাদিত রেশম সূতার প্রায় ৮৫% যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করিত। এই ব্যবসায় বর্তমানে আবার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে সূতা রপ্তানী করিবার কারণ রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে রেশম বস্ত্রের চাহিদা ও নমুনা সর্বসময়ে স্থির করা জাপানের পক্ষে সম্ভব নহে। উপরন্তু রেশম সূতার উপর যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী শুল্ক রেশম বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক অপেক্ষা অল্প। সম্প্রতি অবশ্য জাপান রেশম বস্ত্রও রপ্তানী করিতেছে। জাপানের রেশম বস্ত্রের অপরাপর ক্রেতা হইল ভারত, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ।

চীনের রেশমবয়ন শিল্প—চীনদেশে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে প্রচুর রেশম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ক্যাণ্টন, সাংহাই এবং অন্যান্য শহরে বয়নের কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। চীনের রেশম দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

ভারতের রেশমবয়ন-শিল্প—রেশম শিল্প ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। পূর্বে কুটিরশিল্প হিসাবে রেশমের অতি সূক্ষ্ম সূত্র ও বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলের কূট বাণিজ্য-নীতি, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, ধনী ও রাজন্যবর্গ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অল্প মূল্যের কৃত্রিম রেশমের প্রচুর আমদানী প্রভৃতি কারণে ভারতের এই অতি প্রাচীন কুটিরশিল্পটির নিতান্ত অবনতি ঘটিতে লাগিল। কিছুদিন যাবৎ এই শিল্প সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর ও মহীশূর সরকারের উদ্যমে তথাকার রেশম শিল্প যেরূপ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইতেছে তাহাতে মনে হয় সরকারের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের রেশম শিল্পেরও ভবিষ্যতে সেইরূপ উন্নতি হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে।

উৎপাদন-স্থান ও শিল্পাঞ্চল—বর্তমানে ভারতে গরদ, তসর, এণ্ডি, মুগা, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রেশম বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতের প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলেই রেশম উৎপাদিত হয়:—(ক) দক্ষিণ মহীশূর ও মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর জেলা; (খ) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা; এবং (গ) কাশ্মীর, জম্মু ও পাঞ্জাবের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ

ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে তসর, আসামে এণ্ডি ও মুগা, নীলগিরি অঞ্চলে মুগা এবং উত্তর বিহার অঞ্চলেও বর্তমানে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর এবং কাশ্মীরেই রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। **কাশ্মীরের** শ্রীনগর বর্তমানে ভারতের মধ্যে রেশম শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রেশম উৎপাদনের উপর কাশ্মীর সরকারের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে অধিকাংশ রেশম ইউরোপে রপ্তানী হয়। ভারতের সর্বত্রই রেশম শিল্প এখনও প্রধানতঃ কুটিরশিল্প হিসাবেই পরিচালিত হইতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৯০টি বৃহদায়তন রেশম শিল্পাগার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান (১টি পশ্চিমবঙ্গে, ১টি মহীশূরে এবং ১টি মহারাষ্ট্রে) বিদ্যুৎ সঞ্চালিত মাকু ব্যবহার করিয়া থাকে। **পাঞ্জাবের** অমৃতসর, জলন্ধর এবং মুলতান', **উত্তর-প্রদেশের** কাশী, মির্জাপুর, শাহজাহানপুর, **পশ্চিমবঙ্গের** মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া (সদর) ও বিষ্ণুপুর, **বিহারের** ভাগলপুর, **মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের** নাগপুর, আমেদাবাদ, পুণা, বেলগাঁও, ধারওয়ার, হুবলী ও শোলাপুর, **মহীশূরের** ব্যাঙ্গালোর, **অন্ধ্রের** বহরমপুর, **মাদ্রাজের** ত্রিচিনপল্লী, সালেম এবং তাঞ্জোর অঞ্চলেও রেশম বয়ন শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশাভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় রেশম দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চীন ও জাপান হইতে রেশম আমদানী বন্ধ হওয়ায় এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত ৮৬৮৩১৪ পাউণ্ড রেশম এবং ৩ লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করে।

ভারতীয় রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে বহুবিধ প্রচেষ্টা চলিতেছে। ১৯৩৫ সালে গঠিত 'ইম্পিরিয়াল সেরিকালচার কমিটি' পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ রাজ্যের রেশম শিল্পের উন্নতিবিধানকল্পে সচেষ্ট রহিয়াছে। বর্তমানে আমদানীকৃত বৈদেশিক রেশম হইতে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইতেছে এবং স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের স্পৃহাও দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশম কীট পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে দুইটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং আসাম, মহীশূর ও কাশ্মীরেও অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ভারত আবার রেশম শিল্পে পূর্বগৌরব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। ভারতীয় রেশম শিল্পের অধিকতর উন্নতি সাধন করিতে হইলে সরকার হইতে অর্থসাহায্য, সংরক্ষণ, প্রচার কার্য এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা যাহাতে দরিদ্র শিল্পীরা শোষিত হইতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। সমবায়

সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল বিঘ্ন অপসারণ করা সম্ভবপর। রেশম শিল্পীরা যাহাতে উন্নতধরণের দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভারতের কৃত্রিম রেশম (রেয়ঁ) শিল্প*—ঘাস, বাঁশ, কাষ্ঠমণ্ড ও পরিত্যক্ত কার্পাসের মণ্ড হইতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করা যাইতে পারে। তবে কাষ্ঠমণ্ড অপেক্ষা পরিত্যক্ত কার্পাস হইতে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন হার অধিক। কষ্টিক সোডা, কার্বন ডাই-সালফাইড, সালফিউরিক এ্যাসিড, এ্যাসেটিক এ্যাসিড, এ্যাসিটোন, এ্যালুমিনিয়াম সালফেট, হোয়াইট সোপ, ব্লিচিং লিকুইড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে ক্লোরাইড-বর্জিত জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৫০ সাল হইতেই ভারতে এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ২টি (কেরালার আলওয়াএ এবং বোম্বাই) কৃত্রিম রেশম বয়ন প্রতিষ্ঠান ছিল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে ১৯৫১ সালে ৭·১ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন এবং ১৪০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে এই দুইটি কলের উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া। সম্প্রতি আরও দুইটি (প্রাক্তন হায়দরাবাদ ও মধ্যপ্রদেশ) প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত ৮৪ লক্ষ গজ কৃত্রিম রেশম পাকিস্তান, সিংহল ও ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানে রপ্তানী করে এবং ঐ সালে আমদানী করে ৩৬৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র। বর্তমানে এই শিল্পের প্রধানতম **সমস্যা** হইতেছে যে রেয়ঁ তৈয়ারীতে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাঁচামালই—যথা কাষ্ঠমণ্ড, কটন লিণ্টার, কষ্টিক সোডা, গন্ধক প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যধারার নির্দেশ দিয়াছেন—(১) দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে রেয়ঁ শিল্পের সম্প্রসারণ, রাসায়নিক ও মণ্ড প্রস্তুত শিল্পের সম্প্রসারণের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; (২) বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে দেশাভ্যন্তরে একটি রাসায়নিক মণ্ড তৈয়ারীর কল স্থাপন ও কটন লিণ্টারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল ও তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

---

* পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন—পৃঃ ২৭৭ দেখ।

রেয়, স্টেপ্‌ল্‌ ফাইবার ও রাসায়নিক মণ্ডের উৎপাদন
১৯৫০-৫১—১৯৬৫-৬৬

	একক	১৯৫০-৫১ উৎপাদন	১৯৫৫-৫৬ উৎপাদন	১৯৬০-৬১ অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	১৯৬০-৬১ অনুমিত উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ উৎপাদন ক্ষমতা	১৯৬৫-৬৬ উৎপাদন
রেয়ন সুতা	মিঃ পাউণ্ড	০.৪	১৬.০	৫২.৭	৪৭.০	১৪০.০	১৪০.০
স্টেপল ফাইবার	,,	..	১৪.০	৪৮.০	৪৭.৮	৭৫.০	৭৫.০
রাসায়নিক মণ্ড	হাজার টন	..	...	...	.	১০০.০	৯০.০

প্রশ্নোত্তর

1. Account for the localisation and state the present position of the cotton textile industry of Great Britain. (C.U. '53 '58)

(গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পের একদেশীভবন এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৪৩০-৪৩২)

2. Give a brief account of the cotton textile industries of (a) the U.S.A. and (b) Japan.

((ক) যুক্তরাষ্ট্র ও (খ) জাপানের কার্পাস শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

((ক) পৃঃ ৪২৯-৪৩০, (খ) ৪৩২-৪৩৩)

3. Discuss the regional distribution, present position and the future prospects of Indian cotton textile industry. (C.U. '51)

(ভারতীয় কার্পাস শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪৩৩-৪৩৮)

4. Give an account of the woollen industry of Great Britain (C.U. '45)

(গ্রেট ব্রিটেনের পশম বয়ন শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৪৩৯-৪৪০)

5. Indicate the causes that account for the lack of woollen industry in the major wool producing centres of the world.

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চল সমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থার কারণ সমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৪৩৮-৪৩৯)

6. Give an account of the development of woollen industry in India.

(ভারতে পশম বয়ন শিল্পের বর্তমান সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।)

(পৃঃ ৪৪০-৪৪২)

7. Indicate the present day development of silk and rayon industries in India.

(ভারতীয় রেশম ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থা নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ৪৪৪-৪৪৬ এবং পৃ ৪৪৬-৪৪৭

বিংশ অধ্যায়

অন্যান্য শিল্প

পাট শিল্প

অবিভক্ত ভারত হইতে আমদানীকৃত পাটের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী ডাণ্ডি (Dundee) অঞ্চলেই পৃথিবীর পাটশিল্প সর্বপ্রথম গড়িয়া উঠে। পরবর্তী কালে অবশ্য পাটশিল্প ভারতেই একচেটিয়া শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে ইউরোপের বহু দেশে ভারত ও পাকিস্তান হইতে আমদানীকৃত পাটের সাহায্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মদেশ, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পূর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও পাট শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

ভারতের পাট শিল্প—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সন্নিকটে রিষড়া নামক স্থানে ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই বঙ্গদেশ পাট-শিল্পে সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৯৫০ সালে ভারতে ১১২টি পাটের কল ছিল। তন্মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে ১০১টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, এবং অন্ধ্রে ৪টি কল ছিল। বর্তমানে এই শিল্পে ৭২ হাজারেরও অধিক মাকু, ৩ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এবং প্রায় ১৯ কোটি টাকা পরিমিত স্থিরীকৃত মূলধন নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে এই সমস্ত কলগুলির উৎপাদনক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১২ লক্ষ টন ও ৮.৯২ লক্ষ টন। ঐ সালে এই কলগুলিতে মোট পাটের ব্যবহার হয় ৫৮ লক্ষ গাঁইট; কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩ লক্ষ গাঁইট।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর তীরে ভারতের পাট শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, কারণ—(১) কলিকাতা বন্দর ভিন্ন অন্য কোন বন্দর দিয়া পাট রপ্তানী হয় না। (২) ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার খনিসমূহ হইতে কলিকাতার পাটকলসমূহে স্বল্পব্যয়ে কয়লা আমদানী করা সহজ। (৩) এই অঞ্চলে মূলধনের সরবরাহ প্রচুর। (৪) এই অঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা হইতে সহজে শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়। (৫) এই অঞ্চলে নদীপথে যানবাহন ব্যবস্থা অতি উন্নত। (৬)

এই অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু পাট শিল্প প্রসারের অনুকূল (৭) পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ এই অঞ্চলের নিকটবর্তী এবং উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত। (৮) ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী রিষড়াতে ভারতের সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালেও এই অঞ্চলের চতুর্দিকে বহু পাট-শিল্পাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। (৯) কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য হেতু বিদেশ হইতে পাট-বয়ন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী করার এবং পাটজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করার প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে। বালী, আগরপাড়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়া, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া ও বজবজ পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পাট-শিল্পকেন্দ্র। **অন্ধ্রের** ৪টি কলের মধ্যে দুইটিই বৃহদায়তন। ইহাদের একটি বিশাখাপত্তনম জেলার বিমলিপট্টম তালুকের অন্তর্গত চিতাভালসা এবং অপরটি ঐ জেলার নেলিমারলা অঞ্চলে অবস্থিত। **উত্তরপ্রদেশের** তিনটি কল কানপুর ও সাজানওয়া অঞ্চলে অবস্থিত।
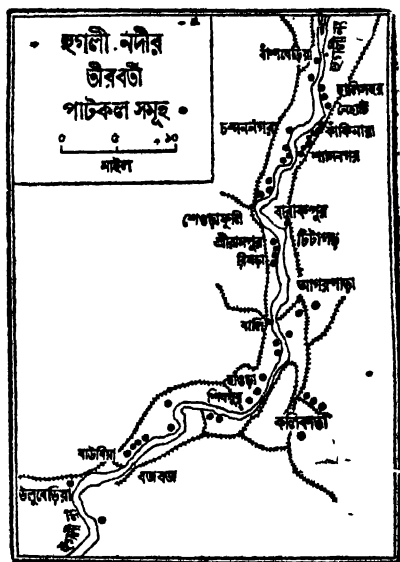
৮২নং চিত্র—হুগলী নদীর তীরবর্তী পাটকলসমূহ

পাটজাত দ্রব্যাদি চারি শ্রেণীর—থলে, চট, গালিচা এবং দড়ি। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, যবদ্বীপ, জাপান, আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা এবং নেদারল্যাণ্ড প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত ৬'৫ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য (মূল্য ১'১৪ লক্ষ টাকা) বিদেশে রপ্তানী করে। বর্তমানে মোট রপ্তানীর প্রায় অর্ধেকই যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে এবং ইহার পরই যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার স্থান। ১৯৫৩ সালে উৎপাদিত ৮'৬৯ লক্ষ টন পাট-জাত দ্রব্যের প্রায় ৮৬%-ই [৭'৪৮ লক্ষ টন] বিদেশে রপ্তানী হয়। কলিকাতা বন্দরের মোট রপ্তানীর প্রায় ৫০% এবং সমগ্র ভারতের মোট রপ্তানীর ২০%-২৫%-ই পাট ও পাটজাত দ্রব্য।

বর্তমান অবস্থা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় পাটশিল্পের সাময়িক শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু অতি সামান্য সময় অতিবাহিত হইবার

পর হইতেই শ্রমিক সমস্যা, কয়লার অপ্রাচুর্য, যুদ্ধের দরুণ দ্রব্যাদি রপ্তানীর অসুবিধা এবং পাটের উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি কারণে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের পর হইতে পশ্চিম বঙ্গের পাটশিল্পে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে। তবে **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে দেশাভ্যন্তরে পাট উৎপাদনের স্বল্পতা এবং যন্ত্রপাতির ও কল-কারখানার সংস্কার সাধনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) এক পূর্ববঙ্গেই উৎপন্ন হয় অবিভক্ত ভারতের প্রায় ৭৩·৪% পাট, অথচ পাটকলের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ফলে বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই ভারত পাটেব জন্য পাকিস্তানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। তবে পরবর্তীকালে ভারত সরকারের চেষ্টায় দেশাভ্যন্তবে পাটের উৎপাদন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৬·৫ লক্ষ গাঁইট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫০-৫১ সালে দাঁড়ায় ৩২·৮ লক্ষ গাঁইটে। ভাবতীয় কলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার অনুরূপ পরিমাণ পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভাবতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২·০ লক্ষ গাঁইট এবং মেস্‌টা ও বিমলি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ গাঁইটে। তাই পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী না হওয়া পযন্ত ভারতকে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানী করিতেই হইবে। (২) আবার পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান প্রভৃতি দেশে আধুনিক ধরণের পাটের কল গড়িয়া উঠিতেছে। এমতাবস্থায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে হইলে ভারতীয় কলগুলিরও যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধন করা আশু কর্তব্য।

পাটশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য "দি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট এনকোয়ারী কমিটি" বস্তা ও চট ব্যতীত অন্যান্য কি কি কার্যে পাট ব্যবহার করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে গবেষণা কার্য চালাইতেছে। এই সমিতির উদ্যোগে ও গবেষণার ফলে পাটজাত দ্রব্যাদি গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও বয়নশিল্পে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৩৮ সালে স্থাপিত "দি ইনষ্টিট্যুট অব জুট টেকনোলজি"-ও পাটের নানাবিধ ব্যবহার উদ্ভাবন কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতীয় **পরিকল্পনা কমিশন** এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত কার্যসূচীর নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) পাটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (২) স্বল্পমেয়াদী কার্যধারা হিসাবে পাকিস্তান হইতে বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে পাটের আমদানী করিতে হইবে; (৩) পাটশিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ব্যবস্থা দেশাভ্যন্তরেই করিতে হইবে; (৪) প্রচারকার্যের দ্বারা বিদেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং (৫) আভ্যন্তরীণ মূল্য-স্তর ও বৈদেশিক চাহিদার

সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যে মধ্যে রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এই সমস্ত কার্যধারা অনুসৃত হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় পাটকলসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে বার্ষিক ১২ লক্ষ ও ১১'৫ লক্ষ টন, রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮'৭৫ লক্ষ টন এবং শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২ লক্ষ গাঁইট। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অনুসৃত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে ভারতীয় পাটকল-সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২ লক্ষ টন ও ১০'৬৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১২ লক্ষ টন ও ১১ লক্ষ টন।

কাগজ শিল্প*

ভারতের কাগজ শিল্প—ভারতে কলে প্রস্তুত কাগজের উৎপাদন আরম্ভ হয় ১৮৭০ সালে, হুগলী নদীর তীরে বালির "রয়্যাল পেপার মিলে"। ১৯৫১ সালে ভারতে মোট ১৭টি কাগজের কল ছিল। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে ৪টি, বোম্বাই প্রদেশে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, মাদ্রাজে (বর্তমানে অন্ধ্রে) ২টি এবং বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া কল ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতাই ভারতীয় কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। বর্তমানে ভারতীয় কাগজ-শিল্পাগারসমূহে ২১'৮ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও প্রায় ২২,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ১৭টি কলের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১'৩৬৬ লক্ষ টন এবং প্রকৃত উৎপাদন ১'১৪ লক্ষ টন। ইহা ব্যতীতও ১৯৫০-৫১ সালে ১৮টি বোর্ড নির্মাণের কল ছিল। ঐ সমস্ত কলের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক ০'৪৮৫ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিল ০'২২ লক্ষ টন। ১৯৫০-৫১ সালের মোট উৎপাদন ১'১৪ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ ৭২,০০০ টন, মুড়িবার কাগজ ২৭,০০০ টন, বিশেষ শ্রেণীর কাগজ ৪,০০০ টন ও কাগজের বোর্ড ২১,০০০ টন উৎপাদিত হয়।

ভারতীয় কাগজের কলসমূহে সাবাই ঘাস ও বাঁশ প্রধান **কাঁচামাল** রূপে ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারীর জন্য ছিন্নবস্ত্র, পাট, শণ এবং পুরাতণ কাগজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাবাই ঘাস উত্তরপ্রদেশ ও নেপালে প্রচুর জন্মে। আসামের কাছাড়, উড়িষ্যার সম্বলপুর, আঙ্গুল, পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি জেলায় এবং গুজরাট রাজ্যের সুরাট ও মহারাষ্ট্রের কানাড়া জেলায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ সাবাই ঘাসের কাগজ অপেক্ষা

* পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কাগজ শিল্প—পৃঃ ২৭৬-২৭৭ দেখ।

নিকৃষ্ট। কিন্তু বাঁশের মণ্ডে কাগজের পরিমাণ অধিক হয় এবং উৎপাদিত কাগজের মূল্যও সুলভ হয়। ভারতে বাঁশের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং ভারতে উচ্চশ্রেণীর কাগজের চাহিদা অল্প হওয়ায় মনে হয় এদেশে বাঁশ হইতে কাগজ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা আছে। উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারী করিতে কাষ্ঠমণ্ড ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ যদিও প্রচুর জন্মে, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা হেতু উহাদিগকে উপযুক্তভাবে কার্যে ব্যবহার করা যাইতেছে না। কাশ্মীর রাজ্যের পাইন বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠমণ্ড এবং উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্প্রতি দেরাদুনের বন-বিজ্ঞান গবেষণাগার বাগাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্লিচিং পাউডার, কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। ১ টন কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রায় ৩½ টন কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে যে সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইতেছে সে সমস্ত স্থানে কয়লার ব্যবহার অল্প।
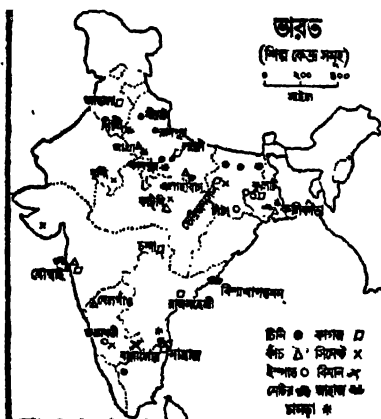
৮৩নং চিত্র—ভারতের শিল্পকেন্দ্রসমূহ

উৎপাদক অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, রাণীগঞ্জ এবং নৈহাটিতে কাগজের কল রহিয়াছে। পূর্বে এই সমস্ত কলে ১০০০ মাইল দূর হইতে আনীত সাবাই ঘাস কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে এই কলসমূহে বাঁশের মণ্ডও ব্যবহৃত হইতেছে। পঃ বঙ্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, ঘাস ও বাঁশের; রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো প্রভৃতি খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লার; স্থানীয় শিল্পাগারসমূহ হইতে এবং কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের; জল, মূলধন ও শ্রমিকের স্থানীয় সরবরাহের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হেতু ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। কলিকাতা কাগজের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার। **উত্তরপ্রদেশ** কাগজ উৎপাদনে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রদেশের কাগজের কল দুইটির একটি লক্ষ্ণৌ এবং অপরটি সাহারানপুরে অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ-এর কলটি বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঘাসের দ্বারা এবং সাহারান-

পুরের কলটি উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম-অঞ্চলের ঘাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদন করিতেছে। **বিহারের** কাগজের কল ডালমিয়ানগরে অবস্থিত। এই কলে সাবাই ঘাস ব্যবহৃত হয়। **উড়িষ্যার** সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত ব্রজবাজনগরের কাগজের কলে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। **পাঞ্জাবের** কাগজের কল জগদ্ধীতে অবস্থিত। ৫০০ মাইল দূরবর্তী নেপাল হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া এই কল চালানো হয়। জগদ্ধীর কলটিতে সুলভ জলবিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ রহিয়াছে। **মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের** কাগজের কলসমূহ বোম্বাই, পুণা এবং আমেদাবাদে অবস্থিত। এই কলগুলির নিকট কাঁচামাল না থাকায় কাষ্ঠমণ্ড (আমদানীকৃত), ছিন্নবস্ত্র এবং কাগজ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **মহীশূর** (ভদ্রাবতী) এবং **কেরালার** (পুণালুর) কলসমূহে বাঁশ এবং জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। অন্ধ্রের কল দুইটি রাজমহেন্দ্রী ও সিরপুরে অবস্থিত। সম্প্রতি (১৯৫৫) মধ্যপ্রদেশের **নেপানগরে** সংবাদ-পত্রের কাগজ উৎপাদনের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি কারখানা মধ্যপ্রদেশ সরকারের সাহায্যে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে এই শ্রেণীর কাগজের চাহিদা ছিল ৬০ হাজার টন, কিন্তু এইরূপ অনুমিত হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ লক্ষ টন (প্রকৃত চাহিদা দাঁড়ায় ৭৫,০০০ টন)। স্থানীয় কাষ্ঠ হইতে এই কলে ব্যবহারের উপযোগী কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হইবে। কাশ্মীর এবং গাড়োয়াল রাজ্যেও কাগজ শিল্প সংগঠনের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। টিস্যু কাগজ তৈয়ারীর জন্য পঃ বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একটি কারখানা খোলা হইয়াছে।

বর্তমান অবস্থা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে কাগজের উৎপাদন ও চাহিদা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে, বর্তমানে ভারতীয় কাগজ শিল্প কতক-গুলি **অসুবিধার** মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। (১) কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সল্ট-কেক্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ অতি উচ্চমূল্যে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে, (২) বন্দর-অঞ্চল হইতে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য কাগজ-শিল্পাগারসমূহে প্রেরণের খরচও অত্যধিক; (৩) শিল্পশক্তির অভাবও কাগজ-শিল্পাগারসমূহে বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে; (৪) বিদেশী কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে; এবং (৫) দেশ বিভক্ত হওয়ায় বাঁশের অপ্রাচুর্য দেখা গিয়াছে।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের ১৯টি কাগজের কলের [মহীশূর, ও বোম্বাই (পুণা)-এর প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোট ২টি নূতন কল] বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২·১১ ও ২·০০ লক্ষ টন এবং নেপানগরের কলটির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩০,০০০ ও

৪,২০০ টন। ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদিত ২ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে ১'২৫ লক্ষ টন লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, ৩৫,০০০ টন মুড়িবার কাগজ, ৬,০০০ টন বিশেষ শ্রেণীর এবং ৩৪,০০০ টন কাগজের বোর্ড উৎপাদিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে দেশাভ্যন্তরে ১'৬৮ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হয় (উৎপাদন ১'৩৫ লক্ষ টন ও আমদানী ০'৩৩ লক্ষ টন)। ১৯৫৫ ৫৬ সালে সংবাদপত্রের কাগজ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় কাগজেব মোট চাহিদা দাঁড়ায় ২ ৩৮ লক্ষ টন (উৎপাদন ২ লক্ষ টন ও আমদানী ০'৩৮ লক্ষ টন)। ভাবত সাধারণতঃ যুক্তরাজ্য, নবওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, জাপান এবং নেদারল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী করে। ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীব কাগজ বিশেষ প্রস্তুত হয় না, তথাপি দেশেব প্রয়োজনীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীব কাগজও ভারতীয় কলগুলি সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ কবিতে পাবে না। কাগজ শিল্পের প্রসাবকল্পে বর্তমান কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ ছাড়াও **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) বাঁশ ও ঘাসের সাহায্যে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত কবা যায় কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা কার্যের প্রয়োজন, (২) চিনিব কলসমূহে ব্যাগাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার না করিয়া বোর্ড নির্মাণের কলগুলিতে ইহাব সববরাহ কবা প্রয়োজন, (৩) বাঁশের ও সাবাই ঘাসেব আবাদের প্রবর্তন করা, (৪) ভারতের অন্তর্গত সমস্ত রাষ্ট্রেব পক্ষেই বন ও বাঁশঝাড ইজাবা দিবাব একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কবা; (৫) এই শিল্পে কয়লাব পরিবর্তে জলবিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের জন্য কলসমূহকে উৎসাহিত করা, এবং (৬) কাগজেব মূল্য হ্রাস ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে কলগুলিব সংস্কাব সাধন কবা নিতান্ত প্রয়োজন।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে দ্বিতীয় পবিকল্পনাব ফলাফল এবং তৃতীয় পবিকল্পনার নির্ধারিত তাগ বুঝা যাইবে।

কাগজের উৎপাদন, ১৯৬০-৬১—১৯৬৫ ৬৬

(একক : হাজাব টন

	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	অনুমিত উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
কাগজ ও বোড	৪১০	৩৫০	৮২০	৭০০
সংবাদপত্রেব কাগজ	৩০	২৫	১৫০	১২০

শর্করা শিল্প

ভারতের শর্করা শিল্প—অতি পুবাকাল হইতেই ভারতে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইতেছে। তবে যান্ত্রিব শিল্প হিসাবে ১৯৩২ সালে সরকারী

সংরক্ষণ পাইবার পর হইতেই ভারতীয় শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আধুনিক ধরণের চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি। ইহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৭২টি, বিহারে ৩০টি, মাদ্রাজে ২৬টি, বোম্বাইতে ১৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪টি, উড়িষ্যায় ২টি, পেপসুতে ২টি, মধ্য ভারতে ৬টি, রাজস্থানে ২টি, হায়দরাবাদে ২টি, এবং আজমীঢ়, ভূপাল, কাশ্মীর, মহীশূর, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কল ছিল। ঐ সালে বোম্বাই ও হায়দরাবাদের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া নূতন কল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৮টি কলের মোট চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ১৫.৪ লক্ষ টন, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিল (মোট ১৩৯টি কলের) ১১.২ লক্ষ টন। এই শিল্পে ৬০ কোটি টাকার মূলধন ও ১৩৫,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের শর্করা শিল্প **উত্তরপ্রদেশ** এবং **বিহারেই** সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ; বিহারের চম্পারণ, শরণ, মজঃফরপুর এবং ভাগলপুরে শর্করা শিল্পের প্রসার অধিক। মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর, মহারাষ্ট্রের বেলাপুর এবং পাঞ্জাবের অমৃতসরের শর্করা শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের মধ্যে **পাঞ্জাবেই** সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শর্করা ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু উৎপাদনেও এই প্রদেশের স্থান উত্তরপ্রদেশের পরেই। কিন্তু পাঞ্জাবের ইক্ষুতে শর্করার পরিমাণ অল্প থাকায় এই স্থানে শর্করা শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। শর্করা ব্যবহারে **মহারাষ্ট্র** ভারতে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে। মহারাষ্ট্রে একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদনও বিহার বা উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। এই অঞ্চলের ইক্ষুও উচ্চশ্রেণীর। মহারাষ্ট্রে শর্করা প্রস্তুত করার পক্ষে অনুকূল সময়ও বিহার বা উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা দীর্ঘতর। কিন্তু কেবলমাত্র ইক্ষু চাষের জন্য বিস্তৃত জমির অভাব ও জলসেচন এবং কৃত্রিম সারের ব্যবহার হেতু ইক্ষু উৎপাদনের ব্যয় অধিক হওয়ায় মহারাষ্ট্রে শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। মহারাষ্ট্রের ন্যায় **মাদ্রাজ** রাজ্যেও চিনির কল স্থাপনের সুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু ইক্ষুর চাষের জন্য বহুদরবিস্তৃত জমির অভাব থাকায় মাদ্রাজের শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এখানেও উৎপাদনের হার বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। **পশ্চিমবঙ্গে** শর্করা-শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। মহীশূর ও হায়দরাবাদ রাজ্যদ্বয়ও শর্করা শিল্পে উন্নত।

বর্তমান অবস্থা—ভারতে বর্তমানে তিন প্রকারে শর্করা উৎপাদিত হয়: (ক) আধুনিক কলসমূহে ইক্ষু হইতে, (খ) পরিস্রাবণ প্রথায় গুড় হইতে, এবং (গ) দেশীয় খান্দেশ্বরী প্রথায়। (খ) ও (গ) প্রথায় শর্করা উৎপাদনের পরিমাণ অতি সামান্য। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান চিনি উৎপাদক দেশ। এই দেশ এক্ষণে চিনির ব্যাপারে একপ্রকার আত্মনির্ভরশীল। গুণাগুণের দিক

হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে ভারতীয় চিনি প্রায় যবদ্বীপের চিনির সমকক্ষ, কিন্তু একর-প্রতি উৎপাদন হিসাবে ভারত যবদ্বীপের ¼ অংশ উৎপাদন করে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের এতাদৃশ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক। এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষেই ইহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই নহে, আন্তর্জাতিক বাজারেও অধিক মূল্য হেতু ভারতীয় চিনি অন্যান্য দেশের চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক হওয়ার কারণ—(ক) ভারতের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ চিনির কল হইতে বহুদূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইক্ষুও বিভিন্ন প্রকারের, (খ) দূরবর্তী ইক্ষুক্ষেত্র হইতে গরুর গাড়ীতে বা রেলগাড়ীতে শিল্পাগারসমূহের ইক্ষু আনয়ন করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় এবং ইক্ষুর রসও অনেক শুকাইয়া যায়; (গ) ভারতীয় চিনির কলসমূহ সারা বৎসরে প্রায় তিনমাসকাল চালু থাকে, অবশিষ্ট নয়মাস-কালই এই কলগুলিকে বন্ধ রাখিতে হয় বলিয়া ভারতীয় চিনির উৎপাদনব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে; (ঘ) ভারতে ইক্ষু হইতে রস-নিষ্কাশন-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটি-বহুল হওয়ায় ইক্ষুপ্রতি নিষ্কাশিত রসের পরিমাণ অল্প, আবার পরিস্রাবণের সময় বহু রসও অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় চিনির উৎপাদন ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। যবদ্বীপের চিনির কলসমূহে শর্করা শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে মদ ('রাম'), মেথিলেটেড স্পিরিট, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড প্রস্তুত হয়, কিন্তু এ দেশের কারখানাসমূহে সেরূপ কোন উপজাতদ্রব্য প্রস্তুত হয় না। সুতরাং ইহাতেও এদেশে চিনির উৎপাদন ব্যয় যবদ্বীপের তুলনায় অধিক হইয়া পড়ে। উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ দূরীভূত না হইলে ভারতে চিনির মূল্য হ্রাস করা ও চিনির অভাব দূর করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবাসী মাথাপ্রতি যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। ১৯৫০-৫১ সালে দেশে ১১ লক্ষ টন চিনির চাহিদা হয়, অর্থাৎ মাথাপ্রতি মাত্র ৭ পাউণ্ড করিয়া। ভারতবাসীর জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে চিনির মূল্য হ্রাস না পাইলে চিনির ব্যবহার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড (১৯৫০) শর্করা শিল্পের উন্নতি বিধান ও চিনির মূল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে—(১) উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা অনুকূল অবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহে চিনির কলসমূহের অপসারণ, (২) ভারতীয় ইক্ষু সমিতিকে ইক্ষু সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণার জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্যদান এবং (৩) চিনির উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই শিল্পের অধিকতর প্রসার ও উন্নতিকল্পে **পরিকল্পনা কমিশন** নিম্নলিখিত কার্যধারার নির্দেশ দিয়াছেন :—(১) নূতন কলস্থাপন করা অপেক্ষা বর্তমান কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; (২) যে সমস্ত কলে পর্যাপ্ত ইক্ষুর

সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না তাহাদিগকে পর্যাপ্ত ইক্ষুর সরবরাহ-যুক্ত অঞ্চলসমূহে অপসারণ করা ; (৩) উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদিত চিনির মূল্য হ্রাস করা ; (৪) ইক্ষুর উপর বর্তমানে যে "সেস্" রহিয়াছে তাহা ইক্ষুর উৎপাদন কার্যে ব্যয় করা ; (৫) মিল মালিক ও ইক্ষু উৎপাদকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য "সমবায় ইক্ষু সরবরাহ সমিতির" গঠন করা ; (৬) কলগুলির সংস্কার সাধন করা ; এবং (৭) চিনি ও গুড় উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসৃত হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০টি। উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৭.৪ লক্ষ টন) ঐ সালে শর্করা উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত ১৪৩টি কলের প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় ১৮.৬ লক্ষ টন। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা কমিশন যে সমস্ত কার্যসূচী নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা অনুসৃত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০ ও ২২.৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৫ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য ১৯৫২-৫৩, ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত বিদেশ হইতে যথাক্রমে ০.০৬, ৭.১৬ ও ৫.৬৮ লক্ষ টন চিনি আমদানী করে।

ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। চিনির মূল্য হ্রাস পাইলে শুধু যে আভ্যন্তরীণ চাহিদাই বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নহে, পরন্তু আফগানিস্তান, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পাকিস্তান এবং ইউরোপের দেশগুলিতেও ভারতীয় চিনির রপ্তানীবাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের উৎপাদনও বহুলাংশে বাড়িয়া যাইবে।

বর্তমানে **পশ্চিমবঙ্গ** তাহার ৪টি কলের সাহায্যে মাত্র ১৩,০০০ টন চিনি উৎপাদন করিতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন চিনির চাহিদা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর চিনির কল স্থাপনের বহু সুবিধা রহিয়াছে—(১) বঙ্গদেশে প্রতি একর জমিতে উত্তরপ্রদেশ বা বিহার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদিত হয় ; (২) ২৪ পরগণা এবং এই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের মৃত্তিকা ও জলবায়ু ইক্ষু চাষের বিশেষ উপযোগী ; (৩) পশ্চিমবঙ্গে চিনির চাহিদাও অত্যধিক ; (৪) রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র হইতে রেলপথে ও নৌকাযোগে সহজে ও অল্পব্যয়ে কয়লা আমদানী করা সম্ভব ; (৫) কলিকাতা বন্দর এই প্রদেশের সমস্ত অংশের সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত ; (৬) শহর ও শহরতলী অঞ্চলে বহুলোকের বসবাস থাকায় এই অঞ্চলে শ্রমিকের অপ্রতুলতা নাই এবং (৭) এ স্থানে মূলধনেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের শর্করা শিল্পের প্রধান অসুবিধা এই যে কলিকাতা বন্দর নিকটে থাকায় আমদানীকৃত অল্প মূল্যের চিনির সহিত দেশীয় চিনি মূল্যাধিক্য বশতঃ প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

1. Account for the localisation and state the present position of jute industry of India. (C. U. '53, '56, '5)

(ভারতীয় পাট শিল্পের একদেশীভবন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ ।)

(পৃঃ ৪৪৮-৪৫১)

2. State briefly the regional distribution and the present position of Indian paper industry. (C. U. '50, '52, '55)

. (ভারতীয় কাগজ শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ ।)

(পৃঃ ৪৫১-৪৫৪)

3. Discuss the regional distribution, the present position and the future prospect of the sugar industry of India. (C. U. '51, '54, '56)

(ভারতীয় শর্করা শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে যাহা জান লিখ ।)

(পৃঃ ৪২৪-৪.৭৷

পঞ্চম খণ্ড

ভোগ ও বাণিজ্য

একবিংশ অধ্যায়

বহির্বাণিজ্য

বাণিজ্য (Trade)—অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে দ্রব্য-সম্ভারের ভোগ এবং বাণিজ্যই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। পৃথিবীর বহু লোকই হয়ত প্রাথমিক উৎপাদন, গৌণ উৎপাদন এবং পরিবহন ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু কোন লোকই প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্যাদির ভোগ ও ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যাদির উৎপাদনে কোন অঞ্চলই স্বয়ংপূর্ণ নহে। সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভোগ্য পণ্য অল্পাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। পণ্যসম্ভারের এই আমদানী-রপ্তানীকে বাণিজ্য বলে। দ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ বা ব্যবহারই বাণিজ্যের সূচক।

সভ্যতা ও বাণিজ্য (Civilisation and Trade)—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব এবং চাহিদাও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য বাণিজ্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীরাই সাধারণতঃ অত্যধিক বাণিজ্যপরায়ণ হইয়া থাকে। জনসংখ্যার প্রাচুর্য, চাহিদার ব্যাপকতা, মনোভাবের সহজ আদান-প্রদান, উন্নতির প্রেরণা, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে স্বতঃই বাণিজ্যপরায়ণ করিয়া তুলে। অপর পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা আঞ্চলিক প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের দরুণ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় অনুন্নত এবং বাণিজ্যপরাঙ্মুখ।

বাণিজ্যের প্রকৃতি (Nature of trade)—দেশগত পরিবেশের উপর বাণিজ্যের প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক পণ্যের প্রকৃতি সম্পর্কেও বিশেষ পার্থক্য ঘটে। এই বিভিন্নতা আবার আঞ্চলিক জলবায়ু, ভূত্বক, ভূপ্রকৃতি,

অবস্থান প্রভৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। (খ) শিল্পসমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশসমূহ সাধারণতঃ প্রচুর শিল্পজাত দ্রব্য এবং জনবিরল ও প্রাথমিক দ্রব্যাদি উৎপাদনে সমৃদ্ধ দেশসমূহ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যাদিই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে। (গ) আঞ্চলিক উৎপাদনবৈশিষ্ট্যও বাণিজ্যের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতের পিত্তল দ্রব্য, জার্মানীর রঞ্জক দ্রব্য, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রপাতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। (ঘ) আমদানী শুল্কের ব্যবহার, সরকারী সাহায্যের দ্বারা পণ্য-বিশেষের রপ্তানী বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ পরিকল্পনা, দ্রব্যবিশেষের উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণকল্পে নানাবিধ চুক্তি, সমবায় ও সম্মেলন এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান-ভেদেও বাণিজ্যের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতি-অবনতি (International trade as economic barometer)—বাণিজ্য আন্তর্দেশিক (internal) বা আন্তর্জাতিক (international) এই উভয় প্রকারই হইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট মূল্যগত পরিমাণকে (total trade) অনেকে দেশগত উন্নতি বা অবনতির সূচক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে দেশগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট মূল্যগত পরিমাণ অধিক হইলে দেশটি উন্নতিশীল এবং অল্প হইলে দেশটি অনুন্নত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ মতবাদ বিচারসহ নহে। দেশগত বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্যগত পরিমাণ অধিক হইলেই যে দেশটি উন্নতিশীল হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্যগত পরিমাণ সুইডেন অপেক্ষা প্রায় ৫০% অধিক তথাপি ভারতবাসীর জীবনমান অতি নিম্নস্তরের অথচ সুইডেনের অধিবাসীদের জীবনমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনমানের প্রায় সমান হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে মাথা প্রতি বাণিজ্যের (per capita trade) মূল্যগত পরিমাণ লইয়া বিচার করা বিজ্ঞানসম্মত। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতের মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ মাত্র ৯ ডলার কিন্তু সুইডেনের ক্ষেত্রে উহা ৩০০ ডলার অপেক্ষাও অধিক। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণের দ্বারা দেশগত উন্নতি-অবনতি সূচিত হইলেও সর্বক্ষেত্রেই যে ইহা সত্য হইবে এমত নহে। নরওয়ে দেশের মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ৩৫৬ ডলার কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উহা মাত্র ১২৭ ডলার। তাই বলিয়া নরওয়ে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা উন্নতিশীল মনে করিলে নিশ্চয়ই ভুল হইবে। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণের অতিশয় উচ্চ বা নিম্ন অংক সমূহ বাদ দিয়া অন্যান্য দেশের মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ লইয়া বিচার করিলে বহুক্ষেত্রে দেশগত আর্থিক উন্নতি বা অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়।

হংকং, ইসরায়েল ও সিংহল ব্যতীত এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ; দক্ষিণ রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, মরক্কো, আলজেরিয়া ও মিশর ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য দেশ ; দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ; কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত অংশেরই মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অতি সামান্য—৫০ ডলারের অনধিক। নিবিড় লোকবসতি, উৎপাদিত সামগ্রীর উদ্বৃত্তাংশের স্বল্পতা, স্থানীয় সম্পদের অপ্রাচুর্য অথবা আর্থিক দৈন্য যে কোন কারণেই হউক না কেন ঐ সমস্ত দেশে মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অতি সামান্য। অপরপক্ষে নিউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি দেশের মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ৫৫৯ ডলার হইতে ৪০০ ডলার পর্যন্ত ; ভেনেজুয়েলা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, ইসরায়েল, যুক্তরাজ্য, মালয় ও সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে উহা ৪০০ ডলার হইতে ২৫০ ডলার পর্যন্ত। এই দেশগুলির কোন কোনটি শিল্পপ্রধান আবার কোন কোনটি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই দেশগুলির অধিবাসীদের জীবনমান অতি উন্নতধরণের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দেশের আয়তন অধিক হইলে বহির্বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে। ১০ লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক আয়তনযুক্ত রুশিয়া, ক্যানাডা, চীন, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফরাসী দঃ পঃ আফ্রিকা, ভারত, আর্জেন্টিনা—এই নয়টি দেশের মধ্যে ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দেশেরই মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অতি সামান্য। বৃহদায়তনযুক্ত দেশসমূহে বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবে নানা প্রকারের সামগ্রী দেশাভ্যন্তরেই উৎপাদিত হয় বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অপেক্ষা আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের পরিমাণই অধিক হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণসমূহ (Causes of international trade)—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণসমূহকে মুখ্য কারণ (basic causes) ও গৌণ কারণ (secondary causes) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

মুখ্য কারণসমূহ—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুখ্য কারণগুলি নিম্নলিখিত ভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। (১) প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ, জৈব ও উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের এই আঞ্চলিক বিভিন্নতাই হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি।

(২) আর্থিক সঙ্গতির বিভিন্নতা—আর্থিক সঙ্গতির আঞ্চলিক বিভিন্নতাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুপ্রেরক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শিল্পপ্রধান যুক্তরাজ্য কৃষিপ্রধান অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে এবং শেষোক্ত দেশসমূহে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে।

(৩) জনসংখ্যার বিভিন্নতা—আঞ্চলিক জনসংখ্যাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি, পরিমাণ ও প্রকৃতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পৃথিবীর জনবিরল তৃণাঞ্চলসমূহ উদ্বৃত্ত খাদ্য সামগ্রী ও কাঁচামাল উৎপাদনেই সক্ষম কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের জনসমৃদ্ধ দেশগুলি খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অথচ শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ। এইরূপ অবস্থায় জনবহুল দেশ হইতে শিল্পসামগ্রী জনবিরল দেশে এবং জনবিরল দেশ হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল জনবহুল দেশসমূহে রপ্তানী হইলে উভয় অঞ্চলের আথিক উন্নতির পক্ষেই সহায়ক হয়।

(৪) পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা—পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা অতি উন্নত ধরণের সেই সমস্ত অঞ্চলে বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক হইয়া থাকে। পরিবহন ব্যবস্থার দৈন্য হেতু প্রাচীন কালে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য এবং তৎকালীন বাণিজ্য কেবলমাত্র পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথের অন্তর্বর্তী দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উত্তর আমেরিকার বাসন্তিক গমবলয়ের সহিত সুদূর যুক্তরাজ্যেরও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

গৌণ কারণ—(১) জাতীয় আয়—দেশের অধিবাসীদের মাথাপ্রতি আয় অধিক হইলে অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জীবনমান উন্নত হয় এবং সম্ভবক্ষেত্রে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মাথাপ্রতি আয় অধিক হওয়ায় ঐ দেশের বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক। অপর পক্ষে মাথাপ্রতি আয় অতি সামান্য হওয়ায় চীনের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা অল্প এবং আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণও সামান্য। আবার স্থিতিশীল মুদ্রানীতি যেরূপ বাণিজ্যের প্রসারের সহায়তা করে, পরিবর্তনশীল মুদ্রানীতি তেমনি বাণিজ্যের প্রসারকে ব্যাহত করিয়া থাকে।

(২) লগ্নীকৃত বৈদেশিক মূলধন—লগ্নীকৃত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ শিল্পকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল ও বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্যানাডা, দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া ও কারিব সাগর সন্নিহিত অঞ্চল-

সমূহে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করায় ঐ সমস্ত দেশের সহিতই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অধিক।

(৩) আমদানী-রপ্তানী শুল্ক—বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইলে বাণিজ্যের পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পায় সেইরূপ আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে বাণিজ্যের পরিমাণও বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে।

(৪) সরকারের বাণিজ্যনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ—যে কোন দুইটি দেশের অন্তর্গত সরকারের বাণিজ্যনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ বিভিন্ন হইলে ঐ দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহুক্ষেত্রে কোন একটি দেশের উপর বৈদেশিক রাজশক্তির প্রভাবও সেই দেশের বাণিজ্যের প্রকৃতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মাঞ্চুকুয়োর উপর জাপানের এবং ভারতেব উপর যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাব এই দুইটি দেশের বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিত।

(৫) যুদ্ধ ও শান্তি—শান্তিকালীন অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহার পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে।

(৬) জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতা—জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতাও বহুক্ষেত্রে বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দেশগত বাণিজ্যিক পণ্যসম্ভারের সরবরাহক প্রতিষ্ঠান সমূহ সততার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে এবং নির্ভরযোগ্য হইলে দেশগত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এবং জনমতের উপরও বহুক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে।

(৭) সমশ্রেণীর দ্রব্যাদির বহুল উৎপাদন—সমৃদ্ধ দেশসমূহ একই দ্রব্য বহু পরিমাণে উৎপাদন করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে সক্ষম হয় বলিয়া ঐ সমস্ত দেশ অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে এবং বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কৃষি যন্ত্রপাতি, মোটব গাড়ী, রেডিও প্রভৃতি দ্রব্যাদির রপ্তানী ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর সুবিধার ইহাই হইল অন্যতম কারণ।

(৮) প্রচারকার্য—প্রচারকার্যের দ্বারাও বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলসমূহ (Important commercial regions of the World)—পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া, কারিব সাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ,

ওশিয়ানিয়া এবং নিকট প্রাচ্য—এই সাতটিই হইল পৃথিবীর বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি অঞ্চলই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিম ইউরোপ—বাণিজ্য-পরায়ণ অঞ্চল হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য বাণিজ্য-পরায়ণ অঞ্চলসমূহের শীর্ষে। পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের প্রায় ৪০%-ই রহিয়াছে এই অঞ্চলটির অধিকারে। আবার এই অঞ্চলটির অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পঃ জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ-এর দখলেই রহিয়াছে পঃ ইউরোপীর অঞ্চলের মোট বাণিজ্যের ৭৫%। অপর ২৫% রহিয়াছে ইতালী, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে দেশগুলির অধিকারে। বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যের মাথা প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ৩০০ ডলার হইতে ৪০০ ডলার পর্যন্ত এবং ফ্রান্স, পঃ জার্মানী ও ইতালীর ক্ষেত্রে ৫০ ডলার হইতে ১৫০ ডলার পর্যন্ত। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে এই দেশগুলি খাদ্যশস্য, মাংস, চর্ম, তন্তুময় ফসল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফলমূল, বাদাম, চা, কফি, তামাক, খনিজ তৈল, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি আমদানী করে এবং বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, মদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, সূতা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত উপরোক্ত দশটি বাণিজ্য-পরায়ণ দেশের মধ্যে রপ্তানী কার্যে যুক্তরাজ্যের স্থানই প্রথম। এই দেশগুলি আবার আমদানীর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উপরই অধিক নির্ভরশীল। অবশ্য সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানী যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই অধিক। আমদানী পণ্যের মধ্যে এই দেশগুলিতে খাদ্যশস্য, তন্তুময় ফসল, জ্বালানীর স্থান সর্বোচ্চ হইলেও
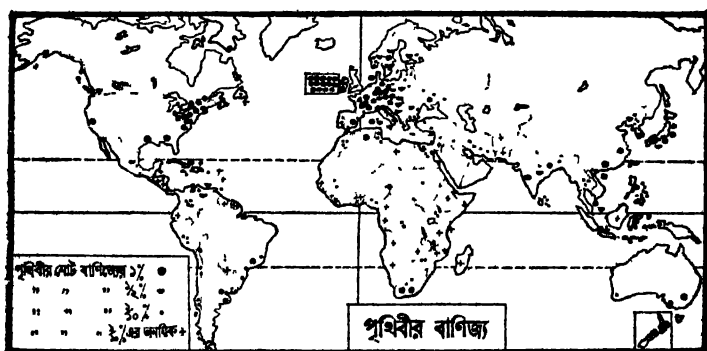
৮৪নং চিত্র—পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলসমূহ

প্রত্যেক দেশই রপ্তানী বাণিজ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স বস্ত্র ও মোটর গাড়ী;

জার্মানী ও যুক্তরাজ্য কয়লা ও যন্ত্রপাতি ; হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ; সুইজারল্যাণ্ড ঘড়ি ; নরওয়ে মৎস্য ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি ; এবং নরওয়ে ও সুইডেন কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানীতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের এই দেশগুলির উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী প্রায় সমপ্রকৃতির বলিয়া এই দেশগুলিকে বহু দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত থাকিতে হয়।

ক্যানাডা-যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ২২%-ই হইল এই দুইটি দেশের অধিকারে। ইহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে রহিয়াছে ১৭% এবং ক্যানাডার অধিকারে রহিয়াছে ৫%। মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ জনবিরল ক্যানাডার ক্ষেত্রে ৪০০ ডলারেরও অধিক এবং জনবহুল যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রায় ১২৭ ডলার। ক্যানাডা হইতে গম, ময়দা, বনজসম্পদ, নিকেল, এ্যাসবেস্টস্ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ব্যতীতও কার্পাস, গম, তামাক, ভুট্টা, খনিজ তৈল প্রভৃতি কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ক্যানাডার সহিত যুক্তরাষ্ট্রেরও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অধিক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ১০% হইল দঃ-পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির অধিকারে। ইহার মধ্যে আবার ৪%-ই হইল ভারত ও জাপানের অধিকারে এবং ইহার পরেই মালয় ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের স্থান। নিবিড় লোকবসতি ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ অল্প হওয়ায় মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১০ ডলারের অনধিক কিন্তু সঙ্গতিসম্পন্ন হংকং ও মালয়ের ক্ষেত্রে ৫০০ ডলার হইতে ২৫০ ডলার পর্যন্ত। ভারত ও সিংহল হইতে চা, ভারত ও পাকিস্তান হইতে কার্পাস ; ভারত ও জাপান হইতে কার্পাস বস্ত্র , ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট , মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে রবার ও রাং , ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ হইতে নারিকেলের শাঁস ; ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ হইতে চিনি ; শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল ; এবং ইন্দোনেশিয়া হইতে খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, এবং অন্যান্য বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই দেশগুলিতে আমদানী হইয়া থাকে। লগ্নীকৃত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ, পৃথিবীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলসমূহের সহিত অনুকূল রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং আধুনিক আবাদী প্রথায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হেতু দঃ পূঃ এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহের বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

কারিব সাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ—ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, কিউবা, কলম্বিয়া, হাইতি, ডমিনিকা গণতন্ত্র, জ্যামেইকা, ত্রিনিদাদ, পোর্টোরিকো, মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ এবং লেসার এন্টিলস্ দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৬% এই সমগ্র অঞ্চলটির অধিকারে। উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ইহাদের বাণিজ্য

সম্পর্ক অধিক। কলা, কোকো, চিনি, কফি, তামাক, সিসল শণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, তাম্র, দস্তা ও খনিজ তৈল হইল এই দেশগুলির প্রধান প্রধান রপ্তানীদ্রব্য। খাদ্যশস্য, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, কার্পাস ও পশমবস্ত্র প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য হইল ইহাদের প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্য। মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ২০ ডলার হইতে ৪০০ ডলার পর্যন্ত।

দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ—ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা ইহার অন্তর্গত। পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৪% এই সমগ্র অঞ্চলটির অধিকারে। আর্জেন্টিনা হইতে মাংস, চর্ম, পশম, গম, কুয়েব্রাকো, ভুট্টা ও তিসি ; ব্রাজিল হইতে কফি, কার্পাস, কোকো, কাষ্ঠ, খনিজ দ্রব্য ও চর্ম এবং উরুগুয়ে হইতে পশম, মাংস ও চর্ম উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশসমূহে রপ্তানী হয় এবং ঐ সমস্ত দেশ হইতে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, বস্ত্র, খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, ও কয়লা প্রভৃতি আমদানী হইয়া আসে। মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে ২০০ ডলার, উরুগুয়ের ক্ষেত্রে ১৬৩ ডলার এবং ব্রাজিলের ক্ষেত্রে ৪২ ডলার।

ওশিয়ানিয়া—অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড ইহার অন্তর্গত। পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৪% এই দুইটি দেশের অধিকারে। মাথাপ্রতি বাণিজ্যের পরিমাণ অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ৩৭৮ ডলার ও নিউজীল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ৫২৮ ডলার। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে প্রচুর পশম, গম, মাখন, পনীর, মাংস, দস্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসক রপ্তানী হয় এবং মোটর গাড়ী, বস্ত্র, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাত, রবার, যন্ত্রপাতি, চা, প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পদ্রব্য এই দুইটি দেশে আমদানী হয়।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্য—পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের প্রায় ৩% নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের অধিকারে। এতদঞ্চলের অন্তর্গত ইস্রায়েল্, ইরাক, আরব ও কুয়েট হইতে খনিজ তৈল এবং তুরস্ক হইতে কার্পাস, তামা, বাদাম, ক্রোমিয়াম আকরিক প্রভৃতি রপ্তানী হয় এবং বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই দেশগুলিতে আমদানী হইয়া আসে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's foreign trade)—বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিই পরিলক্ষিত হইতেছে। (১) মূল্যের দিক হইতে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বহির্বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকা। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬০-৬১ সালে ইহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০১ ও ১৬৫১.৫৩ কোটি টাকায়।

(২) ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে সাধারণতঃ কাঁচামাল (খনিজ, বনজ ও কৃষিজ দ্রব্য) রপ্তানীর এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পাট, কার্পাস, জিপসাম প্রভৃতি কয়েকটি অতি মূল্যবান সামগ্রী পাকিস্তানের ভাগে পড়ায় ভারত হইতে এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্য গুরুতররূপে হ্রাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে ঐ সমস্ত দ্রব্য বহুল পরিমাণে ভারতে আমদানী হইতেছে।

(৩) গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ফলে তাহার কাঁচামালের রপ্তানী হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৮% ও ৪৩% এবং মোট আমদানী বাণিজ্যের ৫৬% ও ২২% ছিল যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকারে। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৪০% ও ২৪% এবং মোট আমদানী বাণিজ্যের ৪৯% ও ২৯% দাঁড়ায় যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকারে।

(৪) সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ যুক্তরাজ্যের সহিত ছিল ঘনিষ্ঠতম। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে একদিকে যেরূপ ভারতের সহিত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক হ্রাস পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ক্যানাডা, জাপান, চীন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের সহিত উহা ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৯৩৭-৩৮, ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের ৩১%, ২৭.৫% ও ২৬.৩% এবং মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৪.৬%, ২২.৫% ও ২৮.৩% ছিল একমাত্র ব্রিটেনের অধিকারে। অপরপক্ষে, ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আমদানীর ৬% ও ১৪.৬% এবং মোট রপ্তানীর ১০% ও ১৭.১% ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে। বিভিন্ন মুদ্রাঞ্চলের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের মাত্র ১০% ছিল 'ডলার' মুদ্রাঞ্চলের সহিত, বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২০-২৫%-এ দাঁড়াইয়াছে। মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৫) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ অতি সামান্য। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থলপথে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য অধিক।

(৬) ১৯৪৭ সাল হইতেই ভারতীয় বাণিজ্যের গতি, বিশেষতঃ ডলার মুদ্রাঞ্চলের সহিত, ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া চলিতে থাকে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতে যন্ত্রপাতি, অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য, পাট, কার্পাস,

প্রভৃতির আমদানীই ইহার মূল কারণ। অবস্থা এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করে যে এই প্রতিকূল বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার ডলার-সম্পর্কিত মূল্য ৩০.৫% হ্রাস করে।

(৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত 'ডলার' মুদ্রাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের গতি ছিল ভারতের অনুকূলে। তবে যুদ্ধোত্তর কালে এই গতি ক্রমাগতই ভারতের প্রতিকূলে যাইতে থাকে। ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে অতি সামান্য বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত (যথাক্রমে ৯.৯ ও ৬.৭৭ কোটি টাকা) থাকিলেও এখনও পযন্ত 'ডলার' মুদ্রাঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ এরূপ উন্নতি লাভ করে নাই যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির উপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করা যাইতে পারে।

ভারতের আমদানী (Imports)—যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী ও তৎসংক্রান্ত সরঞ্জাম, খনিজ তৈল, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পাট, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, ধাতু ও ধাতু আকরিক, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, খাদ্যশস্য, ঔষধ প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য।

যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান, ক্যানাডা ও ফ্রান্স হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে মোট ২৯৪.৭০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়। **যানবাহন** সংক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ৫৪.২১ কোটি টাকা মূল্যের ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি এ দেশে আমদানী করা হয়। **খনিজ তৈল** ও তজ্জাত দ্রব্যাদি ইরাণ, চীন, বোর্ণিও, সুমাত্রা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে এই আমদানীর মূল্য ছিল ৬৭.৭৩ কোটি টাকা। **কাগজ** ও **পেস্টবোর্ড** আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ক্যানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড ও জাপান হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে মোট ১৫.৭০ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ও পেস্টবোর্ড আমদানী হয়। **রাসায়নিক দ্রব্য** ও ঔষধপত্র আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, পঃ জার্মানী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ৪৩.২৯ কোটি টাকা মূল্যের এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয়। **পাট** আমদানী হয় পাকিস্তান হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ৬.২৭ কোটি টাকা মূল্যের পাট ভারতে আমদানী হয়। **কার্পাস** আমদানী হয় প্রধানতঃ ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ৬২.৬৫ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস আমদানী করা হয়। **পশম** আমদানী হয় প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও জাপান হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ১২ কোটি টাকার পশম আমদানী

হয়। **ধাতু আকরিক** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম হইতে আমদানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ৬৫'৯৯ কোটি টাকা মূল্যের অলৌহবর্গীয় ধাতু আকরিক ও তজ্জাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়। **লৌহ** ও **ইস্পাত** এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও ফ্রান্স হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ১০১'৯৮ কোটি টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছিল। **খাদ্যশস্য** আমদানী হয় প্রধানতঃ ক্যানাডা, আর্জেণ্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ১২৬'৪৪ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী হয়। ১৯৬১ সালে মোট পণ্য আমদানীর মূল্য দাঁড়ায় ১০১৪'৬৭ কোটি টাকায়।

ভারতের রপ্তানী দ্রব্য (Exports)—ভারত হইতে বিদেশে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানী করা হয় তাহার মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, চা, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, চামড়া, তৈলবীজ, ধাতু দ্রব্য ও আকরিক, তামাক প্রভৃতি প্রধান।

পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আর্জেণ্টিনা, মিশর, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রাজিল, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ১৪০ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানী হয়। যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, পঃ জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, আরব, সিংহল, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতে যত **চা** উৎপন্ন হয় তাহার ৭০% রপ্তানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ১২১'৪০ কোটি টাকা মূল্যের চা ভারত হইতে রপ্তানী হয়। কাঁচা ও পাকা **চামড়া** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ৩৩'৫৯ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা ও পাকা চামড়া রপ্তানী হয়। **তৈলবীজ** ও **উদ্ভিজ্জ তৈল** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ৫'৮৩ কোটি টাকার তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল রপ্তানী হয়। **ধাতুদ্রব্য** ও **কয়লা** রপ্তানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, জাপান, প্রণালী উপানবেশ, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ইতালী প্রভৃতি দেশে। ১৯৬১-৬২ সালে ১০'৪৪ কোটি টাকা মূল্যের ম্যাঙ্গানীজ আকরিক, ১৭'৪৫ কোটি টাকার লৌহ আকরিক, ৯'৬৬ কোটি টাকার অভ্র, ৩'৫ কোটি টাকার খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি, ও ৩ কোটি টাকা মূল্যের কয়লা রপ্তানী হয়। **কার্পাস বস্ত্র** জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে চালান যায়। ১৯৬১-৬২ সালে ৪৮'৪০ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হয়। **কার্পাস** রপ্তানী হয় ১৯৬১-৬২ সালে ২০'৩৭ কোটি টাকার। ভারতীয় **তামাকের** প্রধান খরিদ্দার যুক্তরাজ্য। ১৯৬১-৬২ সালে মোট ১৪'০৪ কোটি টাকা মূল্যের তামাক

রপ্তানী হয়। প্রায় ৪'৬১ কোটি টাকা মূল্যের **লাক্ষা** আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। প্রায় ১৪'৪৮ কোটি টাকা মূল্যের **মশলা** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ক্যানাডা ও ইতালীতে রপ্তানী হয়। ১৯৬১ সালে মোট ৬৫৯'৯৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসম্ভার রপ্তানী হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য—ভারতের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারত ব্রিটেন হইতে পশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রঞ্জক দ্রব্য, ইঞ্জিন, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, কাঁচ, সাইকেল, মোটর গাড়ী, রবারজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, মদ্য, ঔষধ প্রভৃতি **আমদানী** করে। সমগ্র আমদানীর প্রায় ⅙ অংশই যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা। ভারত ব্রিটেনে চট ও বস্তা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, ধাতু আকরিক, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম, খাদ্যদ্রব্য, চা, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশলা প্রভৃতি **রপ্তানী** করে। ১৯৬১ সালে ভারত ২০০'২৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসম্ভার ব্রিটেন হইতে আমদানী করে এবং ১৬২'৯১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ব্রিটেনে রপ্তানী করে।

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য—ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ ব্যাপক। ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে প্রধানতঃ ধান, চাউল, ডাল, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, আলু, ইত্যাদি **আমদানী** করে। ভারত কার্পাস ও পাটজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চা, চিনি, কয়লা ইত্যাদি দ্রব্য ব্রহ্মদেশে **রপ্তানী** করে। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ দ্রব্যই কার্পাস ও পাটজাত সামগ্রী। ১৯৬১ সালে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ৮'৩৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং ব্রহ্মদেশে ৫'৮২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য—ভারত সিংহল হইতে নারিকেল শাঁস, নারিকেল তৈল, খনিজ দ্রব্য, রবার, চা, প্রভৃতি দ্রব্য **আমদানী** করে এবং ধান ও চাউল, বস্ত্র, মৎস্য, কয়লা (প্রচুর), ডাল, ফল, তামাক, তরকারী, লঙ্কা, সার প্রভৃতি দ্রব্য সিংহলে **রপ্তানী** করে। ১৯৬১ সালে ভারত সিংহল হইতে ৮'৫৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং সিংহলে ১৬'৯৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে।

ভারত-জাপান বাণিজ্য—ভারত জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য, কাচ ও কাচের দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চীনামাটির বাসন, খেলনা, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্টবোর্ড, বিলাস দ্রব্য, রবারজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রঞ্জক দ্রব্য, প্রভৃতি **আমদানী** করে। ভারত কার্পাস (প্রচুর), লৌহ (মোট ভারতীয় রপ্তানীর প্রায় ৫৫ ভাগ), ম্যাঙ্গানীজ, চট, বস্তা, অভ্র, চাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য জাপানে **রপ্তানী** করে।

সম্প্রতি ভারত হইতে জাপানে রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৬১ সালে ভারত জাপান হইতে ৬০·৭০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং জাপানে ৪০·২৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য—ভারত গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, কার্পাস, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটর গাড়ী, খনিজ তৈল, রবার ও লৌহজাত দ্রব্য, তামাক, রঞ্জক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, কার্পাসজাত দ্রব্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে **আমদানী** করে। অপর পক্ষে ভারত লাক্ষা, পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, অভ্র, পশম, ফল, তিসি, চা, মশলা, কার্পাস, দড়ি, রেড়ির তৈল প্রভৃতি দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে **রপ্তানী** করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এই দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ২৪০·০০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী এবং ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১১৪·৪৩ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়।

ভারত-পঃ জার্মানী বাণিজ্য—ভারত জার্মানীতে **রপ্তানী** করে প্রধানতঃ কার্পাস, চা, তামাক, লৌহ আকর, মশলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, হরীতকী, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, নারিকেল দড়ি ও ছোবড়া, পশম, বস্ত্র, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি। ভারত জার্মানী হইতে লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাচ ও কাচের দ্রব্য, কলকব্জা, ধাতুদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, প্লাষ্টিক, রঞ্জক দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি **আমদানী** করে। ১৯৬১ সালে ভারত জার্মানী হইতে ১২২·৫৩ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং জার্মানীতে ২১·২৮ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য—ভারত অস্ট্রেলিয়া হইতে গম, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যাম, কৌটা-বন্দী ফল, মাখন, পনীর, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি **আমদানী** করে। অপরপক্ষে ভারত অস্ট্রেলিয়াতে পাটজাত দ্রব্য, চা, তিসি, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি **রপ্তানী** করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়া হইতে ১৭·৬০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসম্ভার আমদানী এবং অস্ট্রেলিয়ায় ১৬·৫৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য—পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত পাকিস্তান হইতে পাট, কার্পাস, পশম, খাদ্যশস্য, ফল এবং সব্জী **আমদানী** করে এবং পাকিস্তানে কার্পাসবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সিমেণ্ট, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য **রপ্তানী** করে। ১৯৬১ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে ১১·৫৪ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং পাকিস্তানে ৯·৮৫ কোটি টাকার

পণ্য রপ্তানী করে। দেশ বিভাগের পর হইতে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভারত এযাবৎ পাকিস্তানের সহিত স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ১৯৫৭ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় উহা ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এই চুক্তির বলে উভয় রাষ্ট্রই পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে ব্যণিজ্য সম্প্রসারণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। চুক্তি অনুসারে ভারত পাকিস্তানে **রপ্তানী** করে কয়লা, ঔষধপত্র, বিড়ি, হুঁকার তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, বোর্ড, চিনি, চা, কফি, পান, বিড়ির পাতা ও চলচ্চিত্র এবং পাকিস্তান হইতে **আমদানী** করে পাট, চামড়া, মাছ, ও ডিম, সুপারী ও চলচ্চিত্র, হাঁস-মুরগী, মশলা, মধু, যন্ত্রপাতি, সাইকেল, খেলাধূলার সরঞ্জাম, এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি। চুক্তিনামায় যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ ছিল না সেইসব দ্রব্য স্বতন্ত্র আমদানী-রপ্তানী লাইসেন্স অনুযায়ী চলাচল করে। পাকিস্তান হইতে ভারতে লবণ ও বনজ দ্রব্যের এবং ভারত হইতে পাকিস্তানে কয়লা, কাষ্ঠ, পাথরের বোল্ডার ও লবণের রপ্তানীর পরিমাণ এই চুক্তিনামায় পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য বিষয়ক আর একটি চুক্তি উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

ভারতের আড়তদারী বাণিজ্য (Entrepot trade of India)—প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করায় ভারতে আড়তদারী বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা, খনিজ দ্রব্য, ধাতু ও আকরিক প্রভৃতি সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ভারত আমদানী করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্যই পুনরায় কেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে ভারত রপ্তানী করে।

সীমান্তপথের বাণিজ্য (Frontier trade of India)—এইরূপ বাণিজ্য কাশ্মীরের মধ্য দিয়া তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার সহিত, নেপাল ও দার্জিলিং-এর মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত ; ভামোর মধ্য দিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের সহিত ; ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া শান রাজ্য ও শ্যামের সহিত এবং নানা পথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত চলিয়া থাকে। এই সমস্ত দেশের সহিত সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা না থাকায় স্থলপথেই বাণিজ্য চলে। সীমান্তপথে নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত হইতে চাউল, গম, ছোলা, পাট, সরিষা, তিসি, মাখন, পশম, চর্ম, গালিচা, কম্বল, তামাক, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং ভারত হইতে ঐ সমস্ত দেশে বস্ত্র, সুতা, রঞ্জকদ্রব্য, ইস্পাতদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজতৈল, লবণ, চিনি, চা, তামাক, তাম্র, সুপারী ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী হয় ; ইরাণ হইতে নানাবিধ ফল আমদানী হয় এবং ইরাণে বস্ত্র, চা ও পাট রপ্তানী হয় ; আফগানিস্তান হইতে

নানাবিধ ফল, চর্ম ও পশুলোম আমদানী হয় এবং আফগানিস্তানে বস্ত্র, চিনি, চা, জুতা, রবারজাত দ্রব্য, চর্ম, ও ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানী হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine how far international trade acts as an economic barometer.

(দেশগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতির সূচক কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪৬০-৪৬১)

2. Explain the factors that account for the existence of international trade.

(আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ সমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৪৬১-৪৬৩)

3. Describe the important commercial regions of the world.

(পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলসমূহের বিবরণ লিখ।) (পৃঃ ৪৬৩-৪৬৬)

4. Indicate briefly the main features of India's foreign trade (C. U. 51, 53, 54)

(ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৪৬৬-৪৬৮)

5. State the principal imports of India indicating their sources and the chief exports of India indicating their destinations (C. U. 50, '53, '54)

(ভারতের প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্য ও উহাদের উৎপত্তি স্থান এবং প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ও উহাদের গন্তব্য স্থান সম্পর্কে লিখ।) (পৃঃ ৪৬৮-৪৭০)

6 Examine the nature of (a) Indo-U. S. trade, (b) Indo-U. K trade, and (c) Indo-Pakistan trade.

((ক) ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, (খ) ভারত-যুক্তরাজ্য, এবং (গ) ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) ((ক) পৃঃ ৪৭১, (খ) ৪৭০, (গ) ৪৭১-৪৭২)

7 Write short notes on (a) entrepot trade and (b) frontier trade of India.

(ভারতের (ক) আড়তদারী বাণিজ্য এবং (খ) সীমান্ত পথের বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ।) ((ক) পৃঃ ৪৭২, (খ) ৪৭২-৪৭৩)

ষষ্ঠ খণ্ড
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল

দ্বাবিংশ অধ্যায়
পশ্চিম বঙ্গ
ভূমিকা

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতকে ১৪টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে আসামের উপজাতীয় এলাকা লইয়া নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং নামক আর একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকার পত্তন করা হয়। ১৯৬০ সালের ১লা মে তারিখে বোম্বাই রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামক দুইটি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যের পত্তন করা হয়। বর্তমানে ভারতে ১৫টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা রহিয়াছে।

রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহ :—(১) **আসাম**[১]—৮৪,৮৯৯ বঃ মাঃ, অঃ ১১৯ কোটি[২] ; (২) **পশ্চিমবঙ্গ** (প্রাক্তন পঃ বঙ্গ ও বিহারের পুর্ণিয়া ও মানভূম জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত)—৩৩,৯২৮ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৫০ কোটি ; (৩) **বিহার** (প্রাক্তন বিহার হইতে পঃ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিয়দংশ ব্যতীত)—৬৭,১৯৮ বঃ মাঃ, অঃ ৪'৬৫ কোটি ; (৪) **উত্তর প্রদেশ**—১১৩,৪৫৪ বঃ মাঃ, অঃ ৭'৩৮ কোটি ; (৫) **পাঞ্জাব** (প্রাক্তন পাঞ্জাব ও পেপ্‌সু লইয়া গঠিত)—৪৭,০৮৪ বঃ মাঃ, অঃ ২'০৩ কোটি ; (৬) **জম্মু ও কাশ্মীর**—৮৬,০২৪ বঃ মাঃ, অঃ ৩৫'৮৪ লক্ষ ; (৭) **রাজস্থান** (কোটা জেলার সিরোঞ্জ মহকুমা ব্যতীত প্রাক্তন রাজস্থানের সমগ্র অংশ ; আজমীঢ়, বোম্বাই-এর সামান্য অংশ ও মধ্যভারতের মান্দাসোর জেলার সুনেল অঞ্চল লইয়া গঠিত)—১৩২,১৫০ বঃ মাঃ, অঃ ২'০১ কোটি ; (৮) **গুজরাট** (পুনর্গঠিত বোম্বাই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমস্থ সুরাট, ব্রোচ, বরোদা, পাঁচমহল, সবরকণ্ঠ, কায়রা, ভবনগর, আমেদাবাদ, মেসানা, বনসকণ্ঠ, আমবেলা, ঝালাওয়াড়, রাজকোট, জুনাগড়, জামনগর ও কচ্ছ এই জেলাগুলি লইয়া গঠিত)—৭২,২২৬ বঃ মাঃ, অঃ ২'০৬ কোটি ; (৯) **মহারাষ্ট্র** (নবগঠিত গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুনর্গঠিত বোম্বাই রাজ্যেব জেলাগুলি ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় জেলা লইয়া গঠিত)—

১। নর্থইষ্ট ফ্রন্টিয়ার ট্রাক্ট (NEFT) (আয়তন ৩১,৪৩৬ বঃ মাঃ, অঃ ৪'৫ লক্ষ) রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে আসামের রাজ্যপাল কর্তৃক শাসিত হয়।

২। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে।

১১৮,৭৪১ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৯৫ কোটি ; (১০) **মধ্যপ্রদেশ** (বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চারিটি জেলা ব্যতীত প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের সমগ্র অংশ, ভূপাল, বিন্ধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের কোটা জেলার সিরোঞ্জ মহকুমা এবং মান্দাসোর জেলার সুনেল অঞ্চল ব্যতীত প্রাক্তন মধ্যভারতের সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত)—১৭১,২১০ বঃ মাঃ, অঃ ৩'২৪ কোটি ; (১১) **উড়িষ্যা**—৬০,১৬২ বঃ মাঃ, অঃ ১'৭৬ কোটি ; (১২) **অন্ধ্র** (প্রাক্তন অন্ধ্র, প্রাক্তন হায়দরাবাদের পূর্বার্ধের আদিলাবাদ, করিমনগর, নিজামাবাদ, মেডাক, ওয়ারাঙ্গাল, নালগোণ্ডা, মেহ্‌বুবনগর ও আত্রাফ-ই-বালদা জেলা ; গুলবর্গা জেলার কোডাংগল ও তান্দুর তালুক ; এবং রায়চুর জেলার আলামপুর ও গাডোয়াল তালুক লইয়া গঠিত)—১০৬,০৫২ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৬০ কোটি ; (১৩) **মহীশুর** (প্রাক্তন মহীশূর, প্রাক্তন বোম্বাই-এর চাঁদগড় তালুক ব্যতীত বেলগাঁও জেলা, বিজাপুর, ধারওয়ার ও কানাড়া জেলা ; প্রাক্তন হায়দরাবাদের কোডাংগল ও তান্দুর তালুক ব্যতীত গুলবর্গা জেলা, আলামপুর ও গাডোয়াল তালুক ব্যতীত রায়চুর জেলা ; আমেদপুর, নীলঙ্গ ও উদ্গীর তালুক ব্যতীত বিদর জেলা ; কাসারাগোড় তালুক ব্যতীত মাদ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া জেলা এবং মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর জেলার কোল্লাগাল তালুক লইয়া গঠিত)—৭৪,১৯১ বঃ মাঃ, অঃ ২'৩৫ কোটি ; (১৫) **মাদ্রাজ** (কোয়েম্বাটোর জেলার কোল্লাগাল তালুক, দঃ কানাড়া ও মালাবার জেলা ব্যতীত প্রাক্তন মাদ্রাজের সমগ্র অংশ এবং দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের ৫টি তালুক লইয়া নবগঠিত কন্যাকুমারী জেলা লইয়া গঠিত)—৫০,১৩২ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৩৭ কোটি ; (১৫) **কেরালা** (কন্যা-কুমারী জেলা ব্যতীত প্রাক্তন ত্রিবাংকুর-কোচিনের সমগ্র অংশ, মাদ্রাজের মালাবার জেলা এবং দঃ কানাড়ার কাসারাগোড় তালুক লইয়া গঠিত)—১৫,০০৫ বঃ মাঃ, অঃ ১'৬৯ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা—(১) দিল্লী—(৫৭৩ বঃ মাঃ, অঃ ২৬'৪৪ লক্ষ), (২) হিমাচল প্রদেশ—(১০,৮৭৯ বঃ মাঃ, অঃ ১৩'৪৯ লক্ষ), (৩) ত্রিপুরা—(৪,০৩৬ বঃ মাঃ, অঃ ১১'৪১ লক্ষ), (৪) মণিপুর—(৮,৬২৮ বঃ মাঃ, অঃ ৭'৭৮ লক্ষ), (৫) আন্দামান ও নিকোবর—(৩,২১৫ বঃ মাঃ, অঃ ০'৬৩ লক্ষ), (৬) লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ—(১১ বঃ মাঃ, অঃ ০'২৪ লক্ষ) (৭) নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চল—(৬,২৩৬ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৬৯ লক্ষ)* (৮) দাদ্রা ও নগর হাভেলী—(১৮৯ বঃ মাঃ, অঃ অজ্ঞাত), (৯) গোয়া, দমন, দিউ—(১,৪২৬ বঃ মাঃ, অঃ অজ্ঞাত)।

রাজ্যগত স্বাতন্ত্র্যবোধ যাহাতে জাতীয় ঐক্যবোধের অন্তরায় না হয় তজ্জন্য সমস্ত ভারতকে পাঁচটি **আঞ্চলিক পরিষদের** অধীনে [(১) উত্তরাঞ্চল (জম্মু

---

* ৮-২-৬১ তারিখের আইন অনুসারে ইহা বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন।

ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থান), (২) **পশ্চিমাঞ্চল** (মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মহীশূর), (৩) **দক্ষিণাঞ্চল** (কেরালা, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র), (৪) **পূর্বাঞ্চল** (উড়িষ্যা, বিহার, পঃ বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাপাহাড-তুয়েনসাং অঞ্চল) ও (৫) মধ্যাঞ্চল (উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ)] বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই আঞ্চলিক পরিষদগুলি পরস্পর সংলগ্ন রাজ্যসমূহের প্রশাসন ও উন্নয়নেয় বিষয়ে উপদেষ্টার কাজ করিবে।

পশ্চিম বঙ্গ

পরিবেশ—১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে প্রাক্তন পঃ বঙ্গের সহিত বিহারের পুর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ (ডালকালা-কিষণগঞ্জ-চোপরা-শিলিগুড়ি এই 'জাতীয় রাজপথ'টির পূর্বদিকে অবস্থিত ঠাকুরগঞ্জ, গোয়ালপুকুর, ঘুরা, ইসলামপুর এবং কিষণগঞ্জ থানার কিয়দংশ এবং উত্তর দিকে অবস্থিত গোয়ালপুকুর থানার সমগ্র অংশ এবং কিষণগঞ্জ থানার কিয়দংশ) এবং মানভূম জেলার কিয়দংশ (চাষ ও চাণ্ডিল থানা তুইটি ব্যতীত সমগ্র পুরুলিয়া মহকুমা) লইয়া **নবগঠিত** পঃ বঙ্গের পত্তন করা হইয়াছে। পূর্ণিয়া জেলার অংশটি পঃ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পঃ দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পাকিস্তান ও পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যার দ্বারা **আবদ্ধ** এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পঃ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও নবগঠিত পুরুলিয়া—এই ১৬টি **জেলা** লইয়া গঠিত পঃ বঙ্গের **আয়তন** ৩৩৯২৮ বঃ মাঃ, **লোকসংখ্যা** ৩·৫০ কোটি। বসতি ঘনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে (প্রতি বর্গমাইলে ১০৩১ জন) ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ কেরালার পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার হিজলী হইতে পুর্বে ২৪ পরগণা জেলার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়িভাঙ্গার মোহানা পর্যন্ত পঃ বঙ্গের **উপকূল** ভাগ বিস্তৃত। এখানে নদীমুখে অসংখ্য ফাঁড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যে হুগলী নদীর মোহানায় অবস্থিত সাগরদ্বীপ উল্লেখযোগ্য।

ভুপ্রকৃতির বিভিন্নতা হিসাবে পঃ বঙ্গকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলার উত্তরাংশ; (২) উহার দক্ষিণে শিলাবহুল ও পাংশু বর্ণের মৃত্তিকাযুক্ত অব-হিমালয় অঞ্চল (দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর ভাগ); (৩) উহার দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ ও কুচবিহার জেলা লইয়া গঠিত অনুর্বর ও এঁটেল মৃত্তিকাযুক্ত উচ্চভূমি অঞ্চল; (৪) বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এবং পশ্চিমে রক্তাভ ও

পূর্বে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাযুক্ত ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তভাগ (মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সন্নিহিত দঃ ভাগ বালুকাময়); (৫) রূপনারায়ণ-দামোদর-ভাগীরথী-বিধৌত ও উর্বর পলিগঠিত মধ্যভাগের সমভূমি ; (৬) ২৪ পরগণার উত্তরাংশ এবং হাওড়া ও হুগলী জেলার পূর্বভাগের কিয়দংশ লইয়া
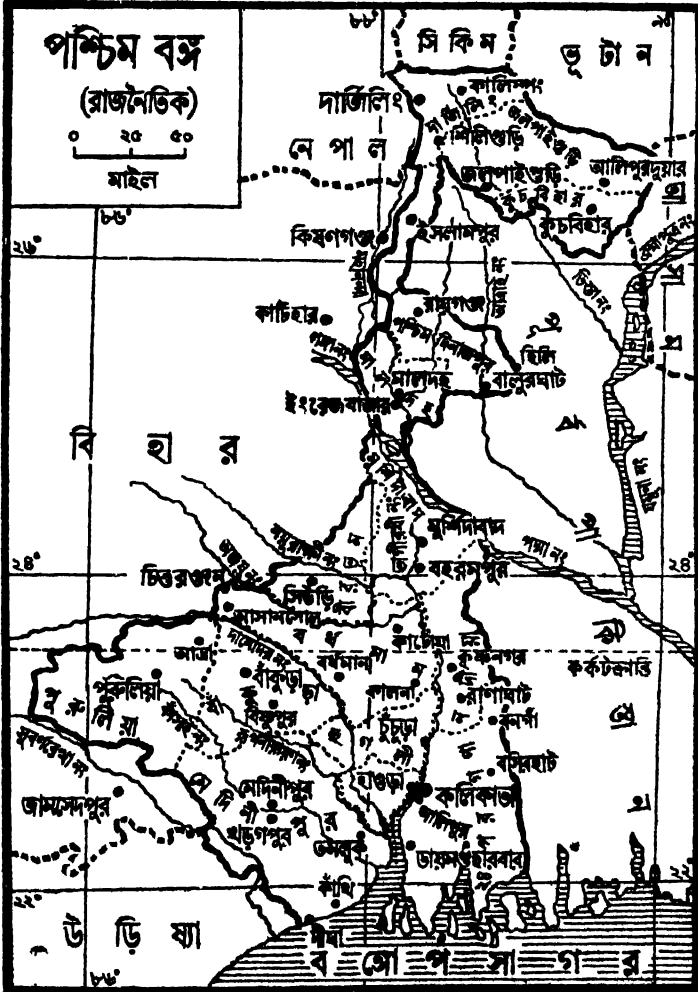
৮৫নং চিত্র—পশ্চিম বঙ্গ (রাজনৈতিক)

পলিগঠিত গাঙ্গেয় বদ্বীপাঞ্চল ; এবং (৭) ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগের প্রায় ৮০ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ৩০-৩২ মাইল বিস্তারযুক্ত উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও অনুর্বর।

ক্রান্তীয় মৌসুমী পরিমণ্ডলের অন্তর্গত পঃ বঙ্গের জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ

ও আর্দ্র, তবে কতকটা সমভাবাপন্ন। শীতকালে শুষ্ক উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না, শীত অল্পস্থায়ী। গ্রীষ্মে আর্দ্র দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমের প্রথমে "কালবৈশাখী" ও শেষে "আশ্বিনের ঝড়" হইয়া থাকে। জলবায়ুর আঞ্চলিক তারতম্যানুসারে এই দেশকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্ম মৃদু, শীত তীব্র ও বৃষ্টিপাত প্রবল (১২০"); (২) অবহিমালয় অঞ্চলে শীত মৃদু, গ্রীষ্ম প্রখর, বৃষ্টিপাত প্রবল (১১৬"); (৩) পশ্চিমের নিম্ন-মালভূমি অঞ্চলে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, বৃষ্টিপাত গড়ে ৫৫"; (৪) মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলে শীত মৃদু, গ্রীষ্ম প্রখর এবং বৃষ্টিপাত নাতিপ্রবল (গড়ে ৬০")—জলবায়ু মহাদেশীয় প্রকৃতির; (৫) উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত উত্তরের সমভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অধিক (গড়ে ৭৫")—জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন।

পঃ বঙ্গের অধিকাংশ **নদ-নদীর** উৎস এই রাজ্যের বাহিরে। উত্তরে তিস্তা ও ইহার উপনদী রঙ্গিত, ঘীস্, চেল প্রভৃতি হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া এবং ধরলা, সঙ্কোশ, তোরসা, গদাধর, জলঢাকা প্রভৃতি জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীসমূহ অত্যন্ত খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। পঃ বঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী গঙ্গা ও ইহার শাখানদী ভাগীরথী-হুগলী। ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই ও ময়ূরাক্ষী দক্ষিণ দিক হইতে এবং জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বাম দিক হইতে ভাগীরথীর ক্ষীণ জলধারাকে পুষ্ট করিতেছে। হুগলী, মাতলা, হাঁড়িভাঙ্গা ও গোসাবা বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। ইছামতী, পিয়ালী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীর গতিও বঙ্গোপসাগরের দিকে। গঙ্গার মূলপ্রবাহ পদ্মা নামে পূর্ব বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহার উপনদী মহানন্দা তীরে মালদহ শহর অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গের নদীসমূহের অধিকাংশই মজা ও বন্যাপীড়িত। সম্প্রতি নদীসমূহের বন্যারোধ ও নাব্যতা-বৃদ্ধিকল্পে দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ও প্রথমটি অংশতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য নদীসমূহেরও সংস্কারসাধন আশু কর্তব্য।

বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায় ২৭% কৃষিজমি **জলসেচে** সিক্ত হইতেছে, তবে পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমাংশেই সেচ কার্যের প্রয়োজন ও প্রসার অধিক। সাধারণতঃ ডোঙ্গার সাহায্যেই জলসেচ কার্য চলে, অবশ্য উড়িষ্যা, হিজলী, মেদিনীপুর, দামোদর, ইডেন, বেহুলা, ডাঁনকুনী, শুভঙ্করী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি খালের সাহায্যেও সেচ কার্য চলিতেছে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত খালের সাহায্যেও জলসেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎচালিত নলকূপের সাহায্যেও সেচ কার্য পরিচালিত হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি

প্রাথমিক উৎপাদন—কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। জন-সংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক কৃষিজীবি। **ধান** প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা সর্বত্রই জন্মে, তবে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ বঙ্গেই ইহার উৎপাদন অধিক। অবশ্য একর প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চভূমি অঞ্চলে সামান্য **গম**; মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় **যব**, দার্জিলিং, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় **ভুট্টা** এবং প্রায় সর্বত্রই সামান্য **ডাল** জন্মে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বঙ্গ আত্মনির্ভরশীল নহে। উচ্চভূমি অঞ্চলে সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি **তৈল-বীজ, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু** প্রভৃতি অতি সামান্য পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচুর **চা** এবং ভাগীরথীর অববাহিকা, দামোদরের নিম্ন অববাহিকা এবং পূর্ণিয়া জেলায় প্রচুর **পাট** জন্মে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় পাটের উৎপাদন সামান্য; মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া (রঘুনাথপুরে তসর) জেলায় প্রচুর **রেশম** পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলার মংপুতে **সিঙ্কোনা**, কালিম্পং ও পুলবাজার অঞ্চলে **বড়এলাচ** এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রচুর **নারিকেল** জন্মে। দার্জিলিং জেলায় প্রচুর **কমলালেবু** এবং মালদহ, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচুর **আম** এবং সর্বত্রই নানাবিধ **ফল** পাওয়া যায়। এদেশে গবাদি **পশু**, মেষ, ছাগল, হাঁস ও মুরগী পালিত হয়, তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তৃত চারণ-ক্ষেত্রের অভাব হেতু ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্য ও ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। খাদ্য হিসাবে **মৎস্যের** ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পশ্চিম বঙ্গেই অধিক। এ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ধৃত হয় তবে ধৃত মৎস্যের দ্বারা স্থানীয় চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটান যায় না। পশ্চিম বঙ্গ **খনিজ** সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা প্রচুর পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলাতেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর টার্শিয়ারী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে মৃৎশিল্পের উপযোগী ফায়ার ক্লে এবং বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশে নানা রং-এর খড়িমাটি পাওয়া যায়। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। আয়তনের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে **বনভূমির** পরিমাণ অতি সামান্য। উপকূলাংশের বিস্তৃত জলাভূমির অরণ্যে (সুন্দরবন) সুন্দরী, গরান, গেঁউয়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, সোলা ও হোগলা নামক জলজ উদ্ভিদ; উপকূলাঞ্চলে নারিকেল, সুপারী, খেজুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ; উত্তর বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে দেবদারু, পাইন,

ফার প্রভৃতি বৃক্ষ; নিম্নতর অংশে শাল, শিশু, জারুল প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ও পশ্চিমের মালভূমির স্থানে স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিতে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ রহিয়াছে। আম, কাঁঠাল, জাম, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্রই দেখা যায়। নানা স্থানে বেত এবং পুরুলিয়ার ঝালদা ও বলরামপুরে প্রচুর লাক্ষা পাওয়া যায়।

পরিবহন—স্থল, জল ও আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। নদ-নদী ও বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও বর্ষাকালে প্লাবন হেতু উৎকৃষ্ট **রাস্তার** বিশেষ অভাব রহিয়াছে। তথাপি এই রাজ্যের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি পথে সারা বৎসবই যানবাহন চলাচল করে। ভবিষ্যতে জাতীয় রাজপথ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইলে এ রাজ্য হইতে অন্য রাজ্য এবং রাজ্যগত, জেলাগত ও গ্রাম্য পথসমূহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইলে এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত যাতায়াত বিশেষ সুগম হইবে। রাঁচী, বাঁকুড়া, জামসেদপুর, ধানবাদ, বর্ধমান ও বরাকরের সহিত পুরুলিয়া রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। এই দেশের উত্তরাংশের মধ্য দিয়া উঃ পূঃ **রেলপথ** এবং দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়া পূর্ব ও দঃ পূর্ব রেলপথ উহাদেব বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সহ প্রসারিত থাকায় পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা ও হাওড়া এই সমস্ত রেলপথের কেন্দ্রস্থল। গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, রূপনারায়ণ, দামোদর, কাঁসাই, মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি **নদী**গুলিব সাহায্যে জলপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা রহিয়াছে। কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থিত নদী-সংযোগকারী অনেক ছোট ছোট খাল কলিকাতার সহিত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে। গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে হুগলী-ভাগীরথী-গঙ্গা নদীপথের নাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। **বিমানপথে** কলিকাতা (দমদম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত।

গৌণ উৎপাদন—কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও পশ্চিম বঙ্গ অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এদেশেব শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৃহদায়তন শিল্পগুলি প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। (১) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল—কলিকাতা বন্দর, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, রেল ও জলপথে পরিবহনের সুবিধা এবং কাঁচামালের সুলভতা প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার সমন্বয়ে কলিকাতা-শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান শিল্প পাটশিল্প। ইহা ব্যতীত বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, এ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক, মৃৎশিল্প, প্রসাধন, কাগজ, রবার, চর্ম, মোটর গাড়ী প্রভৃতি সংক্রান্ত নানারূপ শিল্প এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) আসানসোল শিল্পাঞ্চল—ছোটনাগপুরের

মানভূমি হইতে লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ও বক্সাইট, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, ডি. ভি. সি'র বিদ্যুৎ, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য এবং রেলপথে পরিবহনের সুবিধা হেতু এ অঞ্চলে লৌহ ইস্পাত (বার্নপুর), রেলইঞ্জিন (চিত্তরঞ্জন), টেলিফোনের তার (রূপনারায়ণপুর), এ্যালুমিনিয়ম, সাইকেল, কাগজ, মৃৎশিল্প, চুল্লী নির্মাণের ইষ্টক, কোক-কয়লা প্রস্তুত প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুরে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা ও কয়লা হইতে কোক ও গ্যাস প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে। উপরোক্ত দুইটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীতও দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা ও তৎসংক্রান্ত শিল্প, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় শর্করা শিল্প ও খড়্গপুর এলাকায় রেলের যন্ত্রপাতি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বঙ্গের কুটির শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে তাঁত শিল্প (শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, পঃ দিনাজপুর), রেশম শিল্প (মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহ, পঃ দিনাজপুর), কাঁসা ও পিতলের বাসন (মুর্শিদাবাদ) লৌহদ্রব্য, মৃৎশিল্প, কাঁচ, উদ্ভিজ্জ তৈল, সাবান, কাঠের খেলনা, আসবাবপত্র, নারিকেলের ছোবড়া ও দড়ি, মাদুর, তালাচাবি, বিড়ি, লবণ, গুড়, শঙ্খ, স্বর্ণ-রৌপ্য, বাঁশ-বেত, খাদি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য—পাটজাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, লাক্ষা, চামড়া, কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি এই রাজ্যের প্রধান রপ্তানী এবং খাদ্যদ্রব্য, ইস্পাত, ধাতুদ্রব্য, মোটর গাড়ী, কলকব্জা যন্ত্রাপাতি, ঔষধ, কাঁচদ্রব্য, চিনি, কেরোসিন, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রধান আমদানী দ্রব্য।

বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র—সমুদ্র হইতে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত **কলিকাতা** এই রাজ্যের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর এবং পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য ও রেলকেন্দ্র। কলিকাতার নিকটবর্তী **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। **ডায়মণ্ড হারবার** কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহনার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর। ইহা রেলপথে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত **হাওড়া পূঃ** ও দঃ পূঃ রেলপথের প্রান্তিক স্টেশন, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা একটি সেতুর দ্বারা কলিকাতা শহরের সহিত সংযুক্ত। **মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, কালিম্পং, শ্রীরামপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বাটানগর, বহরমপুর, চিত্তরঞ্জন** অন্যান্য শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। **মালদহ** রেশম ও আমের জন্য বিখ্যাত। হুগলী জেলার **চন্দননগর** হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ঝালদা** (তসরশিল্প) ও **বলরামপুর** (লাক্ষাশিল্প) পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র। **আদ্রা** দঃ পূঃ রেলপথের অন্যতম প্রধান জংশন স্টেশন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত **দুর্গাপুর** একটি

নবগঠিত শিল্পাঞ্চল। শিল্প সংগঠনে বিরাট সম্ভাবনা-পূর্ণ দুর্গাপুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ় বলা হয়। রূঢ় পশ্চিম জার্মানীর তথা সমগ্র ইউরোপের একক বৃহত্তম কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চল। রূঢ় অববাহিকায় লৌহ আকরের অসদ্ভাব রহিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত লৌহ আকরের সাহায্যে এ অঞ্চলে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য রাইন নদী ও তৎসংলগ্ন খালসমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর পশ্চিম বঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখানে একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা ও কয়লা হইতে কোক ও নানা উপজাত দ্রব্য নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। পরবর্তীকালে এই দুইটি শিল্পকে ভিত্তি করিয়া আরও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। দুর্গাপুরের নিকটেই রাণীগঞ্জে প্রচুর কয়লা রহিয়াছে, তবে লৌহ আকর আসিবে উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে। দুর্গাপুরের জলাধার হইতে বড় খাল কাটিয়া পরিবহন ব্যবস্থারও সুবিধা করা হইতেছে। রূঢ় ও দুর্গাপুরের শিল্প সংগঠন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া দুর্গাপুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ় বলা হয়।

পরিশিষ্ট

ভারতের চা-শিল্প (Indian Tea Industry)—ভারতে ৬০০০-এরও অধিক চা-বাগান রহিয়াছে। ইহার ২০% পাঞ্জাবে এবং ১১% আসামে অবস্থিত। পাঞ্জাবের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪ একর মাত্র, কিন্তু আসামের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪০০ একরেরও অধিক। প্রতি চা-বাগানের নিজস্ব চা-প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। চা-পাতা তুলিবার পর অনতিবিলম্বেই চা-প্রস্তুত কার্য আরম্ভ করা প্রয়োজন, নতুবা পাতা শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণেই, চা-শিল্পাগারসমূহ চা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলেই স্থাপিত হয়। ভারতীয় চা-শিল্পে বর্তমানে ৫০ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৯·২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৫০ ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে ভারতে প্রায় ৬০০০ ও ৬৬৩৬ লক্ষ পাউণ্ড প্রস্তুত হয়। মোট উৎপন্ন চা-এর প্রায় ৮০% পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম হইতে আসে। ভারতের সমগ্র চা উৎপাদনের প্রায় ২৫ ভাগ দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪০১০ লক্ষ পাঃ। উহার মধ্যে যুক্তরাজ্য ২৮১০ লক্ষ পাঃ, ক্যানাডা, ১৭০ লঃ পাঃ, অস্ট্রেলিয়া ৬০ লঃ পাঃ, মিশর ১৫০ লঃ পাঃ, যুক্তরাষ্ট্র ২৫০ লঃ পাঃ এবং ফ্রান্স, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশ অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে।

বর্তমানে সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন, জাপান, ফরমোজা এবং ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশ ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে ভারতীয় চা-এর সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ভারতীয় চা-রপ্তানীর ক্রমক্ষীয়মাণ পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই মনে হয় যে চা-এর উৎকর্ষ বিধান একান্ত প্রয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। "কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড" বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এদিকে কিছুদূর সাফল্যলাভও যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা-বাগান অঞ্চলে কয়লা প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া ওঠায় চা-এর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্যা, রাসায়নিক সারের অপ্রাচুর্য হেতু চা-এর উৎপাদন হ্রাস এবং চা-বাক্সের অভাব ও উৎপাদিত চায়ের অপকর্ষ হেতু বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইতেছে। তবে সম্প্রতি ভারত সরকারের সহায়তায় কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন সৌকর্য-সাধন, সারের সরবরাহ বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, অর্থসাহায্য, চা-বাক্সের সরবরাহ বৃদ্ধি, চা-এর উৎকর্ষসাধন এবং মধ্যপ্রাচ্য, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে অধিকতর পরিমাণে চা বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ভারতীয় চা-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the economic geography of West Bengal. (C. U. '54)

(পশ্চিম বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৪৭৬-৪৮২)

2. "Durgapur is the future Ruhr of India" Justify this statement. (C. U. '46)

("দুর্গাপুর ভারতের ভবিষ্যৎ রুঢ়" এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।) (পৃঃ ৪৮১-৪৮২)

3. Examine briefly the development of tea industry of India.

(ভারতীয় চা শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ৪৮২-৪৮৩)

4. Write a brief account of the *large scale industries* of West Bengal under the following heads (i) Nature of industries and producing centres ; (ii) Raw materials ; (iii) Production , (iv) Labour and market.

((i) উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের প্রকৃতি , (ii) কাঁচামাল ; (iii) উৎপাদন ; এবং (iv) শ্রমিক ও বাজার উল্লেখপূর্বক পশ্চিম বঙ্গের বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।) (H. S. '61)

5. Write a brief account of the agricultural resources, mineral resources and industries of West Bengal. (H. S. '63)

(পশ্চিম বঙ্গের কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও শিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ।)